বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়: সামাজিক সচলতা ও বর্ণজাতি কাঠামো

(খ্রি. ষোড়শ- খ্রি. অষ্টাদশ শতাব্দী)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর কলা অনুষদে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক- অভিজিত সাধুখাঁ

রেজিস্ট্রেশন নং- AOOCL1100217

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ- ২৭/১১/২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

ড. ঈপ্সিতা হালদার

সহযোগী অধ্যাপক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২১

Certificate

Certified that the thesis entitled **বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়: সামাজিক সচলতা ও বর্ণজাতি কাঠামো (খ্রি. ষোড়শ - খ্রি. অষ্টাদশ শতাব্দী)** submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts (Comparative Literature) at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Epsita Halder, Associate Professor, Department of Comparative Literature, Jadavpur University.

Neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Abhijit Sadhukhan

Dated: 09.07.2021

Registration No: AOOCL1100217

Date of Registration: 27.11.2017

Countersigned

8/7/2021

Dr. Epsita Halder

(Supervisor)
Associate Professor
Department of Comparative Literature
Jadavpur University
Kolkata- 700032

প্রাক্কথন

এম.ফিল. স্তরে গবেষণার সূত্রে ভারতীয় বর্ণজাতিকাঠামো সম্পর্কে পরিচিত হতে শুরু করেছিলাম। গবেষণার বিষয় ছিল—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে জাতিপ্রথা (খ্রি. ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী)। তখনই বুঝতে পারি, এই বিষয়ে পড়াশোনার যে সূত্রপাত হল তা সহজে থামানোর নয়। জাতপাত ভারতীয় সমাজের এমনই এক কেন্দ্রীয় বিষয়, এমনই এক বিস্তৃত বিদ্যায়তনিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু—যে বিভিন্ন খুঁটিনাটি আর ঘাঁতঘোত বুঝতে, পড়তে পড়তে ভারতীয় সমাজকে চিনতে সময় লাগে অনেকদিন। সেই চেনাও মাঝেমাঝেই 'আধো-চেনা' বলে ঠেকে। এই বিষয়ের বহুমাত্রিকতা আর নানা স্তর, জটিলতাকে বুঝতে চাওয়ার ইচ্ছা থেকেই পিএইচ.ডি. গবেষণার বিষয় হিসাবেও জাতপাতকে কেন্দ্রে রাখার ক্ষেত্রে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ছিল না। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, এম.ফিল. গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সাধ্য-সাধন তত্ত্বের নিরিখে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জাতপাত বিষয়ে মনোভাব পর্যালোচনা। সাধ্য-সাধন তত্ত্বের বিশিষ্টতা কীভাবে জাতপাতের বিচারকে প্রভাবিত করে তা বুঝতে দেখেছিলাম অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধন তত্ত্বকেন্দ্রিক শাস্ত্র ও জাতপাতের সম্পর্ক। মূল ঝোঁক এখানে দর্শনগত। পিএইচ.ডি. গবেষণার মূল লক্ষ্য বিভিন্ন 'নিচু' জাতের আঞ্চলিক স্তরে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জনের ভিত্তিতে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা অধিকার করে জাতে 'ওঠা'র চেষ্টার অনুসন্ধান। শাস্ত্রের চেয়ে এখানে ঝোঁক বিবরণাত্মক তথ্যসূত্রে; অনেক বেশি জোর অর্থনৈতিক ইতিহাসে, আঞ্চলিক আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে। খুব মোটা দাগে বললে, এই গবেষণা অনেক বেশি করে সমাজ-বাস্তবতা (social reality) কেন্দ্রিক।

কোভিড-১৯ অতিমারী জনিত লকডাউনের দুঃসহ সময়ের মধ্যে এই সন্দর্ভ লেখা চলেছে। নানাবিধ প্রতিকূলতা অনিবার্যভাবেই এই গবেষণার সঙ্গী। তবু, হয়তো বা সন্দর্ভ লেখার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পেরেই অতিমারীর ভয়াবহ আঁচের মধ্যেই মানসিক স্থিতির একটা অবলম্বন পাওয়া গেল। অনবধানবশত কোথাও কোথাও বানানের সমতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে; মুদ্রণপ্রমাদও রয়ে গেল কিছু। সবশেষে বলি, ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, যে বই আমরা লিখতে চাই, আর যে বই আমরা লিখি—দুটো এক বই নয়। এই সন্দর্ভের ক্ষেত্রেও সেই কথাটুকু ধার নিলাম। অপূর্ণতা নিয়েই চলুক 'আত্মানং বিদ্ধি'র যাত্রা।

অভিজিত সাধুখাঁ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মধ্যযুগের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার উৎসাহ তৈরি করে দিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমার শিক্ষক দীপান্বিতা ঘোষ। আশ্চর্য দক্ষতায় আর অসম্ভব যত্নে, পরিশ্রমে যেভাবে হাতে ধরে মধ্যযুগ চর্চার খুঁটিনাটি উনি শিখিয়েছিলেন, তাতে ওঁর সম্পর্কে 'আমার শিক্ষক' বললে অদ্ভুত অধিকারবোধ আর আত্মশ্লাঘা হয়। সাত বছর আগে এক বৃষ্টির দিনে উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা ওঁকে 'বাঁচিয়ে' রাখতে চেয়েছি আমাদের সীমিত মেধায়, গবেষণায়। এই গবেষণা তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

এই গবেষণার প্রারম্ভিক পর্বে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল বিশ্বভারতীর ইন্দো-তিব্বতীয় বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠকের সঙ্গে। তাঁর সান্নিধ্যই একটা বিরাট প্রাপ্তি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ আর সুপরামর্শে এই গবেষণা দিশা পেয়েছে। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক কুণাল চক্রবর্তী ও রণবীর চক্রবর্তী আমার গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনা করে, মতামত দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সমিতির সদস্য, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক দেবার্চনা সরকারের নানা মূল্যবান পরামর্শে উপকৃত হয়েছি। তাঁকেও আমার প্রণাম জানাই। গবেষণাপর্বে নানা সময়ে পরামর্শ, খোঁজখবর আর উৎসাহ দিয়েছেন অধ্যাপক ঈপ্সিতা চন্দ, অধ্যাপক অপর্ণা রায়, অধ্যাপক সুদেষ্ণা ব্যানার্জি, অধ্যাপক তিলোত্তমা মুখার্জি, অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ঋতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অভিষেক বসু। তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল।

গবেষণার একেবারে শেষপর্বে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্মৃতিকথার হদিস দিয়েছেন অধ্যাপক গোপা দত্ত। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক অর্জুনদেব সেনশর্মা আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আর বর্ণজাতিপ্রথা সম্পর্কে তাঁর মেধাবী বিশ্লেষণ এই গবেষণাকেও সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইপত্র ব্যবহার করতে দেওয়ার পাশাপাশি এই গবেষণার পাণ্ডুলিপি পড়ে তিনি মতামত দিয়েছেন। অধ্যাপক শেখর ভৌমিকও আমার গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, বইপত্র দিয়েছেন। মল্লভূম বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি আমার বিশেষ কাজে লেগেছে। এঁদের প্রত্যেককে আমার প্রণাম, কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপক মনস্বিতা সান্যাল, অধ্যাপক সত্যবতী গিরি ও উমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ঈপ্সিতা হালদারের অপরিসীম উৎসাহ, সজাগ দৃষ্টি আমার প্রাপ্তি। বোধ করি, তার থেকেও বড়ো প্রাপ্তি গবেষণাকর্মে তাঁর থেকে পাওয়া চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পেরে থাকলে আনন্দিত হব। তাঁর প্রতি আমার অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক পার্থসারথি ভৌমিক ও দেবশ্রী দত্ত রায়কেও এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই।

আঞ্চলিক ইতিহাসের চর্চার সঙ্গে এই গবেষণার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ইতিহাসবিদদের অফুরান সাহায্যে আমি ধন্য। বাঁকুড়া গবেষক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করার, কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। বাঁকুড়া বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে ডেভিড ম্যাক্কাচন, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের মতো গবেষকরাও যাঁর সান্নিধ্যে মুগ্ধ হয়েছেন, সেই চিত্তরঞ্জন বাবুর সান্নিধ্যলাভ খুব তৃপ্তির। তিনি প্রয়াত হয়েছেন বছরখানেক আগে। বেদনা নিয়েই তাঁকে স্মরণ করি। চিকিৎসক ও সমাজবিজ্ঞানী দেবাশিস বসুর সঙ্গে

আলোচনার সূত্রে আমার ভাবনা সুবিন্যস্ত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ সংগীতের ঘরানা সম্পর্কে আমাকে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বিশিষ্ট ধ্রুপদ শিল্পী জগন্নাথ দাশগুপ্ত। লকডাউনের কঠিন সময়ে আঞ্চলিক ইতিহাস সংক্রান্ত বইপত্র, তথ্য, খোঁজখবর দিয়ে উপকৃত করেছেন প্রদীপ কর, তুলসীদাস মাইতি। প্রভূত সাহায্য করেছেন সুভাষ রায়, দিলীপকুমার গোস্বামী, মধুপ দে, জলধর হালদার। লকডাউনে বইপত্রের অপ্রতুলতার মধ্যেও অবাধে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছেন বাঁকুড়া শহরের পশ্চিম রাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের গৌতম দে ও চন্দন শুকুল। বাসুদেব মোশেলের আন্তরিক সহযোগিতায় আলাপ হয়েছে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সংগ্রাহক অশোক রায়ের সঙ্গে। অশোক রায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এই কঠিন সময়েও পুরনো বাংলা পত্রিকার আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। এঁদের প্রত্যেককে আমার প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার জন্য জাপানের Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund এর তরফ থেকে বিদেশের গ্রন্থাগারে গবেষণা কর্ম চালানোর জন্য আমি একটি গবেষণা বৃত্তি (Sylff Research Abroad Award) পাই। এই সংস্থার আধিকারিকদের দক্ষ সহযোগিতা, কোভিড-১৯ অতিমারীর কঠিন সময়েও বিকল্প পথ খোঁজার চেষ্টা, পাশে থাকার ভাবনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁদের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এই গবেষণা বৃত্তি লাভের প্রক্রিয়ায় সর্বক্ষণ আমার পাশে ছিলেন অধ্যাপক জয়শ্রী রায়। অসম্ভব কর্মব্যস্ততার মাঝেও জয়শ্রীদির প্রতিটি বিষয়ে খুঁটিনাটি নজর আর জীবনবোধ আমাকে বরাবরের মতোই আবারও আশ্চর্য করেছে। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। যাদবপুরে SYLFF-এর তৎকালীন নির্দেশক অধ্যাপক শিবাশিস চ্যাটার্জির প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই গবেষণা বৃত্তিলাভের প্রক্রিয়ার অংশীদার স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অফ লণ্ডনের অধ্যাপক রিচার্ড উইলিয়ামস এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমরে বঙ্গাকে। ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লণ্ডনে

আমার গবেষণাকর্মের সহায়ক জ্যাক ক্লিফটের প্রতিও ভালোবাসা রইল। এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সুজান মুখার্জি ও অরিত্র চক্রবর্তীকে। নানা প্রয়োজনে তাঁদের বিরক্ত করেছি আর অসীম ধৈর্যে তাঁরা আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন।

গোপীবল্লভপুর শ্রীপাট থেকে আমার গবেষণার উপযুক্ত বইপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অনঙ্গমঞ্জরী গোস্বামী ও গৌরকিশোরানন্দ দেবগোস্বামী। এছাড়াও ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট, খানাকুল-কৃষ্ণনগরে অভিরাম দাসের শ্রীপাট, চৈতন্যডোবায় কিশোরীদাস বাবাজীর শ্রীপাট, কাটোয়ায় কেশব ভারতীর শ্রীপাট, শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের শ্রীপাট, যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাট, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের শ্রীপাট, নবদ্বীপে হরিবোল কুটিরের কর্তৃপক্ষের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মে জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস ক্যালকাটা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচারের গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছে আমি ঋণী। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা রইল archive.org ,library genesis, Ask For PDF From People With Institutional Access, মলাট ইত্যাদি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রতি। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বইপত্র , দুষ্প্রাপ্য লেখা জোগাড় করতে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক দেবদত্তা চৌধুরী, অধ্যাপক আপ্রী দত্ত, অধ্যাপক অভিষেক ঘোষাল, অধ্যাপক প্রণব সাহা, বিজলীরাজ পাত্র, যশোধরা গুপ্ত, সৌমেন পাল, শাশ্বতী সেনশর্মা। অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন নেহা চ্যাটার্জি। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ‘ঐতিহ্য’ পত্রিকায়। এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। অধ্যাপক সঞ্চিতা বসু বঙ্গবাসী কলেজ (প্রাতঃ

বিভাগ) -এ আমাকে আমার গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেছিলেন। বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ এসেছিল যাদবপুর SYLFF- এর গবেষণা বক্তৃতামালায়। কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে আমাকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, প্রিয় সহকর্মী অধ্যাপক দেবাদিত্য ভট্টাচার্য। গবেষণাকাজে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের নিরন্তন উৎসাহদান আমার কাছে খুব তৃপ্তির। এই বক্তৃতাগুলির সূত্রে আমি ভাবনাকে বিন্যস্ত করতে পেরেছি, নানা নতুন প্রশ্নের নিরিখে নিজের মত যাচাই করার সুযোগ হয়েছে। এঁদের প্রত্যেককে আমি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি ভালোবাসা রইল। ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক অনিন্দ্যশেখর পুরকায়স্থ আমার গবেষণায় প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন। ইংরেজি বিভাগের আরেক অধ্যাপক শান্তনু ব্যানার্জির সূত্রে পুরুলিয়া ও মানভূম সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ দিলীপকুমার গোস্বামীর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। তাঁকে আমার ভালোবাসা জানাই। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পুরুলিয়া থেকে একটি বই জোগাড় করে পাঠিয়েছেন আমার ছাত্র ঝর্ণা মাহাতো। তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ঐতিহাসিক গবেষণার নানা পদ্ধতিগত খুঁটিনাটি জানতে চেয়ে বারংবার বিরক্ত করেছি মালিনী সিদ্ধান্ত ও দেবকুমার ঝাঁঝকে। দেবকুমারদা’র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল বন্ধু শতভিষা। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার ভালোবাসা রইল। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বই লকডাউনের মধ্যেও ঝাড়গ্রাম থেকে পাঠিয়েছেন মামৃতা নন্দী। মামৃতাকে শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা জানাই। আমার প্রাক্তন সহকর্মী, বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিমাদ্রি চ্যাটার্জি আমার সঙ্গে গবেষণা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, পাণ্ডুলিপি পড়ে মতামত দিয়েছেন। গবেষণা সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসায় আমি বহুবার হিমাদ্রিদার দ্বারস্থ

হয়েছি। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার সুবাদে এই গবেষণার ভাবনা, যুক্তিক্রম অনেক সংহত হয়েছে। হিমাদ্রিদার প্রতি আমার বিশেষ ভালোবাসা রইল।

লকডাউনের মধ্যেও বিষ্ণুপুর আর সপ্তগ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা সম্ভব হয়েছে আমার বন্ধু ঋত্বিক মল্লিক আর অরুন্ধতী দাসের অপরিসীম আগ্রহ আর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায়। এই গবেষণার বিভিন্ন কার্যক্রমে ঋত্বিকদা আর অরুন্ধতীর উৎসাহ আর সাহায্য আমার চিরকাল স্মৃতিতে থাকবে। তাঁদের দু'জনকেই আমার ভালোবাসা জানাই।

শাশ্বতী, অধ্যাপক শাশ্বতী রায়, আমার অনুজপ্রতিম। শাশ্বতী নিজেও গবেষণা করছেন বঙ্গদেশের কুলজি শাস্ত্র-সাহিত্য বিষয়ে। খুব কাছাকাছি বিষয়ে চর্চার দরুণ তাঁর থেকে পাওয়া নানা খবরাখবর, বইপত্র আমার নিয়মিত কাজে লেগেছে। প্রতিনিয়ত নানা দরকারে আমার বিভিন্ন প্রয়োজনে শাশ্বতীর অকৃপণ সাহায্যে আমি যারপরনাই মুগ্ধ। তাঁর গবেষণা ও ভবিষ্যৎ জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

অভিজিৎ ব্যানার্জি আমার পড়াশোনা আর গবেষণার নিত্যসঙ্গী। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আমার যাবতীয় বিদ্যায়তনিক কাজকর্ম এগিয়ে থাকে। তাঁর যুক্তি, ভাবনায় এই গবেষণা প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হয়েছে। এই অকিঞ্চিৎকর গবেষণার সামান্য মূল্যও যদি থেকে থাকে, তবে তাতে তাঁর অনেকখানি অবদান। তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা রইল।

অধ্যায়সূচি

প্রাক্কথন		i
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		iii
ভূমিকা		১
প্রথম অধ্যায়	সামাজিক সচলতা ও বর্ণজাতিকাঠামো: পাঠপদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা	৮৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: স্থান, কাল, পাত্র	১২৫
তৃতীয় অধ্যায়	বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: সুবর্ণবণিক	২০২
চতুর্থ অধ্যায়	বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: মল্লরাজবংশ	২৫৭
পঞ্চম অধ্যায়	বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: সদ্‌গোপ	৩১১
সিদ্ধান্ত		৩৬৩
গ্রন্থপঞ্জি		৩৮৮

ভূমিকা

'আধুনিকতা'র সঙ্গে জাত-পাতের সম্পর্ক ঠিক কীরকম? ইউরোপ আমাদের যে 'আধুনিকতা'র ধারণা দিয়েছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রগতি, সমানাধিকার, মানবাধিকার সম্পর্কিত বোধ। ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে এই 'আধুনিকতা'র সঙ্গে আমাদের পরিচয়; তাতে নিশ্চিতভাবে বদলে গেল ভারতীয় সমাজের চিন্তার বিভিন্ন ধরন। প্রগতি, সমানাধিকার আর মানবাধিকারের দাপটে নষ্ট হল কি জাতপাতের পুরনো ছবিটা? ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে পাস হয় 'Caste Disabilities Removal Act'। এই আইন মোতাবেক স্বধর্মত্যাগের ফলে কোন হিন্দু জাতিচ্যুত হলেও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না। আইনের কথা বাদ দিলেও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চেতনাতেও 'আধুনিকতা'র স্পর্শ লাগতে থাকে। মহারাষ্ট্রে উনিশ শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান মুখ জ্যোতিবা ফুলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের এক কড়া প্রতিভাষ্য তৈরি করেন *গুলামগিরি* বইতে। *গুলামগিরি* পড়লেই দেখা যায় ফুলে ও তাঁর অনুগামীরা টমাস পেইনের *Rights of Man*-এর দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। পেইনের বইটি তাঁদের প্রগতি, সমানাধিকারের পক্ষে লড়াই চালানোয় উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু, বিবিধ আইন আর 'আধুনিকতা'র স্পর্শ প্রাণিত ফুলেদের প্রতিভাষ্য কি সত্যিই জাতপাতের যাবতীয় অস্তিত্ব আর সমীকরণ বিনষ্ট করতে পারল? উত্তরটা মোটের উপর—না। আসলে স্তরবিন্যস্ত একেকটি জাতের সঙ্গে 'আধুনিকতা'র সম্পর্কও একেকরকম। 'উঁচু' জাতগুলি 'আধুনিকতা'র সুযোগ-সুবিধা হস্তগত করে সমাজজীবনে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। অন্যদিকে, 'নিচু' জাতগুলি দেখতে পাচ্ছে 'আধুনিকতা'র মধ্যে বন্দিত্ব মুক্তির একপ্রকার সম্ভাবনা। পাশাপাশি, তাঁরা এও বুঝছেন যে, 'আধুনিকতা' আর সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধার নিয়ন্ত্রণ আর কর্তৃত্বও তথাকথিত উঁচু জাতগুলির

হাতেই। স্বাভাবিকভাবেই, 'আধুনিকতা'র সঙ্গে ভারতীয় জাতপাতের সম্পর্ক একমাত্রিক নয়। খ্রিস্টীয় ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে কয়েকটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক সচলতা আমাদের আলোচ্য হলেও, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আঠারো ছাড়িয়ে উনিশ, বিশ, এমনকি একুশ শতকেও জাতপাত আর সামাজিক সচলতার অস্তিত্ব। 'আধুনিকতা' সেই অস্বিত্বকে মুছে দিতে পারেনি। বরং, ধর্মসম্প্রদায়, বিশেষত সগুণ ভক্তিপ্রস্থানগুলি যেমন জাতপাতের ব্রাহ্মণ্য কাঠামোর সঙ্গে সমঝোতা করে সামাজিক সচলতার মাধ্যমে জাতপাতের কাঠামোকেই স্থায়িত্ব দিয়েছিল; ঠিক তেমনভাবেই উনিশ-বিশ বা একুশ শতকেও জাতপাত আর সামাজিক সচলতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পাল্টে অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। এও 'আধুনিকতা'র সঙ্গে জাতপাত আর সামাজিক সচলতার একপ্রকার বোঝাপড়া। বৃহত্তর সময়ের প্রেক্ষিতে জাতপাত আর সামাজিক সচলতার নব নব সমীকরণ বুঝতে পারলে আদতে আমাদের আলোচ্য কালপর্বের জাতপাত আর সচলতার বৈশিষ্ট্য আর স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত বোঝাপড়াই মজবুত হয়। জাতপাত আর 'আধুনিকতা'র এই প্রতর্ককে আমরা পড়তে চাইব কতকগুলি প্রবণতার মাধ্যমে। আমরা মনে রাখব, জাতপাত আর সামাজিক সচলতা একইসঙ্গে একটি বহুমুখী সামাজিক অস্তিত্ব বা প্রথা, অধিকার-রক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলনের কেন্দ্র, একধরনের সক্রিয়তাবাদ (activism); আবার, ভারতীয় সমাজকে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠপদ্ধতিও। এই দুটি দিকের মধ্যে সবসময় জল-অচল ভেদও থাকে না। এই দুটি দিক মাথায় রেখেই আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রবণতা আন্দাজ করতে পারি।

এক, উনিশ-বিশ শতকের 'আধুনিকতা' ও ভারতীয় সমাজে জাতপাত ও সামাজিক সচলতার ধরন।

দুই, উনিশ-বিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের জাতপাত সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তা।

তিন, উনিশ-বিশ শতকে ভারতীয় চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদদের রচনায় জাতপাত ও সামাজিক সচলতার প্রসঙ্গ।

চার, আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্র ও ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাত আর সামাজিক সচলতার প্রকৃতি।

পাঁচ, ব্রিটিশ প্রশাসক এবং পরবর্তীকালের ভারতীয় ও বিদেশি তাত্ত্বিকদের গবেষণায় সামাজিক সচলতা সম্পর্কিত ধারণা।

একে একে প্রবণতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা যাক। আঠারো শতকের একদম শেষ ভাগে কোলব্রুক *Remarks on the Present State of Husbandry and Internal Commerce of Bengal* (১৭৯৫ খ্রি.) বইতে জানাচ্ছেন যে পেশাবদলের প্রবণতা সেই সময়েও ছিল। কয়েকটি পেশা বাদ দিলে মোটামুটি অনেকগুলি পেশাই ছিল সমস্ত জাতের কাছে উন্মুক্ত। যদিও সাধারণভাবে কৌলিক বৃত্তির অনুসরণ ছিল বাঞ্ছনীয়। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে *East India Gazetteer*-এর লেখক হ্যামিল্টনও বলেছেন ব্রাহ্মণদেরও তিনি ক্ষাত্রবৃত্তি বা শূদ্রবৃত্তি অনুসরণ করতে দেখেছেন। কারিগর শ্রেণিভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে সম্ভবত কৌলিক বৃত্তি অনুসরণের ঝোঁক কিছুটা বেশি ছিল। কিন্তু, সেটাও কোন সার্বিক প্রবণতা নয়। বৃত্তিবদল এইসব জাতেও দেখা যেত। কৌলিক বৃত্তি থেকে সরে আসার প্রবণতার পরিসংখ্যানগত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৩৩.৫৪% এবং বৈদ্যদের ৩৬.১০% কৌলিক বৃত্তিতে নিয়োজিত। তুলনায় কুম্ভকার (৭৫.১৬%), কর্মকার (৪৭.৩৫%), গোয়ালা (৪১.৪৫%)-রা অনেকবেশি কৌলিক বৃত্তিতে সম্পৃক্ত।[১] কোলব্রুক যে লিখেছিলেন

[১] অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, *জাতিভেদপ্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ*, কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১, পৃ.২০

কৌলিক বৃত্তির অনুসরণ বাঞ্ছনীয় থাকলেও কার্যক্ষেত্রে কৌলিক বৃত্তির বদল লক্ষ করা যেতই, তার কিছু সাহিত্যিক প্রমাণ আছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর *আত্মচরিত* (প্রথম প্রকাশ ১৯১৮ খ্রি.)-এ বাল্যকালের স্মৃতিচারণায় (আনুমানিক উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কথা) দেখা যাচ্ছে, কলকাতার নিকটবর্তী জয়নগর গ্রামের কাছে মজিলপুর গ্রামের অধিবাসী বাৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণরা মূলত যজন-যাজন-অধ্যাপনাতেই যুক্ত ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্যই সর্বপ্রথম এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করে ইংরেজ গর্ভনমেন্টের অধীনে পণ্ডিতি কর্ম নেন। এই গ্রামের অন্য কোন ব্রাহ্মণ এর আগে রাজকার্যে যুক্ত ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই এই কাজের জন্য হরানন্দকে গ্রামসমাজে প্রবল অপ্রিয় হতে হয়।[২] এই বৃত্তান্তের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সত্য আছে। কৌলিক বৃত্তি অনুসরণ যতই ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমাজের মনঃপুত হোক না কেন; আসলে ইতিহাসের গতি রুখে দেওয়া সেই সমাজের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। বোঝা যাচ্ছে, বঙ্গদেশের ‘উচ্চ’জাতিগুলিই আধুনিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে নানা আধুনিক পেশায় যুক্ত হয়ে পড়েন। এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে সংগতি রেখেই *Calcutta Old and New* বইতে কটন জানালেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙালি সমাজে জাতিগত বৃত্তিভেদ অনেকটাই ক্ষুয়িষ্ণু ধারণা। তবে, এতে ‘উচ্চ’ জাতির উপকৃত হবার প্রবণতা যতটা খেয়াল করা যায়; ‘নিচু’ জাতগুলি কিন্তু ততটা উপকৃত হয়নি। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ছাড়াও নবশাখ অর্থাৎ সদ্‌গোপ, তন্তুবায়, কৈবর্ত বা মাহিষ্যরা কৌলিক বৃত্তির বদলে উচ্চতর ও অপেক্ষাকৃত লাভজনক বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। কৈবর্ত বা অন্যান্য নবশাখগোষ্ঠীর কৌলিক পেশাবদল এবং সমাজে উচ্চতর স্থানলাভের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উনিশ শতকের শুরু থেকেই সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবুবিলাস* (প্রথম প্রকাশ ১৮২৩ খ্রি., মতান্তরে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ)- এ দেখছি অর্থকরী বিদ্যায়

[২] শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, পুনর্মুদ্রণ, ২০০০, পৃ.৪

কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করেই স্বজাতীয় পেশা চাষবাস ইত্যাদি ত্যাগ করে কৈবর্ত বা নানা জাতের লোকই গুরুমহাশয়ের বৃত্তি নিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ভবানীচরণ সেই প্রবণতাকে ভালো চোখে দেখেননি। স্পষ্টই বলেছেন—

'কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুমহাশয় ব্রাহ্মণ ঠাকুর হইতে অধিক উপকার'।[৩] ভবানীচরণের কাছেও অবাঞ্ছিত ছিল ব্রাহ্মণের কৌলিক পেশায় অন্য বর্ণের হস্তক্ষেপ। 'নিচু' জাতগুলোর এই বাড়বাড়ন্ত হুতোম ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহও খুব একটা পছন্দ করেননি। পাশ্চাত্য শিক্ষা, ধর্মসংস্কার ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে 'নিচু' জাতগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখে *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৮৬৮ খ্রি.)-য় কটাক্ষভরে তিনি লিখেছেন—

> অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন কাএতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠ্লো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন—ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যেসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগ্‌লো—[৪]

'হাড়িশাক' বা 'মুচিশাক' শব্দের মধ্যে হাড়ি বা মুচিদেরও নবশাখ মর্যাদা লাভের চেষ্টার প্রতি হুতোমের কটাক্ষ স্পষ্ট। পেশাবদলের মাধ্যমে সামাজিক সচলতার যেধরনের সম্ভাবনা প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের বঙ্গদেশে ছিল, সেই প্রবণতার অস্তিত্ব আমরা উনিশ শতকেও দেখতে পাচ্ছি। সময়ের নিয়ম মেনে পেশার ধরন বদলালেও অভিমুখটি বজায় আছে। অনেক তথাকথিত নিচু জাতের লোকই উনিশ শতকে টাকার জোরে সমাজে আধিপত্য তৈরি করতে পারলেন। তাঁরাই হয়ে উঠলেন সমাজের মাথা। অতীত গ্লানিময় অবস্থান মুছে ফেলে জাতের গৌরব জাহিরের চেষ্টা শুরু করলেন তাঁরা। উনিশ শতকের প্রচলিত ছড়ায় সেসব চেষ্টার

---

[৩] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস(সম্পা.), *নববাবুবিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়,* কলিকাতা: সুবর্ণরেখা, নব সংস্করণ, ১৯৭৯, পৃ.৬

[৪] অরুণ নাগ(সম্পা.), *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮, পৃ.৫৪

স্বাক্ষর আছে—'দুলোল হল সরকার আর ওক্কুর হল দত্ত,/ আমি কি না রইবো যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত'। ঔপনিবেশিক আমলে নতুন আর্থিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে অনেক বেনিয়াই প্রবল আর্থিক প্রতিপত্তির দৌলতে কলকাতা শহরে কেউকেটা হয়ে উঠলেন। হুতোম আবারও কটাক্ষভরে লিখলেন—

> নবো মুনসী, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো।... রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠ্‌লো।

কেষ্টা বাগদি বা ছুঁচো শীল ওরফে মতিলাল শীলের মতো সুবর্ণবণিকের মুরুব্বি হয়ে ওঠা হুতোম মেনে নিতে পারেননি। এই কটাক্ষের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক পালাবদলের সূত্রে সামাজিক আধিপত্যের পরিবর্তন সম্পর্কে হুতোমের মনোভাব স্পষ্ট। তাঁর মনে হয়েছিল টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠেছে।[৫]

সত্যিই কি উনিশ শতকে অর্থকৌলীন্য বংশকৌলীন্যকে ছাপিয়ে গেল? জাতের কোন গুরুত্বই আর রইল না? আমাদের মনে হয়, হুতোমের মতো বিদগ্ধ সমাজ পর্যবেক্ষক ঠিক তা বলতে চাননি। বরং, টাকার জোরেই যে জাতের মর্যাদা কিনে নেওয়া যায়, সমসময়ের নিরিখে হুতোম নিশ্চয়ই তা বুঝতেন। তন্তুবায়দের মতো বিত্তশালী গোষ্ঠী 'ভদ্রলোক' মর্যাদা পাওয়ার জন্য 'উঁচু' জাতের আচার-আচরণ নকল করতে শুরু করেছিলেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের তাঁতিদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত থাকলেও কলকাতার তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বিত্তশালী প্রতিনিধি, শেঠ ও বসাকরা, 'উঁচু' জাতের মতোই এসব আচরণের তীব্র বিরোধিতা

---

[৫] তদেব, পৃ.৬৫

করেন। 'নিচু' জাতের বিত্তশালী লোকদেরও ভদ্রলোক সমাজে জায়গা পাবার আগে 'উঁচু' জাতের মর্যাদা আদায় করতে হত।[৬]

উনিশ শতকে টাকা আর বংশমর্যাদার সম্পর্ক বুঝতে গেলে আমাদের দলাদলির ইতিহাসে নজর দিতে হবে। দলাদলি সেকালের শহর কলকাতার এক আশ্চর্য জিনিস। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কলিকাতা কমলালয়* (প্রথম প্রকাশ ১৮২৩ খ্রি.)-এ দেখা যাচ্ছে গ্রাম থেকে সদ্য কলকাতায় আগত এক ব্যক্তি দলাদলি বিষয়ে শহরের এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। কলকাতায় দল তৈরির ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ দেব শহর কলকাতায় পা রাখার আগেই অন্তত দুটি দলের কথা জানা যাচ্ছে। একটি দলের নেতা ছিলেন মদনমোহন দত্ত, আরেকটি দলের নেতা কেষ্টচরণ মিত্র। নবকৃষ্ণ দেব কেষ্টচরণ মিত্রের দলে যোগ দেন এবং মৌলিক কায়স্থ হয়েও খুব দ্রুতই এই দলের নেতা হয়ে বসেন। প্রাক্-ঔপনিবেশিক কালের রাজাদের মতোই নবকৃষ্ণ কুলীন ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে কলকাতা শহরে বসতি তৈরি করান। এই কুলীন ব্রাহ্মণ আর ঘটকদের সাহায্যে দলপতি নবকৃষ্ণ তাঁর পৌত্র রাধাকান্ত দেবকে কুলীন কায়স্থ পরিবারে বিয়ে দিয়ে জাতিগত মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টা করেন। একজাই করে কুলীনদের ক্রমোচ্চ বিন্যাস তৈরি করা হয় এবং নবকৃষ্ণ গোষ্ঠীপতি হিসাবে স্বীকৃত হন। এইভাবে নবকৃষ্ণ পুরনো পারিবারিক ইতিহাসকে মুছে ফেলতে চান। দল নবকৃষ্ণের মতো উঠতি বড়োলোকদের জাতিগত মর্যাদার স্বীকৃতির সহায়ক হয়ে ওঠে।[৭] দলে সাধারণত নানা জাতের লোকই থাকতেন। তবে, *কলিকাতা কমলালয়*-এর সূত্রে আমরা জানি, সুবর্ণবণিকদের মতো কিছু একজাতীয় দলও ছিল।[৮]

---

[৬] S.N.Mukherjee, *Calcutta: Essays in Urban History*, Calcutta: Subarnarekha, 1st Published, 1993, p.171

[৭] তদেব, পৃ.১৭৩-১৭৫

[৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস(সম্পা.), *নববাবুবিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়*, পৃ.১২৯

সেকালের কলকাতায় শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের পরিবারের মতোই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দলের নেতৃত্বে ছিলেন জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুররা। ঠাকুর পরিবারেরও দলপতি হিসাবে লক্ষ্য ছিল জাতিগত মর্যাদা দূর করা—পিরালি অপবাদ চোকানো। তাঁরা ঘটক ঠাকুর নিযুক্ত করে নতুনভাবে পারিবারিক বংশাবলী তৈরি করেন। 'উঁচু' ঘরে বিয়ে দিয়ে নিজেদের জাতে তোলার চেষ্টা এই পরিবারে প্রবলভাবেই ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর কন্যাকে নৈকষ্যকুলীন পরিবারে বিয়ে দিতে সমর্থ হন। উইলিয়ম ওয়ার্ডের বিবরণী মেনে নিলে বোঝা যায়, টাকা দিয়ে বংশগৌরব কেনার চেষ্টাও তাঁরা করেছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি লাভের জন্য কৃষ্ণনগরের মহারাজা ও নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজকে ঠাকুরবাড়ির তরফে এক লক্ষ টাকা উৎকোচ দেওয়ার কথা শোনা যায়।[৯] 'উঁচু' কুলীন ঘরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে ঠাকুরবাড়ি ছাড়াও অন্য পিরালি ব্রাহ্মণরাও যে জাতে উঠতে চাইত, তার প্রমাণ আছে ঠাকুরবাড়ির পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথায়। জ্ঞানদানন্দিনীর ঠাকুরদাদা কৃষ্ণনগর অঞ্চলে কুলীন ব্রাহ্মণ ফুলের মুখুটি ছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীর বাবাকে যশোর অঞ্চলের এক পিরালি ব্রাহ্মণ খানিক 'কৌশল' করেই জামাই করে তোলেন। পরে এই খবর পেয়ে জ্ঞানদানন্দিনীর ঠাকুরদাদা তাঁর সন্তানকে তীব্র অভিশাপ দেন।[১০] বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জাতে ওঠার চেষ্টার সেই প্রচলিত পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির পিরালি বংশীয়রা।

বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে জাতে ওঠার চেষ্টার প্রচলিত পদ্ধতি ঠাকুরবাড়ির মতো সেকালের আরও অনেক ধনশালী গোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাব। বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর *সত্তর বৎসর-আত্মজীবনী* (পত্রিকা প্রকাশ- 'প্রবাসী', ১৩৩৩ মাঘ-১৩৩৫ বৈশাখ) বইতে শ্রীহট্টের

---

[৯] S.N.Mukherjee, *Calcutta: Essays in Urban History*, pp.178-179

[১০] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, *পুরাতনী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ.৩-৪

জাতপাতের কথা শুনিয়েছেন। লেখকের বাল্যকালে শ্রীহট্টে ভদ্রলোক বলতে মূলত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যকেই বোঝাত। এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যের তুলনায় স্বতন্ত্র—এই বোধ থাকলেও আলাদা করে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জাতপাতের প্রসঙ্গে বিপিন চন্দ্র আলাদা করে বলেছেন এই অঞ্চলে সাহাদের কথা। সাহারা আগে 'শুঁড়ি' নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত মদ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে যোগ থাকার কারণে তাঁদের সঙ্গে 'ভদ্রলোক' এর সামাজিক ব্যবহারে একরকম দূরত্ব দেখা যেত। পরে, তাঁরা সম্ভবত পেশা বদলে ধনসম্পদে পূর্ণ হয়ে ওঠেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলে অনেকসময়েই সাহারা টাকার লোভ দেখিয়ে দরিদ্র বৈদ্য-কায়স্থ ঘরের পুরুষদের জামাই করে আনত। এই বৈবাহিক সম্পর্কের দরুণ বৈদ্য-কায়স্থ পরিবারগুলি সমাজচ্যুত হলেও সাহাদের কাছে এটিই ছিল জাতে ওঠার একটা রাস্তা।[১১] ঔপনিবেশিক পর্বে সাহারা নতুন পেশার সুযোগ নিয়ে ধনশালী হয়েছেন এবং চিরাচরিতভাবেই জাতে ওঠার চেষ্টাও করেছেন। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে জাতে ওঠার চেষ্টাটি অবশ্য প্রচলিত পদ্ধতি। ফলে, 'আধুনিকতা'র ছাপের সঙ্গে প্রাচীন পদ্ধতির ধারাবাহিকতাও এখানে লক্ষণীয়। প্রাচীন পদ্ধতির পাশাপাশি জাতে ওঠার একেবারে নতুন পদ্ধতিও অবশ্য আছে। বিপিন চন্দ্র পালই তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> এখন আমরা জানিয়াছি, সাহারা এবং সুবর্ণবণিকেরা কোনদিন হীন জাতি ছিলেন না। প্রাচীন বর্ণবিভাগে ইঁহারা বৈশ্য ছিলেন, অথচ ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরা বর্ণাশ্রমই মানিতেন না।[১২]

কীভাবে জানা গেল সাহা বা সুবর্ণবণিকরা অস্পৃশ্য নন, বরং বৈশ্য? আমরা জানি, এর নেপথ্যে আছে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক সংগঠনের (caste association) প্রচেষ্টা। ব্রিটিশ উদ্যোগে আদমসুমারি শুরু হতে না হতেই সেকালের ধনশালী অথচ জাতিকাঠামোর নিরিখে 'নিচু' জাত

---

[১১] বিপিন চন্দ্র পাল, *সত্তর বৎসর-আত্মজীবনী*, কলিকাতা: যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬২, পৃ.৯৫-৯৯
[১২] তদেব, পৃ.১০২

বলেই বিবেচিত একাধিক গোষ্ঠী সভা-সমিতি, পত্রিকা প্রকাশ, জাতের ইতিহাস তৈরির মাধ্যমে উচ্চ জাতিমর্যাদা আদায়ে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল আদমসুমারিতে 'উঁচু' জাত হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া। আমাদের গবেষণার তৃতীয় এবং পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সাহা বা সুবর্ণবণিকরা এই প্রকল্পের অংশ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত এই গোষ্ঠীগুলি ক্রমাগত কয়েক দশক ধরে জনগণনা আধিকারিকদের কাছে এবং পাশাপাশি জনমানসেও নিজেদের বৈশ্যত্বের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়। বিপিন চন্দ্র পালের উক্তিতে সেই প্রচেষ্টার কিছুটা কার্যকারিতা দেখা যাচ্ছে। মুদ্রণ সংস্কৃতির সুবিধা নিয়ে বইপত্র প্রকাশ বা আধুনিক রীতি মেনে সভা-সমিতির মাধ্যমে সামাজিক সচলতার দাবি তুলে আনার এই পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পূর্বপরিচয় ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন—'জাতির বইএ দেশ ছাইয়া গেল।'[১৩] সেই ধাঁচা যে ব্রিটিশ ভারতেই শেষ হয়ে গেল তা নয়। স্বাধীনোত্তর ভারতেও, সাত বা আটের দশকে, আমরা দেখেছি সাহাদের তরফে দিগেন্দ্র লাল রায়ের *ইতিহাসে বৈশ্য বা সাহা-সমাজ* বা সদ্‌গোপ জাতির তরফে অতুল সুরের লেখা *সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য* প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিটি বইয়েরই বক্তব্য নিজগোষ্ঠীর বৈশ্যত্ব প্রতিষ্ঠা। শুধু সাহা, সুবর্ণবণিক বা সদ্‌গোপরাই নন; কায়স্থ বা বৈদ্যরাও 'জাতির বই' লেখায় পিছিয়ে ছিলেন না। কায়স্থরা তো প্রবলভাবে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি তুলেছিলেন উনিশ-বিশ শতকে। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ মিত্র *কায়স্থ কৌস্তুভ* প্রকাশ করেন। তারপর থেকেই ধারাবাহিকভাবে কায়স্থদের থেকে এই ধরনের বই বেরোতে থাকে। মনে পড়বে, রাজনারায়ণ বসুর *আত্মচরিত* (প্রথম প্রকাশ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর কথা। রাজনারায়ণ ধর্মে ব্রাহ্ম হয়েও 'হিন্দু' জাতিসত্তাকে ছাড়তে পারেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ যতই উদার হোক, তাঁর পক্ষে জাত্যভিমান পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া কঠিন। রাজনারায়ণ

[১৩] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দলিতের পুরাণকথা*, কলকাতা: অনুষ্টুপ, পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.১৬৪

লিখেছেন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতো খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তিও নিজেকে ‘Brahmin Christian’ বলে পরিচয় দিতেন।[১৪] রাজনারায়ণও কতকটা যেন সেই সূত্র ধরেই ব্রাহ্ম হয়েও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে বিশ্বাস করতেন।[১৫] রাজশেখর বসুর মতো কোন কোন কায়স্থ এই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অসমর্থন জানালেও[১৬], মোটের উপর এই দাবি প্রবলভাবেই ছিল। বৈদ্যরাও উনিশ-বিশ শতকের বঙ্গদেশে অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্বের দাবি তুলে ধরেছেন। আবার, সমস্ত গোষ্ঠীই যে কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণবণিক, সাহা, সদ্‌গোপদের মতো আধুনিক শিক্ষা ও মুদ্রণ সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে লিখিত মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সামাজিক সচলতার দাবি জানিয়ে আসতে পারছেন তা নয়। হাড়ি, বাগদি, ডোমরা দীর্ঘদিন ধরে মুখে মুখে তৈরি করে চলেছেন তাঁদের সৃষ্টিতত্ত্ব ও জাতের ইতিহাস; প্রাচীন পরম্পরার সঙ্গে সংগতি রেখেই। বিভিন্ন পৌরাণিক অনুষঙ্গের সঙ্গে ইতিহাসের কোন সূত্র জুড়ে নিয়ে তৈরি হচ্ছে উচ্চমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।[১৭] প্রতিপত্তিশালীদের লিখিত ভাষ্য আর অবহেলিতদের বাচনকথার মধ্য দিয়েও আমরা পড়ে নিতে পারি ‘আধুনিকতা’র সঙ্গে বিভিন্ন জাতের অসম সম্পর্ককে। সামাজিক সচলতার নতুন আর পুরনো প্রবণতা পাশাপাশি চলতে থাকে।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে সামাজিক সচলতার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্মীয় অনুমোদন। অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির জোরেই সামাজিক মর্যাদা সম্পূর্ণ হস্তগত করা যেত না সবসময়। জাতের মর্যাদাও জরুরি ছিল। তথাকথিত নিচু জাত কোন ধর্মসম্প্রদায়ের স্বীকৃতিকে কাজে লাগিয়ে, ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা অধিকার করে ‘উঁচু’ জাত হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইত।

---

[১৪] রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেস, প্রথম প্রকাশ, ১৯০৯, পৃ.২৮

[১৫] তদেব, পৃ.১২১

[১৬] মানব চক্রবর্তী, শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়(সম্পা.), *বিদগ্ধ রাজশেখর: রসিক পরশুরাম*, কলকাতা: জলার্ক, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃ.১৩৩

[১৭] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দলিতের পুরাণকথা*, পৃ.১৬৭

সামাজিক সচলতার এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করেছি। এই প্রবণতাকে আমরা কেবল প্রাক্-ঔপনিবেশিক প্রবণতা বলেই চিহ্নিত করব না। ঔপনিবেশিক পর্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রবণতার ধারাবাহিকতা। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্ম. ১৮৬৭ খ্রি.) তাঁর আত্মকথা *স্মৃতিতে সেকাল*-এ কৈলাস মুচির কথা লিখেছেন। কৈলাস চর্মকার; যোগেন্দ্রকুমারের পল্লীরই বাসিন্দা। ছোটবেলায় তিনি দেখেছিলেন বাড়িতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কৈলাস ও তাঁর পরিবার উঠোনের একপাশে বসে খাওয়াদাওয়া করত। কিন্তু, তারপরে কী ঘটল সেকথা শোনাচ্ছেন যোগেন্দ্রকুমার—

> কিছুদিন পরে কৈলাস সপরিবারে 'ভেক' লইয়া বৈষ্ণব হইল। মাংস-ভোজন ত্যাগ করিল। আমাদের পাড়ায় আরও দুই-তিন ঘর বৈষ্ণবের বাস ছিল এবং এখনও আছে। কৈলাস মুচি যখন উঠানে বসিয়া খাইত, তখন অন্যান্য বৈষ্ণবগণ রোয়াকের উপর বসিয়া খাইত। কৈলাস 'ভেক' লইয়া বৈষ্ণব হইল এবং উঠান হইতে রোয়াকে তাহার প্রমোশন হইল। অন্যান্য বৈষ্ণবগণের তাহাতে কোন আপত্তি দেখা যায় নাই।[১৮]

পুঁজির সাহায্য ছাড়াও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণই কৈলাসকে একপ্রকার সামাজিক মর্যাদা বা সচলতা দিয়েছে। ধর্মসম্প্রদায়ের স্বীকৃতির সঙ্গে জাতিগত মর্যাদার প্রাচীন সম্পর্কটি এখানেও সহজেই চোখে পড়ে।

আলোচনার এই পর্যায়ে উনিশ-বিশ শতকের 'আলোকপ্রাপ্ত' বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের জাতপাত বিষয়ে ভাবনাচিন্তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এই অংশে আমরা মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতপাত বিষয়ক মতামত দেখব। শুরু করা যাক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *সাম্য* (প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৮৭৯ খ্রি.)-এর কথা দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে

---

[১৮] যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, *স্মৃতিতে সেকাল*, কলকাতা: চর্চাপদ, দ্বিতীয় চর্চাপদ সংস্করণ, ২০১৫, পৃ.২১৬

মনে করেছিলেন *সাম্য* অনেকটাই মিলের ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। এই বইটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে খুব প্রসন্ন ছিলেন না। *সাম্য*-এ প্রচারিত মতামত তিনি 'ভুল' বলে মনে করেছিলেন।[১৯] তবুও, উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর জাতপাত সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার খুব গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আছে বইটিতে। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যত প্রকার বৈষম্য আছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষের বর্ণবৈষম্যের মতো তীব্র বৈষম্য কোথাও দেখা যায় না। এই বৈষম্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'অপ্রকৃত বৈষম্য'; নিয়মবিরুদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

> ব্রাহ্মণ শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য। ব্রাহ্মণবধে গুরু পাপ,—শূদ্রবধে লঘু পাপ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য—শূদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ব্রাহ্মণই কেবল গ্রহীতা কেন?[২০]

প্রশ্নগুলি খেয়াল করলে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নটি তোলার পাশাপাশি, দাতা-গ্রহীতার প্রসঙ্গসূত্রে জাতপাতের সঙ্গে সম্পদের অধিকার ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত বিধানগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। সামাজিক ন্যায়ের অভাব আর অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূত্র ধরে তিনি বলেছেন, জ্ঞানোন্নতিই যাবতীয় উন্নতির মূল কারণ। কিন্তু, শূদ্রকে জ্ঞানচর্চার পরিসর থেকে সরিয়ে রেখে দেশের উন্নতির পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।[২১] 'আধুনিকতা'র ছোঁয়ায় সামাজিক ন্যায় আর সমানাধিকারের কথা তো উঠলই, বঙ্কিমচন্দ্র মনে করলেন সামাজিক ন্যায় বা সাম্যই প্রগতির মূলসূত্র; পাশাপাশি এই সময় থেকেই জাতপাত সম্পর্কিত বিবেচনার সঙ্গে জড়িয়ে গেল 'দেশের উন্নতি'র প্রসঙ্গটি। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালের বাঙালি চিন্তাবিদদের আলোচনাতেও 'দেশের উন্নতি' ও জাতপাতের প্রসঙ্গটি আসবে। আমাদের মনে পড়ে যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র যতই খ্রিস্টান মিশনারিদের হিন্দুধর্মচর্চা সম্পর্কে অসন্তোষ পোষণ

---

[১৯] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী(২য় খণ্ড)*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[২০] তদেব, পৃ.৩৮২

[২১] তদেব, পৃ.৩৮৩

করে থাকুন না কেন; জাতপাত সম্পর্কে *সাম্য* প্রবন্ধের মন্তব্য রেভারেন্ড এম.এ.শেরিং-এর *Hindu Castes and Tribes* (প্রথম প্রকাশ ১৮৭২ খ্রি.)-এর কথা খেয়াল করিয়ে দেবে। শেরিং বলেছিলেন—জাতপাত মানবিক সুখের শত্রু, বৌদ্ধিক স্বাধীনতার বিরোধী, অত্যন্ত প্রগতিবিরোধী ও স্বার্থবুদ্ধিচালিত।[২২]

জাতপাতের প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনা উঠে এল ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী শিবনাথ শাস্ত্রীর *জাতিভেদ* (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪ খ্রি.) বইতেও। ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ বিরোধিতার প্রাক্-ইতিহাস ছিলই। রাজা রামমোহন রায়ও ১৮২১ সালের একটি রচনায় জাতপাতকে যাবতীয় অনৈক্যের মূল এবং ১৮২৮ সালের একটি চিঠিতে জাতপাতকেই দেশাত্মবোধ সৃষ্টির বাধা বলে দাবি করেন।[২৩] বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় জাতপাত আর 'দেশের উন্নতি'র সম্পর্ক নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা দেখছিলাম, তার সূত্রপাত তাহলে রামমোহনেই। লক্ষণীয়, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা 'আত্মীয় সভা'র তরফে জাতপাতের সমালোচনা শুরু করেন।[২৪] ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন *বজ্রসূচীকোপনিষদ* নামে জাতপাত বিরোধী একটি বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদও করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে যুক্ত জাতপাতের ধারণাকে অন্ততপক্ষে তাত্ত্বিকভাবে অতিক্রম করার একটা চেষ্টা ব্রাহ্মদের ছিল। রামমোহনের আমলে ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্ম যদিও জাতপাতকে বাস্তব পরিস্থিতির কারণে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারেনি। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার অঙ্গ বেদপাঠ অব্রাহ্মণ জাতির অসাক্ষাতে হত; কারণ সেযুগে কোন ব্রাহ্মণই শূদ্রের সামনে বেদপাঠে রাজি ছিলেন না। তবে, উপাসনার অন্যান্য

[২২] https://www.sahapedia.org/perspectives-caste-the-nineteenth-century-bengali-literati, accessed on 24.05.2021

[২৩] Sumit Sarkar, *Writing Social History*, New Delhi: Oxford University Press, Oxford India Paperbacks, 1998, p.365

[২৪] শিবনাথ শাস্ত্রী, *জাতিভেদ*, কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সংস্করণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.৬১

কাজগুলিতে এধরনের জাতিভেদ প্রশ্রয় পায়নি।[২৫] আদি ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী কর্ণধার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মনে করতেন—ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে আগামী ২০০ বছরে জাতিভেদ অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে। অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসাবে মেনে নিতেও দেবেন্দ্রনাথের কোন আপত্তি ছিল না। কেশবচন্দ্র সেন বা রাজনারায়ণ বসুর আচার্যত্ব তিনি সানন্দে স্বীকার করেছিলেন।[২৬] এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি। তাঁর রচনার মূল বক্তব্যগুলি এরকম—

১. শিবনাথ শাস্ত্রী প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজে সচলতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বিশেষত, জন্মগত জাতিবাদ নয়, বরং, গুণগত বর্ণবাদের কারণে উঁচু বর্ণের নিম্নবর্ণত্বলাভ বা নিম্নবর্ণের উৎকৃষ্ট বর্ণপ্রাপ্তির শাস্ত্রীয় নিদর্শন সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন।(পৃ.১৮)

২. জাতিভেদ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টায় তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্বান্তরের মাধ্যমে এই ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সূত্রটি ধরতে চেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছিল, মুসলমান শাসনে বৈদ্য ও কায়স্থের হাতে ধনসম্পদ এল। জমিদারি পেয়ে, পদ ও ক্ষমতার জোরে সমাজে তাদের আধিপত্য বাড়ল এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্রাহ্মণকেও তাঁদের মুখাপেক্ষী হতে হল।(পৃ.৩৪)

৩. যদিও সচলতার মতো কাঠামোর অভ্যন্তরীণ রদবদল মাত্র শিবনাথ শাস্ত্রীর অভিপ্রেত নয়, তাই ইংরেজ শাসনের পর্যালোচনায় তিনি দেখলেন ইংরেজের বিদ্যালয়ে ছুতার, গোয়ালা, সদ্গোপ, সুবর্ণবণিক সকলেই সন্তানদের পাঠাচ্ছে। সকলেই একসঙ্গে বসছে, খেলছে, মিশ্ছে। এটাই সবচেয়ে বড়ো সাম্যের শিক্ষা।(পৃ.৩৫)

[২৫] তদেব, পৃ.৬৪

[২৬] তদেব, পৃ.৭৭

৪. এই সূত্রেই দেখছি, সচলতার বদলে শিবনাথ শাস্ত্রীর ঝোঁক সাম্য এবং জাতিভেদ প্রথার বিনষ্টিতে। তিনি স্পষ্টই বললেন, ইংরেজি সভ্যতাই জাতিভেদের প্রধান শত্রু। ইংরেজি শিক্ষার আক্রমণেই ধীরে ধীরে জাতিভেদ নষ্ট হবে।(পৃ.৩৬)

বঙ্কিমচন্দ্র বা শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনায় সামাজিক ন্যায়, সাম্য এবং জাতিভেদের অবলুপ্তি বিষয়ে চিন্তা স্পষ্ট হচ্ছে। অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মাত্রেই যে জাতিভেদ বিষয়ে এতখানি কড়া মনোভাব নিচ্ছিলেন তা নয়। প্রসঙ্গত আমরা রাজনারায়ণ বসু বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে পারি। রাজনারায়ণ বসুর *বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ*)*-এ 'জাতিভেদ বিষয়ে বর্তমান আন্দোলন' নামক প্রবন্ধে তিনি জাতিভেদ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের তদানীন্তন তিনটি প্রবণতার উল্লেখ করেন—১। জাতিভেদের উচ্ছেদপন্থী ধারা, ২। জাতিভেদপন্থী ধারা, ৩। জাতিভেদের সংস্কারপন্থী ধারা। রাজনারায়ণ তৃতীয় ধারাটির সমর্থক। তিনি বিশ্বাস করেন, জাতিভেদ প্রথা উঠিয়ে দিলে আরেকরকমের জাতিভেদ তৈরি হবে। ইউরোপে জাতিভেদ নেই, কিন্তু সেখানে অন্যধরনের বৈষম্য আছে। ফলত, রাজনারায়ণ জাতিভেদের একরকম পরিমার্জিত চেহারা সমাজে দেখতে চান। জন্মগত জাতিবাদ নয়, বরং গুণগত বর্ণবাদেই তাঁর আস্থা। পুরাকালের ভারতবর্ষের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন অধার্মিক, অসৎচরিত্র, মূর্খ ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হতেন। আবার, ধার্মিক, সৎচরিত্র, বিদ্বান শূদ্র স্বীকৃত হতেন ব্রাহ্মণ হিসাবে। তাঁর বিশ্বাস—'এই সুপ্রথা দ্বারা ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হইত।'[২৭] রাজনারায়ণ যে গুণগত বর্ণবাদের কথা বলছেন, তাতে সামাজিক সচলতার ইঙ্গিত আছে বটে; তবে এই গুণগত বর্ণবাদ ঋগ্বৈদিক বা পরবর্তী বৈদিক যুগের বিচ্ছিন্ন কতকগুলি নিদর্শন ছাড়া ঐতিহাসিকভাবে কতখানি বজায় ছিল তা যথেষ্ট সন্দেহযোগ্য। রাজনারায়ণের

---

[২৭] রাজনারায়ণ বসু, *বিবিধ প্রবন্ধ(প্রথম খণ্ড)*, কলিকাতা: ওরিয়েন্ট্যাল পব্‌লিশিং এষ্ট্যাব্‌লিশ্‌মেন্ট, প্রথম প্রকাশ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.৯০-৯২

গুণগত বর্ণবাদে আস্থার কারণটি খেয়াল রাখা দরকার। শেরিং তাঁর বইতে জাতিভেদকে বৌদ্ধিক স্বাধীনতার বিরোধী বলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করেছিলেন, জাতিভেদই দেশের সমস্ত অংশের জ্ঞানচর্চায় অগ্রগতির বাধা। কিন্তু, গুণগত বর্ণবাদকে স্বীকার করলে আসলে জাতিগত বন্ধনের বাইরেও ব্যক্তিগত প্রতিভা, বুদ্ধি, শিক্ষা ইত্যাদির স্বীকৃতি থাকে। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিসরটুকু উনিশ শতকীয় 'আধুনিকতা'র ধারণার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। সেই কারণে, রাজনারায়ণ সম্ভবত গুণগত বর্ণবাদের সামাজিক বাস্তবতা ও প্রয়োগযোগ্যতার প্রশ্নের কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর না থাকা সত্ত্বেও এই মতের পক্ষেই সওয়াল করেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *সামাজিক প্রবন্ধ* (প্রথম প্রকাশ ১৮৯২ খ্রি.)-এর 'পাশ্চাত্য ভাব—সাম্য' আর 'ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধের কথা প্রসঙ্গত আলোচনা করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের *সাম্য*-এর পাশে ভূদেবের প্রবন্ধটিকে রাখলে অনেকগুলি পার্থক্য চোখে পড়ে। 'সাম্য' ধারণার ইউরোপীয় উৎসের কথা ভূদেবের মতো বঙ্কিমও হয়তো স্বীকার করবেন। তবে, বঙ্কিমের সঙ্গে ভূদেবের যথেষ্ট মতভেদ আছে। গৌতম বুদ্ধকে বঙ্কিমচন্দ্র বৈষম্যপীড়িত ভারতবর্ষের উদ্ধারকর্তা মনে করেছিলেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্রে সমতার তত্ত্ব বুদ্ধদেবের প্রবর্তন।[২৮] ভূদেব বলেছেন, বুদ্ধদেব আদতে সাম্যবাদী নন। পূর্বার্জিত কর্মফলের নিরিখে মানুষের ক্রমোৎকর্ষ বা ক্রমোপকর্ষের কথা বুদ্ধদেব স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধধর্মে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরোধিতা আছে বটে। তাঁর মতে, ব্রাহ্মণের নিন্দা দেখেই আধুনিক গ্রন্থকাররা বুদ্ধদেবকে সাম্যবাদী বানিয়ে তুলেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার নিরিখে বুদ্ধদেবকে একেবারে বঙ্কিমি ভঙ্গিতে আমরা হয়তো 'সাম্যবাদী' বলতে পারব না। এপ্রসঙ্গে

[২৮] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী(২য় খণ্ড)*, পৃ.৩৮২-৩৮৩

বর্তমান গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেদিক থেকে ভূদেবের বুদ্ধদেব সম্পর্কে বিবেচনা কিয়দংশে ঠিক। তারপরেও, জাতপাত আর সচলতা সম্পর্কে ভূদেবের বিবেচনায় কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসে। তার আগে ভূদেবের মূল বক্তব্যগুলি দেখা যাক —

১। জাতিভেদ মূলত গার্হস্থ্যধর্মের সঙ্গে জড়িত এবং বিবাহ-সম্বন্ধীয়।

২। জাতিভেদের দরুণ অর্থের দাপট ততখানি প্রকাশ পেতে পারে না। কারণ, জাতি ধনসম্পদের অধীন নয়।

৩। জাতিভেদ থাকলেও ব্রাহ্মণের পেশা ছাড়াও অন্য যেকোন পেশা সকলের জন্য উন্মুক্ত। সুতরাং, জাতিভেদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির বিরোধী নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ভূদেবকেও এক্ষেত্রে জাতপাতের সঙ্গে 'দেশের উন্নতি', বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নতির সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

৪। ভূদেবের মতে, জাতিভেদ প্রত্যেক বর্ণের স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করে কিছুটা আত্মগৌরব বজায় রাখে। অত এব, পরাধীন জাতির পক্ষে জাতিভেদের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এখানেও আমরা 'আধুনিকতা'র সূত্র ধরে জাতিভেদের সঙ্গে 'দেশের উন্নতি'র সম্পর্কে বিবেচনা দেখছি।

৫। পঞ্চমত ভূদেব বললেন, জাতিভেদের দরুণ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন গোষ্ঠীই নিজেদের অন্যের থেকে নিকৃষ্ট মনে করে না। বাংলায় নবশাখরা কায়স্থের থেকে নিজেদের নিকৃষ্ট মনে করে না; মাদ্রাজের পারিয়া নামক অস্পৃশ্য গোষ্ঠী মনে করে তাঁরা ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত, মহারাষ্ট্রের অস্পৃশ্য জাতি মাড়েরা নিজেদের ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সমস্ত জাতির তুলনায় উচ্চতর মনে করে।[২৯]

---

[২৯] ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *প্রবন্ধ সমগ্র*, কলকাতা: চর্চাপদ, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ.১৭৭-১৭৮

ভূদেবের শেষ বক্তব্যটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার—

ক) ব্রাহ্মণ ছাড়া কোন জাতিই নিজেদের অন্যদের থেকে নিকৃষ্ট মনে করে না—কথাটি ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ ভুল। ভারতীয় বর্ণজাতিপ্রথা সম্পর্কে যাঁরা সামান্য খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা জানেন, প্রতিটি জাতের মধ্যে তো বটেই, একেকটা জাতের বিভিন্ন উপ-বিভাগের মধ্যেও মর্যাদার তারতম্য সম্পর্কে তীব্র মতভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উপযুক্ত উদাহরণসহ বিষয়টি আমরা আলোচনাও করেছি।

খ) মহারাষ্ট্রের মাড়েরা নিজেদের ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির তুলনায় উচ্চতর বা মাদ্রাজের পারিয়ারা নিজেদের ব্রাহ্মণ সমতুল্য মনে করে—এই কথার মধ্যেই অস্পৃশ্য জাতিগুলির উচ্চমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বা সামাজিক সচলতার ইঙ্গিত রয়ে যায়। একইসঙ্গে রয়ে যায় বিভিন্ন জাতের ক্রমোচ্চবিন্যাস বা hierarchy-তে পারস্পরিক অবস্থান বিষয়ে তর্ক। জাতপাত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সেকথা ধরতে পারবেন। কিন্তু, ব্রাহ্মণ প্রাধান্য আর জাতিকাঠামোর অনড় চেহারায় অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে গিয়ে ভূদেব আসলে ভারতীয় বর্ণজাতিকাঠামোর ঐতিহাসিক চরিত্রকেই ধরতে পারেন না। এছাড়া, ভূদেবের এই রচনা থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণকে একটি সমসত্ত্ব শ্রেণি বলেই মনে হবে। ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যেও একাধিক থাকের অস্তিত্ব আর বিভিন্ন থাকের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে ভূদেবকে এক্ষেত্রে নীরব থাকতে দেখছি।

স্বামী বিবেকানন্দের জাতপাত বিষয়ে ভাবনার একটি প্রকাশ দেখা যাচ্ছে কলম্বো-আলমোড়া বক্তৃতামালার অন্তর্গত 'Future of India'(সময়কাল ১৮৯৭ খ্রি.) নামক বক্তৃতায়। বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতিরাষ্ট্র (nation-state)-এর কল্পনায় বর্ণজাতিপ্রথাকে অস্বীকার করতে চাননি। 'Buddhistic India'-য় জাতপাতকে ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূল বলেই তিনি মনে করেন। জাতপাতের অনস্তিত্বের কারণে অন্য অনেক জাতিরাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

জাতপাতের গুরুত্ব স্বীকার করলেও জাতপাতের সমস্যা থেকে বিবেকানন্দের নজর সরে যায়নি। জাতপাত যে ব্যক্তিসত্তার বিকাশে বাধা 'আধুনিক' বিবেকানন্দ তা বুঝতে পেরেছিলেন।[৩০] এই সূত্রে জাতপাতের কাঠামো রেখেও ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পরিসরটুকু রক্ষা করার জন্য বিবেকানন্দের ঝোঁক পড়েছিল গুণগত বর্ণবাদে। 'Future of India' বক্তৃতায় বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ প্রাধান্যকে অস্বীকার করেননি। আবার, রেয়াত করেননি ব্রাহ্মণ্য স্বার্থান্বেষী, অর্থলোভী প্রবণতাকে। তিনি বিশ্বাস করেছেন, উঁচু জাতকে টেনে নামানোর মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই। বরং, 'নিচু' জাতকেই উপরে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। 'উপরে' ওঠার রাস্তায় দুটি প্রধান উপাদান— সংস্কৃতিচর্চা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন। 'নিচু' জাতকে কার্যত ধমকে বিবেকানন্দ বললেন—উঁচু জাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, পত্রিকায় লিখে জাত্যুৎকর্ষের চেষ্টা করা নিষ্ফল। বরং, সংস্কৃত ভাষার চর্চা এবং উপযুক্ত সংস্কৃতির আত্তীকরণই সামাজিক সাম্য আনতে পারে।[৩১] অব্রাহ্মণ জাতগুলির উদ্দেশে আরেকটু স্পষ্ট করে তিনি আবার বলেন—ব্রাহ্মণের বিরোধিতা করার আগে তাঁদের মনে রাখা উচিত, সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃতিচর্চার অভাবে তাঁরা নিজেদের দোষেই অধঃপতিত হয়েছেন।[৩২] অথচ, শাস্ত্রেই তো শূদ্রের সংস্কৃত চর্চায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই প্রতিযুক্তি আন্দাজ করেই যেন বিবেকানন্দ বললেন, শাস্ত্রে শূদ্রের সংস্কৃতচর্চায় প্রাথমিকভাবে নিষেধ ছিল বটে; এবং সে নিষেধ নিন্দনীয়। পরবর্তীকালের শাস্ত্রেও শূদ্রের প্রতি মনোভাব শিথিল হতে দেখা যায়। অনেক পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রের উদাহরণ টেনে বিবেকানন্দ দেখাচ্ছেন যে শূদ্রের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহই দেওয়া হচ্ছে।[৩৩] এও কার্যত সংস্কৃতায়নের প্রকল্প। সুমিত সরকার খেয়াল করিয়ে দিয়েছিলেন,

---

[৩০] Swami Vivekananda, *The Complete Works of Swami Vivekananda(Vol.3)*, Calcutta: Advaita Ashram, 13th Reprint, 1958, p.515

[৩১] তদেব, পৃ.২৯১

[৩২] তদেব, পৃ.২৯৮

[৩৩] তদেব, পৃ.২৯৫-২৯৬

শিবনাথ শাস্ত্রীর *জাতিভেদ*-এ বর্ণজাতিপ্রথার কড়া সমালোচনা থাকলেও, ফরিদপুর অঞ্চলে ১৮৭০ এর দশকে নমঃশূদ্রদের আন্দোলনের কোন উল্লেখ নেই।[৩৪] বিবেকানন্দের সময়ে 'নিচু' জাতগুলির ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন আরও কিছুটা গতি পেয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে দশকভিত্তিক জনগণনার সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগ আছে। বিবেকানন্দও 'নিচু' জাতের আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। বর্ণজাতিপ্রথার কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি সেকারণেই সচলতার মাধ্যম হিসাবে গুণগত বর্ণবাদের প্রস্তাব দিচ্ছেন। বিবেকানন্দের রচনায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল সামাজিক সচলতা আদতে বর্ণজাতিকাঠামোকে টিকিয়ে রাখারই মাধ্যম। গুণগত বর্ণবাদের সূত্রে বিবেকানন্দ বারংবার সামাজিক সচলতার পক্ষে সওয়াল করেছেন। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে তিনি বলেছিলেন—ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হবে, এমনটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। ব্রাহ্মণত্বকে গুণ হিসাবে দেখেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে আমেরিকাবাসী মন্ত্রশিষ্যদের 'গুণে ব্রাহ্মণ' বলে মনে করা সম্ভব হয়েছিল।[৩৫]

এই প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করব রবীন্দ্রনাথের জাতপাত সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার পর্যালোচনায়। রবীন্দ্রনাথের পরিবার শহর কলকাতায় এসে ধনশালী হয়েও 'পিরালি ব্রাহ্মণ'এর কলঙ্ক গা থেকে মুছতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্য সমাজের চাপ সহ্য করতে হয়েছিল বলেই বোধহয় জাতপাতের সংকীর্ণতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে অব্রাহ্মণ আচার্য বসতে পারবেন কিনা সেই সংক্রান্ত তর্কে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির ভাবনা উদ্ধৃত করে অব্রাহ্মণ আচার্যের ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া বিরুদ্ধ মতামতের প্রতিবাদ করেছিলেন।[৩৬] জাতপাত সম্পর্কে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার নিদর্শন আছে *গোরা* (প্রথম সংস্করণ ১৩১৬

[৩৪] Sumit Sarkar, *Writing Social History*, p.366

[৩৫] অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, *জাতিভেদপ্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, পৃ.৫৮

[৩৬]গোপা দত্তভৌমিক, 'রবীন্দ্রনাথ এবং জাতপাত সাম্প্রদায়িকতা', https://www.parabaas.com/rabindranath/articles/pGopa3.html, accessed on 25.05.2021

বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে। গোঁড়া হিন্দু গোরা, বন্ধু বিনয়, ব্রাহ্ম সমাজের সুচরিতা আর পরেশবাবুর কথোপকথনে জাতপাত সম্পর্কে তৎকালীন বিতর্ককে ছুঁয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। *গোরা*-র ১৮ নং অধ্যায়ে সুচরিতা সরাসরি বিনয়ের কাছে বর্ণভেদের সফলতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন। বিনয় এই প্রসঙ্গে বলেন, জাতিভেদের ফল বলতে আমরা যা বুঝি তা আদতে অবস্থার ফল, 'আইডিয়া' হিসাবে জাতিভেদের ফল নয়। নানাবিধ চিন্তার দুর্বলতা আর বিকারে 'আইডিয়া'র মূলগত সত্যটি স্পষ্ট হতে পারেনি। সুতরাং, চিন্তার উন্নতি ঘটিয়ে 'আইডিয়া'কে সত্যরূপ দেওয়ার দিকেই নজর থাকা উচিত। আরও বলেন, ভারতবর্ষ জাতিভেদের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার যে মীমাংসা করতে চেয়েছিল; সেই পরীক্ষার সফলতা নির্ধারণের সময় এখনও আসেনি। বিনয়ের এহেন উত্তর সুচরিতাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি স্বাভাবিকভাবেই। সুচরিতা জিজ্ঞেস করেছেন, ব্রাহ্মণ কি আদৌ নরদেবতা হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য? বিনয়ের প্রত্যুত্তর উনিশ শতকীয় গুণগত বর্ণবাদের প্রতি ঝোঁককে খেয়াল করিয়ে দেয়—

> ব্রাহ্মণ, যার ভয় নেই, লোভকে যে ঘৃণা করে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ করে না, যে পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ, যে অটল, যে শান্ত, যে মুক্ত—সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায়—সেই ব্রাহ্মণকে যথার্থভাবে পেলে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।[৩৭]

ব্রাহ্মণত্ব এখানে বংশগত নয়, গুণগত। *গোরা*-র মূল বক্তব্য স্বদেশচেতনাকে হিন্দুধর্মের পরিসরে আটকে না রেখে ভারতধর্মের স্তরে তুলে নিয়ে যাওয়া। উপন্যাসে গোরা শেষ পর্যন্ত পরেশবাবুর কাছে স্বীকার করেছেন, জাতিবর্ণের সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠে সকলকে আপন করে নেওয়ার বোধ তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের *গোরা*-র মধ্যে জাতপাত বিরোধিতা এতখানি তীব্র চেহারা নিয়েছে, যে কন্নড় সাহিত্যিক ইউ.আর.অনন্তমূর্তি মনে করতেন

[৩৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গোরা*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৪৫-১৪৮

ভারতবর্ষের সর্বত্র *গোরা*-কে কেন্দ্র করে আলোচনাচক্র হওয়া উচিত। এই উপন্যাসে ভেদবুদ্ধি বিনাশের ওষুধ আছে।[৩৮] পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে 'প্রবাসী' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৪-১৩১৬ ফাল্গুন পর্যন্ত। *গোরা* রচনা শেষ করার মাস তিন-চারেকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' কবিতাটি লেখেন। *গোরা*-র সঙ্গে 'ভারততীর্থ' কবিতার মূলগত সাদৃশ্য আছে—'সবার-পরশে-পবিত্র-করা-তীর্থনীরে—/আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।' 'উঁচু'-'নিচু' সবার স্পর্শ লেগে আছে বলেই এই 'ভারততীর্থ'এর জল 'পবিত্র' হল। 'ভারততীর্থ' কবিতারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৩১৫, ভাদ্র) প্রবন্ধে। লক্ষণীয়, প্রবন্ধটি যে সময়ে রচিত, তখন *গোরা* উপন্যাসটিও লেখা চলছে। *গোরা,* 'ভারততীর্থ' আর পূর্ব ও পশ্চিম' রবীন্দ্রমানসের এই পর্বের চিন্তার ঐক্যসূত্রটি বোঝাচ্ছে।[৩৯]

এই প্রসঙ্গে গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ বিতর্কের কথা মনে করা যেতে পারে। গান্ধি অস্পৃশ্যতাবিরোধী হলেও পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিভেদের পক্ষে। বংশানুক্রমিক সুনির্দিষ্ট বৃত্তির অস্তিত্ব অর্থনৈতিক উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ রুখে প্রতিযোগিতা কমায়। বর্ণাশ্রমই গান্ধির কাছে আনন্দ ও ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। এমনকি, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জনও করে, তবুও ইহজন্মে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যাবে না। শূদ্রেরও এহেন পরিচিতিগত ঔদ্ধত্য বজায় রাখা অনুচিত।[৪০] *কালান্তর* (প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)-এর 'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধটি পড়লে

---

[৩৮] গোপা দত্তভৌমিক, 'রবীন্দ্রনাথ এবং জাতপাত সাম্প্রদায়িকতা', https://www.parabaas.com/rabindranath/articles/pGopa3.html, accessed on 25.05.2021

[৩৯]তপোব্রত ঘোষ(সম্পা.), *জগদীশ ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত গদ্য,* কলকাতা: ভারবি, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পৃ.১৫৭-১৫৮

[৪০] Sabyasachi Bhattacharya(ed.),*The Mahatma and The Poet*, New Delhi: National Book Trust, 1st Edition, 1997, pp.17-18

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামত আন্দাজ করা যাবে। পছন্দ অনুসারে বৃত্তিগ্রহণের স্বাধীনতাকে ভারতবর্ষ ধর্মশাসনে বাঁধতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> ভারতবর্ষ এই সমস্যার মীমাংসা করেছিল বৃত্তিভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা ক'রে দিয়ে। রাজশাসনে যদি পাকা করা হ'ত তাহলে তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনোই থামত না। পাকা হ'ল ধর্মের শাসনে। বলা হল এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ।[৪১]

গান্ধিজী মনে করতেন, পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিভেদে পেশাদারি নৈপুণ্য ও উৎকর্ষ বাড়ে।[৪২] রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে উল্টোমত পোষণ করে বললেন, বৃত্তিভেদকে ধর্মের শাসনে প্রতিষ্ঠা করায় ক্ষোভ আর অসন্তোষকে চাপা দেওয়া গেলেও তাতে 'জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ' হয়েছে কিনা তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।[৪৩] ফলে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বর্ণজাতিপ্রথার সনাতনী দৃষ্টি অনুসরণের সাময়িক প্রবণতা দেখা গেলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তার ধরন অনেকখানি বদলেছে। বর্ণজাতিপ্রথার অনুশাসনের মধ্যে যুক্তি এবং ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব লক্ষ করে তিনি যথোচিত সমালোচনাও করেছেন। গান্ধির সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়ে দু'জনের মতভেদ রয়ে গেছে। আবার, গান্ধির অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে নীতিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের সায় ছিল। **১৯৩২** খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। কেরালার গুরুভায়ুর মন্দিরে এই আন্দোলন বাধা পেল। কেলাপ্পান নামক গান্ধিজির এক অনুগামী মন্দিরের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করেন। দিনদশেক অনশন চালানোর পরে গান্ধিজি তাঁর

---

[৪১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৫২-২৫৩

[৪২] আশীষ লাহিড়ী, 'হরিজনদের হিন্দুধর্ম ত্যাগ: গান্ধি বনাম রবীন্দ্রনাথ', চেতনালহর, জানুয়ারি-জুন, ২০১৮, পৃ.৯

[৪৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর*, পৃ.২৫৪

অনুগামীকে অনশন তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান এবং বলেন তিন মাসের মধ্যে এই বিষয়ে বিহিত না হলে তিনি নিজেই অনশন শুরু করবেন। কালিকটের রাজা আইনগত বাধ্যবাধকতার প্রসঙ্গ তুলে এই বিতর্কে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের পক্ষ নিয়েছিলেন। গান্ধিজি অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে চিন্তিত হলেও, আম্বেদকর এবং অনুন্নত শ্রেণির নেতারা গান্ধিজির আন্দোলনকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। অস্পৃশ্যদের অন্যান্য সমস্যাকে উপেক্ষা করে মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে এই আন্দোলন তাঁদের মনঃপুত ছিল না। গান্ধিজি অবশ্য নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেছিলেন, আম্বেদকরের মতো অনুন্নত শ্রেণির অগ্রগণ্য মানুষদের কাছে মন্দিরে প্রবেশের বিশেষ গুরুত্ব না থাকলেও অগুণিত অস্পৃশ্য মানুষের জীবনে মন্দিরের বড়ো প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ মন্দির বা আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে খুব চিন্তিত না হলেও সংকীর্ণতার এই চেহারায় উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতিবাদ করার প্রয়োজন বুঝেছিলেন। কালিকটের রাজাকে এবিষয়ে ১৬ নভেম্বর, ১৯৩২ তিনি একটি চিঠিতে লেখেন—মন্দিরে প্রবেশাধিকার বিষয়ে যাবতীয় আইনি বাধা কাটিয়ে কালিকটের রাজার উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। ন্যায় এবং সাম্যের লড়াইতে গান্ধি ও তাঁর অনুগামীদের পরাজয় নিশ্চিতভাবেই গোটা বিশ্বের বিবেকের কাছে ভারতের পক্ষে অসম্মানজনক। যদিও, তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। মাসখানেক পরে (১১ ডিসেম্বর, ১৯৩২) 'প্রবর্তক সঙ্ঘ' এর নেতা মতিলাল রায়ের অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের সাফল্য কামনায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী পাঠান, তাতে খুব স্পষ্ট করে বলেন—জন্মগত অধিকারকেই যদি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়; তাহলে ইংরেজ যদি মনে করে তাঁরা জন্মগত অধিকারের বলেই ভারতশাসনের অধিকারী, তাহলে আর ভারতীয়দের পক্ষে কোন প্রতিযুক্তিই থাকে না। কোন জাতির হীনতা 'জন্মগত ও নিত্য' মনে করা আদতে

'অমার্জনীয় অধর্ম'।[৪৪] গান্ধিজি পুনর্বার আন্দোলন শুরু করলে শ্রীনিকেতনের মেলা প্রাঙ্গণেও অস্পৃশ্যতা বর্জনের দাবিতে একটি সভা হয় (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩)। সেই সভাতেও রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যতার সমালোচনা করে বলেন—যারা মন্দিরে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করছে তারাই আদতে মন্দির থেকে নির্বাসিত। যাদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, যারা আকাশের সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিশ্বদেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানাতে পেরেছে, তারাই যথার্থ পূজারী।[৪৫]

উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের জাতপাত সংক্রান্ত ভাবনা প্রসঙ্গে শেষে একটি কথা বলা যেতে পারে। ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার আমাদের খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন, উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের জাতপাত সম্পর্কিত রচনায় জাতের ক্রমোচ্চবিন্যাসের পক্ষে দাবিদাওয়া তুলনায় কম। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, উনিশ শতকের নয়ের দশক পর্যন্ত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের মতো, খুব একটা তীব্র হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই, জাতিকাঠামোর উচ্চাবচতার সপক্ষে গলা ফাটানোর প্রয়োজনও বিশেষ পড়েনি।[৪৬] আলোচনার পরবর্তী অংশে আমরা ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তকদের রচনায় জাতপাত আর সচলতার প্রসঙ্গটি আলোচনা করব। প্রসঙ্গত মহারাষ্ট্রের কথাও আসবে। সেখানে বিষয়টি আরও ভালো করে লক্ষ করা যাবে।

উনিশ শতকের মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা ফুলে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশরা পুনা অধিকার করে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। তার আগে পেশোয়া শাসনে মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের, বিশেষত চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের, আধিপত্য ছিল। ধর্ম, প্রশাসন এবং

---

[৪৪] নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ(৩য় খণ্ড)*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ.২৫৯-২৬০, ২৬৩-২৬৪

[৪৫] তদেব, পৃ.২৮০-২৮১

[৪৬] Sumit Sarkar, *Writing Social History*, p.374

ভূম্যধিকার—ক্ষমতার তিনটি ক্ষেত্রেই চিৎপাবনদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। পেশোয়াদের সঙ্গে সুসম্পর্কের দরুণ চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের আধিপত্য আরও প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্রে বর্ণজাতিব্যবস্থার ইতিহাস খেয়াল করলে দেখা যাবে, মোটামুটি দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের সূচনা। হেমাদ্রি বা লক্ষ্মীধরের মতো স্মৃতিশাস্ত্রকাররা এইসময়েই শাস্ত্র রচনা করেছেন। লক্ষ্মীধরের রচনা থেকে বিমিশ্র সংস্কৃতির উপর ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসজনিত সংঘাত ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতেই মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণভক্তিকেন্দ্রিক মহানুভব সম্প্রদায়ের উত্থান। মহানুভবপন্থীরা বর্ণজাতিপ্রথা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আরেকটু পরে ভক্তিবাদী সম্প্রদায় হিসাবে বারকরীদের উত্থান কার্যত মহানুভবপন্থীদের ব্রাহ্মণ্যবিরোধিতারই প্রত্যুত্তর। ভক্তি এখানে বর্ণজাতিপ্রথার চৌহদ্দির মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত।[৪৭] চোখামেলের মতো সাধককেও অস্পৃশ্যতার দরুণ বারকরী সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পন্‌ঢরপুরের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে সাসকেন জেলার ব্রাহ্মণদের উদ্যোগে ও পেশোয়াদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে প্রভু নামের কায়স্থ জাতির সংস্কৃতায়ন ও ঊর্ধ্বমুখী সচলতার প্রয়াস বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি, পন্‌ঢরপুরের মূল মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশ আটকে তাঁদের জন্য মন্দিরের বাইরে আলাদা উপাসনাস্থলের বন্দোবস্তও দেখা যাচ্ছে। এমনকি, ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বেও ব্রিটিশ শাসকরা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে না চাওয়ার দরুণ ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য দীর্ঘদিন অবধি অপ্রতিহতই ছিল। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের ২য় রেগুলেশনের ২৭ নং সেকশনের বয়ান অনুযায়ী ব্রিটিশ আইনব্যবস্থা জাতিগত বিবাদের মীমাংসার প্রশ্নটিকে নিজেদের এক্তিয়ারের বাইরে রেখেছিল। এরকম একটি ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের কালেই জ্যোতিবা বা জ্যোতিরাও ফুলের জন্ম। যদিও, ধীরে ধীরে এই অবস্থার বদল

---

[৪৭] Uma Chakravarti, *Rewriting History*: *The Life and Times of Pandita Ramabai*, New Delhi: Zubaan, 1st Published, 2013, https://www.google.co.in/books/edition/Rewriting_History/9TenDAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover , accessed on 27.05.2021

ঘটছিল। প্রশাসনিক ক্ষমতা সরাসরি ব্রাহ্মণদের হাতে না থাকার সুবিধা নিয়ে অন্য অনেক জাত নতুন কর্মসম্ভাবনার জগতে ঢুকে সামাজিক ক্ষমতা হস্তগত করতে চায়। এইসময়ে মহারাষ্ট্রীয় সোনার আর ব্রাহ্মণদের জাতিগত বিবাদের প্রশ্নগুলিতেও ব্রিটিশ সরকারকে না চাইলেও হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং ধীরে ধীরে অনেক অব্রাহ্মণ গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনে ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক সচলতা খোঁজার চেষ্টা করে।[৪৮] ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতার একটি পরিসরও তৈরি হয়। এই প্রেক্ষাপটেই জ্যোতিবা ফুলেকে বিচার করা প্রয়োজন।

জ্যোতিবা ফুলের *গুলামগিরি* (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৩ খ্রি.) এই ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতার ভাষ্য। *গুলামগিরি* রচনার আগে থেকেই অবশ্য ফুলে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লিখিত আক্রমণ শানাচ্ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *Priestcraft Exposed* ও *Brahman Teachers in the Education Department*। প্রথম রচনাটি উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রের সমাজে অশিক্ষিত চাষিদের উপর ব্রাহ্মণদের শোষণের বর্ণনা। দ্বিতীয় রচনায় আছে, শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে জড়িত ব্রাহ্মণ আধিকারিকদের শূদ্রদের শিক্ষিত করে তোলায় অনুৎসাহের বিবরণ।[৪৯] ফুলে বর্ণজাতিবাদের সঙ্গে কখনো সমঝোতায় যেতে চাননি; বরং বর্ণজাতিপ্রথাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানের দাবি তোলেন। যাবতীয় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র আর সমধর্মী ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেন।[৫০] ফুলে জানান, ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের মূল ভিত্তি সমাজের একটা বড়ো অংশকে বাধ্যতামূলক দাসত্ব এবং নিপীড়নের গণ্ডিতে আটকে রাখার ক্ষমতা। এই দাসত্বের ধারা পেশোয়া শাসনকালেও অব্যাহত ছিল। ফুলের ধারণা ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাসদের থেকেও বেশি নিপীড়িত হয়েছিলেন এদেশের নিম্নবর্ণ। পৌরোহিত্যের মাধ্যমে, উচ্চশিক্ষার সুযোগ

---

[৪৮] তদেব

[৪৯] Rosalind O'Hanlon, *Caste, Conflict, and Ideology: Mahatma Jotirao Phule and Low Caste Protest in Nineteenth-Century Western India*, Cambridge: Cambridge University Press, 1st Paperback Edition, 2002, p.136

[৫০] Jotirao Govindrao Phule, *Slavery*, Tr. by P.G.Patil, [], [], 1st Edition, 2020, p.107

করায়ত্ত করে, গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে ব্রাহ্মণরা নানাভাবে শূদ্রদের নিপীড়ন করে চলেছে। পেশোয়া যুগের ব্রাহ্মণ আর ঔপনিবেশিক পর্বের ব্রাহ্মণশ্রেণির মধ্যে তফাত থাকলেও ব্রাহ্মণ্য উচ্চম্মন্যতার বোধ আর অসাধুতা শেষ হয়ে যায়নি। ফুলে খুব জোর দিয়ে বলেন, শূদ্রের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। সরকারি উচ্চশিক্ষা ব্রিটিশ আমলেও 'উঁচু' জাতের একচেটিয়া অধিকার। 'নিচু' জাতের উন্নতিতে সরকার সত্যিই সচেষ্ট হলে উচ্চশিক্ষার অধিকার ও সরকারি চাকরির সুযোগ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। পরিবর্তে, শূদ্রদের সরকারের প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে ব্রিটিশরা নিশ্চিত থাকতে পারবেন।[৫১] উমা চক্রবর্তী খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতার যে পরিসরটি ছিল, তার সঙ্গে ফুলের আন্দোলনের মৌল তফাত এই যে, ফুলে এবং তাঁর অনুগামীরা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতাকে কেবল 'ধর্মীয়' পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁরা অধিকারের প্রশ্নটি ছড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে।[৫২] এই প্রবণতা পরে আমরা দেখতে আধুনিক ভারতে দলিত রাজনীতির ক্ষেত্রেও। প্রসঙ্গটি আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

ফুলে বুঝতেন বর্ণজাতিব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক সচলতার ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। বস্তুত, সামাজিক সচলতার মোহটি সামনে রাখা হয় বর্ণজাতিব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই। তিনি দেখাচ্ছেন, ব্রাহ্মণ্য নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবহেলিত মানুষদের একটি গোষ্ঠী গলা তোলা মাত্রই তাঁদের একটি পৃথক শ্রেণিতে পরিণত করা হয়েছিল। এঁদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই মালি, কুনবি ইত্যাদি গোষ্ঠীকে অস্পৃশ্যতার তকমা থেকে মুক্তি দিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু আসন দেওয়া হয়। তাঁদের অপেক্ষাকৃত উঁচু পেশা অনুসরণের

---

[৫১] Jotirao Govindrao Phule, *Slavery*, pp.xi-xvii

[৫২] Uma Chakravarti, *Rewriting History*: *The Life and Times of Pandita Ramabai*, New Delhi: Zubaan, 1st Published, 2013, https://www.google.co.in/books/edition/Rewriting_History/9TenDAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover , accessed on 27.05.2021

সুযোগও স্বীকৃত হল। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি যাঁরা আস্থা দেখালেন তাঁদের সামনের সারিতে তুলে আনা আর যাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করলেন তাঁদের পিছনের সারিতে ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।[৫৩] ফুলে স্বীকার করে নেন, ব্রাহ্মণ্যবাদ সৃষ্ট এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেরণা এসেছে পশ্চিমি চিন্তাজগৎ থেকেই। তাঁরাই প্রাপ্য অধিকার বুঝে নিতে শিখিয়েছেন।[৫৪] ফুলে এবং তাঁর অনুগামীদের মূল কৃতিত্ব ছিল সামাজিক সচলতার থেকে ঝোঁক সরিয়ে বর্ণজাতিব্যবস্থার সমূল প্রত্যাখ্যানের দাবিতে নজর সরিয়ে আনায়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মরাঠি ভাষায় তুকারাম তাত্য পদভলের *জাতি বিবেকসার* প্রকাশিত হয়। ফুলে খুব নিবিড়ভাবে এই বই প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তুকারাম এই বইতে বিভিন্ন জাতের সংস্কৃতায়ন এবং সামাজিক সচলতার চেষ্টা এবং এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য প্রতিরোধ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেন। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা আর অভিজাতবৃত্তে বদলের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের তরফে কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী গোষ্ঠীকে উচ্চমর্যাদা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলে। যেমন:- শূদ্র শিবাজীকে ব্রাহ্মণরা ‘ক্ষত্রিয়’ মর্যাদা দিয়েছিলেন। ফুলে এই তর্কধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং এই চিন্তার সঙ্গে সংগতি রেখেই কুনবিদের উপবীত ধারণ আর ক্ষত্রিয়ত্বের লড়াইয়ের সঙ্গে তিনি দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, সামাজিক সচলতার এই টোপে পা দিলে নিপীড়িতদের মধ্যে আদতে অজস্র বিভাজন তৈরি হয়ে মূল লড়াইটাই দুর্বল হয়ে যায়।[৫৫] সামাজিক সচলতার এই বাঁধা গত ফুলে এড়িয়ে চলতে চাইলেও ক্রমে ক্রমে ফুলের আন্দোলনও বর্ণজাতিব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঝড় তোলার বদলে একশ্রেণির মানুষের উঁচুতে ওঠার রাস্তা হয়ে যায়। জ্যোতিবার মৃত্যুর বছর দশেকের মধ্যেই

---

[৫৩] Jotirao Govindrao Phule, *Slavery*, pp.xxix-xxx

[৫৪] তদেব, পৃ.১০৬

[৫৫] Uma Chakravarti, *Rewriting History*: *The Life and Times of Pandita Ramabai*, New Delhi: Zubaan, 1st Published, 2013, https://www.google.co.in/books/edition/Rewriting_History/9TenDAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover , accessed on 27.05.2021

কোলাপুরের মহারাজা এই আন্দোলনের মাথায় চড়ে বসে মারাঠাদের ক্ষত্রিয়ত্বের স্বীকৃতি নিয়ে লড়াই শুরু করলেন। তাতে আন্দোলনের প্রতিবাদী চরিত্র অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেল। এইভাবে আন্দোলন এগোতে এগোতে দেখা গেল, মূল দাবি হিসাবে উঠে আসছে থাকবন্দি বর্ণজাতিকাঠামোয় মারাঠাদের ক্ষত্রিয়ত্ব আর অতিরিক্ত সুযোগসুবিধার প্রশ্ন।[৫৬] সামাজিক সচলতার ঝোঁককে আর এড়িয়ে চলা সম্ভব হল না। বিশ শতকের মহারাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে এই প্রবণতার অনুসরণের কথাই শুনিয়েছেন দলিত সাহিত্যিক কুমুদ পাওড়ে। 'নিচু' মাহার জাতির মেয়ে সংস্কৃত পড়তে এসে যখন ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে তখন জ্যোতিবা ফুলের আন্দোলনের ধ্বজাধারীদের থেকেও জাত নিয়ে খোঁটা শুনতে হচ্ছে। অব্রাহ্মণ এই মানুষরা জ্যোতিবা ফুলের আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে বেড়ায়, জাতিভেদ বিষয়ে গরম বক্তৃতা করে আর 'নিচু' মাহাররা সংস্কৃত পড়তে এলে নানারকম খোঁটা দেয়।[৫৭] ফুলের আন্দোলনও ধীরে ধীরে বর্ণজাতিব্যবস্থার বিদ্বেষমূলক ঘেরাটোপেই আটকে পড়ে।

ফুলের আন্দোলন কেবল জাতপাতের গণ্ডির মধ্যে আটকে ছিল না। ১৮৬০-এর দশকের শুরুতে তিনি পুনে অঞ্চলে বিধবা বিবাহের প্রতি মনোভাব বদলের লড়াইতে নেমে পড়েন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন শিশুহত্যা নিবারক আশ্রম। 'উঁচু' জাতের বিধবারা নির্ভয়ে এই আশ্রমে এসে সন্তানের জন্ম দিয়ে সন্তানকে এখানে রেখে আবার বাড়ির পথে পাড়ি দিতেন।[৫৮] ফুলে বুঝতে পারছিলেন বর্ণজাতি আর সামাজিক লিঙ্গরূপগত বৈষম্য ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দুটি আলাদা ঘটনা নয়। দু'য়ের যোগ প্রবলভাবেই আছে। ফুলে তাঁর আন্দোলনে এই দুই দিকেই সমান নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ফুলের সমসাময়িক

---

[৫৬] বি.টি.রণদিভে, *জাত বর্ণ শ্রেণী এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক*, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, নবম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ.১৯

[৫৭] দেবেশ রায়(সম্পা.), *দলিত*, নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ.২৪৭

[৫৮] Rosalind O'Hanlon, *Caste, Conflict, and Ideology: Mahatma Jotirao Phule and Low Caste Protest in Nineteenth-Century Western India*, p.135

আরেক মরাঠি—পণ্ডিতা রমাবাই নারীপ্রগতির লড়াইতে নেমে আদতে বর্ণজাতিপ্রথার সমস্যাগুলিকেই নির্দেশ করেন। মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, পরে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত রমাবাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ রচনা *High-Caste Hindu Woman* (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭ খ্রি.) খুব দ্রুত সাড়া ফেলে দেয়। ৯০০০ কপি প্রকাশের একবছরের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যায়। তৃতীয় সংস্করণও বিক্রি হয়ে যায় জুন, ১৮৮৮-এর মধ্যে।[৫৯] এই বইয়ের শুরুতেই পশ্চিমি পাঠকদের উদ্দেশে রমাবাই ভারতের বর্ণজাতিব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন। তাঁর মতে, বর্ণজাতিব্যবস্থার উৎপত্তি শ্রমের অর্থনৈতিক বিভাজন থেকে। প্রথমদিকে ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব নির্ধারিত হত ব্যক্তিগত প্রতিভা অনুযায়ী। জন্মগত পরিচয় সেখানে নির্ধারক ছিল না। পরবর্তীকালে বর্ণজাতিব্যবস্থা বংশগত হয়ে যায়। তৈরি হয়ে যায় একই জাতের মধ্যে অসংখ্য থাক। এমনকি, অস্পৃশ্য জাতগুলির মধ্যেও আছে অসংখ্য থাক। জাতের কড়া নিয়ম বজায় থাকে সেখানেও।[৬০] রমাবাইয়ের জাতের প্রশ্নের সঙ্গে বিবাহ আর সামাজিক লিঙ্গরূপগত বৈষম্যের প্রশ্নটিকে জুড়ে নিয়েছেন। তিনি খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন আধুনিক বর্ণজাতিব্যবস্থার সঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত নিয়মের কড়াকড়ির কথা। পূর্বভারতের ব্রাহ্মণদের বা উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজপুতদের প্রসঙ্গে জাতপাত আর বৈবাহিক সম্পর্কের কড়াকড়ির কথাও মনে করিয়েছেন তিনি।[৬১] রমাবাই মহারাষ্ট্রে সারদা সদন নামে বিধবাদের জন্য একটি বিদ্যালয় তৈরি করেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ভারতবর্ষে উঁচু জাতের মানুষদের মধ্যে বৌদ্ধিক চর্চার প্রবণতা সর্বাধিক। যদিও, এই জাতের মহিলারা শিক্ষার স্রোতে সেভাবে আসতে পারেননি। তিনি এই গোষ্ঠীর বিধবা মহিলাদের শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতে

[৫৯] Meera Kosambi, *Pandita Ramabai: Life and Landmark Writings*, New York: Routledge, 1st Published, 2016, p.128

[৬০] Pandita Ramabai Saraswati, *The High-Caste Hindu Woman*, New York: Fleming H.Revell Company, New Edition, 1901, pp.34-36

[৬১] তদেব, পৃ.৫০-৫২

নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, একটু যত্ন নিয়ে এঁদের লেখাপড়া শেখালে অচিরেই খুব উন্নতি সম্ভব। উপরিউক্ত বইয়ের শেষভাগে রমাবাই এপ্রসঙ্গে চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলির মতো 'উঁচু' জাতের বাঙালির বা আনন্দীবাই জোশীর মতো মরাঠিদের কথা স্বীকার করেছেন।[৬২] এই 'উঁচু' জাতের মহিলারা যাতে তাঁর আবাসিক বিদ্যালয়ে থাকার সময় জাতপাত সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলতে পারে—সে সম্পর্কেও তাঁর সচেতনতা ছিল।[৬৩] আমাদের মনে পড়ে যাবে, রমাবাই স্বীকার করেছিলেন, তিনি জাত্যভিমান পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। 'আর্য মহিলা সমাজ' নামক প্রতিষ্ঠান, *স্ত্রী ধর্ম নীতি* নামক বই আর বিধবা আশ্রমের মাধ্যমে রমাবাই কার্যত তাঁর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে 'উঁচু' জাতের গণ্ডির মধ্যেই আটকে রেখেছিলেন। ফুলের মতো রমাবাইও বিশ্বাস করেন, বৈষম্যে ভরপুর সমাজ সবসময়েই অনগ্রসর অংশের উন্নতি প্রতিহত করে। তবে মূলত 'উঁচু' জাতের মহিলাদের মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকলেও রমাবাইয়ের প্রতি সমসাময়িক সংস্কারক, নেতা জ্যোতিবা ফুলে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রমাবাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে সমাজের একটি অংশের কাছে নিন্দিত হলেও ফুলে ছিলেন এই ঘটনার সমর্থক। রমাবাই এবং ফুলে দু'জনেই আদতে জাতিগত অথবা ধর্মগত দিক থেকে 'উঁচু' জাতের সমাজের নিরিখে খুবই প্রান্তিক অবস্থানে আছেন। সেখান থেকেই তাঁরা 'উঁচু' জাতের বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়েছেন। সেই সূত্রেই সম্ভবত, পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও, ফুলের রমাবাইয়ের প্রতি সম্ভ্রম ছিল।[৬৪]

ফুলে আর রমাবাইয়ের সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল মহারাষ্ট্রের সমসাময়িক নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের। বর্ণজাতিব্যবস্থা আর অন্তঃপুরে মেয়েদের অবস্থান ঘিরে এই বিতর্ক বেধেছিল।

---

[৬২] তদেব, পৃ.১৩১-১৩২

[৬৩] তদেব, পৃ.১৩৭

[৬৪] Parinita Shetty, 'Christianity, Reform, and the Reconstitution of Gender: The Case of Pandita Mary Ramabai, Journal of Feminist Studies in Religion, Vol.28, No.1, Spring 2012, pp.31-33, 39

মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই পেশোয়া রাজের প্রতি অতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পেশোয়াদের বর্ণজাতিব্যবস্থার রক্ষার প্রতি অনমনীয় মনোযোগ তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল। 'মাহরাট্টা' পত্রিকার ১০ মে, ১৮৯১ তারিখের সম্পাদকীয়তে তিলক লিখেছিলেন—বর্ণজাতিব্যবস্থা আর মেয়েদের অন্তঃপুরে অবস্থানই হিন্দু জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি।[৬৫] আধুনিক চিন্তাবিদদের মতোই তিলকও এক্ষেত্রে জাতপাত আর জাতিরাষ্ট্রের সম্পর্ক বিবেচনা করছেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে পেশোয়া রাজের পতনের পরে অনেক সমাজসংস্কারক বর্ণজাতিপ্রথা আর নারীপ্রগতি বিষয়ে আন্দোলন শুরু করেন। জ্যোতিবা ফুলে এই ধারা মেনে বর্ণজাতিপ্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণের পাশাপাশি ১৮৪৮-১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৈরি করেন কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুঙ্কর, ভি.এন.মাণ্ডলিক এবং তিলক ফুলেদের ভঙ্গিতে আক্রমণ করতে থাকেন। নিজেদের 'জাতীয়তাবাদী' হিসাবে চিহ্নিত করে ফুলেদের 'হিন্দু জাতিরাষ্ট্র' গঠন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসঘাতক বলে দেগে দেন। কুনবি (মহারাষ্ট্রীয় কৃষক)-দের লেখাপড়া শেখার আগ্রহকে তিলক ভালো চোখে দেখেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, কুনবিরা এতে নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনবে। স্পষ্টতই তিলক উচ্চশিক্ষা আর চাকরির জগতে 'উঁচু' জাতের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বাড়াতে নারাজ ছিলেন।[৬৬] অর্থাৎ, শিক্ষা আর চাকরির মাধ্যমে কোন একটি জাতির সামাজিক সচলতার সম্ভাবনা তিলকের মনঃপুত নয়। নারীপ্রগতির ক্ষেত্রেও একই ছবি। জাতীয়তাবাদীরা মনে করতেন বৈদিক আমলের থেকেও পেশোয়াদের আমলে মেয়েদের অবস্থা উন্নত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, ১৮৮০ এর দশক থেকে মহারাষ্ট্রের 'আলোকপ্রাপ্ত' মহিলারা মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ্য পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে গলা ফাটাতে শুরু

---

[৬৫] Parimala V. Rao, 'Nationalism and The Visibility of Women in Public Space: Tilak's Criticism of Rakhmabai and Ramabai', The Indian Historical Review, Vol.XXXV, No.2, July, 2008, p.155

[৬৬] https://velivada.com/2015/06/28/jotiba-phule-and-tilak-and-question-of-education-for-women-and-non-brahmins/ accessed on 29.05.2021

করলেন। তারাবাই ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে *স্ত্রী পুরুষ তুলনা* বইতে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র আর পাতিব্রত্যের ধারণাকে তুলোধোনা করেন। তাঁর যুক্তি আর বাচনভঙ্গি ফুলের রচনার সঙ্গে সাদৃশ্য মনে করিয়ে দেয়। তিলক মেয়েদের শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। মেয়েরা ইংরেজি, ইতিহাস ও গণিত শিক্ষায় অপটু—এমনটাই ছিল তিলকের বদ্ধমূল ধারণা। মেয়েরা বড়োজোর একটু সংস্কৃত, সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি শিখতে পারে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভঙ্গিতেই তিনি মনে করেছিলেন মেয়েরা বেশি পড়াশোনা শিখলে উচ্ছন্নে যাবে।[৬৭] রমাবাইয়ের সঙ্গে তিলকের বিরোধও বাধে এই কারণে। রমাবাই প্রতিষ্ঠিত সারদা সদনের একটি মেয়ে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তিলক পত্রিকায় রমাবাইয়ের নারীপ্রগতির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা ভাষায় ৬ টি প্রবন্ধ লেখেন। তিলকের তীব্র আক্রমণে এই প্রতিষ্ঠান ১৮৯৩ সালে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয়।[৬৮] পরবর্তীকালে আমরা তিলককে আম্বেদকরের সঙ্গে বিতর্কে জড়াতে দেখি। দলিত কৃষকদের উপর ব্রাহ্মণ, মারাঠাদের উচ্চ কর আদায়ের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে আম্বেদকর এই আন্দোলনকে সমর্থন জানান এবং কৃষকস্বার্থকেন্দ্রিক বিল পাশের লড়াইতে সক্রিয়ভাবে পাশে থাকেন। তিলক এই বিলের মধ্যে উচ্চবর্ণের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা বিবেচনা করে বিলটির বিরোধিতা করেন।[৬৯] ব্রাহ্মণ্যবাদের পক্ষে তিলকের এই অবস্থান স্মরণে রেখে আমরা তাঁর *গীতারহস্য* (প্রথম প্রকাশকাল ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) বইটির প্রাসঙ্গিক অংশ বিবেচনা করতে পারি। কর্ম, জ্ঞান আর ভক্তির তুলনামূলক আলোচনায় তিলক বললেন, জ্ঞানমার্গের অনুশীলনে উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন; কিন্তু ভক্তিমার্গে সকলেরই অধিকার। উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র বা জৈমিনির মীমাংসাশাস্ত্রে সাধনার জন্য শ্রুতিনির্দিষ্ট বিভিন্ন যজ্ঞকর্মের,

---

[৬৭] Parimala V. Rao, 'Nationalism and The Visibility of Women in Public Space: Tilak's Criticism of Rakhmabai and Ramabai', pp.156-160

[৬৮] তদেব, পৃ.১৭৩-১৭৪

[৬৯] https://thewire.in/caste/lower-caste-ambedkar-anti-caste-struggle , accessed on 29.05.2021

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের বিধান থাকলেও শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞার কারণেই তা কেবল দ্বিজাতিদের অধিগম্য। নারী আর শূদ্রের মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে এই সমস্ত শাস্ত্র প্রায় চুপ। যদিও, ব্যাসদেবের *মহাভারত*-এর সূত্রে আমরা জানি বিদুর শূদ্র হয়েও পরম উপলব্ধিতে পৌঁছতে পেরেছিলেন। বাদরায়ণের প্রসঙ্গ এনে তিলক বলেন, ঈশ্বরের 'বিশেষানুগ্রহ'ই নারী ও শূদ্রের মুক্তির উপায়। এই 'বিশেষানুগ্রহ' লাভের উপায় আন্তরিক ভক্তি। তা থাকলে যে কোন জাতের লোকই ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেতে পারেন।[৭০] আম্বেদকরের গীতাবিষয়ক অপ্রকাশিত আলোচনা পাশে রাখলে তিলকের অবস্থান আরও স্পষ্ট হবে। তিলক যেখানে *গীতা*-র বর্ণজাতি সম্পর্কিত বক্তব্যে সমালোচনার কিছু দেখছেন না, সেখানে আম্বেদকরের *গীতা*-র ব্রাহ্মণ্যবাদী বয়ানের সমালোচনায় তৎপর। তিলক বলেছিলেন, বৃত্তি বা জাত না বদলেও নারী আর শূদ্রের ভক্তিমার্গে অধ্যাত্ম উপলব্ধি সম্ভব। আম্বেদকর উল্টোদিকে বলেছেন, শুধু আন্তরিক ভক্তির মাধ্যমে মুক্তির কথা *গীতা* বলছে না। বরং, ভক্তির পাশাপাশি বর্ণাশ্রমের নিয়মকানুন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। ফলে, ভক্তিমার্গে মুক্তি মিললেও *গীতা*-র মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র বর্ণজাতিকাঠামো রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছে। বর্ণজাতিপ্রথার সামান্য উল্লঙ্ঘনও সেখানে মুক্তির সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেয়।[৭১] এই সমালোচনার ধাঁচ স্বাভাবিকভাবেই তিলকের রচনায় আশা করা যায় না।

আম্বেদকরের *Annihilation of Caste* (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬ খ্রি.) বইটি তৈরি হয়েছিল লাহোরের জাত-পাত-তোড়ক মণ্ডলের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্য হিসাবে। পরে বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত না হলেও আম্বেদকর স্বতন্ত্র বই হিসাবে লেখাটি প্রকাশ করেন। তাঁর

---

[৭০] Bal Gangadhar Tilak, *Sri Bhagavagita-Rahasya orKarma-Yoga-Sastra(Vol.1)*, Poona: Tilak Brothers, 1st Edition, 1935, pp.613-615

[৭১] https://www.boloji.com/articles/11759/ambedkar-and-the-bhagwat-gita , accessed on 29.05.2021

বিশ্বাস, শাস্ত্রের পবিত্রতায় মানুষের আস্থার দরুণ জাতপাত এত প্রবলভাবে ভারতীয় সমাজে টিকে আছে। শাস্ত্রই মানুষকে জাতপাতের শিক্ষা দেয়। শাস্ত্রের কর্তৃত্বকে, পবিত্রতাকে অস্বীকার করতে না পারলে জাতপাতের বিনষ্টি অসম্ভব—'The real remedy is to destroy the belief in the sanctity of the shastras.'[৭২] পরবর্তীকালে রচিত *Who were the Shudras?*(প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬ খ্রি.)-বইতেও তিনি লেখেন, সিভিল প্রসিডিওর কোডের ১১নং সেকশন অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতে জাতপাতের আইনি বৈধতা শেষ হলেও ধর্মীয় ও সেই সূত্র ধরে সামাজিক বৈধতার জোরেই জাতপাত এখনো একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠান।[৭৩] আম্বেদকর নিজে দলিত মাহার সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁর জাতপাত সংক্রান্ত আলোচনা জাতিগত অবস্থানের কারণেই তিলকের মতো চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বা অন্য 'উচ্চ'বর্ণের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মেলে না। *Annihilation of Caste*-এ তিনি জাতপাতের সমর্থকদের যুক্তিগুলি খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। বর্ণজাতিপ্রথার একদল সমর্থক বলেন—এই ব্যবস্থা আসলে একধরনের শ্রমবিভাজন। যেকোন সভ্য সমাজেই এই ধরনের শ্রমবিভাজনের প্রয়োজন। আম্বেদকর এই মতবাদের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি সাজিয়েছেন[৭৪]—

১. বর্ণজাতিপ্রথা নিছক শ্রমবিভাজন। এর সঙ্গে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের ধারণা এবং বৈষম্যও জড়িয়ে আছে।

২. বর্ণজাতিপ্রথাভিত্তিক শ্রমবিভাজন আদৌ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের বিকাশের সঙ্গে পছন্দ অনুযায়ী পেশা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা বর্ণব্যবস্থায় নেই। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের বিকাশ আর পছন্দের বিপরীতে এক্ষেত্রে পেশা নির্ধারিত হয় বংশানুক্রমে। আমাদের মনে পড়ে যাবে,

---

[৭২] B.R.Ambedkar, *Annihilation of Caste*, New Delhi: Navayana, The Annotated Critical Edition, [], p.287

[৭৩] B.R.Ambedkar, *Who were the Shudras? How they Came to be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society*, Bombay: Thackers, Reprint, 1970, p.xvi

[৭৪] B.R.Ambedkar, *Annihilation of Caste*, pp.233-235

গান্ধির কিছু রচনায় পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিভেদের সমর্থন আছে। সেদিক থেকে দেখলে, আম্বেদকর উল্টো কথা বলছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর আম্বেদকর কার্যত একই দিকে।

৩. শিল্প-বাণিজ্যের জগৎ আর সভ্যতা প্রতিনিয়ত বদলে যায়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে পেশা পরিবর্তনের মাধ্যমে, নতুন পেশা আত্তীকরণের ফলে জীবিকার সংস্থান সম্ভব। বর্ণজাতিব্যবস্থা কার্যত সেই সুযোগ কেড়ে নিয়েছে। সেই দিক থেকে দেখলে, ভারতের মানুষদের বেকারত্বের একটা বড়ো কারণ বর্ণজাতিপ্রথা। এখানে আম্বেদকর জাতপাতের প্রশ্নটিকে দেশের বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে জুড়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গেও গান্ধি-আম্বেদকরের মতানৈক্য চোখে পড়া স্বাভাবিক। 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ১৯২৭ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে গান্ধি লিখেছিলেন—অর্থোপার্জনের জন্য নতুন নতুন পন্থা খোঁজার কোন দরকার নেই। বংশানুক্রমে প্রাপ্ত পেশার অনুসরণই শ্রেয়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত আরেকটি প্রবন্ধে তিনি বলেন—বংশানুক্রমিক বৃত্তি পরিবর্তন সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞাটি খুবই সংগত। বৈষয়িক উন্নতির দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ বৃত্তি পরিবর্তন করতে থাকলে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়ে জীবনের যাবতীয় সৌন্দর্য কেড়ে নেবে।[৭৫]

আম্বেদকর আর্য সমাজীদের চাতুর্বর্ণ্য তত্ত্বের বিরোধিতাও করেছিলেন। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, চাতুর্বর্ণ্য তত্ত্ব জন্ম নয়, বরং গুণের দ্বারা নির্ধারিত। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধেও আম্বেদকর একাধিক যুক্তি দিয়েছিলেন—[৭৬]

[৭৫] https://www.mkgandhi.org/my_religion/36varna_caste.htm , accessed on 30.05.2021

[৭৬] B.R.Ambedkar, *Annihilation of Caste*, pp.263-266

১. যদি গুণের ভিত্তিতেই মানুষের পরিচয় হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ইত্যাদি তকমার কী প্রয়োজন? বিদ্বানকে সেক্ষেত্রে বিদ্বান হিসাবেই সম্মান জানানো যেতে পারে; ব্রাহ্মণ বলে সম্বোধন করার কোন দরকার নেই।

২. যেকোন সংস্কারের সঙ্গেই ধারণা, আবেগ, মনোভঙ্গি পরিবর্তনের সম্পর্ক থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি তকমার সঙ্গে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের ধারণা দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে আছে। পুরনো তকমা অবিকৃতভাবে বজায় রেখে পুরনো ধ্যানধারণার বদল কীভাবে সম্ভব?

৩. আম্বেদকরের তৃতীয় যুক্তিটি আরও ক্ষুরধার। যাঁরা ইতিমধ্যেই উচ্চবংশগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, গুণগত চাতুর্বর্ণ্যের জেরে কীভাবে তাঁদের স্থানচ্যুত করা সম্ভব? কীভাবেই বা তাঁদের বাধ্য করা হবে? এটা কার্যক্ষেত্রে করতে গেলে জাতিব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে তারপর চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোটি প্রতিষ্ঠা করতে হয়!

৪. চাতুর্বর্ণ্য মানুষকে চারটি সুনির্দিষ্ট গুণগত শ্রেণির মধ্যে বেঁধে ফেলতে চায়। মানুষের মধ্যে যে অগুণিত গুণের সম্ভাবনা আছে তা কি আদৌ মাত্র চারটি খোপের মধ্যে এঁটে ফেলা সম্ভব? এদিক থেকে চাতুর্বর্ণ্যের ধারণাটি খুবই ভাসাভাসা।

সামাজিক সচলতা সম্পর্কেও আম্বেদকর প্রশংসনীয় সচেতনতার নিদর্শন দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের পাথারে প্রভু আর সোনারদের সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া প্রতিহত হয়েছিল পেশোয়াদের বিরুদ্ধতায়। সোনাররা ব্রাহ্মণদের মতো করে ধুতি পরছিলেন, নমস্কার জানাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণরা এই সংস্কৃতায়নের প্রক্রিয়া ভালো চোখে নেননি। বলপূর্বক এই প্রচেষ্টা দমন করা হয়। পাথারে প্রভুদের একটি অংশ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বিধবা বিবাহের রেওয়াজ বন্ধ করতে চাইছিল। এটাই ছিল তাঁদের 'উচ্চ'বর্ণকে অনুসরণের চেষ্টা। গোষ্ঠীর একটা অংশ

প্রাচীন বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বিবাদ পৌঁছয় পেশোয়ার দরবারে। পেশোয়ারা পাথারে প্রভুদের একটি অংশের বিধবা বিবাহ রদের মাধ্যমে 'উচ্চ'বর্ণের অনুকরণের চেষ্টা মেনে নিতে পারেননি।[৭৭] দুটি ক্ষেত্রেই সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে সামাজিক সচলতার চেষ্টা বলপূর্বক দমিত হচ্ছে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পথ নিয়েছেন বলেই আম্বেদকরের রচনায় সামাজিক সচলতার দিকে ঝোঁক পড়েছে। *Who were the Shudras* উপশিরোনাম *How they Came to be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society*। উপশিরোনাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে লেখক একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান করেছেন। সেই অনুসন্ধানে শূদ্রের 'অবনমন' এর কারণ অন্বেষণে আম্বেদকর বলেছেন, ব্রাহ্মণরা একসময় শূদ্রের উপনয়নের অধিকার অস্বীকার করতে শুরু করে।[৭৮] উপনয়ন ব্রাহ্মণ্য সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। সেই সংস্কাররহিত হয়েই 'শূদ্র' চতুর্থ বর্ণে পরিণত হয়। সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ার খোঁজ পাওয়া যাবে আম্বেদকরের আরেকটি বই *The Untouchables* (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮ খ্রি.)। ভারতের অস্পৃশ্য জাতিগুলির উদ্ভবের কারণ খুঁজতে গিয়ে আম্বেদকর কিছু প্রচলিত মত অস্বীকার করেছেন। একটিকে বলা যেতে পারে বর্ণগত তত্ত্ব (racial theory), আরেকটি পেশাগত তত্ত্ব (occupational theory)। আম্বেদকর *Annihilation of Caste*-এই বর্ণগত তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছিলেন। নৃতত্ত্বের দিক থেকে পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ আর পঞ্জাবের চামারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[৭৯] এই বইতেও সেই একই যুক্তিতে প্রথম মতটি অস্বীকার করলেন। রাইস সাহেবের মতে, নোংরা এবং ঘৃণ্য পেশাগুলির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণেই কিছু গোষ্ঠীকে অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আম্বেদকর এই যুক্তি মেনে নিতে পারেননি।

---

[৭৭] তদেব, পৃ.২৫১-২৫২

[৭৮] B.R.Ambedkar, *Who were the Shudras? How they Came to be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society*, p.177

[৭৯] B.R.Ambedkar, *Annihilation of Caste*, pp.237-238

নারদস্মৃতি-র সাক্ষ্যে তিনি দেখান, আর্যরাও ক্ষেত্রবিষেষে অপরিষ্কার কাজকর্ম করতেন; কিন্তু সেকারণেই তাঁদের 'অস্পৃশ্য' বলে দেগে দেওয়া হয়নি।[৮০] আম্বেদকর মনে করেছেন, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এককালে এই 'অস্পৃশ্য' গোষ্ঠীগুলির যোগ ছিল। গোমাংসভক্ষণের ধারাও চালু ছিল এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগেও এই বৌদ্ধধর্মভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলি ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য স্বীকার করে নিতে রাজি হয়নি। ব্রাহ্মণরাও এই সুযোগে পুরনো বিদ্বেষের সূত্রে গোষ্ঠীগুলিকে 'অস্পৃশ্য' তকমা দেন।[৮১] তবে, এটিই অস্পৃশ্যতার উৎপত্তির একমাত্র কারণ নয়। অনেক গোষ্ঠীই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই 'অস্পৃশ্য' বলে চিহ্নিত হননি। এই সূত্রে গো-মাংস ভক্ষণকে আম্বেদকর অস্পৃশ্যতার আরেকটি কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, অস্পৃশ্যতার কারণ আন্দাজ করে এই গোষ্ঠীগুলি কেন গো-মাংস ভক্ষণ ছেড়ে দিল না? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন, গো-প্রীতি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে উত্তরোত্তর বাড়ছিল। সেই সঙ্গেই বাড়ছিল গো-হত্যা সম্পর্কে বিরাগ। এই 'অস্পৃশ্য' মানুষগুলি গো হত্যা করতেন না; কেবল মৃত গবাদি পশুর মাংস খেতেন। সুতরাং, গো-হত্যার অভিযোগে অস্পৃশ্যতার খাঁড়া নেমে আসতে পারে—এমনটা তাঁরা আন্দাজ করেননি। এইভাবে আম্বেদকর একটি অধোমুখী সামাজিক সচলতার ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। মনে রাখা দরকার, সামাজিক সচলতার ইতিহাস নির্মাণ করলেও, সামাজিক সচলতার মতো একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রকল্পে আম্বেদকরের সায় নেই। তাঁর নজর স্পষ্টতই বর্ণজাতিপ্রথার বিলোপনে।

ইতিপূর্বেই আমরা অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রকল্পে গান্ধির ভূমিকা লক্ষ করেছি। 'উচ্চ'বর্ণের মানুষের শুভচেতনার উন্মেষের উপরেই গান্ধি অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। মন্দির,

---

[৮০] B.R.Ambedkar, *The Untouchables: Who Were They and Why They Became Untouchables?*, Delhi: Siddharth Books, Reprint, 2008, pp.78-81

[৮১] তদেব, পৃ.৮৯

স্কুল, কলেজ, চাকরিতে অস্পৃশ্যদের বৈষম্য তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, অনেকদিন থেকেই 'অস্পৃশ্য'রা বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি ধর্মে আশ্রয় নিয়ে 'উঁচু' জাতের অত্যাচার থেকে বাঁচতে চেয়েছে। গান্ধির বিশ্বাস, ধর্ম পরিবর্তনের বদলে আত্মনির্ভরতা আর আত্মশুদ্ধিই তাঁদের মুক্তি এনে দেবে। ধৈর্য সহকারে তাঁদের হিন্দুদের চেতনার বদলের জন্য অপেক্ষা করা উচিত! আরেকটি চিঠিতে গান্ধি প্রস্তাব দেন, সকলের প্রথমে শূদ্রের পর্যায়ে নেমে যাওয়া উচিত, শূদ্রের বৃত্তি অনুসরণ করা উচিত। তারপর গুণ-কর্ম অনুযায়ী সেখান থেকেই বাকি তিনটি বর্ণ উঠে আসবে।[৮২] এহেন প্রস্তাব কীভাবে বাস্তবে কার্যকরী হবে, তা অবশ্য বোঝা মুশকিল। আম্বেদকর গান্ধি এবং কংগ্রেসের অস্পৃশ্যতা বিষয়ক কর্মকাণ্ড মেনে নিতে পারেননি। *What Congress and Gandhi have done to the Untouchable* (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ)-নামক বইতে তিনি গান্ধির অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের অসারতা সম্পর্কে অনেকগুলি অভিযোগ করেন। আম্বেদকর লেখেন, ১৯২৯ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অস্পৃশ্যদের আন্দোলনের পাশে গান্ধিকে পাওয়া যায়নি।[৮৩] ১৯৩৩ সালে গুরুভায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে গান্ধিজী দাবি করেন, এই দাবি মানা না হলে তিনি আমরণ অনশন শুরু করবেন। এই মন্দিরে এখনো অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু, গান্ধির আমরণ অনশনের খবর পাওয়া যায়নি। আম্বেদকর খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন, বিভিন্ন দাবিতে অনশন করলেও অস্পৃশ্যদের জন্য গান্ধিজীর অনশনের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। একই বছরে গান্ধি হরিজন সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতিকল্পে এই সংস্থা তৈরি হলেও সংস্থাটির রাশ ছিল 'উচ্চ'বর্ণের হাতে। আম্বেদকর এই

---

[৮২] Prabhati Mukherjee, *Beyond the Four Varnas*, Shimla: Indian Institute of Advanced Study, 1st Published, 1988, pp.8-9

[৮৩] Vasant Moon(ed.), *Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches(Vol.9)*, New Delhi: Dr. Ambedkar Foundation, Reprint, 2014, pp.264

কর্মপদ্ধতি সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল দলিত অধিকার রক্ষার আন্দোলনের রাশ দলিতদের হাতেই থাকা উচিত। তাঁর মনে হয়েছিল উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি আর গান্ধির ঔদাসীন্যে এই সংস্থা প্রায় মৃত্যুর মুখে।[৮৪] গোলটেবিল বৈঠকেও গান্ধি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক রক্ষাকবচের বিরোধিতা করেন।[৮৫] আম্বেদকরের মনে হয়েছিল, কংগ্রেস আর গান্ধি করুণা দিয়ে অস্পৃশ্যদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে মেরে ফেলতে চাইছে। রাজনৈতিক ক্ষমতাই যে অধিকার আদায়ের পথ—একথা গান্ধি স্বীকার করতে চাননি।[৮৬]

গান্ধির লেখালেখির ইতিহাসে বারবার মতবদলের প্রবণতা দেখা যায়। জীবন গান্ধির কাছে ছিল একপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সুতরাং, নানাবিধ অভিজ্ঞতা আর চিন্তার পরিবর্তনের সূত্রে নীতিগতভাবে সত্যের প্রয়োজনে পুরনো মত বদলে ফেলায় তাঁর অনীহা ছিল না। কাজেই, গান্ধির বিপুল রচনাসম্ভারের একটি নির্বাচিত অংশের ভিত্তিতে কোন একটি বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গি সম্বন্ধে চটজলদি সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। সেই প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, ফুলে বা আম্বেদকর পশ্চিমি 'আধুনিকতা' সঞ্জাত বোধের জমিতে দাঁড়িয়ে যেভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈষম্যের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন, সেই 'আধুনিকতা' সম্বন্ধেই গান্ধির সংকোচ এবং প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট। *Hind Swaraj* (প্রথম প্রকাশ ১৯০৮ খ্রি.)-এর মুখবন্ধে গান্ধি লেখেন এই পুস্তিকা 'আধুনিকতা'র কড়া নিন্দা। যত দিন গেছে, এই ধারণা গান্ধির মনে তত বদ্ধমূল হয়েছে।[৮৭] তাঁর বিশ্বাস, পশ্চিমি 'আধুনিক' সভ্যতা ধর্মবোধশূন্য—'This civilisation is irreligion'। এই সভ্যতা ধীরে ধীরে নিজেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। 'আধুনিকতা'দুষ্ট এই সভ্যতা

---

[৮৪] তদেব, পৃ.২৫০-২৫১

[৮৫] তদেব, পৃ.২৫৮

[৮৬] তদেব, পৃ.২৭০

[৮৭] M.K.Gandhi, *Hind Swaraj o Indian Home* Rule, Madras: G.A.Natesan & Co., [], [], p.2

তাঁর কাছে ‘শয়তানের সভ্যতা’।[৮৮] এই বইতেই তিনি আবার বলেন, ধনসম্পদের মধ্যে সুখের উৎস নেই জেনে ভারতীয় পূর্বপুরুষরা ধনোপার্জনের প্রবৃত্তিতে লাগাম পরিয়েছিলেন। ‘আধুনিকতা’-জাত বিধ্বংসী প্রতিযোগিতার আঁচ ইতিপূর্বে কখনও ভারতীয় জীবনে এসে লাগেনি। সকলে পূর্বপুরুষের পেশা অনুসরণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই অভিশপ্ত আধুনিক সভ্যতা এখনও যেখানে পৌঁছয়নি, সেখানে আদি-অকৃত্রিম ভারতবর্ষ টিকে আছে।[৮৯] তাঁর মনে হয়েছিল, ‘আধুনিকতা’ একরকমের ভ্রান্ত চেতনা তৈরি করে মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত চাহিদার জন্ম দেয়।[৯০] গান্ধির পশ্চিমি সভ্যতার বিরোধিতা সেকালে অনেক বুদ্ধিজীবীই মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ গান্ধির বিরুদ্ধে গিয়ে বললেন, পশ্চিমি যন্ত্রসভ্যতা ও বিজ্ঞানকে নির্ভয়ে গ্রহণ না করে, কেবল চরকা আর গ্রামীণশিল্প নিয়ে পড়ে থাকলে দেশ পিছিয়ে থাকবে।[৯১] গান্ধি তবু তাঁর মতে অনড় ছিলেন। ‘আধুনিক’ সভ্যতার প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক সম্পর্কের চাপ জীবনের সৌন্দর্য নষ্ট করে দিতে পারে বলেই তিনি বারংবার বর্ণনির্দিষ্ট পেশার অনুসরণের কথা বলেছেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বরে ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে গান্ধি জানিয়ে দেন, জাত (caste)-এর সঙ্গে বর্ণের পারতপক্ষে কোন সম্পর্ক নেই। ‘জাত’ বর্ণব্যবস্থারই একটি বিকৃত রূপ। প্রাচীনযুগে অন্যের পেশায় অনধিকার প্রবেশের অনর্থক প্রতিযোগিতা ছিল না। তাতে প্রত্যেকেই বংশানুক্রমিক পেশা অনুসরণ করে অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনের সুযোগ পেতেন। সুতরাং, অহেতুক ধনোপার্জনের তাড়নায় পেশা বদলে প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়ে জীবনের মাধুর্য নষ্ট করা বিবেচকের কাজ নয়।[৯২] ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দেই

---

[৮৮] তদেব, পৃ.২৪

[৮৯] তদেব, পৃ.৫৪-৫৬

[৯০] Mahesh Gavaskar, ‘Gandhi’s *Hind Swaraj*: Retrieving the Sacred in the Time of Modernity’, Economic and Political Weekly, September 5-11, 2009, Vol.44, No.36, p.15

[৯১] পান্নালাল দাশগুপ্ত, *গান্ধী-গবেষণা,* কলকাতা:নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০, পৃ.২১৮

[৯২] https://www.mkgandhi.org/my_religion/36varna_caste.htm , accessed on 30.05.2021

'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় প্রকাশিত 'Varnashrama and Its Distortion' প্রবন্ধে তিনি বলেন, সমস্ত পেশার মর্যাদাই সমান। বিভিন্ন বর্ণ ও পেশার মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদের কল্পনা অলীক।[৯৩] এই প্রসঙ্গে দুটি দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, গান্ধি বর্ণজাতিপ্রথার নতুন তত্ত্বায়ন করে ফেললেন। বর্ণজাতিপ্রথাকে বের করে আনতে চাইলেন ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের ধারণা থেকে। আসলে, গান্ধি আর আম্বেদকরের রচনায় 'বর্ণ' শব্দটি বহুবার এলেও দু'জনে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। 'বর্ণ' বলতে গান্ধি বুঝতেন পরস্পর নির্ভরতাযুক্ত চারটি সামাজিক গোষ্ঠীর এক আদর্শায়িত রূপকে।[৯৪] আম্বেদকর বুঝতেন সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যযুক্ত সামাজিক প্রথাকে। সুতরাং, কল্পিত 'আদর্শ' আর বাস্তব 'প্রথা'র ফারাক গান্ধি আর আম্বেদকরের বর্ণজাতি বিষয়ক বিবেচনাকে প্রভাবিত করেছে। এই আদর্শায়িত রূপে বিশ্বাসের কারণেই গান্ধি বর্ণের ক্রমোচ্চবিন্যাস অস্বীকার করেছিলেন। আম্বেদকরের আবার মনে হয়েছিল, 'বর্ণ' শব্দটির সঙ্গে জুড়ে আছে বহু শতাব্দীপ্রাচীন ক্রমোচ্চবিন্যাস আর বৈষম্যের অনুষঙ্গ। তাঁর মতে, চাতুর্বর্ণ্যের এই কাঠামোই জাত আর অস্পৃশ্যতার জন্ম দিয়েছে।[৯৫] বর্ণব্যবস্থার নিয়ম মেনে না চললে নৈরাজ্যের আশঙ্কা বোধ করেছেন গান্ধি। আবার, তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, বর্ণব্যবস্থার যে রূপের কথা তিনি বলছেন, তা কেবল তাঁর কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ। তবে ,সমবেত চেষ্টার মাধ্যমে এই আদর্শায়িত রূপের বাস্তবায়ন সম্ভব। আম্বেদকর আবার বিশ্বাস করতেন, গান্ধির 'বর্ণ' কার্যত জাতেরই ছদ্মনাম। কারণ, জাতের মতোই গান্ধির 'বর্ণ'ও বংশানুক্রমিক পেশা অনুসরণের নির্দেশ দেয়।[৯৬] দ্বিতীয়ত,

---

[৯৩] Mahatma Gandhi, *Young India1927-28*, Madras: S Ganesan, 1st Published, 1935, p.463

[৯৪] পান্নালাল দাশগুপ্ত লিখেছেন, পুরনো নাম বা শব্দের প্রতি গান্ধির ভালোলাগা ছিল। আবার, প্রয়োজনমাফিক, পুরনো শব্দগুলিকেই তিনি আধুনিক অর্থে, নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছেন। বর্ণাশ্রমের যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন, তা ব্যবহারিক বর্ণাশ্রম নয়। একটি আদর্শায়িত রূপ। দ্র.পান্নালাল দাশগুপ্ত, *গান্ধী-গবেষণা,* পৃ.২৫৪

[৯৫] Ankur Barua, 'Revisiting the Gandhi-Ambedkar Debates over 'Caste': The Multiple Resonances of Varna', Journal of Human Values, Vol.25, No.1, 2019, pp.26-27

[৯৬] তদেব,পৃ.৩০-৩২, ৩৫

পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিভেদে আস্থা রাখার নির্দেশের মাধ্যমে গান্ধি সামাজিক সচলতার সম্ভাবনাকে তাত্ত্বিক স্তরে খারিজ করে দিচ্ছেন। বৃত্তিভেদ, অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতা, সচলতা থেকে দূরে থাকতে চেয়ে 'আধুনিকতা'র হাত থেকে বাঁচতে চাইছেন। কিন্তু, গান্ধির এই বক্তব্যে অনৈতিহাসিকতাও রয়ে যাচ্ছে না কি? আমাদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বৃত্তিবদল আর সামাজিক সচলতার প্রবণতা প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতেও পরিচিত ছিল। অর্থের জোরে জাতের মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টা, বিভিন্ন জাতের পেশা বদলের মাধ্যমে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম—সব 'দোষ'কেই 'আধুনিকতা'র ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া বোধহয় ইতিহাসসম্মত হবে না। সামাজিক সচলতার সম্বন্ধে গান্ধির কুণ্ঠা ঠিক কতখানি তা বোঝাতে একটি উদাহরণ যথেষ্ট। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় 'Varnashrama' প্রবন্ধে গান্ধি বলেন, বর্ণ নিঃসন্দেহে বংশগত। তবে, শূদ্রের পক্ষেও বৈশ্য হয়ে ওঠা সম্ভব। যদিও, সেকারণে গায়ে 'বৈশ্য'এর তকমা লাগানো নিষ্প্রয়োজন। যে ব্রাহ্মণোচিত কাজকর্ম করছে, সে নিশ্চয়ই পরজন্মে ব্রাহ্মণ বর্ণ লাভ করবে। কিন্তু ইহজন্মেই এক বর্ণ থেকে আরেক বর্ণে যাতায়াত করলে যথেষ্ট সমস্যা তৈরি হতে পারে।[৯৭]

অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে গান্ধির আন্দোলনের একটা ছবি ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি। একটি চিঠিতে গান্ধি লিখেছিলেন—Untouchability is a soul-destroying sin. Caste is a social evil.[৯৮] এই বিশ্বাস থেকেই গান্ধি বিভিন্ন সময়ে অস্পৃশ্যদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিশ শতকের দুইয়ের দশকে ভৈকমে অস্পৃশ্যদের সত্যাগ্রহ শুরু হলে সে সম্পর্কেও গান্ধি মতামত জানান। তাঁর মনে হয়েছিল, সত্যাগ্রহীরা এই আন্দোলনের মাধ্যমে

---

[৯৭] M.K.Gandhi, *The Removal of Untouchability*, Ahmedabad: Navajivan Publishing Home, Reprint, 1959, p.39

[৯৮] https://www.gandhiashramsevagram.org/selected-letters-of-mahatma/gandhi-letter-extracts-caste-system-and-untouchability.php , accessed on 30.05.2021

জাতের সবচেয়ে কুৎসিত রূপটিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। যদিও, তিনি অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনকে সরাসরি বর্ণব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলন হিসাবে দেখতে চাননি।[৯৯] ভৈকম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্যতম মুখ পেরিয়ারের সঙ্গে একারণেই গান্ধির মতানৈক্য হয়। গান্ধি বর্ণব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে কেবল অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে নজর দিতে চাইলে পেরিয়ার **১৯২৫** খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।[১০০] **১৯২৫** খ্রিস্টাব্দে তামিলনাড়ু কংগ্রেসের অধিবেশনে পেরিয়ারের অব্রাহ্মণদের পক্ষে তোলা দুটি প্রস্তাব খারিজ করা হলে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের সরাসরি সংঘাত বাধে। এরপরেই তিনি নিজ উদ্যোগে 'Self-Respect Movement' শুরু করেন; যার মূল বক্তব্য 'সমধর্ম'।[১০১]

বর্ণজাতিপ্রথা সম্পর্কে গান্ধির তত্ত্বায়নের শাস্ত্রীয় ভিত্তির অন্যতম *ভগবদ্‌গীতা*। তিলক বা আম্বেদকর প্রসঙ্গে বর্ণজাতিপ্রথার আলোচনায় *গীতা*-র প্রাসঙ্গিকতা আমরা লক্ষ করেছি। গান্ধির গীতাচর্চাতেও তিলকের অনুপ্রেরণা আছে। *গীতা*-র ৪/১৩ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছিলেন—

> The Gita does talk of *varna* being according to *guna* and *karma*, but *guna* and *karma* are inherited by birth. The law of *varna* is nothing if not by birth. But there is no superiority implied here.[১০২]

গীতা-র মূল বাণী পর্যালোচনা করতে গিয়ে গান্ধি বলেন সত্য ও অহিংসার কথা। পাশাপাশি খেয়াল করিয়ে দেন, সত্য আর অহিংসার কথা ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। সেদিক

---

[৯৯] M.K.Gandhi, *The Removal of Untouchability*, p.111

[১০০] Ankur Barua, 'Revisiting the Gandhi-Ambedkar Debates over 'Caste': The Multiple Resonances of Varna', p.35

[১০১] Christophe Jaffrelot, *India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India*, London: Hurst & Company, 1st Published, 2003, p.170

[১০২] Mahadev Desai, *The Gospel of Selfless Action or The Gita According to Gandhi*, Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1st Edition, 1946, p.196

থেকে *গীতা* ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের কথা বলছে। এটিই *গীতা*-র নতুন বাণী।[১০৩] এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করলে গান্ধির বর্ণজাতি বিষয়ক বিবেচনার মূল ঝোঁকটি বোঝা যাবে। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের পথ যদি অনুসরণ করা যায়, তাহলে বর্ণনির্দিষ্ট, বংশানুক্রমিক পেশাতেই সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব। কারণ, পেশার বদলের মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রেই জড়িয়ে থাকে অর্থোপার্জন, সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধি ইত্যাদি নানারকম আকাঙ্ক্ষা। পেশাবদল আর তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার আবহ সেদিক থেকে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের বিরোধী। গান্ধির গীতাব্যাখ্যার পাশে আমরা ঋষি অরবিন্দের গীতাব্যাখ্যার প্রাসঙ্গিক অংশ বিবেচনা করতে পারি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ ঋষি অরবিন্দের *গীতা* বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। ঋষি অরবিন্দ নিশ্চয়ই আম্বেদকরের মতো বর্ণজাতিপ্রথার সার্বিক বিলোপন চাননি। কিন্তু, তারপরেও গান্ধি আর তাঁর গীতাব্যাখ্যায় অনেক তফাত রয়ে গেছে। বংশানুক্রমিক বৃত্তিভেদের প্রস্তাব *গীতা*-য় আছে বলে ঋষি অরবিন্দ মনে করেননি। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন, এজাতীয় ভাবনা *গীতা*-র উপর আরোপ করা সংগত নয়—

> we can certainly fasten no such absurd idea on the words of the Gita as that it is a law of man’s nature that he shall follow without regard to his personal bent and capacities the profession of his parents, or his immediate or distant ancestors, the son of a milkman be a milkman, the son of a doctor a doctor, the descendants of shoe-makers remain shoe-makers to the end of measurable time,[১০৪]

গীতা যে বংশানুক্রমিকতার কথা বলতে পারে না—সে প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ আরেকটি যুক্তি দিয়েছেন। জন্মান্তরের তত্ত্বকে স্বীকার করে *গীতা* বলে মানুষের স্বভাব পূর্ব জন্মের কর্মফলের সূত্রে প্রাপ্ত। আত্মিক অভিমুখও পূর্ব জন্মের দ্বারা অনেকটাই নির্ধারিত। সুতরাং, মানসিক বা

---

[১০৩] তদেব, পৃ.১২৯

[১০৪] Sri Aurobindo, *Essays on The Gita(Second Series)*, Calcutta: Arya Publishing House, 2nd Edition, 1942, p.329

আধ্যাত্মিক বিবর্তন কেবল বংশ বা পরিবার বা প্রতিবেশের দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।[১০৫] এই দিক থেকে গান্ধি আর শ্রী অরবিন্দের গীতাব্যাখ্যার পার্থক্য স্পষ্ট।

তিলক-শ্রী অরবিন্দ-আম্বেদকর-গান্ধির সূত্রে ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তকদের মধ্যে কয়েক দশক ধরে আমরা বর্ণজাতিপ্রথার প্রসঙ্গে গীতাব্যাখ্যার ধারা দেখতে পাচ্ছি। উনিশ-বিশ শতকে শাস্ত্র হিসাবে *গীতা*-র এই আধিপত্যের ইতিহাস নিয়েই স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে বর্ণজাতিপ্রথার বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ভিত্তির একটি ছিল *ভগবদ্গীতা*। শ্রুতি, সূত্র সাহিত্যের ধারা, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদির পাশাপাশি বর্ণজাতিপ্রথার এক তাত্ত্বিক বিবেচনা *গীতা*-র মধ্যেও ছিল। কিন্তু, অন্যান্য শাস্ত্রকে ছাপিয়ে *গীতা*-র সর্বাতিশায়ী আধিপত্য ঔপনিবেশিক কালের সৃষ্টি। বিপুল ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসম্ভারের মধ্যে থেকে এই কালপর্বে *গীতা*-র অভ্যুত্থান খুব আকর্ষণীয়। স্বাভাবিকভাবেই, উনিশ-বিশ শতকের ভারতীয় চিন্তাবিদদের বর্ণজাতিপ্রথার তাত্ত্বিক আলোচনায় *গীতা* অনেকসময়ই একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গীতার সূত্রেই সম্ভবত আরেকটি বিষয়ও গুরুত্ব পাচ্ছে—আঁকাড়া বাস্তব 'জাতি'র চেয়ে অনেকসময়েই মনোযোগের কেন্দ্রে থাকছে 'বর্ণ' এর এক আদর্শায়িত চেহারা। *গীতা*-র এই আধিপত্যের জোরেই গান্ধির মতো চিন্তাবিদও 'বর্ণ' এর নব ব্যাখ্যা বা তত্ত্বায়নের বাস্তবতা রীতিমত অলীক বুঝেও কার্যত সেই ভাবনাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চান।

চতুর্বর্ণের কাঠামোকে আক্রমণ না করেও গান্ধির জাতিব্যবস্থার দোষগুলিকে কেবল সরানোর চেষ্টা আম্বেদকর বা পেরিয়ারের যতই অসার মনে হোক না কেন, যতই বর্ণের আদর্শায়িত চেহারা গান্ধির মনঃপুত হওয়ায় তাঁকে নানাবিধ বিতর্কের মুখোমুখি হতে হোক; গান্ধি সমর্থন পেয়েছিলেন নেহরুর থেকে। *দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া* (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬

[১০৫] তদেব, পৃ.৩৩৩

খ্রি.) বইতে নেহরু বলেন, চতুর্বর্ণের মূলগত বৃত্তিভেদের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে গান্ধি জাতিভেদের দোষগুলিকে দূর করতে সচেষ্ট। এই কথা বলেই তিনি একটি নতুন ব্যাখ্যা জুড়ে দেন—গান্ধিজি মনে মনে জানেন যে সমগ্র জাতিভেদ ব্যাপারটাকেই তিনি ভিতর থেকে ধ্বংস করছেন।[১০৬] এই ব্যাখ্যা কতদূর সংগত তা স্পষ্ট না হলেও বোঝা যাচ্ছে কংগ্রেসি নেতৃত্বের মধ্যে গান্ধির জাতিভেদ বিরোধিতা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

স্বাধীনোত্তর ভারতে মার্কসবাদীদের বর্ণজাতিপ্রথার বিশ্লেষণ খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে এসেছে বি.টি.রণদিভে ও ই.এম.এস.নাম্বুদিরিপাদের রচনায়। বি.টি.রণদিভে *Caste, Class and Property Relations* (প্রথম পত্রিকা প্রকাশ ১৯৭৯ খ্রি.)-এ বলেছেন, কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই অস্পৃশ্যতার সমস্যা নিয়ে সচেতন ছিল এবং জাতপাতের সমস্যাটিকে জুড়ে দিয়েছিল কৃষিবিপ্লব আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির 'প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন'-এ বলা হয়েছিল, গান্ধিবাদীরা বর্ণজাতিপ্রথার উপর একটা সংস্কারের প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা করলেও কার্যক্ষেত্রে এই প্রথার বিলোপ ঘটানো ছাড়া কোন উপায় নেই। ব্রিটিশ শাসন আর জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইতে একযোগে সমস্ত শোষিত মানুষ যোগ দিলে বর্ণজাতিপ্রথার এই কাঠামোকে ভেঙে দেওয়া সম্ভব।[১০৭] কমিউনিস্টরা বর্ণজাতি আর শ্রেণি—এই দুটি বিশ্লেষণী তত্ত্বমূল (analytical category)-কে একসঙ্গে জুড়ে দেখতে চাইছিলেন। রণদিভে লিখেছেন, প্রতিটি বর্ণজাতির মধ্যেই বিত্তবান আর বিত্তহীনদের মধ্যে অস্বাভাবিক ফারাক তৈরি হচ্ছিল। শোষণ-পীড়নের সূত্রে সমস্ত জাতিবর্ণের নিচের অংশের মধ্যে একটা বন্ধন তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূত্রে তৈরি হওয়া এই বন্ধনকে

---

[১০৬] জওহরলাল নেহরু, *ভারত সন্ধানে*, কলকাতা: আনন্দ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৪, পৃ.৯৯

[১০৭] বি.টি.রণদিভে, *জাত বর্ণ শ্রেণী এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক*, পৃ.৭-৮

কাজে লাগিয়ে কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমে জাতিবর্ণের কাঠামোটাকেও ভেঙে ফেলতে হবে।[১০৮] রণদিভের বক্তব্য থেকে দুটো বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে—এক,কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমেই জাতপাতের সমস্যার সমাধান হবে বলে মার্কসবাদীরা আদতে বর্ণের তুলনায় শ্রেণিকে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। দুই, প্রতিটি বর্ণজাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানে ফারাক আছে। পরবর্তীকালের তাত্ত্বিকরা বলবেন, গরিব ব্রাহ্মণের সাংস্কৃতিক পুঁজি তাঁকে অন্যান্য 'নিচু' জাতের গরিবগুর্বোর থেকে আলাদা করে দেয়—রণদিভের রচনায় অন্তত সেই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতনতা লক্ষ করা যাচ্ছে না। রণদিভে বরং গরিবের একটা সমসত্ত্ব চেহারা হাজির করছেন।

রণদিভে তাঁর গবেষণায় একদিকে যেমন জাতিবর্ণবিরোধী আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ পেশ করেছেন, তেমনই প্রশ্ন তুলেছেন আম্বেদকর বা পেরিয়ারের মতো বর্ণজাতিপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের নেতাদের পদ্ধতিগত ভাবনাচিন্তা সম্বন্ধে। প্রথমত, রণদিভে দেখালেন, জ্যোতিবা ফুলের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন আর বর্ণজাতিপ্রথার প্রত্যাখ্যানের প্রয়াসও কালক্রমে নিজস্ব চরিত্র হারিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের আবর্তে ঢুকে গেল। কোলাপুরের সামন্তরাজা জ্যোতিবা ফুলের আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে নিজের বংশগত কৌলীন্য বাড়ানোর চেষ্টায় মজে গেলেন। শুরু হল পারিবারিকভাবে সামাজিক সচলতার প্রয়াস। পাশাপাশি, রণদিভে লিখলেন—একালে অস্পৃশ্যরা ভূমিদাসদের মতো জমিতে পরিশ্রম করতে নারাজ। তাঁরাও অন্যরকম কাজের সুযোগ খুঁজছেন। কিন্তু, তাঁদের স্বাধীন কাজের দাবিদাওয়া নিয়ে 'উচ্চ'বর্ণের আপত্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায় অস্পৃশ্যতা প্রথার পিছনে অর্থনৈতিক কারণই কাজ করছে। আম্বেদকরের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ আনলেন, অস্পৃশ্যদের জমি আর আলাদা কলোনি দেওয়ার যে দাবি আম্বেদকর তুলেছিলেন, তা খুবই

[১০৮] তদেব,পৃ.১০

সংগত। কিন্তু, কৃষিবিপ্লব ছাড়া এই দাবির বাস্তবায়ন কার্যত অসম্ভব। আম্বেদকর এবং তাঁর অনুরাগীদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে রণদিভে খুশি হননি। তাঁর মনে হয়েছিল, এতে সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয় না। ভূমিগত সম্পর্কের বিরুদ্ধে না লড়েই তাঁরা অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন জিততে চেয়েছিলেন।[১০৯]

ই.এম.এস.নাম্বুদিরিপাদ ১৯৮১ সালে ‘Social Scientist’ পত্রিকায় ‘Once Again on Castes and Classes’ প্রবন্ধেও বর্ণজাতি আর শ্রেণিগত লড়াইকে একসঙ্গে জুড়ে দেখতে চান। সংরক্ষণ প্রসঙ্গে নাম্বুদিরিপাদ লেখেন, তফসিলি জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণিকে সংরক্ষণের আওতায় আনার পাশাপাশি ‘উঁচু’ জাতের দরিদ্র অংশকেও সংরক্ষণের মধ্যে আনা দরকার। সংরক্ষণের ভিত্তি জাতের বদলে অর্থনৈতিক অবস্থাই হওয়া উচিত। যদিও, এই দাবিতে বিশ্বাস করেও সত্তর-আশির দশকে ভারতীয় মার্কসবাদীরা বাস্তব পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে পুরনো ভিত্তিতেই সংরক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।[১১০] নাম্বুদিরিপাদ লেখেন, শ্রেণি বিভাজনই আসলে জাতিবিভাজনের চেহারা নিয়েছে। যাঁরা বেশি ধনসম্পত্তি হস্তগত করতে পেরেছিলেন, তাঁরাই জাতিকাঠামোয় ‘উঁচু’ জায়গা পেলেন।[১১১] অর্থাৎ, শ্রেণি আর বর্ণগত অবস্থানের সম্পর্ক সমানুপাতিক। নাম্বুদিরিপাদের এই পর্যবেক্ষণ অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট। জাত আর শ্রেণিগত অবস্থানের সম্পর্কের তত্ত্বটিকে আমরা পুরোপুরি খারিজ করছি না। আমরা এও মনে রাখব যে, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন (Backward Classes Commision) লক্ষ করেছে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার

---

[১০৯] তদেব, পৃ.২৩,২৯,৩৪

[১১০] E.M.S. Namboodiripad, ‘Once Again on Castes and Classes’, Social Scientist, Vol.9, No.12, December, 1981, p.16

[১১১] তদেব, পৃ.১৯

অন্যতম প্রধান কারণ বর্ণজাতিকাঠামোয় নিচু অবস্থান।[১১২] এই পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করেও আমাদের বিবেচনায় বামপন্থীদের মতটি একটু একপেশে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বঙ্গদেশের সুবর্ণবণিকরা বা মহারাষ্ট্রের সোনাররা শ্রেণিগত প্রতিপত্তি অর্জন করেও জাতিগত মর্যাদায় খুব একটা উঁচু জায়গা দখল করতে পারেননি। অসংখ্য আর্থিক প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার প্রয়াস বিভিন্ন প্রদেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। উপরন্তু, শ্রেণিকে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে তাঁরা একটু অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন। আমরা দেখেছি, প্রাক্-ঔপনিবেশিক সমাজে 'উপজাতি' সমাজভুক্ত রাজারা প্রবল অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করেও শেষ অবধি বর্ণজাতিকাঠামোয় উঁচু স্থান পেতে চেয়েছেন। এখানেই, শ্রেণির তুলনায় ভারতীয় সমাজে,অন্তত প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে, বর্ণের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি বলে প্রমাণিত হয়।

অবশ্য মার্কসবাদীদের জাতপাত সংক্রান্ত অবস্থান আর দলিত সমস্যা সমাধানের সদিচ্ছা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। দলিত সমাজের প্রতিনিধি লক্ষ করেছেন, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার নেতৃত্বদের অধিকাংশই উচ্চবর্ণের লোক। ব্রাহ্মণ আর উচ্চবর্ণের নেতৃত্বের মাধ্যমে চালিত কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের অবসান ঘটাবে সে সম্পর্কে দলিত সমাজের সংশয় মেটেনি।[১১৩] পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনেও জাতপাতের সমস্যা মিটল কি না সে সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। দ্বিতীয় বাম সরকারের আমলে কান্তি বিশ্বাসের হাতে শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কান্তি বিশ্বাস জাতে চণ্ডাল। কান্তি বিশ্বাস শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.আই(এম)এর তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে ৪০০-এর বেশি অভিযোগপত্র জমা পড়ে। সেই অভিযোগপত্রের মূল দাবি

---

[১১২] Raka Ray & Mary Fainsod Katzenstein, *Social Movements in India: Poverty, Power and Politics*, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1st Published, 2005, p.135

[১১৩] S.K.Biswas, *Nine Decades of Marxism in the Land of Brahminism*, Kerala: Other Books, 1st Published, 2008, p.29-31

চণ্ডালের হাতে শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব গেলে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। প্রমোদ দাশগুপ্ত অবশ্য এই অভিযোগগুলি একেবারেই পাত্তা না দিয়ে কান্তি বিশ্বাসকেই দায়িত্বে বহাল রাখেন।[১১৪] এতেই অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট শাসনে উচ্চবর্ণের প্রতি পক্ষপাতিত্বের সব অভিযোগ ঝেড়ে ফেলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক মিত্র খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের বাম মন্ত্রিসভায় ৪৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৭ জন উঁচুজাতের ব্রাহ্মণ, ১২ জন উঁচুজাতের কায়স্থ, ২ জন বৈদ্য, ২ জন উচ্চ-মধ্য জাতির মানুষ। বাকি সদস্যদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন অন্যান্য শ্রেণির ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ।[১১৫] আরেকটি গবেষণায় দেখছি, এক বামপন্থী শিক্ষক 'নিচু' জাতের ছাত্রদের স্কুলে পড়তে আসা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করছেন। তিনি স্পষ্টই জানাচ্ছেন, এসব 'নিচু' জাতের ছাত্রে স্কুল ভরে যাওয়াতেই রেজাল্টের এত অবনতি হয়েছে! এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আরও মনে পড়ে যায়, প্রায় ২৫ বছরের বাম শাসন অতিবাহিত হওয়ার পরেও ২০০৪-০৫ সালে মিড ডে মিলে 'নিচু' জাতের লোকের হাতে রান্না খাওয়া নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হলে সমস্যা মেটাতে হস্তক্ষেপ করতে হয় শীর্ষস্থানীয় বাম নেতাকে।[১১৬] বোঝা যাচ্ছে, বাম শাসন সম্ভবত রণদিভে বা নাম্বুদিরিপাদের তাত্ত্বিক বক্তব্যে বিশ্বাস রেখেও কার্যক্ষেত্রে জাতপাতের সমস্যার উপযুক্ত সমাধান করে উঠতে পারেনি। বামপন্থী প্রগতিশীলতা আর বামপন্থীদের লক্ষ্যের বাস্তবায়নে একটা দূরত্ব রয়েই গেছে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী, দক্ষিণপন্থী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কে.বি.হেডগাওয়ার তেলুগু ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক হলেও দীর্ঘদিন নাগপুরের বাসিন্দা। পরবর্তী সংঘচালক গোলওয়ালকর করহদ ব্রাহ্মণ। প্রথমদিকের

---

[১১৪] কান্তি বিশ্বাস, *আমার জীবন: কিছু কথা,* কলকাতা: একুশ শতক, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ.৮৭-৮৮

[১১৫] Asok Mitra, *Caste and Class in Indian Society*, Kolkata: The Asiatic Society, Reprint, 2016, p.23

[১১৬] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দলিতের পুরাণকথা,* পৃ.১৬৯-১৭০

স্বয়ংসেবকদের সকলেই ব্রাহ্মণ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মূল লক্ষ্য হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। আদর্শ 'হিন্দু রাষ্ট্র'-এর প্রবক্তারা বর্ণজাতিপ্রথাকে কীভাবে দেখতে চাইছেন? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অন্যতম অনুপ্রেরণা ভি.ডি.সাভারকরের *Hindutva* (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ খ্রি.)-এ দেখছি, বর্ণজাতিপ্রথাকে ভারতীয় জাতীয়তার সঙ্গে এক করে দেখা হচ্ছে। সাভারকরের উদ্ধৃত একটি সংস্কৃত শ্লোকের বক্তব্য—চতুর্বর্ণের কাঠামো যেখানে নেই, সেই দেশ ম্লেচ্ছদেশ![১১৭] ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'Seven Shackles of the Hindu Society' নামক প্রবন্ধে সাভারকর বর্ণজাতিপ্রথার সাতটি দোষ তুলে ধরেন। বৈদিক শিক্ষায় কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার, বাধ্যতামূলকভাবে বংশানুক্রমিক বৃত্তির অনুসরণ, ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক, অসবর্ণ বিবাহ ও পঙ্‌ক্তিভোজনের নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি সাভারকরের মনঃপুত হয়নি।[১১৮] এই বক্তব্য থেকে অবশ্য সাভারকরকে বর্ণজাতিপ্রথার তীব্র বিরোধী মনে করার কোন কারণ নেই। গান্ধী যেমন অস্পৃশ্যতাকে দোষ মনে করেও বর্ণজাতিপ্রথার অস্তিত্বের পক্ষে সওয়াল করতেন; সাভারকরের ক্ষেত্রেও তেমনটাই দেখা যাবে। অধ্যাপক গোপাল গুরু খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন, সাভারকর হিন্দু ঐক্য তৈরিতে উৎসাহী বলেই বর্ণজাতিপ্রথার সপ্তবিধ দোষ ক্ষালন করতে চান। কিন্তু, অসবর্ণ বিবাহ, শূদ্রের বেদাধিকার ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী কার্যক্রমে বাস্তবে সাভারকরের সৎ উৎসাহ, আবেগের তীব্রতা দেখা যায়নি। এই নিষেধাজ্ঞার মূলে যে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র রয়েছে, তাকে আক্রমণ করতেও সাভারকর উদ্যত হননি।[১১৯] সম্ভবত সাভারকরের বক্তব্যের প্রণোদনাতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বিভিন্ন শিবিরে অস্পৃশ্যদের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজনে দেখা যেত। এমনকি, একটি শিবিরে এই ব্যবস্থা দেখে গান্ধিও অত্যন্ত আপ্লুত

---

[১১৭] V.D.Savarkar, *Hindutva*, Bombay: Veer Savarkar Prakashan, 5th Edition, 1969, p.27

[১১৮] https://theprint.in/opinion/savarkar-wanted-to-smash-caste-system-cooked-prawns-and-didnt-worship-the-cow/161016/ accessed on 31.05.2021

[১১৯] Gopal Guru, 'Appropriating Ambedkar', Economic and Political Weekly, Vol.26, No.27/28, July 6-13, 1991, p.1697

হয়েছিলেন।[১২০] পাশাপাশি মনে রাখা দরকার, এখনো পর্যন্ত সংঘপ্রধানরা প্রায় প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ। 'নিচু' জাতের লোক কখনোই সংঘের কর্তৃত্ব পায়নি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান এম.এস.গোলওয়ালকর মরাঠি দৈনিক 'নবকাল' এ একটি সাক্ষাৎকারে (১-২ জানুয়ারি, ১৯৬৯ খ্রি.) বর্ণজাতিপ্রথা সম্পর্কে খুবই ইতিবাচক মন্তব্য পেশ করেন। গোলওয়ালকরের *We or Our Nationhood Defined* প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয় *Bunch of Thoughts*। সেদিক থেকে এই সাক্ষাৎকারটি বর্ণজাতিপ্রথা বিষয়ে গোলওয়ালকরের পরিণত বয়সের মন্তব্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সাক্ষাৎকারে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বর্ণজাতিপ্রথা বংশানুক্রমিকভাবে নির্ধারিত হওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। এমনকি, ইউরোপের দেশগুলিও ভাবতে শুরু করেছে, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সামাজিক অবস্থায় সন্তুষ্টি আসা অসম্ভব। বর্ণজাতিপ্রথা নির্ভর সামাজিক অবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সহযোগিতামূলক সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে।[১২১] সেকারণেই বর্ণজাতিব্যবস্থার অস্তিত্ব অভিপ্রেত। আশ্চর্য লাগে, গান্ধির ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে মতামতের সঙ্গে গোলওয়ালকরের মতামতের সাদৃশ্য আছে। গোলওয়ালকর আরও বলেন, চাষির ছেলে পড়াশোনা শিখে পৈতৃক পেশা ছেড়ে চাকরির পিছনে ছুটলে দেশের ক্ষতি।[১২২] বংশানুক্রমিক বৃত্তিভেদ সম্পর্কে গোলওয়ালকরের সমর্থন থেকে আন্দাজ করতে পারি, সামাজিক সচলতা সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মনোভাব নেতিবাচক। আমাদের মনে পড়তে বাধ্য, গান্ধি নাথুরাম গডসের মতো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যের হাতে খুন হয়েছিলেন। কোন কোন গবেষকের অনুমান, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ

---

[১২০] Christophe Jaffrelot, *The Sangh Parivar: A Reader*, New Delhi: Oxford University Press, Oxford India Paperbacks, 2006, p.64

[১২১] [], *Golwalkar and Caste*, New Delhi: Sampradayikta Virodhi Committee, 1st Published, 1970, pp.4-5

[১২২] তদেব, পৃ.১০

পরিবারের সন্তান গডসে দেখতে পাচ্ছিলেন, মরাঠি ও গুজরাতি বেনিয়ারা ক্রমশ সামাজিক সচলতার মাধ্যমে জাত হিসাবে সমাজে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করছে। গান্ধি হত্যার পিছনে এই জাতিগত কারণও কাজ করে থাকতে পারে।[১২৩] নিছক এই অনুমানটুকু ছেড়ে দিলেও আমরা দেখি, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ মেনে ভি.পি.সিং সরকার সরকারি চাকরিতে 'নিচু' জাতের সংরক্ষণের প্রস্তাব কার্যকর করতে চাইলে 'উঁচু' জাতরা বিক্ষুব্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে এবং সংঘ বিষয়টিতে 'উঁচু' জাতদের পক্ষ নিচ্ছে।[১২৪] চাষির ছেলে পৈতৃক পেশা ছেড়ে চাকরিতে গেলে দেশের ক্ষতি—গোলওয়ালকরের এই উক্তির মধ্যেই সম্ভবত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এই অবস্থানের ব্যাখ্যা আছে।

ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের দরুণ অবশ্য সংঘ 'নিচু' জাতের মানুষদের প্রাথমিকভাবে খুব একটা আকৃষ্ট করতে পারেনি। তবে মহারাষ্ট্রের বাইরে উত্তর ভারতে সংঘের জমি যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতায়নের তাগিদে 'নিচু' জাতের লোকজন সংঘের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ চর্চার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে এই গোষ্ঠীগুলিও নিজেদের জাতের মর্যাদা শক্তপোক্ত করতে চাইছিল। বিশেষত, মহারাষ্ট্রের মতো সংঘের বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণ সমাজের বিরোধিতা উত্তর ভারতে তুঙ্গে ওঠেনি বলেই হয়তো 'নিচু' জাতদের সংস্কৃতায়নের টোপে কাছে টেনে আনা সম্ভব হচ্ছিল।[১২৫] যদিও সংঘের এই অবস্থান কত অলীক তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভানওয়ার মেঘোয়াংশীর আত্মকথা *I Could Not Be Hindu: The Story of a Dalit in the RSS* (প্রথম প্রকাশ ২০১৯ খ্রি., প্রথম ইংরেজি অনুবাদ ২০২০ খ্রি.)-য়। মেঘোয়াংশী দলিত

[১২৩] Christophe Jaffrelot, *The Sangh Parivar: A Reader*, p.65

[১২৪] Martin E.Marty & R.Scott Appleby(eds.), *Fundamentalism and the State: remaking Polities, Economies and Militance*, Chicago: The University of Chicago Press, 1st Published, 1993, p.252

[১২৫] Walter K. Andersen & Shridhar D. Damle, *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*, New Delhi: Vistaar Publications, 1st Published, 1987, p.45

সম্প্রদায়ের মানুষ; রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্য হিসাবে তিনি কিছুটা পদমর্যাদাও পেয়েছিলেন নিজের অঞ্চলে। ধীরে ধীরে স্বয়ংসেবক সংঘের দলিতদের সম্পর্কে মনোভাব উপলব্ধি করতে পেরে প্রবল রাগ আর ঘৃণায় তিনি সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সেই অভিজ্ঞতার কাহিনি তিনি শুনিয়েছেন তাঁর আত্মকথায়। এই আত্মকথা কার্যত সংঘের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা বয়ান। লেখক দেখেন, সংঘের বিশ্বাস প্রতিটি জাতই একেকটি বিশেষ ধরনের কর্তব্য পালনে পারঙ্গম এবং সেকারণেই সম্ভবত পূর্বপুরুষরা বংশানুক্রমিক পেশার ধারণা তৈরি করেছিলেন।[১২৬] স্বয়ংসেবক সংঘের শাখায় এসে লেখক দেখেন, গ্রামে যাঁরা তাঁদের 'নিচু' জাত বলে অসম্মান করে, ঠিক করে কথাও বলে না; শাখায় তাঁরাই যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে সম্বোধন করছে। কিন্তু, এই আপাত-মর্যাদার আড়ালে লেখক লক্ষ করেন, শাখার প্রধান কর্মকর্তারা সকলেই 'উঁচু' জাতের লোক। দলিতরা সকলেই নিচুতলার সাধারণ কর্মী।[১২৭] মেঘোয়াংশী দক্ষতার সঙ্গে আমাদের মনে করিয়ে দেন, সংঘচালক হিসাবে 'উঁচু' বর্ণের লোক ছাড়া প্রায় কারোর কথা বিবেচনার সুযোগই থাকে না। আগামী পঞ্চাশ বছরেও দলিত বা অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের সংঘচালক হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। সংঘচালক বাদ দিলেও অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা বা অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলে দলিত, আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নগণ্য। এই অভিযোগ উঠতে দেখে বিগত কয়েক দশকে সংঘ দলিত বা আদিবাসীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কিছুটা মনোযোগী হলেও, এখনো সংগঠনের উচ্চস্তরে দলিতদের প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে।[১২৮] সবমিলিয়ে, 'নিচু' জাতের অধিকার রক্ষার

---

[১২৬] Bhanwar Meghwanshi, *I Could Not Be Hindu: The Story of a Dalit in the RSS*, New Delhi: Navayana, 1st Published, 2020, p.34

[১২৭] তদেব, পৃ.২৬

[১২৮] তদেব, পৃ.৩৭-৩৮

লড়াইতে সংঘের আন্দোলনের কোন সদর্থক নমুনা মেলে না। অবশ্য, ভারতের প্রেক্ষিতে একটি দক্ষিণপন্থী, হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনের থেকে এটাই প্রত্যাশিত।

এই পর্বের আলোচনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মতামতের বৈচিত্র লক্ষ করেও আমরা 'আধুনিকতা' ও বর্ণজাতিপ্রথার সম্পর্কের কতকগুলি প্রবণতা বুঝতে পারি—

১. বর্ণজাতিকাঠামোর সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্পর্কটি আধুনিক ভারতে ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে। তিলক বা গান্ধির মতো 'উচ্চ' বর্ণের কেউ কেউ যেমন বর্ণজাতিকাঠামোকেই আধুনিক ভারতের ভিত্তি মনে করেছেন; তেমনই ফুলে বা আম্বেদকরের মতো 'নিম্ন' বর্ণের প্রতিনিধিদের মনে হয়েছে, বর্ণজাতিকাঠামোর অস্তিত্বই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথে বাধা।

২. আধুনিকতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একরৈখিক নয় বলেই তিলক বা গান্ধির মতো ব্যক্তিত্বরা বর্ণজাতিপ্রথাকে সমর্থন করেও অস্পৃশ্যতাকে ভারতীয় সমাজের পাপ বলে চিহ্নিত করলেন।

৩. ফুলে বা আম্বেদকরের কৃতিত্বে ভারতীয় দলিতদের অধিকারের প্রশ্নটি বৈষয়িক জগতের নানা প্রশ্ন—চাকরি, শিক্ষা ইত্যাদি ঘিরে আবর্তিত হতে লাগল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক কালের মতো ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক সচলতা প্রাপ্তিই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে রইল না। গান্ধি অবশ্য এযুগেও 'অস্পৃশ্য'দের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে লড়াই চালিয়েছেন। কিন্তু, ধর্মীয় বৃত্তের বাইরেও 'অস্পৃশ্য'দের সামাজিক অধিকারের প্রশ্নগুলিকে তিনিও আধুনিক যুগের প্রভাবেই সরাসরি অস্বীকার করতে পারেননি। অনেকগুলি প্রবণতা পাশাপাশি জায়গা করে নিল।

৪. আধুনিকতার সঙ্গে ভারতীয় সমাজের সম্পর্কের দোটানা স্পষ্ট হবে আরেকটি ক্ষেত্রেও। উত্তর ভারতের যাদবদের মতো কোন কোন গোষ্ঠী উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের

গোড়াতেও 'উঁচু' বর্ণের মূল্যবোধ, প্রতীক অনুকরণ করে সংস্কৃতায়নের মতো বহু শতাব্দীপ্রাচীন পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছে। আবার, তামিলনাড়ুর নাদাররা সংস্কৃতায়নের প্রথাগত পথ অস্বীকার করে ব্রাহ্মণ্যবাদকে খারিজ করার মাধ্যমে নতুন যুগের ভাষায় সামাজিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইল।[১২৯] পাশাপাশি চলছে পুরনো আর নতুন পদ্ধতি।

৫. শাস্ত্রকে বাদ দিয়ে ভারতীয় 'আধুনিকতা' তৈরি হয়নি। গান্ধি, তিলকও বর্ণজাতিপ্রথার সাপেক্ষে শাস্ত্রের আধুনিক ব্যাখ্যা তৈরি করতে চাইলেন। আবার, ফুলে বা আম্বেদকরের মতো শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করার সাহসও দিল এই 'আধুনিকতা'। শাস্ত্রীয় প্রতিগ্রহণের একটা আকর্ষণীয় চেহারা তৈরি হল। তৈরি হল শাস্ত্রের বাইরে গিয়েও সামাজিক অধিকার আদায়ের পথ।

সামাজিক সচলতার প্রাক্-ঔপনিবেশিক চেহারা আমাদের অন্বিষ্ট হলেও এই প্রবণতার উনিশ-বিশ শতকীয় অস্তিত্ব দেখেছি। সেই সূত্রে প্রাক্-ঔপনিবেশিক সামাজিক সচলতার পদ্ধতিগত বহমানতা আর নতুন প্রবণতার উত্থানও বর্তমান আলোচনায় স্পষ্ট। স্বাধীনোত্তর ভারতেও জাতপাতের বৈষম্য একেবারে মুছে যায়নি এবং সেকারণেই নতুন নতুন পথে সামাজিক সচলতার অস্তিত্ব বজায় আছে। এই পথগুলি খেয়াল করে দেখলে সামাজিক সচলতার প্রাক্-ঔপনিবেশিক চরিত্রটির স্বাতন্ত্র্য বুঝতে সুবিধা হয়। সামাজিক সচলতার সাম্প্রতিকতম প্রবণতা বুঝতে আমরা মূলত ভারতীয় নির্বাচনী গণতন্ত্রের সাহায্য নেব। বিষয়টি বহুধাবিস্তৃত, বহুমাত্রিক ও জটিল। কাজেই, আমরা কোন ধারাবাহিক এবং প্রদেশভিত্তিক আলোচনায় না ঢুকে নির্বাচিত কয়েকটি ঘটনার সাহায্যে মূল প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করব। প্রশ্ন হতে পারে, জাতপাতের প্রবণতাকে বুঝতে আমরা নির্বাচনী গণতন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছি কেন? নির্বাচনী গণতন্ত্র প্রত্যেকের সমান ভোটাধিকার স্বীকার করে। এদিক থেকে 'উঁচু-নিচু'র

[১২৯] Christophe Jaffrelot, *India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India*, p.167, 189

ভেদ নির্বাচনী গণতন্ত্রে কার্যকর নয়। তা সত্বেও, জাতপাতের প্রশ্নটি নির্বাচনী গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কারণে। প্রথমত, ২০০৯ সালের সমীক্ষায় দেখছি, জাত বা সম্প্রদায় স্থানীয় স্তরে মানুষের রাজনৈতিক মতদানের অন্যতম ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনী গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত সমানাধিকারের ধারণা 'নিচু' জাতের মানুষদের নাগরিক অধিকার প্রকাশের সুযোগ, সাংবিধানিক কর্তব্য পালনের তৃপ্তি দেয়। অনেকক্ষেত্রেই ভোটাধিকার 'নিচু' জাতের মানুষদের কাছে প্রতীকী ও বৈষয়িক অধিকার অর্জনের রাস্তা।[১৩০]

নির্বাচনী গণতন্ত্রে দলিতদের অবস্থান পর্যালোচনা করার আগে কয়েকটি পরিসংখ্যান খেয়াল রাখা ভালো। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে প্রতি ষোল মিনিটে দলিতদের উপর অদলিতদের একটি অত্যাচারের ঘটনা ঘটে। প্রতি দিন অন্তত চারজন 'অস্পৃশ্য' মহিলা 'উঁচু' জাতের হাতে ধর্ষিত হন। কেবল ২০১২ সালেই ১৫৭৪ জন দলিত মহিলা ধর্ষিত হয়েছেন।[১৩১] পাশাপাশি মনে রাখতে পারি, অন্যান্য জাতের তুলনায় বেকারত্বের হার দলিতদের মধ্যে দ্বিগুণ। ভারতের দরিদ্রতম অংশের তিন-চতুর্থাংশই দলিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত।[১৩২] সমস্ত দলিতের অবস্থানই অবশ্য এতটা কোণঠাসা নয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থানের দলিত বা অপেক্ষাকৃত 'নিচু' জাতের মানুষরা নির্বাচনী গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কোন জায়গায় পৌঁছতে পারছেন, কয়েকটি ঘটনার সূত্রে তা বোঝা যেতে পারে। শুরু করা যাক উত্তরপ্রদেশের প্রসঙ্গে। বহুজন সমাজ পার্টি প্রথম দলিত পরিচালিত রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে ভারতের একটি রাজ্যে সরকার তৈরি করে। উত্তর ভারতে বহুজন সমাজ পার্টি দলিতের চেনা অবস্থানে কতটা বদল আনতে পারল? উত্তরপ্রদেশের মীরাট অঞ্চলের

---

[১৩০] Christophe Jaffrelot, 'The Caste Based Mosaic of Indian Politics', Seminar, University of Toronto Press, 2012, pp.49-53, hal-01024572

[১৩১] B.R.Ambedkar, *Annihilation of Caste*, p.21

[১৩২] Raka Ray & Mary Fainsod Katzenstein, *Social Movements in India: Poverty, Power and Politics*, p.136-137

চারটি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে ভূম্যধিকারী জাত—রাজপুত, গুর্জর, জাটদের সঙ্গে সর্বাধিক অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত(most backward classes বা MBC) সাইনি ইত্যাদি গোষ্ঠীর, অন্যান্য দলিত গোষ্ঠীভুক্ত চামার-জাতভদের সামাজিক সম্পর্কে একটা পরিবর্তন আসছে। এই অঞ্চলে জাতভরা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ঔপনিবেশিক পর্বের শেষদিক থেকেই শক্তিশালী। চামাররা এই অঞ্চলে ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক সচলতার অংশ; বেশ কর্তৃত্বশালী জাতি। এই অঞ্চলে আর্য সমাজের আন্দোলনের প্রভাবে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করে আসছেন।[১৩৩] চামার-জাতভরা বহুজন সমাজ পার্টির দিকে ঝুঁকে থাকলেও, MBC রা ভারতীয় জনতা পার্টির অনুরাগী। চামার-জাতভদের সঙ্গে MBC দের সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুণ এই রাজনৈতিক অভিমুখনের জন্ম। ভূম্যধিকারী গোষ্ঠীগুলি ইতিপূর্বে যথেষ্ট সামাজিক নিপীড়ন চালালেও সমাজবাদী পার্টি বা বহুজন সমাজ পার্টির উত্থানের সঙ্গে এঁদের আধিপত্য অনেক ম্লান হয়েছে। বিশেষত, বহুজন সমাজ পার্টির সরকার গঠনের পর থেকে গ্রামীণ স্তরে দলিতদের জোর একটু বেড়েছে।[১৩৪] ভূম্যধিকারী জাতগুলির আধিপত্য হ্রাসের আরেকটি কারণ ধীরে ধীরে ভূমিনির্ভর জীবিকার বাইরে অন্যান্য জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি এবং 'নিচু' জাতগুলির সেই সুযোগ গ্রহণ করে পেশাবদলের প্রবণতা। এতে ভূম্যধিকারী জাতগুলির উপর 'নিচু' জাতগুলির নির্ভরতা অনেক কমে গিয়েছে।[১৩৫] সংবিধানের ৭৩ নং সংশোধনী অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতে দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার লড়াইকে অন্য মাত্রা দিয়েছে নিঃসন্দেহে। এই অঞ্চলের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, জাতভরা এই নিয়ম কাজে লাগিয়ে রাজপুত, জাট বা গুর্জরদের

[১৩৩] Sudha Pai, 'New Social and Political Movements of Dalits: A Study of Meerut District', Contributions to Indian Sociology, Vol.34, No.2, 2000, p.194

[১৩৪] তদেব, পৃ.১৯৭

[১৩৫] তদেব, পৃ.২০৬

প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছেন। এমনকি, নিয়ম অনুযায়ী গ্রামে দলিতদের সংখ্যাধিক্য থাকলে গ্রামপ্রধানও হবেন একজন দলিত। আগেও এই নিয়ম কাজে লাগিয়ে দলিতরা গ্রামপ্রধান হয়েছেন। তবে, ক্ষমতার রাশ থাকত ভূম্যধিকারী জাতগুলির হাতে। ইদানীং সংরক্ষণের সুবিধা কাজে লাগিয়ে দলিতরা রাজপুত, জাট, গুর্জরদের আধিপত্য অস্বীকার করছেন। এসবের পাশাপাশি মায়াবতী সরকার পরিচালিত আম্বেদকর গ্রাম যোজনা প্রকল্পে দলিত গ্রামের অধিবাসীদের সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধি ও বৈষয়িক উন্নতি-দুইই হয়েছে।[১৩৬] এই সমীক্ষায় নির্দিষ্ট অঞ্চলে জাতভদের আধিপত্যবৃদ্ধি ও রাজপুতদের আধিপত্যহ্রাসের নমুনা স্পষ্ট। লক্ষণীয়, এখানে জাতভদের যে সামাজিক সচলতার নমুনা দেখা যাচ্ছে, তা প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের তুলনায় অনেকটাই আলাদা। ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা প্রাপ্তির নিরিখে এই সচলতার প্রয়াসের সাফল্য বিবেচনা করা যাবে না; কারণ এই লড়াইয়ের মূল ঝোঁক ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার বদলে বৈষয়িক আধিপত্য বৃদ্ধি এবং জাতিগত বৈষম্যের পাল্টা প্রতিবাদ জানানো। এই সমস্ত কারণে, পুরনো কর্তৃত্বশালী জাতগুলির পায়ের তলার জমি যে অনেকটাই সরে যায়, তার প্রমাণ আছে অন্য একটি গবেষণাতেও। বহুজন সমাজ পার্টির উত্থানের পরে পূর্ব ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের রাজপুতরা লক্ষ করেছেন, আগে যেসমস্ত দলিতরা দূর থেকে তাঁদের আসতে দেখলেই সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত, তাঁরা এখন সেসবের ধার ধারে না। বরং, 'উঁচু' জাতের লোকদের সঙ্গে একসারিতে বসে আড্ডা দেওয়ার, চা খাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এখন এঁদের আধিপত্যের কারণে এইসব অপমান মুখ বুজে হজম করতে হচ্ছে।[১৩৭]

১৯৯৯ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে সংখ্যার বিচারে ভারতের তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি যাদবরা। এই সংখ্যার জোরই নির্বাচনী গণতন্ত্রে যাদবদের আধিপত্যের

---

[১৩৬] তদেব, পৃ.২০৮-২০৯

[১৩৭] Christophe Jaffrelot, 'The Caste Based Mosaic of Indian Politics'

ভিত্তি। তাঁরা বিশ্বাস করেন, গণতন্ত্র সংখ্যার খেলা এবং সংখ্যার জোরই তাঁদের গণতন্ত্রে শাসন কায়েম করার অধিকার দেয়।[১৩৮] মথুরার যাদবদের উপর একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই অঞ্চলের যাদবরা অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ হলেও দুগ্ধ উৎপাদনের পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে পরিবহন ব্যবসা এবং নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন। এই সূত্রে সামাজিক আধিপত্য আরও জোরদার করার জন্য তাঁরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণে আগ্রহী। সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠন মজবুত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে তাঁদের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।[১৩৯] সর্বভারতীয় যাদব মহাসভাও রাজনৈতিক শাসনক্ষমতা দখলের এই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত মনোযোগী। লালুপ্রসাদ যাদব বা মুলায়ম সিংহ যাদবের মতো নেতা যাদব সমাজের কাছে 'অবতার'।[১৪০] যাদব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সভায় সম্প্রদায়ের লোকদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়; কারণ, রাজনীতি আর্থ-সামাজিক সচলতার সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম।[১৪১]

নির্বাচনী রাজনীতি আধুনিক ভারতে অনেক সম্প্রদায়ের কাছেই আর্থ-সামাজিক সচলতার মাধ্যম হওয়ায় কর্তৃত্বশালী গোষ্ঠী বা সামাজিক সচলতা অভিলাষী গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। অন্ধ্রপ্রদেশের সবচেয়ে কর্তৃত্বশালী দুই কৃষক জাতি—রেড্ডি ও কাম্মারা যথাক্রমে কংগ্রেস ও তেলুগু দেশম পার্টির সমর্থক। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য রাজনীতিতে এই দুই দলের আধিপত্য হঠাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়ে কাপু নামে আরেক সামাজিক সচলতা প্রাপ্ত জাতির মাধ্যমে। আর্থ-সামাজিক সচলতার দৌলতে কাপুদের একটা বৃহৎ অংশ নিজেদের সম্প্রদায়ের লোককে রাজ্য রাজনীতির শীর্ষে দেখতে চায়। সেই সূত্রেই ২০০৮ সালে অভিনেতা

[১৩৮] Lucia Michelutti, 'We (Yadavs) are a Caste of Politicians: Caste and Modern Politics in a North Indian Town, Contributions to Indian Sociology, Vol.38, No. 1&2, 2004, p.51

[১৩৯] তদেব, পৃ.৫৭

[১৪০] তদেব, পৃ.৬০

[১৪১] তদেব, পৃ.৬১

চিরঞ্জীবীর নেতৃত্বে কাপুদের মদতপুষ্ট প্রজা রাজ্যম পার্টির উত্থান।[১৪২] অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে কাপুরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আগে কাপুদের সঙ্গে তেলুগু দেশম পার্টির সুসম্পর্ক থাকলেও কাপুদের মধ্যে ক্রমশ কাম্মা বিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকায় এই সম্পর্কে ভাঙন ধরে। এই সম্পর্কের অবনতির দরুণ কিছু অঞ্চলে কাপু ভোট হারিয়ে তেলুগু দেশম পার্টি নির্বাচনে পর্যুদস্ত হয়।[১৪৩] কোন একটি জাতির সামাজিক সচলতার সম্ভাবনা কীভাবে রাজনৈতিক জয়-পরাজয় নির্ধারণ করতে পারে, তার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে মহারাষ্ট্র থেকে। ১৯৫৭ সালে আম্বেদকর রিপাবলিকান পার্টি তৈরি করেছিলেন মাহার, মাঙ্গ, মাতঙ্গ ইত্যাদি 'অস্পৃশ্য' জাতিগুলিকে এক ছাতার তলায় এনে দলিতদের রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করতে। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, মাঙ্গ বা মাতঙ্গরা ভোট দিচ্ছেন দক্ষিণপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টিকে। এই গোষ্ঠীগুলির মনে হচ্ছিল, রিপাবলিকান পার্টি আদতে মাহারদের সামাজিক সচলতার মাধ্যম! এসব কারণে, রিপাবলিকান পার্টি বিশেষ নির্বাচনী সাফল্য পায়নি।[১৪৪]

প্রাক্-ঔপনিবেশিক বা ঔপনিবেশিক পর্বের তুলনায় নির্বাচনী গণতন্ত্রের সামাজিক সচলতার কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। নির্বাচনী গণতন্ত্র প্রত্যেক জাতকেই আইনত সমানাধিকার দেয়। এই আইনের সূত্রে এবং স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দৌলতে অনেক তথাকথিত নিচু জাতই 'উঁচু' জাতকে সরাসরি টক্কর দেয় এবং এমনকি, তাঁদের ধর্মকৃত্যগত ও প্রতীকী মর্যাদাকেও বিশেষ পাত্তা দেয় না। দ্বিতীয় পার্থক্য হল, প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে বা ঔপনিবেশিক আদমসুমারির কালেও বর্ণজাতিকাঠামোয় ক্রম নিয়ে জাতগুলির বিশেষ মাথাব্যথা ছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতে নির্বাচনী গণতন্ত্রের দৌলতে 'ক্রম'(rank) আর মূল চিন্তা নয়। বরং,

---

[১৪২] Christophe Jaffrelot, 'The Caste Based Mosaic of Indian Politics'

[১৪৩] K. Srinivasulu, 'BSP & Caste Politics', Economic and Political Weekly, Vol.29, No40, October 1, 1994, p.2586

[১৪৪] Dipankar Gupta, 'Caste and Politics: Identity Over System', Annual Review of Anthropology, Vol.21, 2005, p.418

চাকরি, শিক্ষার ক্ষেত্রগুলিতে জাঁকিয়ে বসে সামাজিক আধিপত্য কায়েম করাই মূল কথা।[১৪৫] যুগের সঙ্গে বর্ণজাতিব্যবস্থার চরিত্র বদলায়, সামাজিক সচলতার অভিমুখ আর তাৎপর্যও বদলে যায়।

সামাজিক সচলতার তাৎপর্য বদলের মোক্ষম প্রমাণ আছে স্বাধীনোত্তর ভারতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায়। তফসিলি জাতি, উপজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণির কাছে শিক্ষা বা চাকরির মাধ্যমে সামাজিক আধিপত্য কায়েম করার প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে, এই পদ্ধতি যেমন তাঁদের অর্থনৈতিক-সামাজিক মর্যাদা দেয়, কার্যত সামাজিক সচলতা তৈরি করে; আবার অন্যদিকে এই মর্যাদা লাভের জন্য প্রয়োজন 'নিচু' জাতের তকমা ধরে রাখা। সংস্কৃতায়নের যে প্রথাগত ধাঁচের কথা আমরা জানি, যেখানে 'নিচু' জাত ক্রমশ আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে, 'উঁচু' জাতের মূল্যবোধ অনুকরণ করে জাত হিসাবে নিজের মর্যাদা বাড়াতে চায়, তার সঙ্গে সংরক্ষণের বিরোধী সম্পর্ক। সংরক্ষণ আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা দখলের সুযোগ দেয়, কিন্তু 'নিচু' জাতের তকমা ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ দেয় না। ছেড়ে দিলে সংরক্ষণের সুযোগই আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু, ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার তুলনায় স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষা, চাকরির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাওয়ায় কার্যত 'নিচু' জাতের তকমা গায়ে লাগিয়েও সংরক্ষণের সুবিধা পেতে আগ্রহী। এমনকি, মাদ্রাজ প্রদেশের বিশ্বব্রাহ্মণ জাতের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, অব্রাহ্মণ এই উঁচু জাত ব্রিটিশ আমলেই সংরক্ষণের সুবিধা পেতে 'নিচু' জাতের তকমা পেতে চেয়েছিল।[১৪৬] প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে এমন যেচে পড়ে 'অধোমুখী সামাজিক সচলতা'র অংশ হতে চাওয়ার নিদর্শন নিশ্চয়ই বিরল। আধুনিক কালে অবশ্য একে 'অধোমুখী সামাজিক

---

[১৪৫] তদেব, পৃ.৪১৪

[১৪৬] Gopal Guru, 'Reservations and the Sanskritization of Scheduled Castes-Some Theoretical Aspects, Sociological Bulletin, Vol.33, No.1/2, September, 1984, pp.32-33

সচলতা’ বলা যাবে কি না সন্দেহ। ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার সঙ্গে সামাজিক সচলতার সম্পর্ক অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে। সামাজিক সচলতার মাপকাঠিগুলিই এযুগে অন্যরকম।

এই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে যাবে, পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে যুযুধান প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অন্যতম ছিল মাহিষ্যদের অন্য অনগ্রসর শ্রেণির (Other Backward Classes বা OBC) অন্তর্ভুক্তিকরণ। মাহিষ্যরা ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী জাতি। ইতিপূর্বে মাহিষ্য জাতির নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাশমল মাহিষ্যদের সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তা নিয়ে মাহিষ্য সমাজের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। এই প্রতিশ্রুতির পর আবার ফেসবুক ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে মাহিষ্যদের দ্বিধাবিভক্ত অবস্থান দেখা যায়। এক দল সংরক্ষণের পক্ষে, আরেক দল অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি আর ইতিহাসের যুক্তিতে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে। এক দলের যেচে সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রয়াসের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এক্ষেত্রে জাতের গায়ে ‘নিচু’ তকমা লেগে গেলেও তা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই। বোঝা যাচ্ছে, ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার সঙ্গে সামাজিক সচলতার সম্পর্ক ক্ষীণ হয়েছে। সংরক্ষণের সুযোগে শিক্ষা, চাকরি হস্তগত করে সচলতার আধুনিক মাপকাঠি অনুযায়ী চলাই বর্তমান প্রজন্মের একাংশের লক্ষ্য।

কিন্তু, ভারতবর্ষ বলেই বোধহয় ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার প্রশ্নটা একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং, সংস্কৃতায়ন আর সংরক্ষণের দাবি হাত ধরাধরি করে চলে। এপ্রসঙ্গে আমরা দুটি বাংলা দলিত আত্মকথা দেখতে পারি। বাংলার নমঃশূদ্ররা সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে থাকেন। আবার, দলিত আত্মকথার সূত্রে জানতে পারছি, স্বাধীনোত্তর ভারতেও নমঃশূদ্র পরিবারগুলি সংস্কৃতায়নে মনোযোগী ছিল। শূকর মাংস ভক্ষণ করে বলে ‘উঁচু’ জাতের

পরিবারগুলি নমঃশূদ্রদের খাটো চোখে দেখত। নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণও ছিল 'নিচু' জাতের বামুন; লোকমুখে 'চাঁড়ালের বাওন'। 'উঁচু' জাতের ধর্মকৃত্যগত স্বীকৃতি পেতে তৎপর নমঃশূদ্র পরিবারগুলি তাঁদের ঘরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে বোঝাতে চাইত তাঁরা এখন শুয়োরের মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। হীন মনোভাব ত্যাগ করে পা বাড়াচ্ছে সভ্যতার দিকে।[১৪৭] সামাজিক চাপ আর হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি পেতে নমঃশূদ্ররা যে পদবি বদলে ফেলে 'ঠাকুর' লিখতেন—সে কথা শুনিয়েছে আরেক দলিত আত্মস্মৃতি।[১৪৮] এও সংস্কৃতায়নের এক চিরাচরিত পদ্ধতি। এই প্রবণতা যেমন ছিল, তেমনই আরেক দলিত আত্মজীবনীকার উপলব্ধি করেছেন নমঃশূদ্রের সৃষ্টিকথার অকারণ ব্রাহ্মণ্যকরণের তাগিদ আর সংস্কৃতায়নের নিষ্ফলতাকে। ব্রাহ্মণ্যকরণের প্রয়াসের বদলে তাঁর আগ্রহ ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রকল্পের প্রত্যাখ্যানে।[১৪৯] এই ভাবেই তৈরি হয় 'আধুনিকতা' আর সামাজিক সচলতার এক জটিল সন্দর্ভ।

বিদ্যায়তনিক চর্চার জগতে বর্ণজাতিব্যবস্থাকে বোঝার ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার ধারণা কীভাবে ক্রমশ গুরুত্ব পেয়েছে, তা আলোচনা করা দরকার। অবশ্য প্রথমেই চোখে পড়বে, বিদ্যায়তনিক পরিসরে সামাজিক সচলতাকেন্দ্রিক চর্চার একটি প্রশাসনিক পটভূমি আছে। সে প্রসঙ্গেও আমরা কথা বলব। মনে রাখা দরকার, সামাজিক সচলতাকেন্দ্রিক বিদ্যায়তনিক চর্চার ইতিহাস দীর্ঘ। বিভিন্ন বিদ্যায়তনিক শৃঙ্খলভেদে সামাজিক সচলতা বিষয়ক চর্চার কালানুক্রমিক ইতিহাস নির্মাণ করার বদলে, সেকারণে আমরা নির্বাচিত রচনার সাপেক্ষে ভারতীয় বর্ণজাতিপ্রথায় সামাজিক সচলতা বিষয়ক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলগুলিকে চিহ্নিত করব।

---

[১৪৭] মনোহরমৌলি বিশ্বাস, *আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি*, কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ.২৫,৭৪

[১৪৮] কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, *আমি কেন চাঁড়াল লিখি*, কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০২১, পৃ.৪৫

[১৪৯] মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন*, কলকাতা: দে পাবলিকেশন্স, [], পৃ.১৮,২৩

ভারতীয় বর্ণজাতিব্যবস্থার আলোচনায় শুরুতেই জেমস মিলের কথা আসে। জেমস মিল তাঁর *The History of British India* (প্রথম প্রকাশ ১৮১৭ খ্রি.) বইতে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় একপ্রকার স্থবিরতার কথা বলেন। এই সূত্রে তৈরি হয়েছিল এক অনড়, পরিবর্তনশীল ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজের ধারণা। মূলত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের ভিত্তিতে জেমস মিলের বর্ণজাতিব্যবস্থার স্থবিরতা সম্পর্কে এই ধারণা জন্মায়। অবশ্য এই ধারণা পরবর্তীকালে অনেকটাই বদলে গেছে। বিশেষত, আদমসুমারি শুরু হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আধিকারিকরা ভারতের জাতপাতের চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন। প্রতিটি জাতির সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করতে গিয়ে একেকটি জাতির পেশাবদলের ইতিহাস, পেশাবদলের মাধ্যমে নতুন জাতের সৃষ্টি, তথাকথিত নিচু জাতির 'উঁচু' জাতের মর্যাদা দাবি—ইত্যাদি নানাপ্রকার ওঠাপড়া সম্বন্ধে তাঁরা অবগত হলেন। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত *The Tribes and Castes of Bengal(Vol.1)*-এর লেখক, আদমসুমারি আধিকারিক এইচ.এইচ.রিজলির লেখালেখি খেয়াল করলেও সামাজিক সচলতা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা ধরা পড়ে। যেমন—কৈবর্তদের সামাজিক মর্যাদা বিষয়ক আলোচনায় তিনি লক্ষ করেন এই গোষ্ঠীর দুটি উপবিভাগ—মৎস্যজীবী (জালিয়া কৈবর্ত) আর কৃষিজীবী (হালিয়া কৈবর্ত)। মৎস্যজীবী কৈবর্তরা ব্রাহ্মণ সমাজে জল অনাচরণীয় হলেও চাষি কৈবর্তদের অবস্থান উন্নততর। তাঁদের হাত থেকে ব্রাহ্মণরা এখনও জল না নিলেও তাঁরা নবশাখদের সঙ্গে একই হুঁকোয় তামাক খেতে পারেন। রিজলি অনুমান করেন, পরবর্তীকালে এই চাষি কৈবর্তরা সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির দরুণ নবশাখ গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, নবশাখ গোষ্ঠীভুক্ত জাতির সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েছে; সুতরাং এই গোষ্ঠীতে ভবিষ্যতে কৈবর্তদের অন্তর্ভুক্তি খুবই সম্ভব।[১৫০] এই কথাগুলির মধ্যে যেমন কৈবর্তদের জাতিগত মর্যাদাবৃদ্ধি বা সামাজিক সচলতা সম্বন্ধে রিজলির সচেতনতা লক্ষ করা যাচ্ছে,

[১৫০] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Bengal(Vol.1)*, Calcutta: Firma Mukhopadhyay, [], p.382

তেমনই বোঝা যাচ্ছে, নবশাখ গোষ্ঠীভুক্ত জাতির সংখ্যাবৃদ্ধি আদতে সামাজিক সচলতারই স্বীকৃতি। রিজলির মতো আদমসুমারি আধিকারিকরা শাস্ত্রীয় ভিত্তির বাইরেও বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ায় জাতব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তনের চিহ্নগুলি নজর করতে পারলেন।

শার্ল মারি এমিল সেনারের *প্রাচীন ভারতে বর্ণ শ্রেণী ও জাত* (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬ খ্রি.) বইতে সামাজিক সচলতার আলোচনাকে আরেকটু গুরুত্ব পেতে দেখছি। ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত বইটির সরাসরি বাংলা অনুবাদ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বইতে সেনার 'জাতের ভিতর ভাঙ্গা-গড়া ও ওঠা-নামা' শীর্ষক অধ্যায়ে পাঠককে স্পষ্ট ভাষায় খেয়াল করিয়ে দিলেন বর্ণভেদপ্রণালীর গঠনকাঠামো অপরিবর্তনীয়—এমন ভ্রান্ত ধারণা যেন কেউ পোষণ না করেন। জেমস মিলের মত তাহলে শতাব্দী ঘুরতে না ঘুরতেই প্রত্যাখ্যাত হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ থেকে প্রাসঙ্গিক একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি—

> গোড়া হইতেই আমি পাঠককে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, যে—বর্ণভেদপ্রণালীর গঠনের কাঠামোটা অপরিবর্তনীয়, উহা অলঙ্ঘ্য ছোট-ছোট বেড়ার ঘরে রুদ্ধ, বেশ সুবিবেচিত ও সুসমঞ্জসীভূত অংশে বিভক্ত—যাহার অক্ষুণ্ন অখণ্ডতা সুনির্দিষ্ট মানমর্যাদার দ্বারা চির-রক্ষিত—এই যে একটি ভ্রান্ত ধারণা ইহা যেন কদাপি মনোমধ্যে পোষণ না করা হয়।[১৫১]

আলোচনার পরবর্তী অংশে তিনি ভূসম্পত্তি ও প্রতিপত্তি অর্জনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের হাত করে, ছদ্ম বংশগৌরব লিখিয়ে, অথবা আদিবাসী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তন করে নতুন গোষ্ঠীনামের সাহায্যে হিন্দুসমাজে আশ্রয় নেওয়ার মাধ্যমে সামাজিক সচলতার কয়েকটি পদ্ধতি নির্দেশ

[১৫১] শার্ল মারি এমিল সেনার, *প্রাচীন ভারতে বর্ণ শ্রেণী ও জাত*, কলকাতা: ছোঁয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, পৃ.১৪৫

করেছেন। ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধকে স্বীকার করা, পুরোহিতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা—তাঁর মতে সামাজিক সচলতার কতকগুলি চেনা ছক।[১৫২]

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *Encyclopedia of Religion and Ethics (Vol.III)*-এর প্রথম সংস্করণে বর্ণজাতিপ্রথা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আরেক আদমসুমারি আধিকারিক ই.এ.গেইট সামাজিক সচলতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতার নমুনা রাখেন। আদমসুমারি আধিকারিকদের বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তাঁদের সাহায্য করছিল। গেইটও সামাজিক সচলতার সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থানের সম্পর্কটি নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেন। সামাজিক সচলতা অভিলাষী গোষ্ঠীগুলি বর্ণজাতিব্যবস্থার স্থাণু রূপ সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় বয়ানটিকে মুখে অস্বীকার করতে না পারলেও, কার্যক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে নিজের জাতের দুর্বল অংশের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র জাত হিসাবে ‘উঁচু’ জাতিমর্যাদা দাবি করে। সেই দাবিটিকে মান্যতা দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে তৈরি করে নেয় ছদ্ম সৃষ্টিকথা। প্রসঙ্গত সরাক তাঁতি বা বঙ্গদেশের তিলিদের উদাহরণ দিয়েছেন গেইট।[১৫৩]

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল রাধাকমল মুখার্জির উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ‘Caste and Social Change’। অর্থাৎ জাতপাতের কারণে স্থবির সমাজ নয়; বরং জাতপাতের নিরিখে জঙ্গম সমাজের কথা বলতে চাইলেন রাধাকমল মুখার্জি। সংস্কৃতায়ন বা Sanskritization এর মতো সামাজিক সচলতার যে পদ্ধতি বিষয়ে আর কয়েক বছর পরেই গভীর ভাবনাচিন্তা করবেন সমাজতাত্ত্বিক এম.এন.শ্রীনিবাস, তার পূর্বসূত্র হিসাবে দেখা যেতে পারে রাধাকমল মুখার্জির প্রবন্ধটিকে। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী পেশা বদলে কিছুটা আর্থিক প্রতিপত্তি অর্জন

---

[১৫২] তদেব, পৃ.১৫১

[১৫৩] James Hastings(ed.), *Encyclopedia of Religion and Ethics(Vol.III)*, Edinburgh: T. & T. Clark, Reprint, 1974, pp.236-237

করে, পুরনো জীবনযাপন পদ্ধতি সংস্কারের মাধ্যমে, ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধের আত্তীকরণে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা জাতে 'ওঠা'র চেষ্টা করে।[১৫৪] সামাজিক সচলতার যে মাপকাঠিগুলির কথা রাধাকমল বললেন, তার অনেকগুলির উল্লেখ পরবর্তীকালে পাওয়া যাবে শ্রীনিবাসের রচনায়।

জেমস মিলের মতো কেউ কেউ শাস্ত্রীয় বয়ানের ভিত্তিতে সচলতাহীন, স্থবির ভারতীয় সমাজের কথা ভাবছিলেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিকরা শাস্ত্রীয় বয়ানের বাইরে অন্যান্য তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে সামাজিক সচলতার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। অবশ্য জেমস মিলদের শাস্ত্রপাঠও খুব একমাত্রিক। শাস্ত্রীয় বয়ানের মধ্যেও যে সচলতার ইঙ্গিত থাকতে পারে, তার প্রমাণ আছে নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ* (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ)-এ। নীহাররঞ্জন দেখাচ্ছেন, *মনুসংহিতা* অনুযায়ী পৌণ্ড্রক ও কিরাতরা আদতে ক্ষত্রিয় হলেও বহুদিন ব্রাহ্মণ্য সংস্পর্শ ও আচার-অনুষ্ঠান বর্জিত হওয়ায়, তাঁদের 'শূদ্র' পর্যায়ে অবনমন ঘটেছিল।[১৫৫] *মনুসংহিতা*-র এই বয়ানের ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু, নীহাররঞ্জনের উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে, সচলতার একটা ভাবনা, খুব সংকীর্ণ অর্থে হলেও, শাস্ত্রকারদের ভাবনার মধ্যেও ছিল।

আরেক বাঙালি নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসুও *হিন্দু সমাজের গড়ন* (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ বঙ্গাব্দ) বইতে সামাজিক সচলতার প্রসঙ্গগুলি নিপুণভাবে চিহ্নিত করেন। নিম্নবর্ণের জাতির মধ্যে উচ্চবর্ণের রীতি-নীতি বা আচার নকল করে 'উঁচু' বর্ণ হিসাবে সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। তিনি লক্ষ করেন, আচার-পরিবর্তন বা একই জাতির মধ্যে একটি অংশের

---

[১৫৪] Radhakamal Mukherjee, 'Caste and Social Change in India', American Journal of Sociology, Vol.43, No.3, 1937, p.379

[১৫৫] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ*, কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৮

বৃত্তি পরিবর্তনের কারণে নতুন নতুন উপ-জাতের উদ্ভবের মাধ্যমে সচলতার একটা আবহ সবসময়েই জারি থাকত। 'ভারতবর্ষের আর্য সমাজ' এর মধ্যে এই প্রবণতা চিরকালই কার্যকর ছিল। আরেকটি পদ্ধতিগত দিকও নির্দেশ করেন নির্মলকুমার বসু। হিন্দুসমাজের শ্রেণিভেদের বাস্তব চিত্রের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আর শাস্ত্রকারদের বয়ান—এই দুইকেই একজায়গায় রেখে পড়লে হিন্দুসমাজের গঠন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। অর্থাৎ, জাতপাতের পুথিগত বয়ান আর ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক অনুসন্ধানের যৌগপত্য প্রয়োজন।[১৫৬] অনেক পরবর্তীকালে এই মন্তব্যের প্রায় প্রতিধ্বনি করবেন বীণা দাস *Structure and Cognition: Aspects of Hindu Caste and Ritual* (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ) বইতে। এছাড়াও, নির্মলকুমার বসু 'বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন' শীর্ষক অধ্যায়ে আদমসুমারির পর্বে বিভিন্ন জাতির সামাজিক সচলতার প্রয়াসের উদাহরণগুলি লিপিবদ্ধ করেন।[১৫৭]

উঁচু জাতের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ নকল করে 'নিচু' জাতের উপরে ওঠার চেষ্টার ধাঁচ যে পূর্ববর্তী গবেষকদের নজর এড়িয়ে যায়নি তা আমরা দেখিয়েছি। কিন্তু, এই পর্যবেক্ষণকে বিধিবদ্ধ ও তাত্ত্বিক চেহারা দিলেন এম.এন.শ্রীনিবাস। দীর্ঘ ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত *Religion & Society Among the Coorgs of South India* বইতে শ্রীনিবাস এই পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেন এবং পদ্ধতিটির নাম দেন 'Sanskritization'(সংস্কৃতায়ন)। শ্রীনিবাসের সামাজিক সচলতার আলোচনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উঠে আসে—এক, কোন একটি জাতির সামাজিক সচলতা অনেকক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতায়ন বা সামাজিক সচলতায় বর্ণজাতিকাঠামোয় কোন একটি জাতির অবস্থানগত বদলই কেবল হতে পারে, কাঠামোটির মূলগত বদল সম্ভব নয়।

---

[১৫৬] নির্মলকুমার বসু, *হিন্দু সমাজের গড়ন*, কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৫বঙ্গাব্দ, পৃ.৭০

[১৫৭] তদেব, পৃ.১৩৪-১৪২

সচলতা যে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসকে টিকিয়ে রাখারই একটা রাস্তা—শ্রীনিবাসের আলোচনায় সেকথা স্পষ্ট।

বিদেশি তাত্ত্বিক পিত্রিম এ. সরোকিনের *Social & Cultural Mobility* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। সরোকিন সামাজিক সচলতার বিভিন্ন অভিব্যক্তির তাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাজন করেন এবং সিদ্ধান্তে আসেন যে, কোন স্তরবিভক্ত সমাজই সম্পূর্ণ স্থবির হতে পারে না। এমনকি, জাতপাতবিভক্ত ভারতীয় সমাজেও যে সামাজিক সচলতার অস্তিত্ব ছিল—সেকথাও সরোকিন নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেন।[১৫৮] ১৯৫৯ সালেই প্রকাশিত হয় মিল্টন সিঙ্গারের সম্পাদনায় *Traditional India: Structure and Change*। বইটির শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট ঐতিহ্যাগত ভারতীয় সমাজের নির্দিষ্ট বর্ণজাতিকাঠামোর মধ্যে থেকেও কীভাবে পরিবর্তন আর সচলতার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে—তাই এই বইটির অন্বিষ্ট।

১৯৫০-এর পর থেকেই বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা নিয়ে আলোচনা বেড়েছিল। তবে, তার মধ্যেও অন্য প্রবণতা লক্ষ করা যায়। লুই দুমোঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications* (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ)-এর মূল ঝোঁক ছিল শাস্ত্রের নিরিখে বর্ণজাতিকাঠামোর আলোচনায়। শুচি-অশুচির দ্বিকোটিক বিন্যাসে প্রবল গুরুত্ব দিয়েছিলেন দুমোঁ। দুমোঁর বিরুদ্ধে যে সমালোচনাগুলি উঠে আসে, তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি প্রথম অধ্যায়ে। বর্ণজাতিকাঠামো বিষয়ে অত্যন্ত বিখ্যাত গবেষক সুবীরা জায়সবাল লক্ষ করেছিলেন, দুমোঁ ভারতীয় বর্ণজাতিকাঠামোর সচলতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না—

Since hierarchy is a religious principle based on the opposition of the pure and the

[১৫৮] Pitrim A. Sorokin, *Social and Cultural Mobility*, Illinois: Free Press, 1st Published, 1959, pp.133-134

impure and this is supposed to lie at the base of the caste system, it is not surprising that Dumont is led to conclude that from a dialectical point of view the hierarchical model of Indian society over the ages represents stagnation.[১৫৯]

দুমোঁর রচনা সত্বেও এই কালপর্বে বর্ণজাতিকাঠামো বিষয়ক আলোচনার মূল ঝোঁক ছিল সামাজিক সচলতায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা জেমস সিলভারবার্গের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত *Social Mobility in the Caste System in India: An Interdisciplinary Symposium* (১৯৬৮ খ্রি.)-এর কথা খেয়াল করতে পারি। 'Interdisciplinary Symposium' কথাটি থেকেই সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক সচলতা সম্বন্ধে আলোচনার প্রবণতা বোঝা যাচ্ছে। এই বইতেও আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সচলতার আলোচনায় দেখলাম, ভারতীয় সমাজে পেশাবদলের উপর ধর্মীয় ও মতাদর্শগত বাধা থাকা সত্ত্বেও, ব্যবসা, সামরিক বৃত্তি, কারিগরি বৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক প্রতিপত্তির জোরে অনেকসময়ই ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক সচলতা তৈরি হয়। আবার, ঠিক বিপরীত কারণে, পেশাগত বিপর্যয়ে তৈরি হতে পারে অধোমুখী সামাজিক সচলতা।[১৬০] প্রায় একই সময়পর্বে ভারতীয় ঐতিহাসিক মহলে বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা সম্বন্ধে আগ্রহের নিদর্শন আছে রমেন্দ্রনাথ নন্দীর 'Gotra and Social Mobility in the Deccan' (প্রথম প্রকাশ- ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, ১৯৭০ খ্রি.), রোমিলা থাপারের 'Social Mobility in Ancient India with Special Reference to Elite Groups' (প্রথম প্রকাশ- *Ancient Indian Social History: Some Interpretations*, ১৯৭৬ খ্রি.) বা চিত্ররেখা গুপ্তের 'The Writers' Class of Ancient India—A Case Study in Social Mobility' (প্রথম প্রকাশ-The Indian Economic and Social History Review, Vol.20, No.2, 1983) রচনায়। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের

---

[১৫৯] Suvira Jaiswal, *Caste: Origin, Function and Dimensions of Change*, Delhi: Manohar, Reprint, 2000, p.36

[১৬০] James Silverberg(ed.), *Social Mobility in the Caste System in India: An Interdisciplinary Symposium*, The Hague: Mouton, 1st Published, 1968, p.32

সামাজিক সচলতা বিষয়ক আলোচনার এই ধারাতেই আমরা হিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণাকে এবার দেখতে পারি।

হিতেশরঞ্জন সান্যালের *Social Mobility in Bengal* (প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ খ্রি.) সম্ভবত বঙ্গদেশের সামাজিক সচলতাকেন্দ্রিক প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। সম্ভবত ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক চর্চাতেই সামাজিক সচলতাকে কেন্দ্রীয় পটভূমিতে রেখে একটি প্রদেশভিত্তিক আলোচনার ধারার প্রথম যুগের অংশ এই বই। এই বইয়ের ভূমিকা বাদ দিলে বাকি তিনটি অধ্যায়ই ১৯৭১-১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় ভারতীয় সমাজকাঠামো বিষয়ে হিতেশরঞ্জনের আগ্রহের অন্যতম প্রেরণা। নীহাররঞ্জন রায়ের গবেষণায় সামাজিক সচলতা সম্বন্ধে যে সচেতনতা আমরা দেখেছি, হিতেশরঞ্জন তাকে নিপুণ বিশ্লেষণে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সার্বিকভাবে বঙ্গদেশের জাতপাতের ঐতিহাসিক চর্চার নিরিখেই এই বই অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই বইতে হিতেশরঞ্জন বঙ্গদেশের বর্ণজাতিকাঠামোর উদ্ভব, সামাজিক সচলতার উৎস ও সীমাবদ্ধতা, মন্দির নির্মাণ ও সামাজিক সচলতা, ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও আধুনিক সমাজে সামাজিক সচলতার প্রবহমানতা বিষয়ে আলোচনা করেন। শেষ অধ্যায়ের অংশ দুটি ‘কেস স্টাডি’—তিলি ও সদ্‌গোপদের সামাজিক সচলতা বিষয়ক সমীক্ষা। বঙ্গদেশের সামাজিক সচলতার আলোচনায় সচলতার চারটি প্রকৃতি নির্দেশ করেছিলেন। এক, একই জাতির অন্তর্গত একটি অংশের সচলতার প্রয়াস। যেমন- মৌলিক কায়স্থদের কুলীন কায়স্থ হওয়ার চেষ্টা। অথবা, মোদকদের মধ্যে ‘কুলীন’ নামক উপবিভাগ সৃষ্টি। দুই, ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসে অবস্থানের বদল না ঘটিয়েও কোন একটি জাতের মর্যাদাবৃদ্ধি। যেমন- গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিকরা নবশাখ মর্যাদাভুক্ত হয়েও বারুই, মোদক, কর্মকার ইত্যাদি নবশাখ গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি সম্মান পেয়ে থাকেন। তৃতীয়ত, কোন একটি জাতের একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী অংশ পেশা বদলে, উচ্চতর

জাতিমর্যাদাসূচক নাম নিয়ে জাতের মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টা করে। নাপিত-মধুনাপিত, শুঁড়ি-সাহা এই ধরনের প্রচেষ্টার উদাহরণ। চার, উচ্চ ক্রমসহ নতুন জাতের সৃষ্টি। যেমন- গোপ-সদ্‌গোপ, তেলি-তিলি, ভূমিজ-ক্ষত্রিয়।[১৬১] বংশানুক্রমিক পেশার বদল, আর্থিক প্রতিপত্তি ও ভূম্যধিকার, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারকে হিতেশরঞ্জন সামাজিক সচলতা প্রয়াসের নির্ণায়ক বলে চিহ্নিত করেন।[১৬২] মন্দির নির্মাণ ও সামাজিক সচলতার আলোচনার মাধ্যমে হিতেশরঞ্জন সামাজিক সচলতার প্রয়াসের ক্ষেত্রে ধর্মসম্প্রদায়ের আনুকূল্য ও ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার সম্পর্ক নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। সামাজিক সচলতার সঙ্গে মন্দির নির্মাণের সম্পর্ক বিচারের প্রক্রিয়া সামাজিক সচলতা বিষয়ক গবেষণার ইতিহাসে চমকপ্রদ। বাংলার মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ে হিতেশরঞ্জনের দীর্ঘদিনের আগ্রহ আর চর্চাকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামাজিক সচলতার সঙ্গে জুড়ে দেন। এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে হিতেশরঞ্জন দেখাতে চেয়েছেন, ঔপনিবেশিক পর্বে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করে একেকটি জাত কীভাবে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে এবং আদমসুমারিতে উচ্চতর জাতিমর্যাদার দাবি জানায়। সামাজিক সচলতা এবং একটি জাতের আত্মপরিচিতি নির্মাণের প্রক্রিয়ার যে প্রবহমানতা আছে; দেওয়াল তুলে কোন নির্দিষ্ট কালপর্বে তাকে আবদ্ধ রাখা যায় না—হিতেশরঞ্জনের এই বিশ্লেষণ তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকেই চিনিয়ে দেয়। তিলি আর সদ্‌গোপ বিষয়ক তাঁর দুটি ‘কেস স্টাডি’ প্রাক্‌-ঔপনিবেশিক পর্বের সামাজিক সচলতা সংক্রান্ত পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ধারণাকেও ভেঙে দেয়। বার্টোন স্টেইন, অরবিন্দ শাহ্‌ বা বার্নাড কোহনের গবেষণায় বোঝা যাচ্ছে, প্রাক্‌-ঔপনিবেশিক পর্বে কিছু অভিজাত গোষ্ঠীর বা দাপুটে পরিবারের সামাজিক সচলতার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু, এই গবেষণাগুলিতে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক

---

[১৬১] Hitesranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal*, Calcutta: Papyrus, 1st Published, 1981, pp.42-44
[১৬২] তদেব,পৃ.৪৯

প্রভাবে অভিজাত পরিবারের সচলতার প্রসঙ্গ এলেও সাধারণ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের একটি জাত হিসাবে সচলতার কথা নেই। হিতেশরঞ্জন সদ্‌গোপ ও তিলি বিষয়ক সমীক্ষার মাধ্যমে দেখালেন, ঔপনিবেশিক 'আধুনিকতা'র সূত্রপাতের আগেই বংশগত সামাজিক সচলতার পাশাপাশি বঙ্গদেশের সমাজে গোষ্ঠীগত সামাজিক সচলতার জোরদার প্রমাণ ছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্বে সচলতার প্রক্রিয়াকে যেভাবে ভারতীয় সমাজে 'আধুনিকতা'র আবির্ভাবের সঙ্গে যোগ করে দেখা হয়; সেই তত্ত্বকে ভাঙতে চাইলেন হিতেশরঞ্জন।

হিতেশরঞ্জন সান্যালের এই অসামান্য গবেষণা থাকা সত্বেও আমরা খ্রি. ষোড়শ-খ্রি. অষ্টাদশ শতাব্দীর কালপর্বে বঙ্গদেশের সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া নিয়ে কেন আলোচনা করলাম? প্রথমেই বলা দরকার, হিতেশরঞ্জনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের কোন মতবিরোধ নেই। বস্তুত, অনেকাংশেই তাঁর বিশ্লেষণী পদ্ধতি আমাদের গবেষণায় ব্যবহৃত। বলা ভালো, এই অসামান্য গবেষণার সিদ্ধান্তগুলিকে আমরা অন্যান্য 'কেস স্টাডি'র সাহায্যে পুনরায় যাচাই করেছি। সামাজিক সচলতা অঞ্চলকেন্দ্রিক, নির্দিষ্ট কালপর্বকেন্দ্রিক। 'কেস স্টাডি' সেকারণেই সামাজিক সচলতার আলোচনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের 'কেস স্টাডি' গুলির মাধ্যমে হিতেশরঞ্জনের মৌল সিদ্ধান্তগুলি পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে; সিদ্ধান্তগুলির দার্ঢ্য সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি। দ্বিতীয়ত, হিতেশরঞ্জনের গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতিগত দিকের অনতিস্ফুট সম্ভাবনাকে এই গবেষণায় আমরা পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছি—

ক) সামাজিক সচলতার সঙ্গে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার সম্পর্ককে হিতেশরঞ্জন গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরেই আমরা বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে বিভিন্ন জাতির সামাজিক সচলতার সম্পর্ক বিচার করেছি। আমাদের গবেষণার অন্যতম অবলম্বন বঙ্গদেশের বৈষ্ণব শাখাভিত্তিক সাহিত্যের প্রভূত ব্যবহার। হিতেশরঞ্জন তাঁর আলোচনায় মধ্যযুগের বাংলা

সাহিত্যের উপযুক্ত ব্যবহার করেও বৈষ্ণব শাখাভিত্তিক সাহিত্য এবং নির্দিষ্ট শাখা বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে একেকটি জাতির সামাজিক সচলতার সম্পর্ক বিশদভাবে নির্ণয় করার প্রচেষ্টা সেভাবে করেননি। আমাদের আলোচনায় নিত্যানন্দ গোষ্ঠী ও সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়, শ্রীনিবাস আচার্যের গোষ্ঠী ও মল্ল রাজবংশ, শ্যামানন্দ গোষ্ঠী ও সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের সামাজিক সচলতার সম্পর্ককে শাখাভিত্তিক সাহিত্যের নিরিখে বোঝার চেষ্টা করেছি।

খ) হিতেশরঞ্জনের মতোই জাতির আত্মপরিচিতি নির্মাণের প্রবহমানতা বুঝতে আলোচনাকে মধ্যযুগের কালপর্বে আবদ্ধ না রেখে আমরা উনিশ-বিশ শতকেও প্রসারিত করেছি। তবে, আলোচনার সংক্ষিপ্ততার জন্যই হয়তো হিতেশরঞ্জন উনিশ-বিশ শতকের জাতিগত উদ্দেশ্যচালিত গ্রন্থের বা বিভিন্ন জাতি সংগঠনের পত্রিকার বিপুল ব্যবহারের সুযোগ পাননি। আমরা সেই রচনাগুলিকে আমাদের আলোচনার পরিধিতে এনে 'আধুনিকতা'র সঙ্গে আত্মপরিচিতি নির্মাণের, সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ার সম্পর্ক নির্ণয় করতে চেয়েছি। তাতে, সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ায় ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার সম্পর্কটিকে প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের নিরিখে যেভাবে বুঝে থাকি, তাকে নতুনভাবে বোঝার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বস্তুত, উনিশ-বিশ শতক, এমনকি একুশ শতকের নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ এনে আমরা তুলনামূলক আলোচনার বৃহত্তর পরিসরে প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের সামাজিক সচলতার স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছি। এমনকি, সামাজিক সচলতার বিবিধ পথের ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনও আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে। বলা যেতে পারে, সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ার বিবিধ তাৎপর্যের পর্ব-পর্বান্তর চিহ্নিত হয়েছে এই গবেষণায়।

গ) সামাজিক সচলতাকে পদ্ধতিগতভাবে পড়ার ক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি মাপকাঠির প্রস্তাব করেছি। আমাদের ধারণা—পরিবর্তনের কারণ, পরিবর্তনের অভিব্যক্তি, পরিবর্তনের

তীব্রতা—এই ত্রিবিধ মাপকাঠির ভিত্তিতে কালানুক্রমিক সমীক্ষায় বিভিন্ন জাতির সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সম্ভব। এই ত্রিবিধ মাপকাঠির নিরিখে আমরা তৈরি করতে চেয়েছি বর্ণজাতিকাঠামোর পরিবর্তনের ব্যাকরণ (grammar of change)। এই পরিবর্তনের ব্যাকরণ নির্মাণই একভাবে এই গবেষণার দর্শনগত ভিত্তি।

হিতেশরঞ্জনের লেখায় পরিবর্তনের কারণ ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা নিশ্চিতভাবেই আছে। কিন্তু, পরিবর্তনের অভিব্যক্তিগুলিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। হিতেশরঞ্জন সামাজিক সচলতাজাত পরিবর্তনের অভিব্যক্তি হিসাবে নবশাখ মর্যাদাপ্রাপ্ত সদ্‌গোপ বা তিলিদের ক্ষেত্রে সৎ ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য লাভ বা একই জায়গায় বসে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অন্নভোজন ইত্যাদিকে চিহ্নিত করেছেন। অথচ, আমাদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, সদ্‌গোপ বা সুবর্ণবণিকদের পরিবর্তনের অভিব্যক্তি হিসাবে প্রাক্‌-ঔপনিবেশিক পর্বে ব্রাহ্মণের জলাচরণীয় হয়ে ওঠা, সৎ ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য প্রাপ্তি ইত্যাদিকে চেনা গেলেও, ঔপনিবেশিক পর্বে সচলতার অভিব্যক্তিগুলি বদলে যায়। আদমসুমারিতে এই জাতিগুলির বৈশ্যত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কারণে প্রধানতম অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায় উপবীত ধারণের দাবি। পরিবর্তনের অভিব্যক্তির এই কালানুক্রমিক পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে হিতেশরঞ্জন আলোচনা করেননি। আবার, সুবর্ণবণিক বা মল্লরাজাদের সচলতার দাবি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বাইরে এবং পরবর্তী কালপর্বে সামাজিকভাবে কতটা মান্যতা পেল তা দেখা প্রয়োজন। একারণেই আমরা পরিবর্তনের তীব্রতা বিচারের প্রস্তাব করেছি। আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট, ষোড়শ শতাব্দীতে নিত্যানন্দ পরম্পরায় স্বীকৃত হয়েও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল*-এ সুবর্ণবণিকদের 'জল অনাচরণীয়' বলেই ঘোষণা করা হয়েছে। আবার, মল্লরাজবংশের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি সমকালীন ব্রাহ্মণসমাজের দ্বারা সমর্থিত হলেও পরবর্তীকালে সেই দাবির যাথার্থ্য নিয়ে একাধিক জন সংশয় প্রকাশ করেছেন। সামাজিক সচলতাজাত পরিবর্তনের

প্রভাব বা তীব্রতা কতটা সুদূরপ্রসারী—পরবর্তী কালপর্বের নিরিখে সেই বিচার হিতেশরঞ্জনের আলোচনায় আমরা দেখতে পাব না।

আমাদের গবেষণার কেন্দ্রে আছে সুবর্ণবণিক, মল্লরাজবংশ ও সদ্‌গোপদের সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান। বঙ্গদেশের বর্ণজাতিকাঠামোর নিরিখে তিনটি জাতির অবস্থানগত পার্থক্য লক্ষণীয়। সুবর্ণবণিকরা জল অনাচরণীয়, 'অসৎশূদ্র'; বল্লাল সেনের চক্রান্তে 'বৈশ্যত্ব' থেকে তাঁরা চ্যুত হয়েছেন বলে তাঁদের দাবি। নিত্যানন্দ পরম্পরার মাধ্যমে তাঁরা ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। আরও পরে, উনিশ শতকে তাঁরা প্রবলভাবে 'বৈশ্যত্ব'এর দাবি তুলবেন। মল্লরাজারা আদতে বাগদি; প্রাথমিকভাবে তাঁদের অবস্থান কার্যত বর্ণজাতিকাঠামোর বাইরে। তাঁরা সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীনিবাসের আচার্যের পরম্পরার হাত ধরে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছেন। গোপরা জল অনাচরণীয় হলেও পেশা বদলে সদ্‌গোপরা নিজেদের নবশাখ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর। উনিশ শতকে সদ্‌গোপদেরও দাবি 'বৈশ্যত্ব'। একেকটি গোষ্ঠী একেক অবস্থান থেকে একেকরকম দাবি তুলেছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছে বৈষ্ণবধর্ম। চৈতন্যদেব পরবর্তী যুগে বৈষ্ণবধর্ম যেভাবে 'নিচু' জাতের মধ্যে প্রসারিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে এই ঘটনা সংগতিপূর্ণ। লক্ষণীয়, তিনটি 'কেস স্টাডি'র মধ্যে একটি বংশগত সামাজিক সচলতা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত; মল্লরাজবংশ। বাকি দু'টি গোষ্ঠীগত সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ার অংশ। ফলে, সচলতার দু'রকম অভিমুখ আর অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বংশগত, রাজপরিবারভিত্তিক সচলতা আর সাধারণ গোষ্ঠীগত সামাজিক সচলতার তফাত আমরা নির্দেশ করেছি। তিনটি 'কেস স্টাডি'র আরেকটি ফারাকও আছে। সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতা সম্বন্ধে বৃহত্তর সমাজের সংকোচ, সংশয় যতখানি; ততটা সদ্‌গোপদের ক্ষেত্রে নয়। দুটি সচলতার প্রয়াসের 'সাফল্য'এর তীব্রতার পারস্পরিক পার্থক্য আমরা বিচার

করতে পারি। বোঝা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি সচলতার প্রক্রিয়া একই গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। সচলতার প্রক্রিয়ায় সামাজিক বাধা বা কুণ্ঠার আন্দাজও পেতে পারি এ থেকে।

সচরাচর সচলতার একটা প্রচলিত রাস্তা হিসাবে ধর্মান্তরকে দেখা হয়ে থাকে। অজস্র উদাহরণও পাওয়া যাবে। ধর্মান্তরকে সচলতার একটা সম্ভাব্য রাস্তা ধরে আমরা বুঝতে চেয়েছি, আমাদের আলোচ্য গোষ্ঠীগুলি কেন ধর্মান্তরের পথ না নিয়ে বর্ণজাতিকাঠামোর মধ্যেই নতুন অবস্থানে পৌঁছতে চাইল? এই প্রশ্নকে সামনে রাখায় আলোচ্য গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে সামাজিক সচলতা প্রাপ্তির সম্পর্ক বুঝতে সুবিধা হয়েছে। সুবর্ণবণিক, মল্ল রাজবংশ বা সদ্‌গোপদের আলোচনায় এই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। সামাজিক সচলতার আলোচনায় তিনটি 'কেস স্টাডি' আমাদের কাছে বঙ্গদেশে আলোচ্য কালপর্বের ধর্মসাংস্কৃতিক চেহারাকে বোঝার উপায়। একেকটি গোষ্ঠীর আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থান আর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার সংগতি তৈরি করার ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন শাখার প্রতিক্রিয়া আমরা বুঝতে চেয়েছি। সেই সূত্রেই আমাদের খতিয়ে দেখতে হয়েছে বৈষ্ণবধর্মের সাংগঠনিক বিন্যাস আর দর্শনগত ভিত্তির সঙ্গে সামাজিক সচলতার সম্পর্ক।

আমাদের আলোচ্য তিনটি গোষ্ঠী প্রাক্-ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশের আঞ্চলিক শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। ইতিপূর্বেই বলেছি, সামাজিক সচলতার প্রকৃতিটি আঞ্চলিক। প্রথমত, অঞ্চলগত অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েই গোষ্ঠীগুলির উত্থান। দ্বিতীয়ত, একটি অঞ্চলে গোষ্ঠীর মর্যাদাবৃদ্ধি অপর অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মর্যাদাবৃদ্ধি করে না। বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানকারী একই গোষ্ঠীর সামগ্রিক এবং ঐক্যবদ্ধভাবে মর্যাদাবৃদ্ধির প্রয়াস শুরু হয় আরও পরে; ঔপনিবেশিক পর্বে। রাঢ়ের এই তিনটি গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার অনুসন্ধান

আমরা করতে চেয়েছি প্রাসঙ্গিক সাহিত্য, পুরালেখ, বিদেশি পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রশাসনিক নথি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে।

আমাদের গবেষণা প্রশ্ন—

১. অঞ্চলগত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে একটি গোষ্ঠী সামাজিক সচলতা লাভ করতে পারে? পরিবর্তনের কারণ, তীব্রতা এবং অভিব্যক্তি কেন সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া নিরূপণে জরুরি?

২. খ্রিস্টীয় ষোড়শ- খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের বর্ণজাতিকাঠামোয় কেন এবং কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে?

৩. বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় কেন এবং কীভাবে সামাজিক সচলতায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে?

৪. বঙ্গদেশে নির্দিষ্ট সময়পর্বে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলির কাছে সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য ইসলাম ধর্মগ্রহণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট বর্ণজাতিকাঠামোর মধ্যে মর্যাদাবৃদ্ধি ও উত্থানের প্রয়াস আকর্ষণীয় হল কেন?

৫. বৈষ্ণবধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ার যোগ কীভাবে ঘটছে?

এই গবেষণা ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত বাদে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বর্ণজাতিকাঠামো চর্চার বিভিন্ন পদ্ধতিগত দিক আলোচিত। সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন পাঠপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পাঠপদ্ধতি নির্মাণ করতে

চেয়েছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুটি উপবিভাগ — সামাজিক সচলতার ভারতবর্ষীয় প্রবণতা ও বঙ্গদেশীয় প্রবণতা। ভারতবর্ষের মত বিপুলায়তন ভূখণ্ডের বর্ণজাতিব্যবস্থার ধারাবাহিক আলোচনা বর্তমান পরিসরে সম্ভব নয়। জাতপাতের আঞ্চলিক রূপভেদগুলিকে বিবেচনার মধ্যে আনলে তো ব্যাপারটা আরও দুরূহ। উপরন্তু, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বর্ণজাতিব্যবস্থার উদ্ভবলগ্নকে যদিও বা চিহ্নিত করা যায়, ব্যবস্থাটির কোন পরিসমাপ্তিকাল চিহ্নিত করা অসম্ভব। নতুন নতুন গোষ্ঠী দীর্ঘদিন জাতের চেহারা নিয়েছে, সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়াটিও চলছে নিয়মিতভাবেই। এদিক থেকে বর্ণজাতিব্যবস্থা পুরোদস্তুর জায়মান। আমরা তাই এই আলোচনায় ধারাবাহিক বিবরণের বদলে ভারতবর্ষে বর্ণজাতিব্যবস্থা ও সামাজিক সচলতার বিবর্তনের ধারা ও প্রবণতাগুলিকে দেখেছি। বঙ্গদেশের বর্ণজাতিব্যবস্থা ও সামাজিক সচলতা আমাদের মূল আলোচ্য। এক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে আমরা প্রাক-চৈতন্যযুগ পর্যন্ত কালপর্বকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে, সুবর্ণবণিকদের সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া আমাদের অন্বিষ্ট। সপ্তগ্রাম বন্দরের সূত্রে আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করে সুবর্ণবণিকরা কীভাবে নিত্যানন্দ পরম্পরার মাধ্যমে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা পেতে চাইলেন—তা আমরা সবিস্তারে দেখিয়েছি। আমরা লক্ষ করেছি, উনিশ শতকে সুবর্ণবণিকের 'বৈশ্যত্ব'এর প্রকল্পও। চতুর্থ অধ্যায়ে, বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে মল্লরাজাদের সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়াটি খতিয়ে দেখা হয়েছে। রাজবংশের সামাজিক সচলতার অভিব্যক্তির সঙ্গে সাধারণ গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার অভিব্যক্তিগত পার্থক্যও এই অধ্যায়ে আলোচিত। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখতে চেয়েছি কীভাবে সদ্‌গোপরা আর্থিক প্রতিপত্তি আর জমিদারির সঙ্গে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদাকে জুড়ে নিয়ে নিজেদের অবস্থান আরও পাকাপোক্ত করতে চেয়েছেন। সদ্‌গোপ সমাজের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঝোঁকটি এই অধ্যায়ে লক্ষণীয়। সামাজিক সচলতা অভিলাষী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কীভাবে

বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন শাখার মিথোজীবিতার সম্পর্ক তৈরি হয়—তা এই 'কেস স্টাডি' গুলিতে আমাদের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

এই গবেষণার অন্যতম সীমাবদ্ধতা—এই আলোচনা মূলত রাঢ়কেন্দ্রিক। যে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে সামাজিক সচলতার জন্ম আমরা রাঢ় অঞ্চলে লক্ষ করেছি, বরেন্দ্র বা সমতটের মতো উপ-অঞ্চলের ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা অন্যান্য 'কেস স্টাডি'র মাধ্যমে পরখ করে দেখার সুযোগ আছে। দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টীয় ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশের প্রধান ধর্মমত বৈষ্ণবধর্মের সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের রূপটিই আমরা কেবল বিচার করেছি। বঙ্গদেশের শাক্ত বা শৈবধর্মের সঙ্গে সামাজিক সচলতার যোগাযোগ বা শাক্ত-শৈব ধর্মের সামাজিক সচলতা সম্বন্ধে দার্শনিক ও প্রায়োগিক অবস্থান স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হতে পারে। তৃতীয়ত, বঙ্গদেশের মতো যেসমস্ত অঞ্চলে (দক্ষিণ ভারতের কিছু প্রদেশ ইত্যাদি) দ্বিবর্ণ বিভাজিত জাতিকাঠামো প্রচলিত, সেই সব অঞ্চলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ার সঙ্গে বঙ্গদেশের সামাজিক সচলতার তুলনামূলক আলোচনাও পরবর্তী গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া সম্ভব। পরবর্তী সময়ে এই ভাবনাসূত্রগুলিকে বিকশিত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক সচলতা ও বর্ণজাতিকাঠামো: পাঠপদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা

অধ্যায়: ১

সামাজিক সচলতা ও বর্ণজাতিকাঠামো: পাঠপদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা

ভারতীয় সমাজের স্থাণুত্ব সম্পর্কিত একরকম ধারণা ঔপনিবেশিক আমলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *The History of British India* বইতে জেমস মিল বেশ জোরের সঙ্গেই একথা বলেন।[১] এই স্থাণুত্বের ধারণা আরো জোরদার হয় ভারতীয় সমাজের সময় সম্পর্কিত ধারণাকে কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই মনে করা হতে থাকে ভারতীয় সমাজ বৃত্তাকার সময়ের (cyclic time) ধারণায় বিশ্বাসী। আবর্তনশীল চক্রকার সময়ে পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এখানেই দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত রৈখিক সময়ের (linear time) সঙ্গে বৃত্তাকার সময়ের তফাৎ। আবদ্ধ বৃত্তাকার সময়কে সেযুগের চোখে খুবই 'অপ্রীতিকর' বলে মনে হত। উল্টোদিকে রৈখিক সময়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল উনিশ শতকীয় 'প্রগতি'র ধারণা। ভারতীয় সমাজে বৃত্তাকার সময়ের ধারণার অস্তিত্বে জেমস মিলের বিশ্বাস ছিল।[২] সেই সূত্রেই জেমস মিল ভারতীয় সমাজের স্থবিরতা বিষয়ে নিশ্চিত হন। অবশ্য একা মিল নন, কার্ল মার্ক্সের লেখাতেও আমরা পাচ্ছি একইরকম ধারণা। নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে মার্ক্স লেখেন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বদল হয়ে থাকলেও অনাদি অতীত থেকে ভারতের সামাজিক অবস্থা একেবারে অপরিবর্তিত। উনিশ শতকের

---

[১] James Mill, *The History of British India*, London, 1826

[২] রোমিলা থাপার, *সময়: ইতিহাসের রূপক প্রাচীন ভারত*, কলকাতা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রথম বাংলা সংস্করণ, ২০১৮, পৃ. ৫-৬

শুরুর দশকগুলিতে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রে ভারতের সামাজিক অবস্থায় একটা বদল আসে।[৩] জেমস মিলের মতে ভারতীয় সমাজের স্থাণুত্বের একটা জোরালো নিদর্শন ভারতবর্ষীয় বর্ণজাতিব্যবস্থা। ভারতীয় বর্ণজাতিব্যবস্থা সম্পর্কে মিলের ধারণা তৈরি হচ্ছে কীভাবে? ভারতীয় বর্ণজাতিব্যবস্থার আলোচনায় তিনি মূলত প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের (orientalist) উপর মিল খুব সন্তুষ্ট নন, কিন্তু জাতপাতের আলোচনায় মিল তাদের মতই ভারতীয় শাস্ত্রকে মান্যতা দিয়েছেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত উইলিয়ম জোন্স-কৃত *মনুসংহিতা*-র অনুবাদটি এক্ষেত্রে জেমস মিলের প্রধান অবলম্বন।[৪] ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে এলফিনস্টোন দু'খণ্ডে তাঁর ভারতবিষয়ক বইটি প্রকাশ করেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতপাতের প্রশ্নে কিছু পরিবর্তন এলফিনস্টোনের চোখে পড়ে। তিনি দেখেন, ব্রাহ্মণরা অনেকেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশার বদলে অন্যান্য পেশায় যুক্ত। কিন্তু, শাস্ত্রের বাইরে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে এলফিনস্টোন তাঁর রচনার প্রধান অবলম্বন করে তোলেননি। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগুলিই তাঁর আলোচনার প্রধান ভিত্তি। সম্ভবত, অঞ্চলভেদে ভারতীয় সমাজের বাস্তব চিত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ফারাক এবং ভারতীয় সমাজকাঠামো আর সামাজিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ইংরেজদের স্বল্প জ্ঞানের দরুণ শাস্ত্রকেই তাঁরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৫] ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা এই যুগের ইংরেজ লেখকদের মধ্যে একটা একপেশে ধারণার জন্ম দেয়। অনুশাসনাত্মক ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের নিরিখে সমাজকে দেখতে চাওয়ায় সমাজের একটা স্থবির ছবি ধরা পড়াই স্বাভাবিক। অনুশাসনাত্মক গ্রন্থ নির্ভর বর্ণজাতিব্যবস্থার স্থবির চিত্র ভারতীয় সমাজে

[৩] Karl Marx, The British Rule in India, New York Tribune, 1853, মার্ক্সের এই মত সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দেখুন, Pragyan Choudhary, 'Caste Mobility and Social Transformation in Medieval India c. 9th to 16th century: Case Studies of Some Peasant Communities (Jats, Meos and Vellalas)', unpublished Ph.D. thesis submitted at Jawaharlal Nehru University, 2009, p. 4

[৪] Nicholas B. Dirks, *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India*, New Delhi: Permanent Black, 1st Indian Edition, 2001, p. 34

[৫] তদেব, পৃ.-৩৬-৩৭

পরিবর্তনের যাবতীয় নিদর্শনকে নাকচ করেছে এবং নির্মাণ করেছে উনিশ শতকীয় 'প্রগতি'র ধারণার নিরিখে এক 'অপর'কে।

অনুশাসনমূলক গ্রন্থের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের পাঠকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত পদ্ধতিগত তর্ক তৈরি হয়েছে, লুই দুমোঁর *Homo Hierachicus: The Caste System and Its Implications* (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, প্রথম ইংরেজি অনুবাদ ১৯৭০ খ্রি.) এর সূত্রে সেবিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বিশ শতকের শেষার্ধে প্রকাশিত এই গবেষণা ভারতীয় বর্ণজাতিব্যবস্থার আলোচনায় আলোড়ন ফেলে দেয়। দুমোঁ ভারতীয় বর্ণজাতিকাঠামোকে বুঝতে চেয়েছেন শুচি (pure) আর অশুচি (impure)-র বিপরীতকোটিক বিন্যাসে। শুচি-অশুচির এই বিপরীত কোটির সূত্রেই আসছে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের (hierarchy) ধারণা। ফলত সামাজিক মর্যাদায় শুচি অশুচির তুলনায় উচ্চতর অবস্থানে তো আছেনই, উপরন্তু এই শুচিতা ধরে রাখার প্রয়োজনেই দুই গোষ্ঠীর পার্থক্য বজায় রাখার সামাজিক আয়োজন। পার্থক্য সৃষ্টির একটা বড়ো মাধ্যম প্রত্যেক জাতের জন্য পৃথক পেশার নির্দিষ্টকরণ।[৬] ধর্মশাস্ত্রমতে, প্রত্যেকটা জাতের জন্য পেশা নির্দিষ্ট; আর প্রত্যেক পেশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শুচি-অশুচির ধারণা। দুমোঁ বর্ণজাতিব্যবস্থার মধ্যে একটি মতাদর্শ (ideology) অন্বেষণ করতে চান। বর্ণজাতিব্যবস্থাকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি অন্তর্লীন কাঠামো (structure)-এর অনুসন্ধান সমাজতত্ত্বের অবয়ববাদী (structuralist) ঘরানার অংশ। ব্রাহ্মণ্য বর্ণজাতিব্যবস্থাকে বোঝার ক্ষেত্রে দুমোঁ মতাদর্শকে আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এদিক থেকে দুমোঁর আলোচনাকে অনেকবেশি শাস্ত্রনির্ভর মনে হতে পারে। যদিও প্রথম যুগের ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের সঙ্গে দুমোঁকে এই কারণে ঠিক একই সারিতে বসিয়ে দেওয়া যায় না। দুমোঁ

[৬] Louis Dumont, *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications*,New Delhi: Oxford University Press, 1st Indian Edition, 1988, p.43

ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যেও নজর দিয়েছেন, কিন্তু সমাজকাঠামোর বাস্তব ও আঞ্চলিক রূপগুলির তুলনায় মতাদর্শের শাস্ত্রীয় চেহারাতেই তাঁর ঝোঁক বেশি।[৭] দুমোঁ নিজেও তাঁর বইতে এবিষয়ে জবাব দিয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন জাতপাতের যাবতীয় প্রকারভেদ বুঝতে শুচি-অশুচির ধারণার সফল প্রয়োগ সম্ভব নয়—এমন একটা আপত্তি উঠে আসছে। বিশেষত জাতপাতের বিন্যাস অঞ্চলভেদে আলাদা এবং কখনও কখনও শুচিতার তুলনায় অন্য বিষয়গুলি এক্ষেত্রে নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে। এই আপত্তি খণ্ডন করে দুমোঁ বলছেন অঞ্চলভেদে জাতপাতের বিন্যাসগত বিভিন্নতা যতই হোক না কেন এবং যতই অন্যান্য নির্ধারক থাকুক না কেন, যাবতীয় নির্ধারকই শেষ অবধি শুচি-অশুচির মৌল বিরোধমূলক অবস্থানে উপনীত হয়।[৮] আন্দ্রে বেতেইয়ের আপত্তি ছিল জাতপাতের আঞ্চলিক উপবিভাগ সৃষ্টিকে দুমোঁর আপেক্ষিক শুচিতার তত্ত্ব দিয়ে পড়ে ফেলা মুশকিল। এপ্রসঙ্গে দুমোঁ জানান, তিনি আপেক্ষিক শুচিতাকে জাতপাতের বিভাগ বা উপবিভাগ সৃষ্টির কারণ (cause) হিসাবে দেখতে চান না। বরং, শুচি-অশুচির বিপরীতকোটিক অবস্থান তাঁর মতে জাতপাতের বিন্যাসটির রূপ (form)।[৯] অনেকে মনে করেন, জাতপাতের মতাদর্শগত রূপটি বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় কি না সেই প্রসঙ্গ দুমোঁর বইতে গৌণ বিচার্য বিষয়। এঁদের যুক্তি, ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক তথ্য দুমোঁ ব্যবহার করেন দুটি কারণে। এক, দুমোঁর বিচারে মতাদর্শ বর্ণজাতিব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে না, ঠিক যেমন সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয় কেবল ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক তথ্যের সাহায্যে। এই দুইয়ের সংশ্লেষকে তিনি কখনও কখনও ব্যবহার করতে চেয়েছেন তাঁর বইতে। দুই, তাঁর

---

[৭] T.N.Madan, ‘Introduction’, On the Nature of Caste in India A Review Symposium on Louis Dumont’s *Homo Hierachichus*, Contributions to Indian Sociology, Vol.5, 1971, p. 9

[৮] Louis Dumont, *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications,* pp. 44-45

[৯] তদেব

মূল যুক্তিক্রমটি স্পষ্ট করার কাজেও দুমোঁ কখনও কখনও ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল।[১০]

অনুশাসনাত্মক গ্রন্থের ভিত্তিতে দুমোঁ শুচি-অশুচির যে বিপরীত যুগ্মকটির কথা বলছেন, সেই মতাদর্শটি অনুশাসনাত্মক গ্রন্থের নিরিখে কতদূর ঘাতসহ? বিবাহ আর মৃত্যু সংক্রান্ত আচারকে যদি শুচি- অশুচির তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে দেখি তাহলে মনে হবে যে মৃত্যু সংক্রান্ত আচার অশৌচ ধারণার কারণেই অশুচিতার সঙ্গে যুক্ত। বিবাহ ঠিক তার বিপরীত, শুচি। অথচ পি.ভি. কানের গবেষণা থেকে দেখছি নারায়ণভট্টের *অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি* মৃতদেহ সৎকারের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বিবাহের পাত্র সংক্রান্ত আচার-ক্রিয়ার আশ্চর্য মিল![১১] দুমোঁর মতের নিরিখে দেখলে বিভ্রম তৈরি হওয়া স্বাভাবিক যে কীভাবে বিবাহের পাত্রকেন্দ্রিক আচার কিছুদূর অবধি অশুচিতার সঙ্গে যুক্ত সৎকারকেন্দ্রিক আচারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে? এই তথ্যগুলি কি আদৌ দুমোঁর মতের সঙ্গে খাপ খায়? ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকেও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অনুরূপ ধারণা। দক্ষিণ ভারতের কুর্গদের নিয়ে গবেষণাতেও শ্রীনিবাস দেখতে পান বিবাহ ও সৎকার অনুষ্ঠানের আচারবিধির বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মিল।[১২] বর্ণজাতিকাঠামোয় শুচি-অশুচির যে অবস্থানগত, আচারগত পার্থক্যের কথা দুমোঁ বলেছিলেন তা এক্ষেত্রে রক্ষিত হচ্ছে না। বরং, বিভিন্ন আচার বা অনুষ্ঠান ক্রিয়ায় 'উঁচু' ও 'নিচু' জাতের পারস্পরিক অংশগ্রহণ দেখা যায়। ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের শীর্ষে থাকা ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং নিচের দিকে থাকা নাপিত দুজনেই বিবাহ ও সৎকার সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের অনিবার্য অংশ।[১৩]

---

[১০] T.N.Madan, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ.৪

[১১] Veena Das & Jit Singh Uberoi, 'The Elementary Structure of Caste', On the Nature of Caste in India A Review Symposium on Louis Dumont's *Homo Hierarchichus*, Contributions to Indian Sociology, Vol.5, 1971, p.36

[১২] তদেব, পৃ. ৩৫

[১৩] তদেব, পৃ. ৩৮

ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস (hierarchy) এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (reciprocity)-কে দুমোঁর তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজকাঠামোর পরস্পরবিরোধী মনে হলেও আদতে ভারতীয় বর্ণজাতিব্যবস্থার আলোচনায় তা কার্যকরী নয়।[১৪] বরং, ধর্মীয় অনুষ্ঠান-ক্রিয়ায় উচ্চাবচতা ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহাবস্থান দেখা যায়।

অনুশাসনাত্মক গ্রন্থকে মতাদর্শ বোঝার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় আরেকটা প্রশ্ন দুমোঁর ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনকে তিনি কীভাবে দেখছেন? *Homo Hierarchicus*-এর একাদশ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গটি বিশদে আলোচিত। দুমোঁ জানাচ্ছেন ভারতবর্ষে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে, চাষযোগ্য জমি আর শ্রমিকের অনুপাতেও বদল এসেছে অনেকখানি। অর্থের প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, পরিবহন ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধিও লক্ষণীয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেকখানি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা নির্ভর। তথাপি দুমোঁ লক্ষ করেন সমাজে কিছু বদল (change *in* society) হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সমাজের কোন বদল (change *of* society) হয়নি।[১৫] বদলের প্রসঙ্গটি যেভাবে দুমোঁর লেখায় এসেছে তাতে বোঝা যায় তিনি ভারতীয় সমাজে একইসঙ্গে স্থবিরতা ও পরিবর্তনের অভিমুখ দেখছেন। এখানেই দুমোঁ প্রথম যুগের ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের থেকে আলাদা হয়ে যান। একইসঙ্গে তিনি অতিক্রম করে যান ঐতিহ্যবাহী (traditional) ও আধুনিক (modern) সমাজের ধ্রুপদী দ্বিকোটিক বিন্যাস। দুমোঁ এও বলেন আধুনিকতার অভিমুখে এই পরিবর্তনের কেন্দ্রভূমি বলা যেতে পারে চারটি পুরুষার্থের অন্যতম 'অর্থ' (political-economic domain)-কে। আবার ভারতীয় সমাজে একইসঙ্গে স্থিতিশীলতা রক্ষা

[১৪] তদেব, পৃ. ৪০

[১৫] Louis Dumont, *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications*, pp.217-218

করে যাচ্ছে আরেকটি পুরুষার্থ 'ধর্ম'(domain of religion and ritual status)।[১৬] দুমোঁর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধেও আপত্তি উঠেছে। একটা মত হল, দুমোঁ কিছুটা যেন প্লেটোর ঢঙেই বলেছেন যাবতীয় পরিবর্তনই মায়া; কারণ বাস্তব শাশ্বত ও অনাদি।[১৭] এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই দ্বিতীয় মত হল, অনুশাসন ও বাস্তব ঘটনাবলী একটি বিশেষ সময়ে অস্তিত্বসম্পন্ন এবং এগুলির বদল ও স্থায়িত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। দুমোঁ ভারতীয় সমাজের আদর্শ কাঠামো নির্মাণ করতে গিয়ে আদতে ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমকে এবং সময়ের গুরুত্বকে তাঁর লেখায় বেশ গুরুত্বহীন করে দেন। পাশাপাশি, পরিবর্তনের সঙ্গে 'অর্থ' আর স্থায়িত্বের সঙ্গে 'ধর্ম' নামক পুরুষার্থকে যুক্ত করে এবং এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতা লক্ষ করে দুমোঁ আসলে অস্বীকার করেন এই দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের সম্ভাবনাকে।[১৮] বর্তমান গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা লক্ষ করব 'ধর্ম' আর 'অর্থ' এর এই বিচ্ছিন্ন অবস্থানের ধারণা বাস্তবে কার্যকরী নয়। খেয়াল করা দরকার, প্রথমত, দুমোঁর বিরুদ্ধ আপত্তিগুলির নির্যাস কেবল অনুশাসনাত্মক গ্রন্থের উপর ভিত্তি না করে অন্যান্য তথ্যসূত্রের উপর ভরসা করার কথা বলে। দ্বিতীয়ত, জাতপাতের আঞ্চলিক ভেদগুলিকে কেবল ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের শুচি-অশুচির বড় খোপে এঁটে দিতে চায় না। তৃতীয়ত, মনে করে 'সময়' জাতপাতের পরিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি বক্তব্যই আমাদের পরবর্তী আলোচনায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অনুশাসনমূলক গ্রন্থ অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির বাইরে তাকালে ভারতীয় বর্ণজাতিকাঠামোতেও একরকমের সচলতা বা গতিময়তা চোখে পড়ে। যে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের কথা দুমোঁ তাঁর রচনায় বারবার বলেছেন সেই স্তরভেদের

[১৬] Milton Singer, 'Modernization or Traditionalization', On the Nature of Caste in India A Review Symposium on Louis Dumont's *Homo Hierachicus*, Contributions to Indian Sociology, Vol.5, 1971, p.52

[১৭] T.N.Madan, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ১২

[১৮] Milton Singer, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৫৫

(stratification) অনিবার্য অংশ সচলতা বা গতিময়তা (mobility)। সমাজ মাত্রেই স্তরবিন্যস্ত, আর সেদিক থেকে প্রতিটি সমাজেই সচলতা বা পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও নিদর্শন উপস্থিত। স্থাণু সমাজের কল্পনা এই তাত্ত্বিক প্রস্থানে প্রশ্রয় পায় না। অনুশাসনমূলক গ্রন্থগুলি একরকম আপাত-স্থাণুত্বের কথা বলে বলেই ভিন্ন তথ্যসূত্র ও পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের প্রয়োজন। ভারতীয় বর্ণজাতিব্যবস্থার আলোচনায় সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিকরা বারবার সেই পদ্ধতির পক্ষে সওয়াল করেছেন। প্রতিটি বিদ্যাশৃঙ্খলের (academic discipline) অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে, যোগাযোগও আছে। পরবর্তী আলোচনায় ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট হবে।

সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থানের বদলকে সামাজিক সচলতা বা social mobility বলে মনে করা হয়। পিত্রিম.এ.সরোকিন *Social and Cultural Mobility* (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯ খ্রি.) বইতে লিখেছেন প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক সচলতা দু'রকমের—আনুভূমিক (horizontal) এবং উল্লম্ব(vertical)। একই পদমর্যাদায় চাকরির বদল, এক দেশের নাগরিকত্ব থেকে অন্য দেশের নাগরিকত্ব ইত্যাদিকে আনুভূমিক সামাজিক সচলতা বলে মনে করা হয়। আবার, সমাজের এক স্তর থেকে অপর স্তরে উন্নতি বা অবনতি উল্লম্ব সামাজিক সচলতা। স্বাভাবিকভাবেই উল্লম্ব সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে দুটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়- ঊর্ধমুখী (upward social mobility) ও অধোমুখী (downward social mobility)।ঊর্ধমুখী বা অধোমুখী সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে দুটি ঘটনা ঘটতে পারে—এক, কোন বিশেষ ব্যক্তি একটি সামাজিক স্তর থেকে অপর সামাজিক স্তরে উন্নত বা অবনত হতে পারে। দুই, কোন একটি গোষ্ঠী যূথবদ্ধভাবে একটি উচ্চতর বা নিম্নতর

মর্যাদা সম্পন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।[১৯] সরোকিন এরপরেই তুলে আনেন প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার প্রসঙ্গ। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত স্বীকার করে সরোকিন জানান, ভারতবর্ষের সমাজকাঠামোয় ব্রাহ্মণদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ ছিল না। ক্ষত্রিয়দের দাপট ছিল যথেষ্ট। সে দাপট কিছুটা খর্ব করে ব্রাহ্মণদের সমাজকাঠামোয় সর্বোচ্চ স্থান পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এই ইতিহাস যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে বলতেই হচ্ছে একটি গোষ্ঠীর সার্বিক উল্লম্ব সামাজিক সচলতার প্রকাশ ঘটেছে এই ঘটনায়।[২০] প্রাচীন ভারতের সমাজকাঠামোয় সচলতাকে স্বীকার করে সরোকিন বুঝিয়ে দেন ভারতের বর্ণজাতিকাঠামোর আলোচনার ধরনে বদল আসছে। বদলে যাচ্ছে 'স্থাণু' ভারতের ধারণা। সরোকিন বলেন তাত্ত্বিক ভাবে যদি সম্পূর্ণ অচল আর প্রবল গতিময়, সচলতা সম্পন্ন দুটি বিরোধী সমাজকাঠামোর কথা স্বীকার করা যায়, তাহলে ভারতবর্ষের বর্ণজাতিকাঠামোকে অনেকেই হয়তো প্রথম ধরনের সমাজের অংশ বলে মনে করবেন। অথচ, ঐতিহাসিকভাবে দেখা যাচ্ছে, আপাত-স্থবির এই কাঠামোতেও সামাজিক সচলতার নিদর্শন রয়েছে। অত এব, কোন স্তরবিন্যস্ত সমাজই সম্পূর্ণ স্থবির হতে পারে না।[২১] সরোকিনের তাত্ত্বিক পরিভাষা ধার করে বলতে পারি বর্তমান গবেষণায় সামজিক সচলতার গোষ্ঠীগত এবং উল্লম্ব রূপটিই আমাদের বিচার্য। সরোকিনের লেখায় ভারতীয় বর্ণজাতিকাঠামোর সামাজিক সচলতার স্বীকৃতি থাকলেও তার তীব্রতা বা গভীরতা নিয়ে কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতে উল্লম্ব সামাজিক সচলতা খুবই দুর্বল।[২২] পরবর্তী গবেষণায় এই ধারণাটিকেও বদলে যেতে দেখব।[২৩]

---

[১৯] Pitrim A. Sorokin, *Social and Cultural Mobility*, Illinois: Free Press, 1st Published, 1959, pp.133-134

[২০] তদেব, পৃ. ১৩৪

[২১] তদেব, পৃ. ১৩৭-১৩৯

[২২] তদেব, পৃ. ১৩৯

[২৩] ঐতিহাসিক বার্টোন স্টেন মনে করেন মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজে ধারাবাহিকভাবে সামাজিক সচলতার বিপুল প্রসার লক্ষ করা গেছে। স্টেনের এই মত উদ্ধৃত করেছেন M.N.Srinivas, *Social Changes in Modern India*, New Delhi: Orient BlackSwan, Reprint, 2016,p.30

১৯৫২ সালে এম.এন.শ্রীনিবাসের বিখ্যাত গবেষণা *Religion and Society Among the Coorgs of South India* প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতার আলোচনা নতুন মোড় নেয়। পেশায় সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ শ্রীনিবাস এই বইতে সংস্কৃতায়ন (sanskritization)-কে সামাজিক সচলতার একটি মাধ্যম হিসাবে দেখান। সংস্কৃতায়নকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীনিবাস বলেন, এই প্রক্রিয়ায় তথাকথিত নিচু জাতির লোকেরা 'উঁচু' জাতির আচার-অনুষ্ঠান, মতাদর্শ, জীবনচর্যা অনুসরণ করার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য স্থানীয় সামাজিক স্তরবিন্যাসে উচ্চতর অবস্থান লাভ।[২৪] সংস্কৃতায়নের তত্ত্বটি কেবল ভারতীয় সমাজে সচলতার অস্তিত্বের ধারণাকে জোরদার করে না, একইসঙ্গে অনুশাসনমূলক গ্রন্থ নির্ভর ভারতীয় সমাজের পাঠকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। শ্রীনিবাস লেখেন, চতুর্বর্ণকাঠামো অনুযায়ী সমাজে প্রত্যেকের অবস্থান সুনির্দিষ্ট। অথচ, কার্যক্ষেত্রে সমাজে চতুর্বর্ণের অন্তর্গত জাতিগুলির সামাজিক স্তরবিন্যাসে অবস্থান মোটেই ততটা নিশ্চিত নয়। বর্ণকাঠামোর শীর্ষে থাকা ব্রাহ্মণের হাত থেকে জল নিতে অস্বীকার করছে বর্ণকাঠামো বহির্ভূত হরিজনরা—এমন ঘটনা বর্ণকাঠামোসম্মত না হলেও বাস্তবে ঘটেই থাকে।[২৫] প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে সামাজিক সচলতা লাভের অন্যতম মাধ্যম ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থার নমনীয়তা এবং চাষযোগ্য জমির সদ্ব্যবহার।[২৬] উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত পরিবহন পথ, আধুনিক অস্ত্র ও প্রযুক্তির অভাবে ভারতের মত বড়ো দেশে একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন কাজ ছিল। ফলত, কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কর প্রদানকারী সামন্তরা অনেকসময়ই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে জাঁকিয়ে বসত। মহারাষ্ট্রে

---

[২৪] M.N.Srinivas, *Social Changes in Modern India*, p.6

[২৫] তদেব,পৃ. ৪

[২৬] M.N.Srinivas, 'Mobility in the Caste System', *Structure and Change in Indian Society*, ed. by Milton Singer & Bernard S. Cohn, Jaipur: Rawat Publications, 1st Published, 1996, p. 189

শিবাজীর উত্থানকে এইভাবে দেখা যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটের বিভিন্ন অংশেও এই ধরনের উদাহরণ অজস্র।[২৭] পানিক্করের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে বিখ্যাত রাজবংশগুলির অধিকাংশই আদতে ক্ষত্রিয় নয়; রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে তারা ক্ষত্রিয় মর্যাদা দখল করেছে। দক্ষিণ ভারতের ভেল্লালা, নায়ার, গুজরাটের পাতিদার, বাংলার পাল রাজাদের কথা এপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এই বংশগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি নিজেদের পূর্বতন আচার-অনুষ্ঠানকে ঢেলে সাজিয়েছে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের আদর্শ অনুসারে।[২৮] অবশ্য সবসময় উচ্চতর মর্যাদা লাভের প্রয়াস খুব সফল হয় না। ব্রিটিশ ভারতে নতুন নতুন কাজের সুযোগকে ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি জাত বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। যেমন: উত্তরপ্রদেশের পূর্ব ভাগের নোনিয়া বা গুজরাটের সুরাট উপকূলের কোলিরা। অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জনের পাশাপাশি তাঁরা তৎপর হয়ে ওঠেন উপবীত ধারণ, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে 'দ্বিজ'দের সমকক্ষ হয়ে ওঠার। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রভাবশালী বা প্রধান জাতগুলি তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে ভালো চোখে নেয়নি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জাতগুলির উপর তাঁরা শারীরিক অত্যাচার চালান এবং অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করে তাঁদের সামাজিক সচলতার রাস্তা বন্ধ করে দেন।[২৯] 'The Dominant Caste in Rampura' প্রবন্ধে শ্রীনিবাস মহীশূর থেকে ২২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত রামপুরা গ্রামে সমাজকাঠামোয় কৃষক সম্প্রদায় (ওক্কালিগা)-এর দাপট প্রসঙ্গে এবিষয়ে আরও কয়েকটি কথা বলেন। তাঁর মতে, স্থানীয় স্তরে আধিপত্য তৈরি করার জন্য অনেকগুলি উপাদান প্রয়োজন। এক, সংশ্লিষ্ট জাতটির সংখ্যাগরিষ্ঠতা; দুই, স্থানীয় স্তরে অন্য জাতগুলির তুলনায় অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দাপট। তিন, ব্রিটিশ শাসনপর্বে কোন একটি অঞ্চলে একটি জাতের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত, চাকুরিজীবী লোকের অস্তিত্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠার

---

[২৭] তদেব

[২৮] তদেব, পৃ. ১৯০

[২৯] তদেব,পৃ. ১৯৩

একটি অংশ। উপরন্তু, স্থানীয় জাতিবিন্যাসে জাতটির অবস্থান যদি খুব নিচু না হয়, তাহলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজ আরও সহজ হয়ে যায়।[৩০] শ্রীনিবাস আরও খেয়াল করিয়ে দেন স্থানীয় স্তরে আধিপত্যবিস্তারকারী জাতগুলি বড়োজোর সংশ্লিষ্ট গ্রাম ও প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে প্রভাবশালী। পার্শ্ববর্তী গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে যদি জাতগুলিকে একটি বা দুটি জেলায় আধিপত্য দেখাতে দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে স্থানিক বৃত্তের বাইরে এদের একটা আঞ্চলিক দাপট আছে।[৩১] একই জাত এক গ্রামে প্রভাব বিস্তার করেও পাশের গ্রামে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসে অপেক্ষাকৃত নিচে অবস্থান করতে পারে এমন উদাহরণও দুর্লভ নয়।[৩২] রামপুরা গ্রামেও যেমন দেখছি কৃষক ওক্কালিগারা ব্রাহ্মণ বা লিঙ্গায়েতদের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন। অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির উৎস এক্ষেত্রে ভূম্যধিকার। গ্রামের বিভিন্ন বিবাদ নিষ্পত্তিতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাঁদেরই। গ্রামের একটা বড়ো অংশ অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। ওক্কালিগারা অবশ্য তাঁদের উন্নতি বা মর্যাদা প্রতিহত করতেই আগ্রহী। সংখ্যাতত্ত্বও অন্ত্যজ মানুষগুলির মর্যাদাবৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারেনি।[৩৩]

ওক্কালিগাদের মতো গোষ্ঠীগুলির আর্থিক ও সামাজিক স্তরমর্যাদার উন্নতি ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের শাস্ত্রীয় চেহারায় বদল আনে নিঃসন্দেহে। লক্ষণীয়, শাস্ত্র যেখানে সর্বভারতীয় বা অন্ততপক্ষে আঞ্চলিক পরিসরকে মাথায় রেখে কথা বলে, সেখানে এই পরিবর্তনগুলি একেবারেই স্থানীয় স্তরের। দ্বিতীয়ত, শ্রীনিবাস একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই বদলগুলি জাতিকাঠামোর ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসে কতকগুলি অবস্থানগত বদল (positional

---

[৩০] M.N.Srinivas, 'The Dominant Caste in Rampura', American Anthropologist, New Series, Vol.61, No.1, 1959, p.1

[৩১] তদেব

[৩২] তদেব, পৃ. ৪

[৩৩] তদেব

change) আনলেও কোন কাঠামোগত বদল (structural change) আনে না।[৩৪] ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস বা hierarchy সামাজিক সচলতা বা mobility এর প্রাক্‌শর্ত। সুতরাং, এখানে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওঠা-নামার মাধ্যমে কেবল অবস্থান্তরই সম্ভব। ভারতীয় বর্ণজাতির কাঠামোয় পরিবর্তনের যে ছবি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে তার একটি বিশেষ চরিত্র লক্ষ করা যাচ্ছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীই স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে রাজনৈতিক ও অন্যান্য উপায়ে যে আর্থিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন তার ভিত্তিতে উচ্চতর জাতিগত মর্যাদালাভে প্রয়াসী। উচ্চতর জাতিগত মর্যাদার প্রশ্নটি আসলে ব্রাহ্মণ্য আচারবিধির অধিকারলাভের সঙ্গে যুক্ত। সেকারণেই উত্তরপ্রদেশের নোনিয়া বা সুরাট উপকূলের কোলিদের উপবীত ধারণের প্রয়াস। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেও দেখছি, আর্থিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন অথচ জাতিগত মর্যাদায় নিম্নতর অবস্থানবিশিষ্ট গোষ্ঠীগুলি নবার্জিত ধনসম্পদের সাহায্যে মন্দির নির্মাণে আগ্রহী। নবশাখ, অজলচল এবং অন্ত্যজরা পেশা পরিবর্তনের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিপত্তি অর্জন করে ভূমিব্যবস্থায় প্রভাব ফেলতে চান। জমিদারি লাভের মাধ্যমে সামাজিক পদমর্যাদা অর্জন ছিল তাঁদের লক্ষ্য। আর্থিক প্রতিপত্তির পাশাপাশি তাঁদের মন্দির নির্মাণের চেষ্টা স্থানীয় জাতিবিন্যাসে তাঁদের উচ্চতর অবস্থানলাভকে সুনিশ্চিত করে।[৩৫] বঙ্গদেশের তিলিদের কথা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তেলিদের একটা অংশ তাঁদের পৈতৃক পেশা তৈল উৎপাদন ও তৈল ব্যবসা ছেড়ে বড়োমাপের পাইকারি ব্যবসায় যুক্ত হয়। ধনদৌলতের সাহায্যে এই অংশটি নিজেদের ‘তিলি’ বলে পরিচয় দিয়ে ‘তেলি’দের থেকে উন্নত জাতিমর্যাদা দাবি করে। ‘তেলি’রা বঙ্গদেশের সমাজে অজলচল বা অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত। অথচ তিলিরা ধীরে ধীরে সৎশূদ্র বা নবশাখ পরিচিতি পায়।[৩৬] তিলি

[৩৪] M.N.Srinivas, *Social Changes in Modern India*, পৃ.৬

[৩৫] Hitesranjan Sanyal, ‘Temple Promotion and Social Mobility’, *History and Society Essays in Honour of Professor Niharranjan Ray*, ed. Debiprasad Chattopadhyay, Calcutta,: K P Bagchi & Company, 1st Published, 1978 pp.357-358

[৩৬] Hitesranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal*, Calcuta: Papyrus, 1st Published, 1981, pp. 97-98

সমাজের অন্যতম প্রধান মুখ কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণকান্ত নন্দী একবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে আটক (পুরীর দরিদ্রদের সেবার জন্য জমিদান) অর্পণ করতে গিয়ে পাণ্ডাদের থেকে বাধা পান তাঁর 'নিচু' জাতের কারণে। এই ঘটনার পরে কৃষ্ণকান্ত নবদ্বীপ ও ত্রিবেণীর প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডেকে তাঁর জাতিমর্যাদা বিষয়ক সংশয়ের নিরসন চান। পণ্ডিতেরা বিধান দেন, 'তিলি' শব্দটি এসেছে 'তুলাদণ্ডধারী তৌলিক' থেকে, অর্থাৎ তিলিরা সাধারণ তৈল উৎপাদক ও তৈল ব্যবসায়ী নন। বরং, বড়োমাপের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তুলাদণ্ডে জিনিসপত্র ওজন করা তাঁদের পেশার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। এই যুক্তিতে তাঁরা অজলচল নন, নবশাখ পর্যায়ভুক্ত এবং দেবমন্দিরে দান করার অধিকারী ।[৩৭] ভারতীয় সমাজের সচলতার ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে ধর্ম ও অর্থনীতির এই সংযোগটি বোঝা দরকার। আর্থিক প্রতিপত্তিকে পুঁজি করে ধর্মীয় আচারব্যবস্থায় উন্নত অবস্থান (higher ritual status) লাভ করলে সামাজিক সচলতায় শিলমোহর পড়ে। কেবল আর্থিক পুঁজি নয়, ধর্ম-সাংস্কৃতিক পুঁজির প্রয়োজন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নক। দুমোঁ 'ধর্ম' আর 'অর্থ'কে যেভাবে দুটি আলাদা পরিসর হিসেবে দেখে এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (reciprocity)-কে অস্বীকার করেছিলেন তা আদপেই ভারতীয় সমাজবাস্তবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ধর্ম আর অর্থনীতির সংযোগের কথা বলে আমরা অবশ্য কোন একমাত্রিক ধরনের কথা বলতে চাইছি না। সেক্ষেত্রে দুমোঁর মতই একটা অতিসরলীকৃত বক্তব্য পরিবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ভারতীয় বর্ণজাতিকাঠামোর জটিল ব্যবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে নিঃসহায় হয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা ধরে রাখা সম্ভব। বেইডেলম্যানকে উদ্ধৃত করে শ্রীনিবাস তাঁর গবেষণায় জানিয়েছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আচার এবং সংস্কারাধিকারগত অবস্থান (ritual rank) অর্থনৈতিক অধিকার নিরপেক্ষ। সেনপুর এবং রামপুরে ব্রাহ্মণরা জাট বা ঠাকুরদের তুলনায়

[৩৭] তদেব, পৃ. ১০২-১০৩

অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই কম ক্ষমতাশালী। কিন্তু গ্রামের সকলেই একমত হবেন যে, আচার-সংস্কার অধিকারে ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ পদে আসীন। সেই ক্ষমতার জোরেই ব্রাহ্মণরা চাইলে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিশালী নিচু জাতের হাত থেকে রান্না করা খাবার এবং অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করতে পারে।[৩৮]

সামাজিক সচলতার আলোচনায় ধর্ম ও অর্থনীতির আলোচনা করার সূত্রেই সচলতার প্রশ্নে স্থানের মাত্রাটি এসে পড়েছে। 'The Dominant Caste in Rampura' প্রবন্ধে শ্রীনিবাস স্থানের গুরুত্বটি খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন। আন্দ্রে বেতেইরাও দুমোঁর বিরুদ্ধ যুক্তি হিসাবে তুলে এনেছিলেন জাতপাতের আঞ্চলিক বৈচিত্রের প্রসঙ্গটি। আলোচনার এই পর্যায়ে জাতপাতের আলোচনায় স্থানের নানাবিধ মাত্রা সম্পর্কে কথা বলা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে স্থানের তিনটি মাত্রা স্বীকৃত। স্থানের বৃহত্তম এককটিকে বলতে পারি সর্বভারতীয় (pan indian) আর ক্ষুদ্রতম এককটি স্থানীয় (local)। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখতে পারি স্থানের এক তৃতীয় একককে; যা সাংস্কৃতিক পরিসর হিসাবে সর্বভারতীয়ের তুলনায় ক্ষুদ্র ও স্থানীয়ের তুলনায় বৃহৎ। এই তৃতীয় এককটিকে বলছি আঞ্চলিক (regional)। কেবল ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকেই এই একক বিভাজন নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংস্কৃতি ও মতাদর্শের প্রশ্নও। আঞ্চলিক পরিসরে সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ বা স্থানীয় সংস্কৃতির মতাদর্শ কোনটিই অবিকৃতরূপে নেই, কিন্তু তৈরি হয়েছে দুয়েরই এক মিশ্রিত, ঈষৎ পরিবর্তিত প্রাদেশিক চেহারা।[৩৯] স্থানের নানাবিধ মাত্রাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলের ঝোঁকের রকমফের। ভারততত্ত্ববিদরা যেখানে সর্বব্যাপী সংস্কৃতকেন্দ্রিক ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণারত, সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের ঝোঁক সেখানে ভারতের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা

---

[৩৮] M.N.Srinivas, *Social Changes in Modern India*,, পৃ.১২

[৩৯] Kunal Chakrabarti, *Religious Process The Puranas and the Making of a Regional Tradition*, New Delhi:Oxford University Press, Oxford India Paperbacks,2018,p. 1

পর্যালোচনায়। আঞ্চলিক ঐতিহ্য (regional tradition) এই দুই বিদ্যাচর্চার ধারাতেই উপেক্ষিত।[৪০] ঐতিহাসিকদের মধ্যেও অবশ্য অঞ্চল (region) চর্চার প্রবণতা খুব পুরনো নয়। ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার একটি ধারা তৈরি করেছে ভারত ইতিহাসের জাতপাতবিশিষ্ট অনড় গ্রাম্য সমাজের এক সার্বিক এবং আধিপত্যবাদী (hegemonic) চিত্র। ইতিহাসচর্চার এই ধরন যেমন ভারত ইতিহাসের সহজবোধ্য, একমাত্রিক চেহারা নির্মাণ করে, ঠিক তেমনই তাতে অঞ্চলভিত্তিক বৈচিত্র তার নিজস্ব রূপ হারিয়ে একটা বড়ো ইতিহাসে মিশে যায়।[৪১] আধুনিক ইতিহাসবিদরা দেখতে চাইছেন অঞ্চল (region) কীভাবে নিছক ভৌগোলিক গণ্ডির বাইরে একটি সাংস্কৃতিক পরিসর হয়ে ওঠে, কীভাবে বিভিন্ন মতাদর্শের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নির্মিত হয় নিজস্ব চরিত্র। আঞ্চলিক ঐতিহ্যের ধরনটি চেনা গেলে জাতপাতের প্রশ্নটি বুঝতেও সুবিধা হতে পারে।

আমাদের গবেষণার প্রয়োজনে বর্তমানে আমরা বঙ্গদেশের অঞ্চল এবং আঞ্চলিক উপবিভাগ (sub regions) বিষয়ে কথা বলব। যদিও অঞ্চল (region) বলতে নিছক একটি ভৌগোলিক গণ্ডি বোঝায় না, বরং অঞ্চলকে একটি সাংস্কৃতিক একক হিসাবে দেখার প্রবণতা এবং সেই সাংস্কৃতিক পরিসর নির্মাণের ইতিহাস অনুসন্ধান[৪২] বর্তমানে ইতিহাসচর্চার একটি বিশিষ্ট ঘরানা, তবুও অঞ্চলের ইতিহাস রচনায় ভৌগোলিক গণ্ডিটিকে নিয়ে কিছু কথা বলতেই হয়। যে সাংস্কৃতিক পরিসর হিসাবে অঞ্চলকে দেখা হচ্ছে, সেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বায়ুভূত নিরালম্ব নয়, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই তা আবদ্ধ। একারণেই সাংস্কৃতিক পরিসর হিসাবে অঞ্চলের নির্মাণের ইতিহাসে ভূগোল নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন।

---

[৪০] তদেব

[৪১] Bhairabi Prasad Sahu, *The Changing Gaze Regions and the Constructions of Early India*, New Delhi; Oxford University Press, 1st Published, 2013, pp.2-3

[৪২] Kunal Chakrabarti, *Religious Process The Puranas and the Making of a Regional Tradition*, p. 288

এই প্রসঙ্গে শুরুতেই তাই ঐতিহাসিক ভূগোল (Historical Geography)- এর অবতারণা। ঐতিহাসিক ভূগোল নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি অসুবিধার কথা খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এক, অঞ্চলের বা উপ-অঞ্চলের সীমানা ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে বদলে বদলে গেছে। ক্ষুদ্র জনপদ কখনো কখনো রাজনৈতিক শক্তির সাহায্যে পার্শ্ববর্তী জনপদ গ্রাস করে আকারে বৃদ্ধি পেত।[৪৩] প্রাচীন এবং আদি মধ্যযুগের গৌড় এর নিদর্শন।[৪৪] দুই, একটি অঞ্চল বা বিশেষত উপ-অঞ্চলের একটি অংশ সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক কারণে কখনও কখনও আলাদা জনপদ হিসাবে উল্লিখিত।[৪৫] তিন, যেমস্ত তথ্যসূত্রের উপর ভরসা করে ঐতিহাসিক ভূগোল নির্মাণ করা হয়ে থাকে তাতে কোন বিভ্রান্তি থেকে গেলে পুরো বিষয়টাই অনেক জটিল হয়ে যায়। ফলত, ঐতিহাসিক ভূগোলের আলোচনা অনিবার্যত একাধিক তথ্যসূত্রের উপর নির্ভরশীল। 'বঙ্গ' নামটির ইতিহাস খোঁজার ক্ষেত্রেও একাধিক তথ্যসূত্র প্রয়োজন। *ঋগ্বেদ*- এর একটি শ্লোকের (৮.১০১.১২) এর ব্যাখ্যায় *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ (২.১.১) 'বঙ্গাবগাধাশ্চেরপাদাঃ' অংশে বঙ্গ নামক জনপদের উল্লেখ আছে।[৪৬] পাণিনির ব্যাকরণে বঙ্গভূমির বাসিন্দা তিনটি জাতি ও তাদের বিষয় (দেশ)-এর নাম পাওয়া যায়- বঙ্গ, সূক্ষ্ম, পুন্ড্র। বঙ্গের অবস্থান গাঙ্গেয় ভাটি অঞ্চলে, সূক্ষ্ম গঙ্গার পশ্চিমে, আর উজান গাঙ্গেয়ভূমি পুন্ড্র।[৪৭] একইরকমভাবে, বঙ্গদেশের একেকটি উপ-অঞ্চলের ঐতিহাসিক ভূগোলের জন্যও নানা তথ্যসূত্রের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। যেমন রাঢ়ের ক্ষেত্রে জৈন *আচারাঙ্গ সূত্র*-এ সূক্ষ্মভূমির কথা পাওয়া যাচ্ছে। বিবরণ অনুযায়ী, সূক্ষ্মভূমি রাঢ়েরই অংশ।[৪৮] বিভিন্ন সাহিত্যিক সূত্র এবং পুরালেখগুলিতে রাঢ় শব্দটির

---

[৪৩] দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত,* কলকাতা: সাহিত্যলোক,পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ.৩৮

[৪৪] Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1st Published, 1977, p.54

[৪৫] দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত,* পৃ.৩৮

[৪৬] সুকুমার সেন, *বঙ্গভূমিকা,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ ৪-৫

[৪৭] তদেব, পৃ. ৬

[৪৮] দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত,* পৃ. ৫০

উচ্চারণভেদ রয়েছে- রাঢ়, রাড়, লাট, লাঢ়, লাড় ইত্যাদি।[৪৯] *রঘুবংশ*- এর বিবরণ অনুযায়ী রঘু সূহ্মদের দেশ পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বঙ্গ জনপদ আক্রমণ করেন এবং কপিশা (কাঁসাই) নদী পেরিয়ে চলে যান কলিঙ্গে। এই বিবরণ রাঢ়ের একটা অংশের ভৌগোলিক সীমাকে কিছুটা হলেও চিহ্নিত করছে। অর্থাৎ, সূহ্মের অবস্থান অধুনা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মেদিনীপুর জেলা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের উত্তরভাগে।[৫০] *মহাভারত*- এর ভীম দিগ্বিজয় আখ্যানে সূহ্মের পাশাপাশি ভীমের বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি জনপদ বিজয়ের প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দেয় সূহ্মের থেকে সমুদ্রোপকূলের দূরত্ব খুব বেশি ছিল না।[৫১] সেদিক থেকেও সূহ্মের বর্তমান মেদিনীপুরে অবস্থানের ধারণাটি জোরদার হয়। অবশ্য এই বর্ণনাটি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাম্রলিপ্ত আর রাঢ় দুটি আলাদা জনপদ। যদিও পরবর্তী তথ্যসূত্র দণ্ডীর *দশকুমারচরিত*-এর বয়ান অনুসারে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) সূহ্মেরই অংশ। সম্ভবত, তাম্রলিপ্ত কখনো কখনো আলাদা জনপদ, আবার কখনও সূহ্মের অংশ হিসাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালপর্বে নিজের অস্তিত্ব ধরে রেখেছিল।[৫২] বিভিন্ন তথ্যসূত্রের ব্যবহার এইভাবে জনপদের সীমাবদলের ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করছে। আবার দ্বাদশ শতাব্দীর সেনরাজবংশের সভাকবি ধোয়ী ব্রহ্ম নামক জনপদের কথা বলছেন। ঐতিহাসিকদের মতে ব্রহ্ম সূহ্মেরই নামান্তর। ধোয়ীর বর্ণনায় সূহ্মদেশ গঙ্গাতীরস্থ। ধোয়ীর রচনায় বিষ্ণুমন্দির, রঘুকুলগুরু নামক সূর্য মন্দির, শিব-পার্বতীর মন্দির, বল্লালসেনের নামাঙ্কিত বাঁধের কথা আছে। ধোয়ীর বর্ণনার ভিত্তিতে অনেকের সিদ্ধান্ত তিনি আসলে সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী অঞ্চলের কথা বলছেন।[৫৩] *মহাভারত*-এর টীকাকার নীলকণ্ঠ

---

[৪৯] Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.),*History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives(up to c.1200 CE)*, Vol.1, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1st Published, 2018, p.20

[৫০] দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত*, পৃ. ৫০

[৫১] তদেব

[৫২] Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, p.46-47

[৫৩] দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত* , পৃ. ৫১

জানিয়েছেন রাঢ় আর সূক্ষ্ম অভিন্ন প্রদেশ।[৫৪] *আচারাঙ্গ সূত্র* থেকে রাঢ়ের সীমানা ছাড়াও ভূপ্রকৃতি ও জনগণের আচারব্যবহারের একটু আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। রাঢ়দেশ জঙ্গলাকীর্ণ, অধিবাসীরা অমার্জিত। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের পিছনে এই অঞ্চলের লোকরা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।[৫৫] রাঢ়ের বাসিন্দাদের ক্রূর, অমার্জিত আচরণের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়ার একটা সুযোগ আছে রাঢ়েরই বাসিন্দা মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-এর সূত্রে। রাঢ়দেশবাসীরা মুকুন্দের বয়ানে একটু রূঢ় ও অশিষ্ট প্রকৃতির। রাঢ়ের আরেক কবি ঘনরামও রাঢ়দেশবাসীদের সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলেছেন।[৫৬] রাঢ়ের ভূপ্রকৃতির বিবরণ আছে ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর *প্রশস্তি* পুরালেখতেও। এই পুরালেখ অনুসারে রাঢ় জলশূন্য, শুষ্ক অঞ্চল।[৫৭] পুরালেখের সাক্ষ্য কাজে লাগে রাঢ়ের দুটি বিভাগ বুঝতেও। দশম শতাব্দীর রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই লেখে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ়ের উল্লেখ।[৫৮] অর্থাৎ, অন্তত দশম শতাব্দী থেকেই দক্ষিণ রাঢ় আর উত্তর রাঢ় নামে দুটি বিভাগ তৈরি হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর *তবকাৎ-ই-নাসিরি* বলছে রাঢ় বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিমভাগের অংশ।[৫৯] অনেক পরবর্তী সময়েও দেখছি রাঢ় বলতে একই অঞ্চলকে বোঝানো হচ্ছে; ষোড়শ শতাব্দীর জোয়াও দ্য বারোসের মানচিত্রেও রাঢ় গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ অঞ্চল। যদিও পরবর্তীকালের মানচিত্রে রাঢ় শব্দটির আর উল্লেখ নেই। শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে না *আইন-ই-আকবরি* তে উল্লিখিত বঙ্গদেশের মহলগুলির তালিকাতেও।[৬০] বিভিন্নরকমের তথ্যসূত্রের (বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ, সাহিত্য, টীকা, পুরালেখ, ইতিবৃত্ত বা chronicle, মানচিত্র, প্রশাসনিক নথি) কালানুক্রমিক পর্যালোচনা এইভাবে একটি উপ-অঞ্চলের ঐতিহাসিক

---

[৫৪] তদেব

[৫৫] তদেব

[৫৬] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব্ব)*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৭

[৫৭] Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, p. 49

[৫৮] তদেব, পৃ. ৫০

[৫৯] তদেব, পৃ. ৪৯

[৬০] তদেব

ভূগোল তৈরি করছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন উপ-অঞ্চলের রূপরেখা নিচের সারণিতে পেশ করা হল।

প্রাক্-মুঘল আমলে বঙ্গদেশের উপ-অঞ্চল বিষয়ক রূপরেখা[৬১]

প্রাচীন নাম	**পুণ্ড্রবর্ধন** পুণ্ড্রবর্ধনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বরেন্দ্র	**রাঢ়** রাঢ়ের দু'টি বড়ো ভাগ- উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ়	**গৌড়**	**বঙ্গ**। বঙ্গাল ছিল দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চল। বঙ্গের নাব্য বিভা্গটি সম্ভবত বঙ্গাল	**সমতট**	**হরিকেল**
সীমা	পশ্চিমে গঙ্গা (পদ্মা) ও পূর্বে করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল	ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ অঞ্চল রাঢ়। ভাগীরথী ও কাঁসাই এর মধ্যবর্তী অংশে রাঢ়ের বিস্তার	উত্তর ও উত্তর-পূর্বে পুণ্ড্র ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম রাঢ়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল গৌড়	ব্রহ্মপুত্রের পূর্বভাগ থেকে বঙ্গোপসাগর অবধি বিস্তৃত। মূলত বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বভাগ বঙ্গ হলেও এক সময়য় পশ্চিমভাগ পর্যন্ত এর বিস্তৃত ছিল	কামরূপের দক্ষিণে সমতটের অবস্থান। আরেকটি দিক সমুদ্রকূলবর্তী। পূর্বে ত্রিপুরা ও আরাকানের পার্বত্যভূমি ও পশ্চিমে মেঘনার মধ্যবর্তী ভূভাগ।	মেঘনার ওপারে সমতটের থেকে পৃথক অঞ্চল। মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র মোহনার পূর্ব দিকে অবস্থিত।
নদ-নদী	করতোয়া, পদ্মা, মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রাই, তিস্তা	অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই	গঙ্গা এবং পুর্ব-দক্ষিণ বাহিনী পদ্মা শাখা	ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা	সুরমা, মেঘনা, ক্ষী্রোদা বা ক্ষীরনই।	মেঘনা
প্রথম উল্লেখ	*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*	রাঢ়ের একটি অংশ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মের প্রাচীনতম উল্লেখ পতঞ্জলির রচনায় পাচ্ছি।	পাণিনি-র *অষ্টাধ্যায়ী* (গৌড়পুর শব্দের উল্লেখ), কৌটিল্য-র *অর্থশাস্ত্র*	জনগোষ্ঠী হিসাবে প্রথম উল্লেখ *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ। ভৌগোলিক পরিসর হিসাবে	সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি	

[৬১] Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*,pp 41-84, দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত* , পৃ. ৩৮-৫৬ , 'Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.),*History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives(up to c.1200 CE)*, Vol.1 pp. 1-34

				কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ।		
ভৌগোলিক সীমার বিস্তার	গুপ্ত ও পাল রাজাদের আমলের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি আর চন্দ্র, বর্মন, সেন আমলের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি এক নয়। সেন আমলে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি বঙ্গদেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব অংশকে বোঝাত। *ভবিষ্যপুরাণ*-এর কিংবদন্তীতে পুণ্ড্রদেশের অন্তর্গত সাতটি দেশের উল্লেখ আছে- গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃতি (বরেন্দ্রের উত্তর ভাগে অবস্থিত অঞ্চল),সূক্ষ্ম, জাঙ্গল, ঝারিখণ্ড, বরাহভূমি ও বর্ধমান।	অজয় নদ উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় দুই অংশের বিভাজন রেখা। হাওড়া-হুগলি-মেদিনীপুর অঞ্চলে অবস্থিত পশ্চিম খাটিকা (পশ্চিম খাড়ি) বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। বর্ধমানভুক্তির দক্ষিণ সীমা প্রায় বঙ্গোপসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল	প্রথমে বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার দক্ষিণে ছিল গৌড়, কেন্দ্রে ছিল কর্ণসুবর্ণ। দুবি শাসনের ইঙ্গিত থেকে অনুমান করা যায় শশাঙ্ক পুণ্ড্র অঞ্চলে রাজত্ব করতেন যা গৌড়ের সীমা প্রসারণের প্রমাণ। *কামসূত্র*-এর যশোধর টীকায় গৌড়ের কলিঙ্গ অবধি বিস্তারের কথা পাচ্ছি। *শক্তিসঙ্গম তন্ত্র*-এ বঙ্গ ও ভুবনেশ্বরের মধ্যবর্তীতে গৌড়ের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে	তিরুমালাই লেখ-এর বিবরণ অনুসারে সম্ভবত দশম শতকে বঙ্গাল দেশ দণ্ডভুক্তি, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় সহ ভাগীরথীর পূর্ব তীর অবধি বিস্তৃত হয়েছিল	কখনও কখনও ২৪ পরগনা অবধি সমতটের বিস্তার ছিল।	রাজনৈতিক শক্তির জোরে নোয়াখালি, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট (সিলেট) অবধি বিস্তৃত হয়।
বর্তমান অবস্থান	বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর এবং পশ্চিম বাংলার উত্তরভাগের কিছু অংশ	বীরভুম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর	মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের উত্তরের কিছু অংশ	ঢাকা, ফরিদপুর, মুন্শীগঞ্জ, বরিশাল	বাংলাদেশের নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ভারতের ত্রিপুরার কিছু অংশ	চট্টগ্রাম উপকূল ও সংলগ্ন অঞ্চল।

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য	গুপ্ত সম্রাটদের তাম্রশাসনে উত্তর বাংলাকে পুণ্ড্রবর্ধন নামক ভুক্তি বা প্রদেশ বলা হয়েছে। এই উপ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্যস্থান- কোটিবর্ষ বিষয় (জেলা) এবং অধিষ্ঠান (প্রধান নগর), পুণ্ড্রবর্ধন নগর। পুণ্ড্রবর্ধন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত ছিল।	বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্র শাসনে উত্তর রাঢ় বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত, লক্ষ্মণ সেনের সময়ে অংশটি কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত।	*ভবিষ্যপুরাণ*-এর মতে গৌড়ের সীমা পদ্মা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত এবং দীনেশচন্দ্র সরকার দেখিয়েছেন কোন এক সময়ে বঙ্গদেশের পূর্বভাগ বঙ্গ ও পশ্চিমভাগ গৌড় নামে পরিচিত ছিল।	দক্ষিণ ভারতীয় অনুশাসনে বঙ্গ ও বঙ্গাল সমার্থক ছিল। *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* ও অন্যান্য রচনায় বঙ্গাল সমগ্র বঙ্গদেশকে বোঝাত। বঙ্গাল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।	সমতট পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত ছিল।	*কল্পদ্রুকোশ* অনুযায়ী হরিকেল/ হরিকেলা/ হরিকোলা শ্রীহট্টের নামান্তর। হরিকেল সম্ভবত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

সারণি- ১

প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের উপ-অঞ্চল বিষয়ক ধারণাটি মুঘল যুগে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়। ইতিপূর্বেই দেখা গেছে, ‘রাঢ়’ শব্দটিই মুঘল প্রশাসনিক নথিতে নেই। মুঘল আমলে টোডরমলের রাজস্ব নীতি অনুযায়ী বাংলা সুবাহকে ১৯টি সরকারে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সরকারের মধ্যে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ছিল একাধিক মহল। পরবর্তীকালে মহলের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে নানা সময়ে। কখনও কখনও চালু হয়েছে নতুন প্রশাসনিক বিভাগ। বাংলা সুবাহর পাশাপাশি উড়িষ্যা সুবাহকে ভাগ করা হয়েছিল পাঁচটি সরকারে। সবমিলিয়ে বাংলা ও উড়িষ্যা সুবাহতে ছিল ২৪টি সরকার। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুবর্ণবণিক, মল্ল রাজবংশ ও সদগোপদের সামাজিক সচলতা আমাদের অন্বিষ্ট, তাদের অবস্থান প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ভূগোল অনুযায়ী রাঢ়ের বিভিন্ন অংশে। সুবর্ণবণিকদের প্রধান কেন্দ্র হুগলির সপ্তগ্রাম আর বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশ আর মেদিনীপুরের সদগোপদের অবস্থান রাঢ়ের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে। মুঘল আমলের প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী ১৯টি সরকারের অন্যতম ছিল

সাতগাঁও। ৫৩ টি মহল বিশিষ্ট এই সরকারের অংশ ছিল চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলি। মল্ল রাজাদের বাসভূমি বিষ্ণুপুর ছিল মান্দারন সরকারের অন্তর্গত। ১৬ সরকার বিশিষ্ট মহলটির অংশ ছিল বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, উত্তর-পশ্চিম বর্ধমান, হুগলির পশ্চিমভাগ।[৬২] মেদিনীপুর অবশ্য ছিল উড়িষ্যা সুবাহর অন্তর্গত। উড়িষ্যার জলেশ্বর সরকারের অংশ হিসাবে মুঘল আমলে মেদিনীপুরকে দেখতে পাচ্ছি।

মুঘল আমলে সমগ্র বঙ্গদেশকে 'বঙ্গাল' বলা হলেও দেখা যাচ্ছে, প্রাক-মুঘল যুগে বাংলা বা বঙ্গদেশ নামে কোন স্বতন্ত্র অঞ্চল ছিল না। পুণ্ড্র, রাঢ় ইত্যাদি উপ-অঞ্চলগুলির সমষ্টিগত রূপকে বঙ্গদেশ বলা হচ্ছে। উপ-অঞ্চলগুলির ভিত্তিতে বঙ্গদেশ নামক স্বতন্ত্র অঞ্চল নির্মিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি এবার দেখা যাক। অঞ্চলকে যেহেতু কেবল ভৌগোলিক পরিসর হিসেবে না দেখে আমরা একটি সাংস্কৃতিক একক হিসাবে দেখতে চাইছি, সেহেতু সাংস্কৃতিক নির্মিতির বা মতাদর্শ নির্মাণের ইতিহাসটি পর্যালোচনা করা দরকার।

সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে একটি সাংস্কৃতিক পরিসর হিসাবে দেখার চল দীর্ঘদিনের।[৬৩] জন লেভিট দেখাচ্ছেন, ১৯৫০ সাল থেকে ভারতবর্ষে নৃতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে দুটি মডেল খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একটি মডেলের মূল নির্মাতা লুই দুমোঁ; আরেকটি মডেল তৈরি হয় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের হাত ধরে। দুই মডেলের মধ্যে বিপুল পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও দুটি মডেলই দক্ষিণ এশিয়াকে একটি সাংস্কৃতিক পরিসর (single cultural area) হিসাবে দেখেছে। এই দৃষ্টি নেহরুর 'India is one' ধারণার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এই দুই তত্ত্বপ্রস্থানেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য এবং তার নিজস্ব ঐতিহাসিকতা

---

[৬২] Sk. Salim, 'Administration of Bengal(1700-1757 A.D.)', unpublished Ph.D. thesis submitted at University of Calcutta, 1996, pp.16-19

[৬৩] Kunal Chakrabarti, Cult Region: 'The *Puranas* and the Making of the Cultural Territory of Bengal', Studies in History, 2000, 16:1, p.1

উপেক্ষিত।[৬৪] ইতিহাসের এই একমাত্রিক নির্মাণের বিপরীতে বঙ্গদেশের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য কীভাবে নির্মিত হচ্ছে দেখা যাক। এই স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস আসলে পরিচিতি নির্মাণের (identity formation) প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

ভারত-ইতিহাসে 'মধ্যযুগীয়' প্রবণতাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় জোর দিয়েছিলেন আঞ্চলিক শাসকদের উত্থান, লিপি, ভাষা, শিল্পকলার আঞ্চলিক রূপে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নির্মাণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদি মধ্যযুগকে দেখতে চেয়েছেন তিনি।[৬৫] যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কথা নীহাররঞ্জন বলেছেন তা বোঝার জন্য বঙ্গদেশের সঙ্গে উড়িষ্যা বা মহারাষ্ট্রের তুলনা করা যেতে পারে। উড়িষ্যার আঞ্চলিক ঐতিহ্য নির্মাণের কেন্দ্রে রয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দির। উড়িষ্যায় একাদশ শতাব্দী থেকেই বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজীবন শৈবধর্মাবলম্বী রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ ধর্মীয় প্রবণতার এই স্রোত বুঝতে পেরে পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন। অনেকের মতেই এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব জগন্নাথকে 'রাষ্ট্রদেবতা' এবং নিজেকে জগন্নাথের 'রাউত' বলে ঘোষণা করেন। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে উড়িষ্যা এবং উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে তীর্থযাত্রার ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে মন্দিরের নথি থেকে জানা যাচ্ছে 'উড়িষ্যা রাজ্যের অধিপতি স্বয়ং জগন্নাথদেব'। পরবর্তীকালে উনিশ শতকেও জগন্নাথদেব ওড়িয়া জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রতীক ছিলেন।[৬৬] বঙ্গদেশে এত বড়ো মাপের কোন মন্দির গড়ে ওঠেনি বা মন্দিরকে ঘিরে রাষ্ট্রনীতি আবর্তিত হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অবশ্য বঙ্গদেশে মন্দির নির্মাণের জোয়ার আসে।

---

[৬৪] John Leavitt, 'Cultural holism in the anthropology of South Asia: The challenge of regional traditions', Contributions to Indian Sociology, 1992, 26:1, pp. 3-4

[৬৫] Kunal Chakrabarti, *Religious Process The Puranas and the Making of a Regional Tradition*, p.289

[৬৬] তদেব, পৃ.৩০৫

এই ধারা চলেছিল প্রায় আঠারো-উনিশ শতক পর্যন্ত। ছোট ছোট টেরাকোটা মন্দিরগুলি বিভিন্ন জাতের ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক সচলতা প্রাপ্তির অংশ হলেও মন্দিরগুলি এককভাবে বা সামগ্রিকভাবে জগন্নাথ মন্দিরের মত প্রভাব বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে তৈরি করতে পারেনি। আবার, মহারাষ্ট্রের পনঢরপুরে বিঠোবার মন্দিরের কথা খেয়াল করলে দেখব স্থানীয় দেবতাই কীভাবে স্তরে স্তরে ব্রাহ্মণ্য দেববিশ্বের অংশ হয়ে উঠছেন, আবার পরবর্তী সময়ে কীভাবে এই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে তৈরি হচ্ছে 'নিচু' জাতির প্রতিবাদ। বিঠোবার মন্দিরের সঙ্গেও অবিচ্ছেদ্য তীর্থযাত্রার ঐতিহ্য। এই তীর্থযাত্রার অংশীদার কিন্তু মূলত মহারাষ্ট্রের লোকজন। বাইরের অঞ্চলের মানুষের অংশগ্রহণ খুবই কম। এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে একটি আঞ্চলিক ঐতিহ্যের স্মারক। বঙ্গদেশে এরকম বড়ো মাপের তীর্থকেন্দ্র অবশ্য এখনও অবধি দেখছি না আমরা। গঙ্গাসাগরের মেলায় বিপুল তীর্থযাত্রীর সমাগম হলেও সেখানে অবাঙালিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শাক্ত পীঠ বা চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করেও বঙ্গদেশে এই মাপের তীর্থ সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ঐতিহ্য নির্মাণের প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হয়েছে পুরাণ নামক শাস্ত্রপরম্পরার মাধ্যমে।[৬৭]

বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রের বিপুল প্রতিপত্তির সামনে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ ব্রাহ্মণ্যধর্মকে পুনরায় শক্তিশালী করতে খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে পুরাণ রচনার ধারা শুরু হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের শক্তিবৃদ্ধির আয়োজনে দরকার ছিল বিপুল মানুষের সমর্থন। অ-ব্রাহ্মণ্য পরিসরকেও সেক্ষেত্রে নিয়ে আসতে হবে ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাসের বৃত্তে। এই প্রক্রিয়া একমুখী নয়, বরং, উভমুখী এবং আদানপ্রদানমূলক। স্থানীয়, লোকায়ত বিশ্বাসগুলিকে যেমন এই প্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ্য পরিসরে ঠাঁই দেওয়া হয়, তেমনই লৌকিক স্তরেও ছড়িয়ে যেতে থাকে ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাসের

[৬৭] তদেব, পৃ. ৩০৫-৩০৯

চিহ্ন। সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধারা এবং একাধিক স্থানীয় ধারার সংমিশ্রণমূলক এই প্রকল্পের মৌলিক চাহিদা ছিল বৃহত্তর সমাজে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এই প্রক্রিয়ায় পুরাণগুলি বেদকে ধারণাগতভাবে স্বীকার করেও বৈদিক বিশ্বাস এবং আচারপদ্ধতি থেকে অনেকটা সরে আসে। বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার স্থান নেয় লৌকিক ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পূজা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বঙ্গদেশে প্রবেশ করেছে অনেক পরে। গুপ্ত আমল থেকে ভূমিদানের মাধ্যমে বহির্বঙ্গের ব্রাহ্মণরা যখন বঙ্গে বসতি তৈরি করছেন তখন পৌরাণিক ধর্মমত একটা নিজস্ব চেহারা নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু স্থানীয় ধর্মাচরণের ধারাগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধারার সংশ্লেষের ফলে নির্মিত এই চেহারাটিও সম্ভবত বঙ্গদেশের জন্য যথেষ্ট উপযোগী ছিল না। আর্যাবর্ত থেকে বহুদূরে অবস্থিত বৌদ্ধ ও তন্ত্রমতের শক্ত ঘাঁটি বঙ্গদেশের জন্য পুরাণরচনার আরেকটি ধারা লক্ষ করা যায়—একেই উপপুরাণ বলছি। অল্প কয়েকটি উপপুরাণ বাদ দিলে বেশিরভাগ উপপুরাণই বঙ্গদেশে রচিত।[৬৮] উপপুরাণগুলির মাধ্যমে দেবীপূজা নির্ভর আঞ্চলিক সংস্কৃতি নির্মাণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। একই সঙ্গে উপপুরাণগুলির সূত্রে বঙ্গদেশে জোরদার হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমের ধারা। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* বঙ্গদেশের জাতিকাঠামো প্রস্তাব করছে। সর্বভারতীয় জাতিকাঠামো-অনুগ চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বদলে বঙ্গদেশে দেখা যাচ্ছে দুটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। শূদ্ররা আবার সৎশূদ্র-অসৎশূদ্র অথবা উত্তম সংকর- মধ্যম সংকর- অধম সংকর ইত্যাদি নানা ভাগে বিভক্ত। এইভাবে পুরাণগুলি মারফত বঙ্গদেশে তৈরি হচ্ছে থাকবিন্যস্ত বর্ণজাতিব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ মেনেই সেই কাঠামোয় থাকছে ব্রাহ্মণের আধিপত্য। বর্ণজাতিকাঠামোর এই আঞ্চলিক রূপটি বর্তমান গবেষণায় বিশেষভাবে বিবেচ্য। বর্ণব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ আর্যাবর্ত থেকে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে জাঁকিয়ে বসছে। এই কাঠামোয় যাঁরা অপেক্ষাকৃত 'নিচু'

[৬৮] Kunal Chakrabarti, Cult Region: 'The *Puranas* and the Making of the Cultural Territory of Bengal', pp. 1-16

অবস্থানে রইলেন তাঁরা কীভাবে পরবর্তীকালে সামাজিক সচলতা পেতে চাইছেন সেটাই এই গবেষণার অন্বিষ্ট। আঞ্চলিক বর্ণজাতিকাঠামোর আলোচনায় তাই বঙ্গদেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতি নির্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপপুরাণগুলির কথাও জরুরি।

ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বর্ণজাতিব্যবস্থায় সামাজিক সচলতাকে বুঝতে হলে কেবল অর্থনীতি নয়, ধর্মীয় পরিস্থিতির সমীকরণগুলোর দিকেও নজর দেওয়া দরকার। আবার, কেবল বর্ণজাতিকাঠামোর একমাত্রিক, সর্বভারতীয় রূপের বদলে আঞ্চলিক বৈচিত্রগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্কটি ইতিপূর্বেই আলোচিত। এখন, অঞ্চল ও ধর্মব্যবস্থার সম্পর্কটি খতিয়ে দেখা দরকার। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক একটা উদাহরণ আমরা বিশদে আলোচনা করতে পারি। বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির হাত ধরে সুবর্ণবণিক, মল্ল রাজবংশ ও সদগোপদের সামাজিক সচলতার বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমাদের আলোচ্য। বঙ্গদেশের থাকবিন্যস্ত জটিল বর্ণজাতিকাঠামোয় দীর্ঘদিনের আয়াসে এই জাতিগোষ্ঠীগুলি সামাজিক সচলতা পেতে চেয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার সহায়ক হয়েছে বঙ্গদেশের বিভিন্ন বৈষ্ণব ধারা। এই ধারাগুলির সঙ্গে বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যোগাযোগও বজায় ছিল। আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেরই একটা ধারা বঙ্গদেশের বৈষ্ণবদের সূত্রে পৌঁছয় মণিপুরে। মণিপুরের বর্ণজাতিকাঠামোয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে অঞ্চলভেদে বর্ণজাতিকাঠামোয় ধর্মের ভূমিকার বিভিন্নতা চোখে পড়বে।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবল প্রভাব শুরু হয়। কিন্তু মণিপুরে বৈষ্ণবতার ইতিহাস বুঝতে আরেকটু পিছিয়ে যাওয়া জরুরি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মণিপুরি রাজা কিয়াম্বার (১৪৬৭-১৫০৮ খ্রিস্টাব্দ) সঙ্গে পার্শ্ববর্তী পঙ্গ রাজ্যের রাজার একটি সৌহার্দ্যমূলক চুক্তি হয়। উপহারস্বরূপ পঙ্গ রাজা কিয়াম্বাকে যেসমস্ত উপহার দেন তারমধ্যে

ছিল একটি বিষ্ণুমূর্তি। বিষ্ণুমূর্তির দেবত্ব সম্পর্কে রাজা অনবগত ছিলেন। নানা ঘটনার পর রাজা স্বপ্নাদেশে এক ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুমূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজার দায়িত্ব দেন। বিষ্ণুর দেবত্বে অভিভূত রাজা মণিপুরের পুরনো রাজধানী লামাংডং-এ নির্মাণ করেন একটি বিষ্ণুমন্দির। *মণিপুরি বিষ্ণু পুরাণ*-এর বিবরণ আমাদের একথা জানাচ্ছে।[৬৯] বিষ্ণু পূজার সূত্রপাত হলেও রাজা কিন্তু তখনও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত নন। জনগণের মধ্যেও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের কোন নজির সমসাময়িক সাক্ষ্য থেকে মিলছে না।[৭০] রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও বিষ্ণু উপাসনা তখন মূলত বাইরে থেকে আসা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[৭১] অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিপত্তি বাড়ছে। এই সময়, রাজা চারাই-রঙ্গবা (১৬৯৭-১৭০৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। মণিপুরের রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত *চেইথরল কুমবব* থেকে একথা জানা গেলেও কোন সম্প্রদায়ে রাজা দীক্ষা নিয়েছিলেন সেবিষয়ে নথিটি নীরব। ফলত, একটা তর্ক গবেষকমহলে তৈরি হয়েছে। মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক অথবা চৈতন্য সম্প্রদায়ে রাজার দীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে আছে একাধিক মত। অবশ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখলে রাজার রাধা-কৃষ্ণ যুগলমূর্তির উপাসনা এবং এই সময় থেকেই মণিপুরে সংকীর্তনের প্রসার চৈতন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজার যোগের ধারণাকেই জোরদার করে।[৭২] বৈষ্ণব উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হলেও স্থানীয় মেইতেই গোষ্ঠীর উপাসনার ধারার সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। বরং, বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে এই ধারাটিও।[৭৩] জনগণের উপর বলপূর্বক এই সাধনপদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়নি। উত্তরাধিকারী রাজা গরিবেঁওয়াজ ১৭১৭

---

[৬৯] Konsam Manikchand Singh, 'The Social Institutions of the Meities', unpublished Ph.D. thesis submitted at Gauhati University, 1984, pp. 267-269

[৭০] তদেব, পৃ. ২৬৯

[৭১] তদেব

[৭২] তদেব, পৃ. ২৭৪-২৭৫

[৭৩] তদেব, পৃ. ২৭৬-২৭৭

খ্রিস্টাব্দে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রথামাফিক দীক্ষা নেন গুরু গোপাল দাসের কাছে।[৭৪] পিতার মতই প্রথম দিকে তিনিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি স্থানীয় ধর্মমতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে গুরু গোপাল দাস মণিপুর ছেড়ে চলে যাবার পর মণিপুরের ধর্মীয় ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। রামানন্দী সম্প্রদায়ের গুরু শান্তিদাস গোঁসাই মণিপুরে এসে ভক্তিধর্মের প্রচার চালাতে থাকেন। দক্ষ প্রচারকের বক্তব্যে মুগ্ধ হন রাজা গরিবেঁওয়াজও। শান্তিদাস গোঁসাই রাজাকে বোঝাতে সক্ষম হন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সূক্ষ্মতা সাধারণের বোধগম্য নয়।[৭৫] রাজা পুনরায় শান্তিদাস গোঁসাইয়ের প্রণোদনায় দীক্ষা নেন রামানন্দী সম্প্রদায়ে। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাজা শান্তিদাস গোঁসাইয়ের নেতৃত্বে রাজ্যে নানারকম ব্রাহ্মণ্য শুদ্ধিকরণ চালান। বাড়িতে শূকর ইত্যাদি পশু রাখা নিষিদ্ধ হয়। বিভিন্ন নথি থেকে জানা যাচ্ছে, ১৭২৩ সালে তিনি বেশ কিছু স্থানীয় দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস করেন। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে জারি করেন হিন্দু সৎকারপদ্ধতি বিষয়ক নির্দেশিকা। নির্দেশ অমান্যকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।[৭৬] গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এই সময় পিছু হটে যায়। ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ স্থানীয় মণিপুরি ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করতে চেষ্টা করে। শান্তিদাসের নেতৃত্বে এইসময় মণিপুরে প্রথম ব্রাহ্মণ্য গোত্রব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তৈরি করা বংশলতিকায় দেখানো হয় মহাকাব্যের চরিত্রদের সঙ্গে মণিপুরের রাজবংশের সংযোগ।[৭৭] জাতপাতের কাঠামোও মণিপুরে নির্মিত হতে থাকে এই সময় থেকে। বেশ কিছুটা পরে রাজা জয়সিংহের আমলে আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় মণিপুরে। কাছাড়ে থাকাকালীন জয়সিংহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। জয়সিংহ সিংহাসন অধিকার করার পরে বঙ্গদেশের নরোত্তম

[৭৪] তদেব, পৃ. ২৭৯

[৭৫] তদেব, পৃ. ২৮১

[৭৬] তদেব

[৭৭] তদেব, পৃ. ২৯৩

ঠাকুরের পাঁচ শিষ্য মণিপুরে আসেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে।[৭৮] রাজা এই বৈষ্ণব প্রচারকদের কাছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। এরপর থেকে মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বাইরে থেকে আসা ব্রাহ্মণরাও বৈষ্ণবধর্মের এই শাখায় দীক্ষা নিতে থাকে।[৭৯] মন্দির নির্মাণসহ নানা উপায়ে জয়সিংহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফিরে আসে ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি। মেইতেইদের নিজস্ব ধর্মাচরণে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ না করে সেই উপাসনার ধারাটিকে যুক্ত করে নেওয়া হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে।[৮০] মণিপুরের রাজার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা অবশ্যই এক সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বৈষ্ণব গোস্বামীদের সহযোগিতায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে জয়সিংহের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদের গোস্বামীরা রাজা চন্দ্রকীর্তিকে সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন।[৮১] গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মণিপুরে জনপ্রিয়তা লাভের অন্য কতকগুলো সাংস্কৃতিক কারণও ছিল। সে আলোচনা এই প্রসঙ্গে জরুরি নয়। আমরা বরং দেখে নিতে পারি জাতপাত নামক প্রতিষ্ঠানটি বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে মণিপুরে কীভাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

মণিপুরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রবেশ করেছে অনেক পরে। বর্ণজাতিকাঠামোর কোন অস্তিত্বও ছিল না। রাজা কিয়াম্বার আমলে বাইরে থেকে আসা কিছু ব্রাহ্মণকে মণিপুরে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, ব্রাহ্মণদের আধিপত্য মণিপুরের সমাজে তখন কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং, সামাজিক মর্যাদার নিরিখে ব্রাহ্মণরা বেশ নিচের দিকেই ছিলেন।[৮২] ধীরে ধীরে মণিপুরের সমাজে ব্রাহ্মণদের মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটে। নিশ্চিতভাবেই ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও

---

[৭৮] Moirangthem Kirti Singh, ‘Religious Developments in Manipur in the Eighteenth and Nineteenth Centuries’, unpublished Ph.D. thesis submitted at Gauhati University, 1971, pp.208-209

[৭৯] তদেব, পৃ. ২১০

[৮০] তদেব, পৃ. ২৪৬

[৮১] তদেব, পৃ. ২৪৫

[৮২] S. Bebita Devi, ‘The Advent of Caste: Emergence of Brahmans in Manipuri Society’, unpublished Ph.D. thesis submitted at Assam University, Silchar, 2013, p.92

বর্ণজাতিকাঠামো নির্মাণের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল।[৮৩] জনবিন্যাস ও ধর্মীয় পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরে একটি নিজস্ব বর্ণজাতিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বাইরে থেকে আসা ব্রাহ্মণরা অবশ্যই তাঁদের ব্রাহ্মণ পরিচয় সযত্নে ধরে রাখেন আর মেইতেইরা নিজেদের সঙ্গে জুড়ে নেন ক্ষত্রিয় অনুষঙ্গ।[৮৪] অবশ্য বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণদুটির অস্তিত্ব মণিপুরি সমাজে নেই। মেইতেই ক্ষত্রিয় রাজা নিজেকে বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষক বলে ঘোষণা করেন, ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্যের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ব্যবসায়ী ও বণিক মণিপুরি সমাজে থাকলেও তাঁরা বৈশ্য হিসাবে পরিচিত নন। লোই, ফুঙ্গানাই, তেঙ্গখুল, কেই প্রভৃতি গোষ্ঠী নিম্নবর্গের মানুষ হলেও বর্ণপরিচয়ে শূদ্র নন। স্মৃতিশাস্ত্রের সাধারণ বিধান অনুযায়ী তিন উচ্চবর্ণের সেবাও তাঁদের কর্তব্যকর্ম নয়, কেবল রাজার সেবাতেই তাঁরা নিয়োজিত। ভারতবর্ষের শূদ্রদের সঙ্গে এঁদের এক পঙ্‌ক্তিতে ফেলা যায় না।[৮৫] এই বর্ণকাঠামো নির্মাণের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে বিবাহ ও খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত নানা নিয়ম কানুন। মণিপুরি সমাজের এই বর্ণজাতিকাঠামো নির্মাণের ইতিহাস ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অর্বাচীন। বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম মনোযোগ ছিল মণিপুরে বর্ণজাতিকাঠামোর প্রতিষ্ঠায়। বঙ্গদেশে যেমন ষোড়শ শতাব্দীর আগেই রীতিমত থাকবিন্যস্ত একটি জটিল বর্ণজাতিব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মণিপুরে আমরা তেমনটি দেখছি না। ফলত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ‘নিচু’ অবস্থানে থাকা জাতিগুলির সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নের বা সামাজিক সচলতার যে চেষ্টা আমরা বঙ্গদেশে দেখেছি, মণিপুরে সেটি আলোচ্য কালপর্বে সম্ভব নয়। মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কার্যকলাপ বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক সচলতা লাভের প্রক্রিয়ার

---

[৮৩] Konsam Manikchand Singh, ‘The Social Institutions of the Meities’, p.294

[৮৪] তদেব

[৮৫] Moirangthem Kirti Singh, ‘Religious Developments in Manipur in the Eighteenth and Nineteenth Centuries’, p. 251

সমকালীন হলেও দুই প্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভিজ্ঞতা একেবারে আলাদা। কারণ, থাকবিন্যস্ত বর্ণজাতিকাঠামো অত্যন্ত জটিল না হয়ে উঠলে সামাজিক সচলতার প্রশ্নটিও ঠিক ততখানি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে অভিব্যক্ত হয় না। মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম আমাদের আলোচ্য সময়সীমায় স্থানীয় মেইতেইদের ক্ষত্রিয় পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে বর্ণজাতিব্যবস্থায় নিশ্চয় একটা মর্যাদাজনক স্থান দিয়েছে। একে মেইতেই গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতা হিসাবে দেখতেই পারি। কিন্তু, দুটি অঞ্চলের বর্ণজাতিকাঠামোর পার্থক্যের নিরিখে দুটি ঘটনার ফারাক অত্যন্ত প্রকট। অঞ্চল, ধর্মব্যবস্থা আর সামাজিক সচলতার যোগসূত্রটি এবার খানিকটা স্পষ্ট হচ্ছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে দুই প্রদেশে দেখতে পেলেও বঙ্গদেশ আর মণিপুরের অঞ্চলগত বিশিষ্টতার কারণে যে পৃথক ইতিহাস এবং সমাজবিন্যাস নির্মিত হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে সমাজজীবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। বর্ণজাতিকাঠামোর আঞ্চলিক বিশিষ্টতা ধর্মসম্প্রদায়ের কার্যক্রমের অভিমুখকেও নির্ধারণ করছে একভাবে।

উপরের আলোচনা থেকে সামাজিক সচলতা বিষয়ক গবেষণার পদ্ধতিগত দিকগুলি কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমত, অনুশাসনমূলক বা নির্দেশমূলক গ্রন্থ (normative text) ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ চালিত। স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার যোগ একটু দূরের। স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের বিধানে সমাজের একটি গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ সমাজের একটি কল্পনা হাজির করা হয়ে থাকে। ‘আদর্শ’ সমাজের ধারণা আর সমাজের বাস্তব চিত্রের দূরত্ব অনেকখানি। প্যাট্রিক ওলিভেল যেমন ধর্মসূত্রের আলোচনায় খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন, ধর্মসূত্র থেকে সমাজজীবনের ছবি যদি নাও পাওয়া যায়, তাহলেও অন্তত স্তরবিন্যস্ত সমাজে ব্রাহ্মণ পুরুষদের আদর্শ জীবনবিধি কী হওয়া উচিত সেটুকু বোঝা যাবে।[৮৬] এই আদর্শ

---

[৮৬] Patrick Olivelle (tr.), *Dharmasutras: The Law Codes of Ancient India*, New York: Oxford University Press,1st Published, 1999, p.xxi

সমাজের কল্পনাকেই সমাজের প্রকৃত ছবি হিসাবে মেনে নেওয়ায় ভারতীয় সমাজের স্থাণুত্ব সম্পর্কিত মতটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল বলে দেখেছি। সামাজিক সচলতার সঙ্গে অবশ্য এই আদর্শ রূপের বিরোধই বেশি। বর্ণজাতিকাঠামোর আদর্শ রূপে যে গোষ্ঠীগুলি বেশ কিছুটা নিচের দিকে তাদের মধ্যেই সামাজিক সচলতালাভের উদ্যম প্রবলভাবে লক্ষণীয়। ধর্মশাস্ত্র আদর্শ রূপের কথা বলতে গিয়ে এই ইতিহাসটার খবর দেয় না। কাজেই, সামাজিক সচলতার আলোচনায় অনুশাসনমূলক গ্রন্থের বাইরে অন্যান্য তথ্যসূত্রের দিকে তাকানো জরুরি। ঐতিহাসিকরা মূলত সেকারণেই পুরালেখ, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইতিবৃত্ত, সাহিত্যিক সূত্র ইত্যাদির উপর নির্ভর করেন। অনুশাসনমূলক বা নির্দেশমূলক গ্রন্থের বিপরীতে এই ধরনের সূত্রগুলিকে বলতে পারি বিবরণাত্মক গ্রন্থ বা রচনা (descriptive text)। সামাজিক সচলতার আলোচনায় এই ধরনের রচনার গুরুত্ব অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সচলতা প্রাপ্তি (ঊর্ধমুখী বা অধোমুখী) একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ফল। ফলে জাতপাত এবং সামাজিক সচলতার ইতিহাস অনুসন্ধানে বিভিন্ন তথ্যসূত্রের দ্বিকালিক বা কালানুক্রমিক পাঠ (diachronic study) জরুরি। এখানে সামাজিক সচলতা সম্পর্কিত গবেষণায় জড়িত বিভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলের পদ্ধতিগত পার্থক্যের আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক। সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিকরা মূলত সাম্প্রতিক বা নিকট অতীত নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী। ফলে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার দ্বিকালিক পাঠ নির্মাণ তাঁদের পক্ষে সবসময় সম্ভব নয়। একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক রূপ বা বিন্যাসটি মূলত তাঁদের আলোচ্য। সাম্প্রতিক বা নিকট অতীত নিয়ে কাজ করেন বলেই তাঁদের ক্ষেত্রসমীক্ষা (fieldwork ও ethnography) করার সুযোগ থাকে। ইতিহাসবিদরা, বিশেষত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের গবেষকদের সবসময় সে সুযোগ নেই। সামাজিক সচলতা বোঝার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী অতীতকে বড়ো কালপর্বে দ্বিকালিক সমীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা আসলে একটা প্রক্রিয়া (process)-কে বুঝতে চান। আমরা অবশ্য এখানে বিভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলের মধ্যে কোন

জল-অচল ভেদ করতে চাইছি না। বরং, দেখতে পাচ্ছি সমাজতাত্ত্বিক বা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদরাও অনেকসময়ই দ্বিকালিক পাঠে আগ্রহী। ‘ The Dominant Caste in Rampura’ প্রবন্ধে কৃষক সম্প্রদায় ওক্কালিগাদের স্থানীয় সমাজে আধিপত্য বিচার করতে গিয়ে শ্রীনিবাস মন্তব্য করেন আধিপত্য বিস্তারের যথার্থ বিবেচনা করার জন্য যে অঞ্চলে তাঁদের আধিপত্য একটি বড়ো কালপর্ব জুড়ে সেই সমগ্র অঞ্চলের সমীক্ষা প্রয়োজন। শ্রীনিবাস আক্ষেপ করে জানিয়েছেন এধরনের সমীক্ষার উপযোগী তথ্যভাণ্ডার তাঁর হাতে নেই।[৮৭] দুটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। এক শ্রীনিবাসও সামাজিক সচলতা অনুসন্ধানে দ্বিকালিক পাঠের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন। দুই, অনেকসময়েই গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা (village studies)-য় তথ্যসূত্র অপ্রতুল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, এমনকি একটি অঞ্চল বা উপ-অঞ্চল নিয়ে কাজ করলে যে পরিমাণ তথ্য পাওয়া সম্ভব, কেবল একটি গ্রামের বিষয়ে সে ধরনের তথ্যভাণ্ডার সচরাচর থাকেই না। সামাজিক সচলতা বোঝার ক্ষেত্রে দ্বিকালিক পাঠের গুরুত্ব অনুভব করলেও শ্রীনিবাস তা নিজের গবেষণায় প্রয়োগ করে উঠতে পারছেন না একেবারেই তাঁর নিজস্ব বিদ্যাশৃঙ্খলগত কারণে। নিকট বা সাম্প্রতিক অতীত নিয়ে কাজ করার দরুণ ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ থাকলেও সামাজিক সচলতাকে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া হিসাবে বুঝে নেওয়ার সুযোগ তাঁদের নেই।

সামাজিক সচলতার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাটি যুক্ত। এই পরিবর্তনের মূলত তিনটি অভিমুখ আছে বলে আমাদের মনে হয়—পরিবর্তনের কারণ, পরিবর্তনের অভিব্যক্তি, পরিবর্তনের তীব্রতা। সামাজিক সচলতার আলোচনায় এই তিনটি দিকই গুরুত্বপূর্ণ। খেয়াল করলে দেখা যাবে, পরিবর্তনের এই ত্রিমাত্রিক অভিমুখ

[৮৭] M.N.Srinivas, ‘The Dominant Caste in Rampura’, p. 1

সমাজতাত্ত্বিকদের পক্ষে পূর্ণমাত্রায় ধরতে পারা সম্ভব নয়। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। এই গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা সুবর্ণবণিকদের সচলতার প্রসঙ্গটি আলোচনা করব। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গুরু নিত্যানন্দের হাত ধরে সুবর্ণবণিকরা সাধনাধিকার পেয়েছিলেন। সাধারণভাবে জল-অচল হলেও তাঁদের গুরুপরম্পরায় সুবর্ণবণিকরা জল-অনাচরণীয় নন। সুবর্ণবণিকদের সাধনাধিকার প্রাপ্তির সঙ্গে তাঁদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির যোগ আছে নিঃসন্দেহে। অথচ, এই পরিবর্তনের তীব্রতা কতখানি ছিল তা বুঝতে আমাদের তাকাতে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা ঘনরামের ধর্মমঙ্গল-এ। ঘনরামের আখ্যান সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতাকে স্বীকার করেনি। বরং, সুবর্ণবণিককে ব্রাত্যই বলেছে। একটি কালপর্বে আটকে থেকে তাহলে এই পরিবর্তনের তীব্রতা বোঝা সম্ভব নয়। আবার, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সামাজিক সচলতার অভিব্যক্তি হিসাবে যজ্ঞোপবীত ধারণের দাবি সুবর্ণবণিক সমাজে সেভাবে ছিল না। কিন্তু, উনিশ শতকে ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানে আদমসুমারি শুরু হলে সুবর্ণবণিকরা বৈশ্যত্বের দাবি করতে থাকেন। একইসঙ্গে উঠে আসে যজ্ঞোপবীত ধারণের দাবি। নিত্যানন্দের হাত ধরে একপ্রকার সামাজিক সচলতা হলেও উনিশ-বিশ শতকে নিত্যানন্দকেই নিজেদের প্রয়োজনমতো সুবর্ণবণিকরা ব্যবহার করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গের খুঁটিনাটি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এখানে শুধু এইটুকু বোঝাতে চাইছি, এক সময়ের সঙ্গে আরেক সময়ের বোঝাপড়ায় পরিবর্তনের অভিব্যক্তি বা তীব্রতার যে তারতম্য হয়; তা বুঝতে দ্বিকালিক বা কালানুক্রমিক পাঠ অনিবার্য। পরিবর্তনের অভিমুখকে আমরা যেভাবে বুঝতে চাইছি তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীনিবাসের ধরন বা পদ্ধতির একটা তফাত হয়ে যাচ্ছে।

সমাজতাত্ত্বিক বা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের কেউ কেউ যেমন ঐতিহাসিকদের দ্বিকালিক পাঠের পদ্ধতিতে আগ্রহী, ঐতিহাসিকদেরও তেমনি কখনও কখনও সাম্প্রতিক বা

নিকট অতীতের বিবরণে নজর দিতে দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিদদের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণকে ঐতিহাসিকদের দীর্ঘ কালপর্বের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনুসন্ধানের সঙ্গে মেলানো গেলে পরিচিতি নির্মাণের (identity formation) বহুস্তরীয় অভিব্যক্তি বোঝা সম্ভব।[৮৮] অতীতের একমাত্রিক বয়ান বদলে যেতে পারে সাম্প্রতিক কাল বা নিকট অতীতকে বিবেচনার অংশ করে তুললে। বিভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলের মধ্যে পদ্ধতিগত চলাচলটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গবেষণায় ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সুবর্ণবণিক, মল্ল রাজবংশ, সদগোপদের সামাজিক সচলতা আমরা বিচার করতে চেয়েছি। সাম্প্রতিকের থেকে অনেকটাই দূরবর্তী এই কালপর্বের আলোচনায় আমাদের মূল ঝোঁক থাকবে দ্বিকালিক সমীক্ষায়। সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া বুঝতে এই পদ্ধতিটিই সবচেয়ে কার্যকরী বলে আমাদের ধারণা। পাশাপাশি, সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়াটি পরিচিতি নির্মাণের (identity formation) সঙ্গে যুক্ত বলেই এটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি কালপর্বকে সেক্ষেত্রে সবসময় অন্য কালপর্বের থেকে দেয়াল তুলে আলাদা করা যায় না। এই গবেষণায় আমরাও তাই প্রয়োজনবোধে উনিশ শতক বা বিশ শতকে শুরুর দিকের অল্প কিছু তথ্যসূত্র ব্যবহার করব। ঐতিহাসিকদের পাশাপাশি সাহায্য নেব নৃতাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার। প্রক্রিয়া (process)কে জুড়ে নেব ফলাফল (end result/product) এর সঙ্গে। তৃতীয়ত, অনুশাসনমূলক বা নির্দেশমূলক রচনাগুলির দ্বিকালিক পাঠ কি সামাজিক সচলতা সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারে না? ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মত বৈদিক রচনার দ্বিকালিক পাঠ থেকেই তো জানতে পারছি রথকার নামক গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদার প্রাথমিক উন্নতি ও পরবর্তী অবনমন।[৮৯] না, তারপরেও নির্দেশমূলক গ্রন্থগুলিকে আমরা এই কাজে প্রধান অবলম্বন করে তুলতে পারব না। কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রের

[৮৮] Kunal Chakrabarti, *Religious Process: The Puranas and the Making of a Regional Tradition,* pp.314-315

[৮৯] A.C.Banerjea, *Studies in the Brahmanas*, Delhi: Motilal Banarsidass Pvt. Ltd., 1st Published, 1963, pp.78-80

মত নির্দেশমুলক গ্রন্থের দ্বিকালিক পাঠে যদিও বা একটি গোষ্ঠীর উন্নতি বা অবনতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, তবুও কোন্ আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এই উন্নতি বা অবনতির কারণ সে সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র আমাদের প্রায় কিছুই জানায় না। অগত্যা, এই প্রক্রিয়ার অনুসন্ধানে আমাদের দ্বারস্থ হতেই হয় বিবরণাত্মক রচনার। যদিও স্মৃতিশাস্ত্র বা অন্যান্য নির্দেশমূলক রচনা আমাদের আলোচনায় মাঝেমধ্যেই আলোচিত হবে; মূলত আদর্শ কাঠামোকে একটা প্রসঙ্গ ধরে সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের সুবিধার্থে। স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার সম্পর্কও তাতে স্পষ্ট হবে। চতুর্থত, বর্ণজাতিকাঠামোর সর্বভারতীয় রূপটির তুলনায় আঞ্চলিক রূপ বা বৈচিত্রগুলিই আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। বঙ্গদেশ ও মণিপুরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, বর্ণজাতিকাঠামো কীভাবে প্রতিটি অঞ্চলে নিজস্ব রূপ নির্মাণ করে। প্রতিটি অঞ্চলের জনবিন্যাস এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে আধিপত্যবিস্তারকারী জাতগুলি আলাদা। বঙ্গদেশে বৈদ্য বা কায়স্থের জাতিগত মর্যাদা অন্যান্য অনেক প্রদেশের তুলনায় বেশি। বৈদ্যরা এমনকি উনিশ শতকের বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণত্বের দাবিও করেছে। সামাজিক সচলতার ধারণাটাও তাই অঞ্চলনির্দিষ্ট (region specific), কখনও কখনও উপ-অঞ্চল (sub-region) বা স্থানীয় এলাকা (local area) নির্দিষ্ট। বর্তমান গবেষণায় আমরা রাঢ়ের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত কয়েকটি জাতির সামাজিক সচলতার প্রশ্নটিই আলোচনা করব। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় স্থানীয় বা উপ-আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়; বরং বৃহত্তর আঞ্চলিক সংস্কৃতি নির্মাণে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই একটি উপ-অঞ্চলকে ঘিরে যে সামাজিক সচলতার আবহ তৈরি হচ্ছে তা বড়ো অর্থে আঞ্চলিক সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যে বর্ণজাতিকাঠামোর কোন বিশেষত্ব তৈরি করতে পারছে কি না—সেটাই দেখার বিষয়। পঞ্চমত, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সচলতা যেহেতু কেবল আর্থিক পুঁজি নির্ভর নয়, বরং, ধর্মীয় অনুমোদনও একইসঙ্গে জরুরি; সুতরাং সামাজিক সচলতার আলোচনায়

ধর্মসম্প্রদায়ের ভূমিকা এপ্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুবর্ণবণিক, মল্ল রাজবংশ বা সদগোপদের সামাজিক উত্থানে বঙ্গদেশের বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কার্যকরী ভূমিকা ছিল। সামাজিক সচলতায় শিলমোহর দিচ্ছে এই সম্প্রদায়গুলিই। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি নবদ্বীপ ও ত্রিবেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধান কীভাবে তিলিদের সামাজিক সচলতা সুনিশ্চিত করেছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলিও সেবাধিকার বা সংস্কারাধিকার, কোন কোন ক্ষেত্রে উপবীত ধারণের অধিকার দিচ্ছে এই গোষ্ঠীগুলিকে। সামাজিক সচলতায় ধর্মসম্প্রদায়ের ভূমিকাও অঞ্চলভেদে আলাদা। মণিপুর প্রসঙ্গে তা আমরা লক্ষ করেছি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরিসরে (ritual space) অংশগ্রহণের মাত্রায় অধিকারবৃদ্ধি সামাজিক সচলতার অন্যতম স্মারক। অধিকারবৃদ্ধির নমুনা ছড়িয়ে আছে চরিতগ্রন্থে, বৈষ্ণবীয় কড়চা জাতীয় রচনায়, কুলপণ্ডিতদের তৈরি করা বংশতালিকায়, মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যকর্মে। একইসঙ্গে জানা প্রয়োজন মন্দির নির্মাণে এই গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা, ধর্মসম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্পকলায় পৃষ্ঠপোষকতাদানের ইতিহাস। মধ্যযুগের বঙ্গদেশে গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতা বুঝতে এই উপাদানগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ষষ্ঠত এবং শেষত, এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় খেয়াল করিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা সামাজিক সচলতার পদ্ধতিগত আলোচনায় মূলত ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণাপদ্ধতির কথা বলেছি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে বর্ণজাতিকাঠামো ও সামাজিক সচলতার আলোচনায় অংশগ্রহণ কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য? এক্ষেত্রে কয়েকটি যুক্তি পেশ করা যেতে পারে। এক, সামাজিক সচলতার আলোচনায় আমরা বারবার অনুশাসনমূলক বা নির্দেশমূলক গ্রন্থের তুলনায় বিবরণাত্মক সূত্রগুলির উপর প্রয়োজন অনুভব করেছি। এই বিবরণাত্মক রচনাগুলির অন্যতম বিভিন্ন সাহিত্যিক সূত্র। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের সামাজিক সচলতার আলোচনায় সাহিত্যিক সূত্রের ব্যাপক ব্যবহার করতে দেখেছি। প্রসঙ্গত, হিতেশরঞ্জন সান্যালের *Social Mobility in Bengal* (প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ) বইটির কথা মনে

করা যেতে পারে। পেশাদার ঐতিহাসিক হিতেশরঞ্জন বঙ্গদেশের সামাজিক সচলতার ইতিহাস বুঝতে ব্যাপক পরিমাণে সাহিত্যিক সূত্র ব্যবহার করেছেন। বঙ্গদেশে বর্ণজাতিকাঠামো বুঝতে সাহিত্যিক সূত্রগুলির কার্যকারিতার নিদর্শন আছে সাহিত্যের অধ্যাপক ও গবেষক অণিমা মুখোপাধ্যায়ের *সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য* (প্রথম প্রকাশ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ) বইতে। দুই, ধর্ম যেহেতু সামাজিক সচলতার আলোচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক; অতএব, এই সূত্রেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে বিপুল ধর্মীয় সাহিত্যের ব্যবহার। বৈষ্ণবীয় চরিত বা কড়চার সম্প্রদায়ভিত্তিক অভিমুখ, সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মদর্শনের সঙ্গে জাতপাতের সম্পর্ক, চরিতগ্রন্থ বা অন্যান্য সাহিত্যের প্রামাণিকতা বা নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ক তর্ক এই আলোচনায় অনিবার্য। লক্ষণীয়, হিতেশরঞ্জন সান্যাল সামাজিক সচলতা বিষয়ক প্রণিধানযোগ্য গবেষণাগ্রন্থটিতে বিভিন্ন সাহিত্যিক সূত্রের ব্যাপক ব্যবহার করলেও এই ধরনের সূত্র অর্থাৎ বঙ্গদেশের বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় বা শাখার (যেমন- নিত্যানন্দ বা শ্যামানন্দ শাখা) সাহিত্য, চরিতগ্রন্থ বিশেষ ব্যবহার করেননি। অথচ, সুবর্ণবণিক বা সদগোপের সাধনাধিকারের স্বীকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে শাখাভিত্তিক রচনায়। সুবর্ণবণিকের মতো কোন কোন সম্প্রদায়ের সচলতার স্বীকৃতি আবার শাখাবিশেষেই সীমাবদ্ধ। ফলত, আমাদের আলোচ্য জাতিগুলির সামাজিক সচলতার ইতিহাস বুঝতে নির্দিষ্ট শাখার চরিত, অন্যান্য রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণার পদ্ধতিকে স্বীকার করলেও তথ্যসূত্রের ব্যবহারে বর্তমান গবেষণার সঙ্গে হিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণার একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। ভূমিকা অংশেও এই প্রসঙ্গে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। সাহিত্যের ছাত্র বা গবেষকের পক্ষে তাঁর বিদ্যায়তনিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে এই নতুন বা অচেনা সাহিত্যিক সূত্রগুলির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব। সামাজিক সচলতার আলোচনায় তাতে নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: স্থান, কাল, পাত্র

২.১ ভারতবর্ষীয় প্রবণতা

২.২ বঙ্গদেশীয় প্রবণতা

অধ্যায়: ২

বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: স্থান, কাল, পাত্র

একটি জাতি (caste group) কি সর্বভারতীয়? এমন একটা আপাত-নিরীহ প্রশ্ন তুলেছেন *A Social History of Early India* গ্রন্থের সম্পাদক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়। উত্তরে তিনি জানাচ্ছেন কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের মতো কোন জাতিকেই সর্বভারতীয় বলা চলে না। কায়স্থরা আদি মধ্যযুগে কাশ্মীর, মধ্য ও উত্তর ভারত, পূর্ব ভারতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি গোষ্ঠী। ব্রাহ্মণদের তো দেখতে পাওয়া যাবে সারা ভারত জুড়েই। অথচ, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও এই জাতিগুলির অসংখ্য উপবিভাগের মধ্যে কোন নিবিড় জ্ঞাতিত্ব বা আত্মীয়তা বন্ধন নেই। বরং, সারা ভারত জুড়েই কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যাবে সামাজিক সম্পর্কের আঞ্চলিক বিন্যাস। একই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যেও দেখা যাবে অসংখ্য উপবিভাগ। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই বর্ণজাতি ব্যবস্থাকে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে বোঝা প্রয়োজন। এই অংশেই সামাজিক সচলতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মত, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে সামাজিক সচলতা লাভ করা গেলেও সকলেই অভীষ্টে পৌঁছতে পারে না। চণ্ডালদের কি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির জোরে আমরা খুব বেশি ক্ষেত্রে সংস্কারাধিকারগত মর্যাদা লাভ করতে দেখি?[১] স্বাভাবিকভাবেই এই সচলতার আলোচনায় কালের মাত্রাটিও খুব জরুরি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে

[১] B.D. Chattopadhyaya(ed.), *A Soial History of Early India,* in *History of Science, Philospohy and Culture in Indian Civilization(vol.II, part 5)*, General Editor: D.P. Chattopadhyaya, Delhi: Pearson Longman, 1st Published, 2009, pp. xxxviii-xl

সেবিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি সুনিশ্চিতভাবে বর্ণজাতিকাঠামো ও সামাজিক সচলতার আলোচনায় স্থান, কাল, পাত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বর্ণজাতিকাঠামো ও সামাজিক সচলতার ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় প্রবণতা বুঝতে চাইব দুটি উপ-অধ্যায়ে। ভারতবর্ষের মত বিপুলায়তন ভূখণ্ডের বর্ণজাতিব্যবস্থার ধারাবাহিক আলোচনা বর্তমান পরিসরে সম্ভব নয়। জাতপাতের আঞ্চলিক রূপভেদগুলিকে বিবেচনার মধ্যে আনলে তো ব্যাপারটা আরও দুরূহ। উপরন্তু, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বর্ণজাতিব্যবস্থার উদ্ভবলগ্নকে যদিও বা চিহ্নিত করা যায়, ব্যবস্থাটির কোন পরিসমাপ্তিকাল চিহ্নিত করা অসম্ভব। নতুন নতুন গোষ্ঠী দীর্ঘদিন জাতের চেহারা নিয়েছে, সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়াটিও চলছে নিয়মিতভাবেই। এদিক থেকে বর্ণজাতিব্যবস্থা পুরোদস্তুর জায়মান। আমরা তাই এই আলোচনায় ধারাবাহিক বিবরণের বদলে ভারতবর্ষে বর্ণজাতিব্যবস্থা ও সামাজিক সচলতার বিবর্তনের ধারা ও প্রবণতাগুলিকে দেখব। বঙ্গদেশের বর্ণজাতিব্যবস্থা ও সামাজিক সচলতা আমাদের মূল আলোচ্য। এক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে আমরা প্রাক-চৈতন্যযুগ পর্যন্ত কালপর্বকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করব। পরবর্তী কালপর্বে বঙ্গদেশে বর্ণজাতিব্যবস্থা ও সামাজিক সচলতার ধারাটি আলোচিত হবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেও এই অধ্যায়ে ধারাবাহিক বিবরণের চাইতে প্রবণতা অনুসন্ধানেই আমাদের ঝোঁক থাকবে বেশি। ভারতবর্ষীয় প্রবণতার পাশে বঙ্গদেশীয় প্রবণতাগুলির বিচার বঙ্গদেশের বর্ণজাতিব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করবে।

২.১ ভারতবর্ষীয় প্রবণতা:-

'বর্ণ' শব্দটি বৈদিক সাহিত্যে মূলত চারপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক—রূপ(বাহ্য অবয়ব), বর্ণ (রং), কান্তি, দীপ্তি; দুই—নিবারক (প্রতিরোধক); তিন—অক্ষর, ধ্বনি, শব্দ ইত্যাদি; চার—

সামাজিক স্তর, মর্যাদা প্রভৃতি।[২] বেদের সংহিতা অংশে সামাজিক স্তর বোঝাতে 'বর্ণ' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত। *ঋগ্বেদ* (২.১২.৪ এবং ৩.৩৪.৯)-এ আর্য ও দস্যু বা দাস বর্ণের কথা পাচ্ছি।[৩] আর্য ও দাসদের সম্পর্কটি বিরোধিতার। *ঋগ্বেদ*-এ (৩.১২.৬)এ দেখা যাচ্ছে– 'হে ইন্দ্র এবং অগ্নি! একসঙ্গে চেষ্টা করে আপনারা দাস অধিকৃত ৯০টি শহর ধ্বংস করেছেন।[৪] *ঋগ্বেদ*-এ দাস বা দস্যুদের নানা বিশেষণে অভিহিত হতে হয়েছে—কৃষ্ণত্বচ্ (কৃষ্ণবর্ণগাত্র), অনাস (চ্যাপ্টা নাক), মৃধ্রবাক (দুর্বোধ্য ভাষা), অকর্মণ (ক্রিয়াহীন, যজ্ঞক্রিয়াহীন), অদেবসু (দেবতাদের প্রতি বিমুখ), অব্রহ্মণ (ভক্তিহীন), অব্রত (রীতি বা ব্রতহীন), অন্যব্রত (অন্য রীতির অনুসারী) ইত্যাদি। *ঋগ্বেদ*-এ আর্য ও দাসদের বর্ণগত পার্থক্যের ভিত্তি গাত্রবর্ণ, দেহগঠন ও উপাসনা পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য। *ঋগ্বেদ*-এর সংহিতা অংশে (রচনাকাল আনুমানিক খ্রি.পূ. ১৫০০-১০০০ অব্দ) বর্ণ ব্যবস্থার আধুনিক চেহারা তৈরি হয়নি। পুরুষসূক্ত (১০.৮৯) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া গেলেও অংশটি প্রক্ষিপ্ত। এই অংশে 'বর্ণ' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়নি। বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ একবারই (১০.৮৯) মাত্র পাওয়া গেছে সমগ্র *ঋগ্বেদ* সংহিতায়। বর্ণজাতিব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কৌলিক বৃত্তির অনুসরণ *ঋগ্বেদ*-এ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষিত হত না। একটি অংশে (৯.১১২.৩) দেখছি—'আমি মন্ত্রোচ্চারণ করে থাকি, আমার পিতা চিকিৎসক, মা পাথর দিয়ে শস্য পেষাই করেন। নানা উপায়ে আমরা ধনসম্পদ অর্জনে আগ্রহী।'[৫] বর্ণজাতিব্যবস্থার কড়াকড়ি তৈরি হওয়ার আগে আলোচ্য পর্বের ঋগ্বৈদিক সমাজে কি তাহলে সামাজিক সচলতার স্থান ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে *ঋগ্বেদ*-এর যুগের ভূগোল ও অর্থনীতি সম্বন্ধে ধারণা

---

[২] Uma Chakravarty, 'A Glance at the Word Varna in the Vedic Literature, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol.84, 2003, p.2

[৩] তদেব, পৃ.৪-৫

[৪] P.V.Kane, *History of Dharmasastra*(Vol.2, Part-I), Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute,1977, pp.26-27

[৫] তদেব, পৃ. ৩১

প্রয়োজন। আফগানিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের অন্তর্গত পঞ্জাবের দুটি অংশ, হরিয়ানা, নিম্নসিন্ধু উপত্যকার অংশ ও রাজস্থানের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত *ঋগ্বেদ*-এর ভৌগোলিক সীমা। *ঋগ্বেদ*-এর অর্থনীতি মূলত পশুচারণনির্ভর। পশুচারণভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত ঋগ্বৈদিক সমাজ মূলত পরিযায়ী প্রকৃতির। গবাদি পশু এই সমাজের প্রধান ধনসম্পদ। কৃষির উল্লেখ *ঋগ্বেদ*-এ নগণ্য। সমাজের প্রধান সম্পদ বা 'রয়ি'—'গো' বা গবাদি পশু। 'গো' আর 'রয়ি' *ঋগ্বেদ*-এ অনেকক্ষেত্রেই সমার্থক। ধনী ব্যক্তি বোঝাতে *ঋগ্বেদ* সংহিতায় 'গোমৎ' শব্দটির ব্যবহার সুপ্রচুর। 'গো' শব্দটি *ঋগ্বেদ*-এ অন্তত ১৭৬ বার উল্লিখিত।[৬] স্বাভাবিকভাবেই ঋগ্বৈদিক উপজাতিগুলির যুদ্ধের মূল লক্ষ্য গবাদি পশু দখল। *ঋগ্বেদ*-এর প্রধান দেবতা ইন্দ্রের অন্যতম কাজ ছিল শত্রুগোষ্ঠীর গোসম্পদ ছিনিয়ে আনা।[৭] গবাদি পশু লুণ্ঠনের প্রধান নায়ক হিসাবেই গোষ্ঠীপতির গুরুত্ব। লুণ্ঠিত দ্রব্য গোষ্ঠীর মধ্যে পুনর্বণ্টিত হত। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক বৈষম্য খুব প্রকট না হলেও, তার অস্তিত্ব ছিল নানাভাবে। পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে সমান বাঁটোয়ারা হত না। লুণ্ঠনের নেতৃত্বদানকারী রাজা এবং পুরোহিত পরিবারগুলি ভোগ করত এই সম্পদের একটা বড় অংশ।[৮] সম্পদের অসম বিন্যাসের ইঙ্গিত আছে 'মঘবন' শব্দে। *ঋগ্বেদ*-এ 'মঘবন'-এর অর্থ ও খাদ্যসম্পদে ধনশালী ব্যক্তি।[৯] বর্ণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হলেও সচলতার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে নানাভাবে। যেমন—

---

[৬] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.৪৩-৪৪

[৭] রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ গঠন*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ.২৮

[৮] Romila Thapar, *From Lineage to State*, New Delhi: Oxford University Press, Oxford India Paperbacks, 1990, p.26

[৯] K.L.Sharma(ed.), '*Social Inequality in India*', New Delhi: Rawat Publications, Reprint, 2012, p.71

১. *ঋগ্বেদ*-এ উল্লিখিত দাসদের প্রত্যেকেই পরাজিত, নিপীড়িত নন। অনেকেই শাসক এবং বৈদিক সূক্ত রচয়িতা। বলবূথ, তরুক্ষ নামক দাস-গোষ্ঠীপ্রধানরা আর্য পুরোহিতদের প্রচুর দান করেন এবং বিপুল প্রশংসা পান। সম্ভবত আর্থিক প্রতিপত্তির জোরেই বৈদিক পরিমণ্ডলে এঁদের প্রতিষ্ঠালাভ।[১০]

২. ঋগ্বৈদিক গোষ্ঠীর মধ্যে দুটো বড়ো ভাগ দেখছি—ঋষি বা পুরোহিত-কবি গোষ্ঠী আর যোদ্ধৃ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলি আধুনিক অর্থে 'জাত' এর চেহারা নেয়নি তখনও; ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হিসাবেও তাঁদের পরিচিতি ছিল না।[১১] এই ঋষিগোষ্ঠীগুলি অনেকক্ষেত্রেই দাবি করছিল দৈবী উদ্ভবের। যেমন—অঙ্গিরসরা স্বর্গের সন্তান, বশিষ্ঠ বা অগস্ত্য মিত্র ও বরুণের থেকে জাত।[১২] এই যোদ্ধাগোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিরাও অবশ্য কখনো কখনো ঋষি বা পুরোহিত হয়ে উঠেছেন। নতুন সামাজিক পরিচিতি নির্মাণের পথটিতে অবশ্য বাধাবিঘ্নও ছিল যথেষ্ট। যোদ্ধৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি বিশ্বামিত্র পুরোহিত হয়ে উঠতে চাইলে বশিষ্ঠ গোষ্ঠীর তরফে বাধা পান। শেষ অবধি অবশ্য বিশ্বামিত্রের দাবি স্বীকৃতও হয়।

৩. বৈদিক জনসাধারণ বা 'বিশ' এর মধ্যেও উচ্চাবচতা তৈরি হচ্ছিল। জনসাধারণের অবস্থানগত মর্যাদা প্রথমে এক থাকলেও, সামাজিক সম্পর্কের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস জন্ম নিতে থাকে। এই পর্যায়ে স্তরবিভাগটি হয়তো খুব দৃঢ় ছিল না। ঐতিহাসিকদের অনুমান, সামাজিক যোগাযোগের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির সূত্রে 'বিশ' এর যে অংশটি অধিকতর উদ্যোগী, তাঁরাই 'বিশ' এর অন্য অংশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[১০] Haripada Chakraborty, *Socio-Economic Life of India in the Vedic Period*, Calcutta:Sanskrit Pustak Bhandar, 1st Published, 1986, p.5

[১১] Ramaprasad Chanda, *The Indo-Aryan Races: A Study of the Origin of Indo-Aryan People and Institutions*, Calcutta: Indian Studies: Past & Present, Reprint, 1969, p.7

[১২] তদেব, পৃ. ১০

আধিপত্যবিস্তারকারী 'বিশ' এর অংশটুকুর মধ্যেও সকলের ক্ষমতা সমান ছিল না।[১৩] ঋগ্বৈদিক সমাজে ঘোড়ায় টানা রথ আর ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল মূলত বিত্তশালীদের অধীন। সামাজিক বৈষম্যের এও এক ইঙ্গিত।[১৪]তবে, *ঋগ্বেদ*-এর যুগে সূক্ত রচনার ধারাটি জারি ছিল বলেও সম্ভবত সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে একটা চলাচল ছিল। কারণ, কবিপ্রতিভা বা দৈবীপ্রতিভা কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জন্মগত অর্জন হতে পারে না।[১৫] এই কালপর্বে বর্ণব্যবস্থা পাকাপোক্তভাবে তৈরি না হলেও বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মধ্যে চলাচল বা গতিময়তার কারণ ব্যক্তিপ্রতিভা, আর্থিক প্রতিপত্তি, সামাজিক যোগাযোগ, ধর্ম বিষয়ে আধিপত্য ইত্যাদি। এই সূত্রে পরবর্তী বৈদিক পর্বের বর্ণজাতিব্যবস্থার আলোচনা করা যেতে পারে।

পরবর্তী বৈদিক যুগের (আনুমানিক খ্রি.পূ. ১০০০-৬০০ অব্দ) আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের মূল অবলম্বন সাম, যজু:, অথর্ব সংহিতা, বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সমূহ। পরবর্তী বৈদিক যুগে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের বদল হয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণদিকের জনবসতি সম্পর্কে আর্যদের ধারণা তৈরি হচ্ছিল। গঙ্গা ও যমুনা অনেক গুরুত্বসহ এই পর্বের বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ পাঁচটি প্রধান এলাকার উল্লেখ আছে—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চল। শেষোক্ত অঞ্চলটিই পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ মধ্যদেশ। পরবর্তী বৈদিক পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি নদী—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী। গাঙ্গেয় উপত্যকার সঙ্গে পরিচয় তৈরি হচ্ছিল; তবে মূলত উত্তর ও পশ্চিম অংশের সঙ্গে। পাশাপাশি এযুগে পঞ্জাব থেকে ক্রমে জনবসতি সরে আসছিল পূর্বদিকে।[১৬] *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এর একটি

---

[১৩] Kumkum Roy, *The Emergence of Monarchy in North India Eighth-Fourth Centuries B.C*, Delhi: Oxford University Press, 1st Published, 1994, p.212

[14] ইরফান হাবিব, বিজয় কুমার ঠাকুর, *বৈদিক সভ্যতা*, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ.১৫

[১৫] Nripendra Kumar Duta, *Origin and Growth of Caste in India*, Calcutta: Firma K L M Pvt. Ltd., First Combined Reprint Edition, 1986, p.33

[১৬] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, পৃ. ৫৫-৫৬

আখ্যানে এই সূত্র পাওয়া যাবে। অগ্নিদেবতাকে অনুসরণ করতে করতে সদানীরা (গণ্ডক নদী) পর্যন্ত এসে থামলেন বিদেঘ মাঠব নামে এক ব্রাহ্মণ। তখনও অবধি কোন আর্য সদানীরা নদী অতিক্রম করেনি। অগ্নিদেব মাঠবকে নির্দেশ দিলেন তাঁকে নদীর অপর পারে নিয়ে যেতে। এইভাবে নদীর অপর পারের রাজ্য আর্য নিয়ন্ত্রণে এল। বিদেঘ মাঠবের নামানুসারে নতুন প্রদেশের নাম হল বিদেহ।[১৭] পূর্বমুখী অভিপ্রয়াণের এই এক সাহিত্যিক ইঙ্গিত। আর্যরা যত ভারতের গভীরে প্রবেশ করেছে তত ক্ষীণ হয়ে গেছে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের আদি বাসভূমির স্মৃতি। পরবর্তী বৈদিক যুগের সাহিত্যে পূর্বতন বাসভূমি সম্পর্কে আছে তাচ্ছিল্য ও অবহেলা।[১৮] ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের পাশাপাশি বদলে যাচ্ছিল অর্থনীতিও। পশুচারণভিত্তিক সমাজ ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছিল কৃষিজীবী সমাজে। *অথর্ববেদ*-এ দেখা যাচ্ছে, আর্যরা মূলত কৃষিজীবী, ব্রাত্যরাই মূলত বৈদিক ধর্মের বিরোধী ও কৃষিকাজের সঙ্গে সংস্রববহীন। সম্ভবত, পশুচারণের সংস্কৃতির কথা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল এই পর্বের মানুষের মন থেকে।[১৯] কৃষিজীবী সমাজের সূত্র ধরেই বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। তার সঙ্গে স্পষ্ট ভাবে বেড়েছে সামাজিক স্তর বোঝাতে 'বর্ণ' শব্দটির ব্যবহার। *ঋগ্বেদ*-এ যেখানে 'বর্ণ' শব্দটি মোট ২৩ বার ব্যবহৃত বিভিন্ন অর্থে, সেখানে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ মিলিয়ে 'বর্ণ' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে ১৬০ বার।[২০] ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্য ও শূদ্রের সামাজিক মর্যাদার তারতম্যও এই পর্বে স্পষ্ট। কৃষিজীবী সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে উদ্বৃত্তের ধারণা। এই উদ্বৃত্তের সূত্রে রাজন্যবর্গ কর আদায়কে বাধ্যতামূলক করেছে। ঋগ্বৈদিক যুগে এই কর ছিল স্বেচ্ছাপ্রদত্ত। পরবর্তী

---

[১৭] এ.এল.ব্যাশাম, *অতীতের উজ্জ্বল ভারত,* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ৫৭

[১৮] তদেব, পৃ.৫৯

[১৯] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে,* পৃ.৫৭

[২০] Uma Chakravarti, 'A Glance at the Word Jati in the Vedic Literature', Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol.86(2005), p.129

বৈদিক যুগে রাজার উপাধি বলিহৃৎ-বলি আহরণকারী ব্যক্তি।[২১] সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ। এই গ্রন্থ অনুযায়ী বৈশ্য বলিকৃৎ (শাসকের জন্য বলি বা কর উৎপাদনকারী), যথাকামোত্থাপ্য (যাকে যথেচ্ছ উৎখাত করা যায়), যথাকামপ্রেষ্য (যাকে যথেচ্ছ অত্যাচার করা যায়)।[২২] শূদ্রকে অন্যে শোষণ করতে পারে (অন্যস্য প্রেষ্য), কামোত্থাপ্য (ইচ্ছেমত উৎখাত করা যায়) ও যথাকামবধ্য (ইচ্ছেমত হত্যা করা যায়)। বৈশ্য ও শূদ্রের ভেদ ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে পড়ছিল।[২৩] *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-র (৫.৭.৬.৪) একটি অংশে দেখা যাচ্ছে বৈশ্য ও শূদ্র কার্যত একই বন্ধনীভুক্ত। যদিও বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে বৈশ্য-শূদ্রের দূরত্ব ছিলই। অশ্বমেধ যজ্ঞে শূদ্র উপস্থিত থাকতে পারলেও অভিষিক্ত হওয়ার বা যজ্ঞগৃহে প্রবেশের অধিকার পায়নি। এমনকি, সোমরস পানের অধিকারও তাদের নেই।[২৪] পাশাপাশি এই কালপর্বেই *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য় ব্রাহ্মণদের সরাসরি দেবতা বলা হয়েছে।[২৫] ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক অবস্থান বিষয়ে তর্কের অবশ্য সমাধা হয়নি। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ দেখছি—ক্ষত্রের চেয়ে উঁচু কেউ নয়; রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণ নিচেই বসবেন। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-তে বর্ণিত আরেকটি অনুষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত ফল ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রদের ক্ষত্রিয়ের অধীনতা স্বীকার।[২৬] সামাজিক সচলতার নিদর্শনও ছিল এই সময়পর্বে—

---

[২১] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, পৃ. ৬৫

[২২] রণবীর চক্রবর্তী, ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ১১৭

[২৩] তদেব; এই বিশেষণগুলো সম্পর্কে ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন অরবিন্দ শর্মা, 'An Analysis of Three Epithets Applied to the Sudras in Aitareya Brahmana VII.29.4', Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol.18, No.3,(Oct. 1975), pp. 300-317

[২৪] Nripendra Kumar Duta, *Origin and Growth of Caste in India*, p. 68-69

[২৫] Rajendranath Sharma, *Brahmins Through The Ages*, Delhi: Ajanta Publications, 1st Published, 1977, p.46

[২৬] তদেব,পৃ.৫২

১. শূদ্র বর্ণের মধ্যে রথকার এবং তক্ষণের স্থান বেশ উঁচুতে। *যজুর্বেদ*-এর শতরুদ্রীয় অংশে রথকার এবং তক্ষণ রুদ্রদেবের বিশেষণ। যজু: সংহিতায় রত্নিনদের মধ্যে রথকারের উল্লেখ আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াটির রক্ষকও রথকার।[২৭] এদিক থেকে দেখলে শূদ্রবর্ণের সকলে একই মর্যাদাভুক্ত নয়, উচ্চাবচ অবস্থায় আসীন। যদিও, রথকারের বর্ণ নিয়ে তর্ক আছে। জৈমিনি *পূর্বমীমাংসা সূত্র*-এ বলেছেন, রথকার বর্ণ মর্যাদায় শূদ্রের উপরে এবং তিন উচ্চবর্ণের ঈষৎ নিচে।[২৮]

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যাচ্ছে কোন কোন শূদ্র বিপুল গবাদিসম্পদের অধিকারী। সম্পদ হিসাবে গবাদি পশুর গুরুত্ব তখনও অবধি যথেষ্ট। সম্পদশালী শূদ্ররা সম্ভবত *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এর 'অন্যস্য প্রেষ্য', 'যথাকামবধ্য' শূদ্রদের পর্যায়ভুক্ত নন।[২৯]

২. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এর বয়ান অনুযায়ী বৈশ্যদের হীন সামাজিক মর্যাদার একটা ছবি তৈরি হলেও সমস্ত বৈশ্যদের অবস্থা একরকম ছিল না। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য় দেখা যাচ্ছে তৎকালীন সামাজিক সংগঠনের অন্যতম উচ্চপদ 'গ্রামণী'-র জন্য বৈশ্যরা আবেদন করতেন। ধনশালী বৈশ্যদের এই পদে অভিষিক্ত করতেন রাজা।[৩০] সাধারণ বৈশ্যদের থেকে 'গ্রামণী' বৈশ্যদের খুব সহজেই আলাদা করা যায়।

৩. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ ইলূষপুত্র কবুষের বৃত্তান্তে দেখছি দাসীপুত্র ইলূষকে সরস্বতীর তীরবর্তী যজ্ঞস্থলে ঋষিরা কবুষের উপস্থিতি মেনে নিতে পারেননি, দাসীপুত্র কবুষের রক্তের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁরা সরস্বতী নদী থেকে বহু দূরবর্তী একটি জলহীন অঞ্চলে কবুষকে

---

[২৭] U.N.Ghoshal, *A History of Hindu Public Life*(Part-I), Calcutta: Ramesh Ghoshal,[ ], [], pp.134-135

[২৮] P.V.Kane, *History of Dharmasastra*(Vol.2, Part-I), p.45

[২৯] Jaimal Rai, *The Rural- Urban Economy and Social Changes in Ancient India*, Varanasi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1st Edition, 1974, p. 308

[৩০] তদেব, পৃ.৩০৬-৩০৭

নির্বাসনে পাঠান। কিন্তু কবুষের উপর দৈবী শক্তিপাত হয়, তিনি বৈদিক সূক্ত রচনা করেন, সরস্বতী নদী তাঁর চারপাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে ঋষিরা অভিভূত হয়ে তাঁকে সাদরে নিজেদের বৃত্তে গ্রহণ করেন।

ধর্মীয় পরিসরে জন্মগত অবস্থান বা রক্তের বিশুদ্ধিতে নজর পড়ছিল বোঝাই যাচ্ছে। তবে আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য ও শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক স্তরের দূরত্ব এই পর্বে ছিল অতিক্রমযোগ্য। কবুষের আখ্যান বুঝিয়ে দিচ্ছে এই সময়েও জন্মগত অবস্থান মানুষের সামাজিক মর্যাদার একমাত্র নির্ধারক নয়।[৩১] আবার, বৈশ্য ও শূদ্রবর্গের অভ্যন্তরীণ স্তরভেদ সৃষ্টিতে আর্থিক প্রতিপত্তিই মূল কারণ।

পরবর্তী সময়ে বৈদিক সাহিত্য সম্ভারের অংশ হিসাবে রচিত হচ্ছে বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গের সূত্র অংশটি (শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র) আমাদের আলোচনায় বিশেষ জরুরি। চারটি প্রধান ধর্মসূত্র (গৌতম, আপস্তম্ব, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ) আনুমানিক ৬০০ খ্রি.পূ.- ১০০ খ্রি.পূ. সময়কালের মধ্যে রচিত। শ্রৌতসূত্র বা গৃহ্যসূত্রগুলির অধিকাংশও এই সময়েরই রচনা। পাশাপাশি আমরা পাচ্ছি বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি অংশকে। বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে নানা সময়ের প্রক্ষেপ আছে। বৌদ্ধ জাতকগুলির ভিত্তিতে এই পর্বের সামাজিক পরিস্থিতি বিচারের চেষ্টা করেছিলেন রিচার্ড ফিক এবং রিজ ডেভিডস। তবে ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন জাতকের কাহিনিগুলির বর্তমান রূপ খ্রি. দ্বিতীয় শতকের আগে নয়।[৩২] বরং, এই পর্বের সমকালীন রচনা *বিনয়পিটক, দীঘনিকায়, মজঝিমনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়* ও *সুত্তনিপাত*। এই সময়পর্বেই রচিত হচ্ছে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (খ্রি.পূ. পঞ্চম শতক)। ৬০০ খ্রি.পূ. এর পর থেকে

---

[৩১] Jogiraj Basu, *India of the Age of the Brahmanas*, Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1st Published, 1969, pp.29-31; Ashutosh Biswas, 'Society and Culture in the Brahamana Period: Notes from the Aitareya Brahmana', Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol.13, No.2(1931-32), pp. 145-146

[৩২] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, পৃ.৭১

পরবর্তী তিন শতক জুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্রে ছিল মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা। গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরাংশে কৃষিজীবনের যে বিকাশ শুরু হয়েছিল তা আরও গতিপ্রাপ্ত হল এই অঞ্চলে এসে। এই সময়পর্বের প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ লোহার কুডুলের সংখ্যা লক্ষণীয়। মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার ঘন বনাঞ্চল পরিষ্কার করে কৃষিজমি সৃষ্টির কাজে এগুলি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষির গুরুত্ববৃদ্ধির কারণে *সংযুক্তনিকায়, বিনয়পিটক* প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষিকে উচ্চমর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[৩৩] কৃষি অর্থনীতিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্তের সূত্র ধরে গড়ে উঠল নগরজীবন। একইসঙ্গে প্রকট হল সামাজিক বৈষম্য। এই পর্বের ষোড়শ মহাজনপদগুলির অধিকাংশই এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই নগরগুলিকে কেন্দ্র করেই এসময় বিকশিত হচ্ছে শ্রামণ্য ধর্মমতের বিভিন্ন ধারা। গৃহ্যসূত্র বা ধর্মসূত্রের মত নির্দেশমূলক গ্রন্থ থেকে এই সময়কালে ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার একটা ছবির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ইতিপূর্বে বৈদিক সাহিত্য সম্ভারে আর্য ও দাস বর্ণ, বিজয়ী ও বিজিতের দ্বিকোটিক বিন্যাস লক্ষ করা গেছে। সূত্র সাহিত্যে মৌল বিভাজন দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) ও একজাতি (শূদ্র)-র। এই বিভাজন গাত্রবর্ণ বা আকারগত নয়; বরং ধর্মীয় সংস্কারগত এবং সামাজিক।[৩৪] যদিও, দ্বিজাতিভুক্ত বর্ণগুলির মধ্যেও স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছে সূত্রসাহিত্য। যেমন: *শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র* -এর মতে ব্রাহ্মণ সন্তানের চূড়াকর্মের উপযুক্ত বয়স এক বা তিনবছর; ক্ষত্রিয় সন্তানের পাঁচ বছর, বৈশ্যের সাত বছর।[৩৫] উপনয়নের বিধানে আট বা দশ বছর বয়সী ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নের কথা থাকলেও ক্ষত্রিয়ের উপনয়নের উপযুক্ত বয়স এগারো, বৈশ্যের বারো।[৩৬]

---

[৩৩] তদেব, পৃ. ৭৩

[৩৪] Nripendra Kumar Duta, *Origin and Growth of Caste in India*, p.89

[৩৫] F. Max Muller(ed.), *The Sacred Books of the East*(Vol.29), Oxford: Clarendon Press, 1st Published, 1886, p. 55

[৩৬] তদেব,পৃ.৬০

ব্রাহ্মণের উপনয়নের উপযুক্ত ঋতু বসন্ত, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্ম, বৈশ্যের শরৎ।[৩৭] সামগ্রিক জীবনচর্যাতেই বর্ণগত পার্থক্য নির্দেশ করেছে সূত্রসাহিত্য। *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র*-এ গৃহনির্মাণের জন্য জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক বর্ণের জন্য রয়েছে আলাদা বিধান।[৩৮] দানের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি বর্ণ গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। ব্রাহ্মণ গো-দান করবেন, রাজা গ্রাম দান করবেন আর বৈশ্য ঘোড়া দান করবেন বিবাহ অনুষ্ঠানে।[৩৯] ভূমিদানের বিধান থকে বোঝা যাচ্ছে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা প্রতিষ্ঠিত। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র*-এর বয়ান অনুসারে একজন দশ বছর বয়সী ব্রাহ্মণ বালক ও একশো বছর বয়সী ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। তাঁদের দুজনের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের।[৪০] আবার *গৌতম ধর্মসূত্র*-এর মতে, ক্ষত্রিয় রাজা এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই আদর্শ জীবনচর্যায় রত। তাঁদের উপরই চতুর্বর্ণব্যবস্থা নির্ভরশীল।[৪১] গৌতম এবং বৌধায়নের ধর্মসূত্রে রাজাকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নির্দেশ মেনে চলতে বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের কর্তব্য নির্দেশ করবেন এবং সেগুলি সমাজে বলবৎ করবেন রাজা।[৪২] সমাজ পরিচালনায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই সংযোগ প্রত্যাশিত হলেও ব্রাহ্মণের বর্ণগত আধিপত্য সম্বন্ধে ধর্মসূত্রে কোন সংশয় নেই। সেকারণে একমাত্র ব্রাহ্মণই করছাড় পাবেন।[৪৩] সাধারণক্ষেত্রে উত্তরাধিকারহীন সম্পত্তি রাজার হস্তগত হয়, তবে সম্পত্তিটি ব্রাহ্মণের হলে তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়াই বিধেয়।[৪৪] উপনয়ন বা অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কারে

---

[৩৭] Patrick Olivelle(tr.), *Dharmasutras: The Law Codes of Ancient India,* New York: Oxford University Press,1st Published, 1999, p.8

[৩৮] F. Max Muller(ed.), *The Sacred Books of the East*(Vol.29), p.212

[৩৯] V.M.Apte, *Social and Religious Life in the Grihya Sutras*, Bombay: The Popular Book Depot, Reset Ediotion, 1954, p.7

[৪০] Patrick Olivelle(tr.), *Dharmasutras: The Law Codes of Ancient India,* p. 18

[৪১] তদেব,পৃ.৯০

[৪২] U.N.Ghoshal, 'The Status of the Brahmanas in the Dharmasutras', The Indian Historical Quarterly, Vol.XXIII, No.2, June 1947, p.89

[৪৩] তদেব, পৃ.৮৮

[৪৪] তদেব, পৃ.৮৫

পার্থক্য থাকলেও দেখা যাচ্ছে, গৌতম বৈশ্য ও শূদ্রের ক্ষেত্রে একই কুশল সম্বোধন নির্দেশ করছেন। সামাজিক জীবনে বৈশ্য-শূদ্রের পেশাগত পার্থক্যও বিশেষ ছিল না। উচ্চবর্ণের পেশাগুলির অনুসরণ সম্ভব না হলে বৈশ্য শূদ্রের পেশা গ্রহণ করতে পারত, আবার আপৎকালে শূদ্রও গ্রহণ করত বৈশ্যবৃত্তি।[৪৫] এই কালপর্বের সূত্রসাহিত্যে শূদ্রের হাতে প্রস্তুত খাদ্যগ্রহণও নিষিদ্ধ নয়; নিষিদ্ধ কেবল শূদ্রের উচ্ছিষ্টভক্ষণ।[৪৬] ঋগ্বৈদিক বা পরবর্তী বৈদিক যুগে 'বর্ণ' শব্দটির ব্যবহার দেখলেও বেদাঙ্গে অবশ্য 'জাতি' শব্দের ব্যবহারই বেশি। বেদাঙ্গে 'বর্ণ' আর 'জাতি' শব্দদুটি যথাক্রমে রয়েছে ৯৮ ও ৯৯ বার।[৪৭] সামাজিক স্তর বোঝাতে 'বর্ণ' এর পাশাপাশি 'জাতি' ধারণার প্রয়োগ এই সময়পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় আসার সূত্রে বৈদিক আর্য জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বৃত্ত যত বাড়ছিল তত পরিচিতি তৈরি হচ্ছিল একাধিক কৌমগোষ্ঠীর সঙ্গে। যে জাতিগুলিকে বর্ণসংকর বলা হচ্ছিল তাদের অধিকাংশের নামই উপজাতি বা স্থানবাচক।[৪৮] এই কৌমগোষ্ঠীগুলি ক্রমশ বর্ণব্যবস্থার অংশ হতে থাকে। এই অবস্থায় চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যেই জাতি নামক ব্যবস্থার জন্ম। জাতি যেমন অন্তর্বিবাহের কথা বলে, তেমনই জোর দেয় বংশানুক্রমিক বৃত্তির অনুসরণে। ফলে একই বর্ণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একাধিক জাতির অস্তিত্ব। বর্ণের কাঠামোর মধ্যে জাতির উপবিভাগ সম্ভবত শূদ্র বর্ণের ক্ষেত্রেই প্রথমে দেখা যাচ্ছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের মধ্যেও এই উপবিভাগ লক্ষ করা গেছে।[৪৯] গোত্র ও চরণের ভেদ অনুসারে অনেক জাতির বিকাশ লক্ষ করা গেছে পাণিনির রচনায়।[৫০] সূত্রসাহিত্যের পর্বে বর্ণজাতিব্যবস্থার আরও দুটি দিক নজর কাড়ে। এক,

---

[৪৫] Nripendra Kumar Duta, *Origin and Growth of Caste in India*, pp. 114-115

[৪৬] তদেব, পৃ.১১৯

[৪৭] Uma Chakravarti, 'A Glance at the Word Jati in the Vedic Literature', p. 129

[৪৮] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা*, কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃ. ২৪

[৪৯] Dev Nathan(ed.), *From Tribe to Caste*, Shimla: IIAS, 1st Published, 1977, pp.170-171

[৫০] বাসুদেব শরণ অগ্রবাল, *পাণিনিকালীন ভারতবর্ষ*, বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, ২০১৪, পৃ.৮৯

পরবর্তী বৈদিক যুগের রচনায় বর্ণগুলির পারস্পরিক অবস্থান সংক্রান্ত তর্ক ছিল। ধর্মসূত্রে অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই পরিচিত ক্রমটিই পাওয়া যাচ্ছে।[৫১] পূর্ববর্তী যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সংঘাতের নিদর্শন থাকলেও এযুগের সূত্রসাহিত্য সেবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।[৫২] দুই, বর্ণসংকরের ধারণাটা প্রথম পাওয়া যাচ্ছে ধর্মসূত্রেই। বর্ণসংকরের ধারণাটি অনেক ঐতিহাসিকদের মতেই একটি অলীক কাঠামোমাত্র। বিভিন্ন বর্ণের পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে নতুন নতুন গোষ্ঠীর উৎপত্তি—এই তত্ত্ব আসলে ব্রাহ্মণ্য বর্ণকাঠামোকে মৌল চেহারা বজায় রেখেই আশ্চর্য নমনীয়তা দিয়েছিল। অনেকেই মনে করেছেন বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট একেকটি বর্ণসংকরগোষ্ঠী কেবল বিভিন্ন বর্ণের বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে তৈরি হতে পারে না। নিষাদদের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাগার্য গোষ্ঠীকে বর্ণসংকর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ, *রামায়ণ* ও মহাভারত-এও নিষাদরাজ্যের কথা আছে।[৫৩] এই বিপুল জনসংখ্যা কেবল অসবর্ণ বিবাহের ফলে উৎপন্ন—এমন তত্ত্ব ধোপে টেকে না। কার্যত তিন ধরনের মানুষের অস্তিত্ব বর্ণসংকরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে—১। পশ্চাৎপদ আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ২। অধঃপতিত কারিগর শ্রেণি, ৩। বর্ণবিধি লঙ্ঘনকারী গোষ্ঠী বা ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডল বহির্ভূত গোষ্ঠী।[৫৪] চণ্ডাল বা নিষাদদের উল্লেখ পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যেও পেয়েছি, কিন্তু বর্ণসংকর হিসাবে তাদের পরিচিত করা হচ্ছে ধর্মসূত্রগুলিতেই। যেখানে বর্ণসংকর হিসাবে চণ্ডাল এত ঘৃণিত সেখানে এক বিপুলাকার জনগোষ্ঠী প্রবলতম সামাজিক বাধা অতিক্রম করে ব্রাহ্মণ নারী-শূদ্র পুরুষের অবৈধ মিলনে উৎপন্ন হয়েছে—এমনটা বিশ্বাস করা দুষ্কর। আবার, পূর্ববর্তী

---

[৫১] Dev Nathan(ed.), *From Tribe to Caste*, p. 178

[৫২] Rajendra Nath Sharma, *Culture and Civilization as Revealed in the Srautasutras*, Delhi: Nag Publishers, 1st Published, 1977, p.57

[৫৩] Ram Gopal, *India of Vedic Kalpasutras*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd, 1st Published, 1983, pp. 115-116

[৫৪] V.N.Jha, ‘Varnasamkara in the Dharmasutras: Theory and Practice’, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol.XIII, 1970, pp.287-288

যুগের মর্যাদাযুক্ত পেশাদার গোষ্ঠী—রথকারদেরও ধর্মসূত্রে দেখছি বর্ণসংকরের তালিকায়।[৫৫] এইসমস্ত গ্রন্থের ভিত্তিতে বর্ণজাতিব্যবস্থায় সচলতার কতকগুলি নিদর্শনও চোখে পড়ে—

১. ব্রাহ্মণ সাহিত্যে রথকারের সামাজিক ও ধর্মসংস্কারগত মর্যাদার তুলনায় এই যুগে বেশ খানিকটা অধঃপতন দেখা যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সাধারণ শূদ্রের থেকে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী রথকার পরবর্তীযুগে সম্ভবত একাধিক দক্ষ পেশাদারি গোষ্ঠীর উত্থানের ফলে মর্যাদা বেশ কিছুটা খুইয়ে বসেন।[৫৬] 'বর্ণসংকর' হিসাবে আখ্যাত হওয়ার দরুণ সংস্কার অধিকার বেশ কিছুটা হ্রাস পায়। যদিও, পূর্ববর্তী যুগের রেশের কারণেই সম্ভবত *বৌধায়ন ধর্মসূত্র*-এ রথকারদের উপনয়নবিধি নির্দেশিত।[৫৭] শ্রৌতসাহিত্যেও বর্ষাকালে রথকারকে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালের ভাষ্যকাররা রথকারের উপনয়নের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য, রথকার দ্বিজ নন; কাজেই উপনয়নের প্রশ্নটি অবান্তর। কেবল যজ্ঞাগ্নি রক্ষার বিধানটিকে কেন্দ্র করেই রথকারের উপনয়ন সংক্রান্ত এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি।[৫৮]

২. ব্রাহ্মণদের সকলেই সমমর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অধঃপতিত ব্রাহ্মণদের শূদ্রদের সমতুল মনে করেছে। নিষিদ্ধ জিনিষপত্রের বিক্রয়কার্যে যুক্ত ব্রাহ্মণরাও শূদ্র বা অন্ত্যজতুল্য। এমনকি, বৌধায়ন ধর্মসূত্রের বিধান অনুসারে যে ব্রাহ্মণরা ত্রিসন্ধ্যা পালন করেন না তাঁদের রাজা শূদ্রের বৃত্তিতে নিযুক্ত করতে পারেন।[৫৯] আচারনিষ্ঠার সঙ্গে সামাজিক

---

[৫৫] তদেব, পৃ. ২৮৩-২৮৫

[৫৬] A.C.Banerjea, *Studies in the Brahmanas*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd, 1st Edition, 1963, p. 80

[৫৭] V.N.Jha, *Candala: Untouchability and Caste in Early India*, Delhi: primus Books, 1st Published, 2018, p.64

[৫৮] Ram Gopal, *India of Vedic Kalpasutras*, p.117

[৫৯] U.N.Ghoshal, 'The Status of the Brahmanas in the Dharmasutras', pp. 90-91

মর্যাদার যোগ ও সামাজিক স্তরের উন্নতি-অবনতি একটা লক্ষণ হিসাবে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। বিশেষত, ব্রাহ্মণ বর্ণের ক্ষেত্রে।

৩. বৈশ্যদের মর্যাদাহানি বিগত যুগেই কিছুটা লক্ষ করা গিয়েছিল। ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে সূত্রসাহিত্যের পর্বে দেখছি *শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র* বাজপেয় যজ্ঞে দ্বিজাতিমাত্রের অধিকার স্বীকার করলেও, বেশিরভাগ শ্রৌতসূত্রেই এই অধিকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দিষ্ট। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেবল ক্ষত্রিয়ের জন্য।[৬০]

ব্রাহ্মণ্য নির্দেশমূলক গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত সমাজব্যবস্থার ছবিটি বাস্তবের সঙ্গে কতদূর সংগতিপূর্ণ তা বোঝা যেতে পারে সমকালীন বৌদ্ধ সাহিত্যের সূত্রে। রিজ ডেভিডসের ধারণা ছিল আদিযুগের বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণত জাতপাতবিরোধী। অন্যদিকে ওল্ডেনবার্গের অভিমত, প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে অভিজাতশ্রেণির প্রতি একটা ঝোঁক চোখে পড়ছিল এবং গৌতম বুদ্ধকে নিম্নশ্রেণির রক্ষাকর্তা মনে করার কোন কারণ নেই।[৬১] বুদ্ধ সরাসরি বর্ণজাতিব্যবস্থাকে অস্বীকার করেননি। ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থার তুলনায় বুদ্ধের বর্ণবিভাগ সম্পর্কিত ক্রমটি আলাদা—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণের বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব বুদ্ধ সরাসরি অস্বীকার করেছেন।[৬২] *দীঘনিকায়*-এর অগ্‌গঞ্ঞ সূত্রে বৌদ্ধদের জগৎ-উদ্ভব সংক্রান্ত ধারণাটি পড়লে দেখা যাবে চৌর্য, নিন্দা ইত্যাদি পাপধর্মের অবসানকল্পে প্রথমে ক্ষত্রিয়ের আবির্ভাব হচ্ছে। তারপরে ব্রাহ্মণের আবির্ভাব।[৬৩] ব্রাহ্মণ্য সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে পার্থক্য সুস্পষ্ট। *মজ্‌ঝিম নিকায়*-এর মধুরা সূত্তেও বুদ্ধ জানান কেবল নিম্নতর বর্ণগুলির সেবাপ্রাপ্তির কারণেই ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারেন

---

[৬০] U.N.Ghoshal, *A History of Hindu Public Life*(Part-I), pp.136-137

[৬১] Uma Chakravarti, *The Social Dimension of Early Buddhism*, New Delhi: Munshiram Manoharlal, Reprint, 1996, pp. 95-96

[৬২] তদেব, পৃ.৯৮

[৬৩] ভিক্ষু শীলভদ্র(অনূদিত), *দীঘনিকায়,* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০৬, পৃ. ৪৪৬-৪৪৭

না। প্রতিপত্তিশালী শূদ্রও অন্যের সেবা আদায় করতে পারে।[৬৪] ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে বুদ্ধ সামাজিক অবস্থানগত ভেদকে একেবারেই আপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছেন। বৌদ্ধ সংঘে জাতিভেদ ছিল না। *সূত্তনিপাত* এর একটি আখ্যানে বুদ্ধ বলছেন—চার বর্ণের চারটি পাখি তাঁর পায়ে এসে পড়ল এবং প্রত্যেকেই হয়ে গেল শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। এই রূপকটি সংঘে বর্ণভেদের গুরুত্বহীনতার প্রমাণ।[৬৫] নৈতিক চরিত্র নির্মাণে জাতির ভূমিকা থাকে না—এবিষয়েও বুদ্ধ সচেতন। উচ্চকুলজাত ব্যক্তি খুনি, ডাকাত, মিথ্যুক হতেই পারে। জন্ম সচ্চরিত্রের নির্ধারক নয়।[৬৬] *দীঘনিকায়*-এর *অম্বট্‌ঠ* সূত্তে দেখছি বুদ্ধের মতে জাতিবাদ কেবল বিবাহসম্পর্কে কার্যকরী; প্রজ্ঞা বা ধর্মাচরণে নয়।[৬৭] উচ্চকুলের আলোচনায় বুদ্ধ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গহপতিদের কথা বলেছেন। ক্রমটি সর্বত্রই এইরকম। এমনকি, নিম্নকুলের ক্ষেত্রেও ক্রমের তারতম্য হয়নি। যদিও, উচ্চ বা নিচকুলের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের স্পষ্ট ইঙ্গিত পালি সাহিত্যে নেই।[৬৮] গহপতি বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্যে উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসূচক শব্দ। কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত সম্পদশালী ব্যক্তিমাত্রেই গহপতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারতেন—তিনি যে বর্ণেরই হোন না কেন।[৬৯] বিভিন্ন বর্ণের মানুষই গহপতি হতে পারতেন—এথেকে বোঝা যায় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশার বাইরেও অনেকে অন্য পেশার অনুসরণ করতেন। গহপতিকে উচ্চকুলের অংশ হিসাবে দেখে বুদ্ধ কৃষিকার্যের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গুরুত্ব যেমন স্বীকার করেন, তেমনই বুঝিয়ে দেন অর্থনীতিই সমাজব্যবস্থার প্রাণ।[৭০] আবার, বৈশ্যদের গুরুত্বহ্রাস ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হলেও

---

[৬৪] Uma Chakravarti, *The Social Dimension of Early Buddhism*, p.99

[৬৫] তদেব, পৃ.১০৯

[৬৬] Y.Krishan, 'Buddhism and the Caste System', The Journal of the International Association of Buddhist Studies, Vol.9, 1986, p.81

[৬৭] Uma Chakravarti, *The Social Dimension of Early Buddhism*, p.110

[68] তদেব, পৃ.১১৮, যদিও নরেন্দ্র ওয়াগলে এই ক্রমটিকে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের ইঙ্গিত হিসাবেই পড়তে চেয়েছেন। Narendra Wagle, *Society at the Time of Buddha*, Bombay: Popular Prakashan, 2nd Edition, 1995, p.155

[৬৯] রণবীর চক্রবর্তী, ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড),পৃ.১৭০

[৭০] Uma Chakravarti, *The Social Dimension of Early Buddhism*, p.118

বৌদ্ধসাহিত্যে বৈশ্যদের আর্থিক প্রতিপত্তির অজস্র নিদর্শন আছে। বৌদ্ধ সংঘ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল বৈশ্যদের দানে। বিশেষত খ্রি.পূ. ৬০০-খ্রি.পূ. ৩০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালে কৃষি অর্থনীতির ভিতের উপর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাণিনির রচনায় বাণিজ্যের মূল দুটি অংশ—ক্রয়বিক্রয়ের উল্লেখ আছে। প্রাচীন পালি শাস্ত্রে ধনী বণিক (সেট্‌ঠি) এবং ভ্রাম্যমাণ বণিক (সার্থবাহ)-দের বিপুল সম্পত্তি ও সামাজিক মর্যাদা বর্ণিত। মুদ্রাব্যবস্থার উদ্ভব বাণিজ্য অর্থনীতিকে আরও জোরালো করে।[৭১] কৃষির সঙ্গে বাণিজ্যের একটি চমৎকার তুলনা আছে পালি সাহিত্যে। কৃষিপণ্য উৎপাদন শ্রমসাপেক্ষ, দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং অনেকাংশে প্রাকৃতিক সাহায্য নির্ভর। কিন্তু বাণিজ্যে অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকে।[৭২] বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বণিকরা একই যাত্রাপথ ধরে চলতেন। সেই সুবাদে তাঁদের মধ্যে যে নৈকট্য গড়ে উঠেছিল বলে আশা করা যায়, তার ছাপ পড়েছিল বৌদ্ধদের বাণিজ্য এবং বণিকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে। অর্থনীতির নবতম প্রবণতাকে বৌদ্ধরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই তৈরি হয়েছিল বৌদ্ধ সমাজে বণিকের মর্যাদা।

মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার মহাজনপদগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল মগধ। খ্রি.পূ. ৩২৫ অব্দ থেকে মগধে মৌর্য শাসনকালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড়ো মাপের পালাবদল দেখা যায়। মৌর্যরা প্রায় সর্বভারতীয় একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। অশোকের অনুশাসনগুলির প্রাপ্তিস্থান থেকে বোঝা যায়, উত্তরে আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণে কর্ণাটকের উত্তরাংশ পর্যন্ত, পশ্চিমে কাথিয়াওয়াড় থেকে পূর্বে কলিঙ্গ অবধি মৌর্য আমলে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার স্বার্থে দক্ষ সেনাবাহিনী ও প্রশাসনব্যবস্থা প্রয়োজন, আর বৃহদায়তন সেনাবাহিনী ও অসংখ্য রাজকর্মচারীর

---

[৭১] Ranavir Chakravarti, *Trade and Traders in Early Indian Society*, New Delhi: Manohar, 1st Paperback Edition, 2007, p.43

[৭২] তদেব,পৃ. ২৪

ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজন প্রচুর সম্পদ। একারণে রাজস্বব্যবস্থায় বিশেষ নজর দেওয়া হল মৌর্যযুগে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্রীয় তদারকির মাধ্যমে তৈরি হল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি।[৭৩] এই পর্বের ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে গ্রিক দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণী *ইণ্ডিকা* হারিয়ে গেলেও তা কিছুটা রক্ষিত হয়েছে পরবর্তী গ্রিক লেখক আরিয়ান, স্ট্রাবো ও ডিওডোরাসের রচনায়। এছাড়া আছে অশোকের অনুশাসনগুলি। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ বিভিন্ন সময়ের প্রক্ষেপ থাকলেও অধ্যক্ষপ্রচার অংশটি সম্ভবত এই পর্বের রচনা। গ্রন্থটির বর্তমান রূপ সম্ভবত খ্রি. প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর সমকালীন।[৭৪] *অর্থশাস্ত্র*-এর বয়ান থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাষ্ট্র সরাসরি কৃষি উৎপাদনে অংশ নেয়। উৎপাদনবৃদ্ধির স্বার্থেই রাষ্ট্র জনবসতিহীন এলাকায় বা পরিত্যক্ত এলাকায় জনপদ স্থাপনে আগ্রহী। প্রয়োজনে জনবহুল এলাকা থেকে লোক সরিয়ে বা যুদ্ধে পরাজিতদের তুলে এনে জনপদ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন কৌটিল্য। এই নতুন জনপদে উৎপাদনবৃদ্ধির স্বার্থে যাবতীয় বিনোদন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে *অর্থশাস্ত্র*-এ। কৌটিল্যের নির্দেশ—নতুন জনপদের অধিকাংশ কৃষকই হবেন শূদ্র('শূদ্রকর্ষকপ্রায়')।[৭৫] রণবীর চক্রবর্তী মনে করেছেন এই মন্তব্যে উচ্চজাতির সেবা ছাড়াও ধনোৎপাদন প্রক্রিয়ায় শূদ্রের অধিকারের স্বীকৃতি আছে।[৭৬] আবার রামশরণ শর্মা মনে করেন, এই শব্দবন্ধে শূদ্র কৃষকের বিশেষণ নয়; শূদ্র ও কৃষক দুটি আলাদা শব্দ। *অর্থশাস্ত্র*-এর দুই টীকাকারের মধ্যেও এবিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যাবে।[৭৭] রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক মনোযোগের নিদর্শন হিসাবে *অর্থশাস্ত্র*-এ দেখছি গোপ নামক প্রশাসনিক কর্মচারী রীতিমতো গ্রামবাসীদের

---

[৭৩] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, পৃ.৯৫

[৭৪] তদেব, পৃ.৯৬

[৭৫] তদেব, পৃ. ৯৯-১০১

[৭৬] রণবীর চক্রবর্তী, ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড),পৃ. ২১২

[৭৭] Ram Sharan Sharma, *Sudras in Ancient India*, New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 2nd Reprint, 2014, pp.161-162

তালিকা তৈরি করে মাথাপিছু কর ধার্য করেন। আবার, সামগ্রিকভাবে গ্রামভিত্তিক কর আদায়ের প্রথাও ছিল।[৭৮] কৃষক ও কারিগরদের থেকে আদায়কৃত করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও কর্মচারীদের অর্থমূল্য দেওয়া হত। খ্রি.পূ. তৃতীয় শতাব্দীতে ধাতবমুদ্রার ব্যাপক ব্যবহারে প্রক্রিয়াটি আরও সহজ হয়ে ওঠে।[৭৯] মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে সাতটি সামাজিক স্তরের কথা পাওয়া যাচ্ছে– দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক ও শিকারী, কারিগর ও ব্যবসায়ী, সৈন্য, গুপ্তচর, প্রশাসক ও মন্ত্রণাদাতা। এই সামাজিক স্তরগুলিকে বর্ণজাতিব্যবস্থার সমতুল্য মনে করা অনুচিত। মেগাস্থিনিসের বিবরণে এই স্তরগুলির উচ্চাবতার কোন আভাস নেই; অথচ উচ্চাবচতাই বর্ণজাতিব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য।[৮০] তবে, মেগাস্থিনিসের দুটি মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ –এক, নিজের জাতের বাইরে বিবাহ করা যায় না এবং দুই, জাতিনির্দিষ্ট পেশার অনুসরণই কর্তব্য। বর্ণজাতিব্যবস্থার মৌল লক্ষণগুলি যে সেসময়ে প্রায় তৈরি হয়ে উঠেছিল মেগাস্থিনিসের বিবরণে তা স্পষ্ট।[৮১] বর্ণজাতিব্যবস্থার অনুশাসনাত্মক দিকটিকে মেগাস্থিনিস চিহ্নিত করলেও কার্যক্ষেত্রে অবশ্য বিভিন্ন বর্ণের শাস্ত্রবহির্ভূত নানা পেশা অনুসরণের নির্দেশ চোখে পড়ে। ব্রাহ্মণদের যেমন জ্যোতিষী, কথক, গুপ্তচর, এমনকি সৈন্যবাহিনীতেও নিযুক্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে।[৮২] *অর্থশাস্ত্র* বলেছে বৈশ্য বা শূদ্ররাও দক্ষতার সঙ্গে সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন।[৮৩]

অর্থশাস্ত্র-এর 'বিদ্যাসমুদ্দেশ' অংশে কৌটিল্য চারপ্রকার বিদ্যার কথা বলেছেন– আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি। আন্বীক্ষিকী বা তর্কশাস্ত্রের মাধ্যমে বাকি তিন

---

[৭৮] D.N.Jha, *Economy and Society in Early India: issues and Paradigms*, New Delhi; Munshiram Manoharlal, 1st Published, 1993, p.46

[৭৯] রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ. ৪৮

[৮০] রণবীর চক্রবর্তী, ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড),পৃ. ২১৩

[৮১] P.V.Kane, *History of Dharmasastra*(Vol.2, Part-I), p. 50

[৮২] Rajendra Nath Sharma, *Brahmins Through the Ages*, p.166-167

[৮৩] ইরফান হাবিব, বিবেকানন্দ ঝা, *মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ*, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ.১৫৬

বিদ্যার বল-অবল, প্রাধান্য-অপ্রাধান্য বিচার করা হবে। অর্থাৎ, কৌটিল্য নিঃসংশয়ে বেদকে মেনে নেওয়ার বদলে ক্ষেত্রভেদে বেদের প্রয়োগযোগ্যতা বিচার করতে চাইছেন। 'ত্রয়ী' বা 'বেদ' বলতে কৌটিল্য মূলত বর্ণাশ্রমধর্মকেই বুঝেছেন। এদিক থেকে কোন্ ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম কতটা প্রযোজ্য তা আন্বীক্ষিকীর মাধ্যমে বিচার করতে হবে। আবার, আন্বীক্ষিকীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় তিনটি-সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন ও লোকায়ত অর্থাৎ বস্তুবাদ বা জড়বাদ। বেদপ্রামাণ্যবিরোধী নাস্তিক দর্শন লোকায়তও আন্বীক্ষিকীর অন্তর্ভুক্ত। এই সবকিছুকেই প্রয়োগ করা হবে ত্রয়ী তথা বার্তা ও দণ্ডনীতির বিচারে।[৮৪] বেদের বর্ণাশ্রমধর্মকে আন্বীক্ষিকীর মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনলেও এই সময়পর্বে ব্রাহ্মণদের পূর্ববর্তী পর্বের মতোই বেশ কিছু সুযোগসুবিধা পেতে দেখছি। আপৎকালেও ব্রাহ্মণের সম্পত্তিতে হাত দেওয়ার অধিকার রাজার নেই। ধর্মসূত্রের বিধানকে অনুসরণ করেই কৌটিল্য জানাচ্ছেন, উত্তরাধিকারীহীন মৃত ব্রাহ্মণের সম্পত্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়াই শ্রেয়। নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমিও ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য। খেয়া পারাপারের ক্ষেত্রেও বিনা পয়সায় যাতায়াতের সুযোগ পাবেন ব্রাহ্মণরা।[৮৫] অশোকের পুরালেখগুলিতে অবশ্য ব্রাহ্মণের প্রতি এধরনের পক্ষপাত পরিহার করার কথা বলা হয়েছে।[৮৬] শূদ্রের অবস্থা এর প্রায় বিপরীত। এই সময়কালে শূদ্র জনগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশ কাজ করত কৃষিশ্রমিক ও দাস হিসাবে। প্রাচীন পালি সাহিত্যে তিনটি বড়ো কৃষি খামারের কথা পাওয়া যায়। মৌর্য আমলে নিশ্চিতভাবেই খামারের সংখ্যা অনেক বেড়েছিল; পাল্লা দিয়ে বেড়েছিল খামারে নিযুক্ত শূদ্র শ্রমিক ও দাসের সংখ্যা। *অর্থশাস্ত্র* পড়লে মনে হয়, শূদ্ররা

[৮৪] মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), *কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম(প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ষষ্ঠ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১৪, পৃ.৭৩-৭৭

[৮৫] Rajendra Nath Sharma, *Brahmins Through the Ages*, p. 168-170

[৮৬] Govind Prasad Upadhyay, *Brahmanas in Ancient India*, Delhi: Munshiram Manoharlal, 1st Edition, 1979, p. 20

করপ্রদানকারী ছিলেন না। প্রশাসনিক অধিকর্তা হিসেবে গোপের এধরনের শূদ্রদের তালিকা প্রস্তুত করার কথা। পরিবর্তে এই শূদ্ররা রাষ্ট্রকে বিনা পয়সায় কায়িক পরিশ্রম দিত। মৌর্য শাসনকালে ভাগচাষী হিসাবে শূদ্রদের প্রথমবার দেখা গেলেও অধিকাংশই নিযুক্ত থাকতেন কৃষিশ্রমিক ও দাস হিসাবে। সৈন্যবাহিনীতে জায়গা পেলেও শূদ্রদের ভূমিকা কী ছিল তা নিয়ে একটু সন্দেহ আছে। মেগাস্থিনিস বা আরিয়ানের বিবরণ থেকে মনে হতে পারে, শূদ্রদের ভূমিকা সেনাবাহিনীর অশ্ব পরিচর্যা ইত্যাদিতেই সীমিত ছিল। সামগ্রিকভাবে এই পর্বে শূদ্রের রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।[৮৭] এই পর্বের সামাজিক সচলতার নিদর্শনগুলির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রবণতা যেমন লক্ষ করা যাচ্ছে, তেমনই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন প্রবণতা। যেমন—

১. ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি শ্রেণি দেখা যাচ্ছে—শ্রোত্রীয় ও অ-শ্রোত্রীয়। কৌটিল্য শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদেরই অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগসুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৮৮] আচারনিষ্ঠার কারণেই শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের প্রতি কৌটিল্যের এই পক্ষপাত।

২. অমাত্যদের চরিত্র নির্ধারণ করার জন্য কৌটিল্য একটি বিশেষ পরীক্ষা করার কথা বলেছেন। রাজার নির্দেশ সত্ত্বেও কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত যদি 'অযাজ্য' কাউকে যজ্ঞকর্মে বা অন্য অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে রাজি না হন, তাহলে রাজা তাঁকে বরখাস্ত করতে পারেন। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত চাইবেন অমাত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাজাকে গদিচ্যুত করতে। অমাত্য যদি সেই প্ররোচনায় পা না দেন, তবেই তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

---

[৮৭] Ram Sharan Sharma, *Sudras in Ancient India*, pp. 163-183

[৮৮] তদেব, পৃ.১৬৮

এই অংশের *জয়মঙ্গলা* ব্যাখ্যায় বোঝা যাচ্ছে, 'অযাজ্য' শব্দটি সম্ভবত উচ্চবর্ণের ঔরসজাত শূদ্রাপুত্র। অত এব, নিয়মমাফিক রাজা চাইলে এরা কেউ কেউ যজ্ঞকর্মে এবং বেদাধ্যয়নে অংশ নিতে পারেন। এই নিয়ম থেকে যেমন রাজার চূড়ান্ত ক্ষমতা স্পষ্ট হয়, তেমনই অনুমান করা যায়, তাত্ত্বিকভাবে শূদ্রাগর্ভজাত অনুলোম বর্ণসংকরদের একটা অংশ রাজ-আনুকূল্যে এই অধিকারটুকু আদায় করে নিতে পারছে। এই ধরনের শূদ্রাপুত্রদের দাসে পরিণত করা যায় না, পৈতৃক সম্পত্তিতেও তাঁদের অধিকার থাকে।[৮৯] রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সুসম্পর্কের দৌলতে অতিরিক্ত ধর্মীয় অধিকার আদায় করে সাধারণ শূদ্রদের থেকে অনেকটা উচ্চ অবস্থানে পৌঁছে যাচ্ছেন তাঁরা।

৩. চণ্ডালদের অবস্থানেও একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। ইতিপুর্বেই চণ্ডালদের সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে ঘৃণাজনক উক্তি পাওয়া গেছে। চণ্ডালের সংস্পর্শ তো বটেই, চণ্ডাল দৃষ্টিগোচর হওয়াই উচ্চবর্ণের শুচিতার পক্ষে ক্ষতিকর। *অর্থশাস্ত্র* চণ্ডালের ঘৃণিত অবস্থান মেনে নিয়েও আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকলাপে চণ্ডালের ভূমিকা স্বীকার করেছে। অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডপ্রদান, শ্মশানে দাহকর্ম ইত্যাদি কাজে চণ্ডালকে নিয়োগের সুপারিশ করেছে *অর্থশাস্ত্র*। এসব কারণে চণ্ডাল অস্পৃশ্য মেনে নিয়েও *অর্থশাস্ত্র* চণ্ডালের সঙ্গে দেখা বা কথা বলায় কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি।[৯০] এপ্রসঙ্গে আমরা আবার *অর্থশাস্ত্র* বর্ণিত আন্বীক্ষিকীর মাধ্যমে ত্রয়ীর বিচারের বিষয়টি খেয়াল করতে পারি। বেদমূলক শাস্ত্র চণ্ডালের সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, আন্বীক্ষিকীর দ্বারা ত্রয়ীর বিচারের মাধ্যমে *অর্থশাস্ত্র* সেই নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করেছে। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে আদানপ্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়টুকু দিয়েছে *অর্থশাস্ত্র*।

---

[৮৯] তদেব, পৃ. ১৮৭-১৮৮

[৯০] V.N.Jha, *Candala: Untouchability and Caste in Early India,*, pp.63-64

আচারনিষ্ঠার সূত্রে যেমন সামাজিক স্তরের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করছে, তেমনই প্রশাসনিক সুসম্পর্ক বা আর্থ-সামাজিক ভূমিকা সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটিকে নিয়ন্ত্রণ করে নানাভাবে। সামাজিক সচলতার এই নির্ণায়কগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মৌর্য পরবর্তী ভারতবর্ষে একটি কেন্দ্রীয় রাজশক্তির আধিপত্যের বদলে দেখা যাচ্ছে, একাধিক ছোট অথচ প্রভাবশালী রাজবংশের উত্থান। একদিকে উত্তর ভারতে সুঙ্গ, কাণ্ব, চেদী ইত্যাদি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, আবার অন্যদিকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন, চোল ইত্যাদি নতুন শক্তির উত্থানে ভারতবর্ষে রাজনীতির পালাবদল ঘটে। এই পর্বে দক্ষিণ ভারতেও কৃষি অর্থনীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। এছাড়া, মৌর্য আমলের মতো অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের বদলে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা এবং সমুদ্রবাণিজ্যের প্রসার। কৃষিকাজের জন্য এই সময় সেচব্যবস্থার প্রতি রাজশক্তিগুলির বিশেষ নজর দেখা যাচ্ছে। রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপির সাক্ষ্যে জানা যায় কাথিওয়াড় অঞ্চলে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে নির্মিত সুদর্শন হ্রদের বাঁধটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলে রুদ্রদামন তৎপরতার সঙ্গে বাঁধটি সংস্কার করেন। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে চোলরাজ কারিকালের কাবেরী নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করে সেচব্যবস্থার উন্নতির উদ্যোগের কথা আছে। সমকালীন স্মৃতিশাস্ত্রেও সেচপ্রকল্পের গুরুত্ব প্রবলভাবে স্বীকৃত। কৃষি ও বাণিজ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রসার দেখা গেলেও খনি ও খনিজ শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। এই পর্বের ইতিহাস রচনার উপাদানও পূর্ববর্তী সময়পর্বের থেকে অনেকবেশি। স্ট্রাবো, ডিওডোরাস, প্লিনির বিবরণী, অসংখ্য পুরালেখ, সৃজনশীল সাহিত্য, মুদ্রা, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিগ্রন্থ, *মহাভারত*-এর শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব এযুগের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[৯১]

[৯১] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, পৃ.১১৯-১৩০

সামাজিক মর্যাদার জন্মগত দিকটি এই সময়ের কিছু কিছু রচনায় খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। পতঞ্জলির রচনায় দেখা যাচ্ছে, বর্ণানুগ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলেও কেবল জন্মগত কারণেই ব্রাহ্মণের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা থাকে।[৯২] *মনুসংহিতা*-তেও (৯.৩১৭) দেখা যাচ্ছে অনুরূপ উক্তি—বিদ্বান হোক বা অবিদ্বান, ব্রাহ্মণ পরম দেবতা।[৯৩] এইকারণেই, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের থেকে কর নেওয়ায় আপত্তি জানিয়েছে সমসাময়িক স্মৃতিশাস্ত্রগুলি। এমনকি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণের উপর ধার্য করের হার নিম্নতম—লভ্যাংশের ১/২০ ভাগ।[৯৪] সমকালীন সূত্রগুলির নিরিখে বুঝতে পারি, ব্রাহ্মণরা কেবল বর্ণনির্দিষ্ট পেশাতেই যুক্ত নন। পতঞ্জলির রচনায় দু'ধরনের ব্রাহ্মণ জনপদের কথা আছে—ব্রাহ্মণক ও ব্রাহ্মণকীয়। ব্রাহ্মণক হচ্ছে এমন জনপদ যেখানে ব্রাহ্মণরা শস্ত্রজীবী।[৯৫] স্বাভাবিকভাবেই একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর পক্ষে কেবল যজন, যাজন, অধ্যাপনার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব ছিল না। আপৎকালে স্মৃতিকাররা ব্রাহ্মণকে ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু, সাধারণ সময়েও ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। অন্ততপক্ষে, বৌধায়ন, পাণিনি বা কৌটিল্যের রচনা থেকে তাই বোঝা যাচ্ছে। সোদাসের (খ্রি.১০-১৫) এর প্রস্তরলেখে ধনী বণিক ব্রাহ্মণের দানের কথা উল্লিখিত। কৃষিশ্রমিক ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে বৌদ্ধ *জাতক*-এ।[৯৬] অর্থনৈতিক তাগিদে ব্রাহ্মণরা যে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণপ্রাপ্তির অযোগ্য ব্রাহ্মণদের তালিকা দেখলে। চিকিৎসক, দোকানদার, মন্দিরের পুরোহিত, গবাদি পশু পালনকারী, শূদ্রের শিক্ষক, অভিনেতা, গায়ক, স্থপতি, দূত

[৯২] Sibesh Chandra Bhattacharya, *Some Aspects of Indian Society*, Calcutta: Firma K L M Pvt Ltd, 1st Edition, 1978, p. 37

[৯৩] মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়(অনূদিত), *মনুসংহিতা,* কলকাতা: সদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৪৫০

[৯৪] Rajendra Nath Sharma, *Brahmins Through the Ages*, p.212

[৯৫] তদেব, পৃ.২১০

[৯৬] Harishchandra Satyarthi, 'Some Aspects of Economic Condition of the Brahmanas(C.185 B.C-A.D. 319)', Proceedings of the Indian History Congress, Vol.30(1968), pp. 110-113

প্রভৃতি পেশায় যুক্ত ব্রাহ্মণরা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।[৯৭] ব্রাহ্মণদের সাধারণ সামাজিক মর্যাদাকে একটু তলিয়ে দেখলে অবশ্য বোঝা যাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অজস্র স্তরভেদ ও সামাজিক মর্যাদার তারতম্য আছে। *মহাভারত*-এর শান্তিপর্বে স্পষ্টই বলা হচ্ছে একমাত্র ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণরাই করছাড়ের উপযুক্ত। আবার, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাদে অন্য কোন ব্রাহ্মণই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করতে পারেন না। কেবল জন্মগত অবস্থান এক্ষেত্রে মাপকাঠি নয়।[৯৮] ব্রাহ্মণবর্গের অভ্যন্তরীণ স্তরভেদ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রমাণ মিলবে স্মৃতিশাস্ত্র থেকেও। সাধারণভাবে, আত্মীয়মৃত্যুর দশদিন পরে ব্রাহ্মণের অশৌচমুক্তি ঘটে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলবেন, শ্রোত্রীয়, ঋত্বিক ইত্যাদি প্রকৃতির ব্রাহ্মণদের মৃত্যু পরিবারে অশৌচ সৃষ্টি করে না। *মনুসংহিতা*-এর বিধানে বলা হচ্ছে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকেই দান করা উচিত। লোভী, স্বার্থপর, হিংস্র ব্রাহ্মণকে দান নিষ্ফল হতে বাধ্য।[৯৯] ক্ষত্রিয়রাও কেবলমাত্র অস্ত্রচালনা এবং সাম্রাজ্যরক্ষায় যুক্ত ছিলেন না। *জাতক*-এ ক্ষত্রিয়দের বণিকবৃত্তির নিদর্শন আছে বেশ কয়েকবার।[১০০]

পূর্ববর্তী কালপর্বের মতোই বৈশ্য-শূদ্রের অবস্থানগত পার্থক্য বিষয়ে কিছু সংশয় এই যুগেও রয়েছে। *মনুসংহিতা*-এর বয়ান অনুসারে সত্ত্বগুণের অধিকারী ব্রাহ্মণরা, রজগুণের অধিকারী ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও ম্লেচ্ছদের মধ্যে রয়েছে তমোগুণ। বর্ণ হিসাবে বৈশ্যের পৃথক উল্লেখ না থাকায় মনে হতে পারে, বৈশ্য ও শূদ্র একই পর্যায়ভুক্ত।[১০১] অথচ, এই পর্বেই বহু বিখ্যাত বৈশ্য বণিকের উপস্থিতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায়। এই বিষয়ে উত্তর খোঁজার আগে আমরা শূদ্রদের পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করব। মৌর্য যুগের সমাপ্তির পর সম্ভবত

---

[৯৭] Sibesh Chandra Bhattacharya, *Some Aspects of Indian Society*, p. 48-52

[৯৮] তদেব, পৃ.৪৩-৪৭

[৯৯] Harish Chandra Satyarthi, ' Some Aspects of Group-Consciousness Among the Brahmanas of North India During the Post-Maurya Period(C.185 B.C- 19 A.D), Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 31, 1969, pp. 99-100

[১০০] Sibesh Chandra Bhattacharya, *Some Aspects of Indian Society*, p. 88-89

[১০১] Ram Sharan Sharma, *Sudras in Ancient India*, p. 239

বৈশ্য ও শূদ্রদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশার গণ্ডিতে আটকে রাখা ক্রমশ কঠিন হচ্ছিল। মনু রাজাকে বৈশ্য ও শূদ্রদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশায় বলপূর্বক নিযুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বৈশ্যদের একটা অংশ সম্ভবত শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ করছিল; আপদ্ধর্ম বর্ণনায় মনু এই প্রসঙ্গে ছাড়পত্রও দিয়েছেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ *মিলিন্দপঞ্হ*-তে বলা হয়েছে বৈশ্য ও শূদ্র—উভয়েরই পেশা কৃষিকাজ ও পশুপালন। বৈশ্য ও শূদ্রের পৃথক বৃত্তির উল্লেখ সেখানে নেই।[১০২] মনু শূদ্রের কারিগর বৃত্তিকে ভালো চোখে দেখেননি, একমাত্র দ্বিজাতিশুশ্রুষায় জীবিকানির্বাহ না করতে পারলেই শূদ্রের কারিগরবৃত্তিকে তিনি অনুমোদন করেছেন। তবে, এই মন্তব্যের সঙ্গে তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতার বিশেষ সম্পর্ক নেই। মৌর্য পরবর্তী যুগে প্রচুর কারিগরদের কথা সাহিত্যিক ও পুরালেখগত সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বাণিজ্য অর্থনীতিতে ভারতের উন্নতির সুবাদে কারিগরদের অর্থনৈতিক অবস্থার বেশ উন্নতি ঘটে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি বিভিন্ন কারিগরশ্রেণির দানের উল্লেখ এই পর্বের পুরালেখগুলি থেকে নিয়মিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষত রোমের সঙ্গে বাণিজ্যের কারণে এই পর্বে মথুরা অঞ্চলের বস্ত্রশিল্পীরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিলেন। *মহাবস্তু অবদান*-এ রাজগৃহের আঠারোটি কারিগর সংঘের উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে কারিগর সংঘগুলির কারণে কারিগরদের উপর সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মনুর বিধানে বর্ণপ্রাধান্য অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের যথাক্রমে দুই, তিন, চার ও পাঁচ শতাংশ মাসিক কর দেওয়ার কথা। তবে নাসিক থেকে প্রাপ্ত একটি পুরালেখতে দেখছি, বস্ত্রশিল্পীদের সংঘের তরফে প্রদত্ত মাসিক করের পরিমাণ ১ বা ৩/৪ শতাংশ। বাস্তবে, শূদ্রদের সবথেকে বেশি করের বোঝা বহন করতে হত—এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই।[১০৩] পুরাণে কলিযুগের বর্ণনাকে যদি প্রাক্-গুপ্ত যুগের সামাজিক পরিস্থিতির আভাস বলে বিবেচনা

---

[১০২] তদেব, পৃ.১৯৩-১৯৪

[১০৩] তদেব, পৃ. ১৯৯-২০২

করি, তাহলে *কূর্মপুরাণ*-এর সাক্ষ্যে মনে হওয়া স্বাভাবিক শূদ্রের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আধিপত্যে ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।[১০৪] এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে এযুগেও সামাজিক সচলতার নিদর্শন অজস্র। যেমন—

১. ব্রাহ্মণদের মধ্যে অজস্র শ্রেণিবিভাগ তৈরি হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক তাগিদে ব্রাহ্মণরা নানা পেশায় যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সেই সূত্রে তৈরি হয়েছে ব্রাহ্মণ বর্ণের অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবিভাগ, উচ্চাবচতা এবং মর্যাদার তারতম্য। ইতিপূর্বেই এই অংশে প্রসঙ্গটি আলোচিত।

২. বণিকদের মধ্যে বৌদ্ধ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠী (সেট্‌ঠি)-এর উল্লেখ অজস্র। শ্রেষ্ঠী বৌদ্ধ সাহিত্যে বিপুল ধনশালী বলেই উল্লিখিত। *জাতক* কাহিনীগুলিতে শ্রেষ্ঠীর ভূমিকা দু'রকম—এক, শ্রেষ্ঠী ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসা চালানো বিত্তশালী ব্যক্তি। দুই, শ্রেষ্ঠী অন্য বণিকদের নেতা এবং রাজদরবারে বণিক সমাজের প্রতিনিধি। আর্থিক প্রতিপত্তির কারণে বণিকসমাজের বাকি অংশ তাঁর আধিপত্য মেনে নিত। তাঁর কাজ ছিল রাজদরবারে বণিক সমাজের দাবিদাওয়া বিষয়ে সোচ্চার হওয়া।[১০৫] ব্রাহ্মণ সমাজের মত বণিক সমাজেও তাহলে একরকম স্তরভেদ দেখা যাচ্ছে। এই বণিকদের যদি বৈশ্য বলে ধরে নিই, তাহলে বৈশ্য সমাজের আরও একপ্রকার স্তরভেদ চোখে পড়ে। ইতিপূর্বেই দেখেছি বৈশ্য সমাজের একটা অংশ প্রায় শূদ্র পর্যায়ভুক্ত, অর্থনৈতিক সংগতিবিহীন। অর্থাৎ, বৈশ্য সমাজে এই সময় মূল দুটি অংশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল—একটি অংশ আর্থিক প্রতিপত্তিশালী, সংগঠিত, আলোকপ্রাপ্ত, উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। আরেকটি অংশ, দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তির কারণে শূদ্রদের সমপর্যায়ভুক্ত।[১০৬]

[১০৪] তদেব, পৃ. ২৩৩-২৩৪

[১০৫] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, পৃ. ১৩৬

[১০৬] H.C.Satyarthi, 'Some Aspects of the Social Position of the Vaisyas During the Post-Maurya Period(c.200 B.C- A.D. 300), Proceedings of the Indian History Congress, Vol.37, 1976, p. 95

৩. বর্ণসংকরগোষ্ঠীগুলি তাত্ত্বিকভাবে সকলেই শূদ্র। যাজ্ঞবল্ক্য যদিও মনে করছেন অনুলোম বর্ণসংকরগুলি সৎ ও প্রতিলোম বর্ণসংকরগুলি অসৎ। পি.ভি.কানের মতে, অনুলোম বর্ণসংকরগুলিকে সৎ বলার অর্থ যাজ্ঞবল্ক্য এই গোষ্ঠীগুলির সংস্কারের অধিকারকে স্বীকার করছেন। অনুলোম বর্ণসংকর বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রপরম্পরায় মূলত তিনটি মত খুঁজে পেয়েছেন অধ্যাপক পি.ভি.কানে। প্রথম মত, কোন বর্ণের পুরুষ যদি অব্যবহিত নিম্নবর্ণের নারীকে বিবাহ করেন, তাহলে বিবাহজাত সন্তান পিতার বর্ণ পাবে। দ্বিতীয় মত, অনুলোম বিবাহ জাত সন্তানের বর্ণ পিতার তুলনায় নিচু, মাতার তুলনায় উঁচু। তৃতীয় মত, অনুলোম বর্ণসংকর মাতার বর্ণগত মর্যাদাভুক্ত। এখন, যাজ্ঞবল্ক্য যেহেতু ব্রাহ্মণ পুরুষ ও শূদ্রা নারীর গর্ভে উৎপন্ন নিষাদ বা পারশবের সংস্কার অধিকারকে স্বীকার করেছেন, তাহলে বুঝতে হবে অনুলোম বর্ণসংকরকে পিতার সমান মর্যাদা দিচ্ছেন তিনি। মজার কথা, অম্বষ্ঠ, নিষাদ ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি অনার্য উৎস সম্ভূত। দেখা যাচ্ছে, কালক্রমে গোষ্ঠীগুলি কেবল ব্রাহ্মণ্যবৃত্তেই জায়গা করে নেয়নি,সংস্কারের অধিকারও আদায় করেছে।[১০৭]

৪. মনু বিধান দিয়েছিলেন শূদ্রের পৌরোহিত্যকারী ব্রাহ্মণরা মূর্খ হিসেবেই বিবেচিত হবে। *মনুসংহিতা*-এর একটি অংশের ভাষ্যে কুল্লুকের মত, শূদ্ররা কয়েকটি গৌণ পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারে। ভাসের নাটকগুলিতেও দেখছি, শূদ্ররা মন্ত্রহীনভাবে দেবতা নমস্কার করে। মনুও বলেছেন, এই ধরনের পুণ্যার্জনের প্রক্রিয়ায় শূদ্রদের বেদোচ্চারণ থেকে বিরত থাকা উচিত। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় এযুগে শূদ্ররা অতিরিক্ত কিছু ধর্মীয় অধিকার লাভ করেছেন।

[১০৭] Sudhakar Chattopadhyaya, *Social Life in Ancient India*, Calcutta: Academic Publishers, 1st Edition, 1965, pp.15-16

শূদ্রদের সমকালীন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রতিপত্তির সঙ্গে এই অধিকারলাভের সম্পর্ক খোঁজা অমূলক নয়। বৈষ্ণব ধর্মের উত্থানও শূদ্রের ধর্মীয় মর্যাদাপ্রাপ্তিতে সহায়ক হয়েছিল।[১০৮]

আর্থিক প্রতিপত্তি এই পর্বেও সামাজিক উচ্চাবচতা ও গতিময়তার অন্যতম নির্ণায়ক। এই পর্বে বর্ণজাতিব্যবস্থার চরিত্রটি ভালোভাবে বোঝা যেতে পারে জৈন গ্রন্থ *অঙ্গবিজ্জা*-র সূত্রে। এই বইতে বর্ণজাতিব্যবস্থা সম্পর্কে চারটি মত পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম মত, সমাজ চতুর্বর্ণে বিভক্ত। দ্বিতীয় মত, সামাজিক অবস্থান জন্ম ও বৃত্তি দুই দ্বারাই চিহ্নিত। অর্থাৎ, জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন এবং বৃত্তিও তাঁর সামাজিক মর্যাদার নির্ণায়ক। তৃতীয় মত, সমাজের দুটি অংশ—আর্য ও ম্লেচ্ছ। চতুর্থ মত, সমাজের দুটি গোষ্ঠী—আর্য বা সম্পন্ন গোষ্ঠী এবং প্রেষ্য বা দাস/ দরিদ্র। এই ধারণা অনুযায়ী নিম্নজাতির কোন ব্যক্তি যেমন আর্থিক প্রতিপত্তির জোরে 'আর্য' হয়ে উঠতে পারেন, তেমনই উচ্চজাতির ব্যক্তি আর্থিক সংগতির অভাবে হয়ে যেতে পারেন 'প্রেষ্য'।[১০৯] আর্থিক সমৃদ্ধিকে এই প্রথম এত স্পষ্ট করে সামাজিক গতিময়তার নির্ণায়ক হিসাবে স্বীকৃত হতে দেখছি।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূচনাকাল থেকে গুপ্ত পরবর্তী সময়েরও কিছুটা জুড়ে, মোটামুটি খ্রি. চতুর্থ থেকে খ্রি. সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত একটা বড়ো সময় জুড়ে গুপ্তরা ভারতের প্রধানতম রাজনৈতিক শক্তি ছিল। দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে গুপ্তদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাকাটক বংশ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কনৌজে হর্ষবর্ধনকে কেন্দ্র করে আরেকটি বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এইসময় হর্ষবর্ধনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গৌড়ের অধিপতি শশাঙ্ক। আবার, দক্ষিণ ভারতে বাকাটকদের পতনের পর চালুক্য ও পল্লবদের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে হূণদের আক্রমণে উত্তর ভারতে সাময়িক

---

[১০৮] Ram Sharan Sharma, *Sudras in Ancient India*, p. 232

[১০৯] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, পৃ.১৫৩

অস্থিরতা দেখা গেলেও দক্ষিণ ভারত ছিল হূণ আক্রমণের প্রভাবমুক্ত। কৃষি অর্থনীতির অপ্রতিহত বিস্তার এই যুগেও দেখতে পাওয়া যায়। এই যুগের অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'অগ্রহার' ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মস্থান বা পুরোহিতদের উদ্দেশে বিপুল পরিমাণ নিষ্কর ভূমিদান। নিষ্কর ভূমিদানের উল্লেখ বিগত যুগে মিললেও এই যুগে ভূমিদানের প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। 'অগ্রহার' ব্যবস্থা কৃষি অর্থনীতির বিকাশেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এছাড়া, সমকালীন ঐতিহাসিক সূত্রগুলি থেকে শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের নমুনাও মিলছে। এই পর্বের ঐতিহাসিক সূত্রগুলির মধ্যে গুপ্ত শাসনকালে রচিত ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য, নারদ, বৃহস্পতি বা বিষ্ণুর স্মৃতিগ্রন্থ, ফা-হিয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্ত, রাজা হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের *হর্ষচরিত* এবং হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবিবরণী উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি অতি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য এই পর্বের অজস্র পুরালেখ।[১১০]

গুপ্ত পর্বে জন্মগত জাতিবাদের উপর ঝোঁক অনেকখানি বেড়ে যায়। বিশেষত ঋগ্বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগের সঙ্গে তুলনা করলে এই পার্থক্য অনেকবেশি নজরে পড়বে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ কবুষের আখ্যানে আমরা দেখেছিলাম দাসীপুত্র হয়েও সাধনমাহাত্ম্যের জোরে কবুষ ব্রাহ্মণসমাজে সমাদর লাভ করছে। গুপ্ত পর্বে পিতৃপরিচয় ও জন্মগত জাতিবাদের গুরুত্ব বেড়ে যায়। কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম* নাটকের সূত্রে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। কালিদাসের শকুন্তলার আখ্যানের পূর্বসূত্র ব্যাসদেবের *মহাভারত*। কিন্তু, *মহাভারত* ও কালিদাস রচিত আখ্যানের অনেক পার্থক্য আছে। *মহাভারত*-এর শকুন্তলা চরিত্র যেখানে খুব প্রতিবাদী, কালিদাসের শকুন্তলা সেখানে অনেক ম্রিয়মাণ। পার্থক্য আছে আরেকটা জায়গাতেও। কালিদাসের নাটক শেষ হচ্ছে দুষ্যন্তের নিজ পুত্র ভরতকে চিনতে পারার

---

[১১০] তদেব, পৃ. ১৫৪-১৫৬

মাধ্যমে। ভরত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবেন। পিতৃপরিচয় সুনিশ্চিত না হলে তাঁর ক্ষত্রিয়ত্ব এবং উত্তরাধিকার নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। গুপ্ত আমলে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জাতি পরিচয় সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট করতে এবং এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করতে খুব জরুরি। উত্তরাধিকার এবং পিতৃপরিচয়, জন্মগত জাতিপরিচয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কালিদাস তাঁর নাটকের ঘটনাবস্তুকে *মহাভারত*-এর তুলনায় অনেকখানি প্রসারিত করেছেন।

এরপরে আসা যাক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। 'অগ্রহার' ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের তরফে ধর্মস্থানে বা পুরোহিতবর্গকে যে নিষ্কর জমি দান করা হত, সেই জমির উপর দানগ্রহীতার অধিকার চিরকালীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ভূমিদানের ঘটনাগুলির পুরালেখগত সাক্ষ্যের সূত্রে জমির প্রকৃতি, সীমা নির্ণয়ের পদ্ধতি, গ্রহীতার অধিকার স্পষ্ট করে বোঝা গেছে। পুরালেখগুলি থেকেই দেখা যাচ্ছে অনেকসময় পতিত, অনাবাদি জমিও হস্তান্তর করা হত। কখনও কখনও জমির পাশাপাশি সম্পূর্ণ গ্রামও দান করার কথাও জানা যাচ্ছে। জমি দান করলে জমির উপর দানগ্রহীতার সম্পূর্ণ অধিকার বর্তায়, কিন্তু গ্রাম দান করলে কেবল গ্রামের রাজস্বটুকুই গ্রহীতার প্রাপ্য। বাকাটক তাম্রশাসনে কোন কোন ব্রাহ্মণকে একাধিক গ্রাম দান করার নজিরও রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূমিদান গ্রহণ করে করে ব্রাহ্মণরা বড়ো মাপের ভূম্যধিকারীতে পরিণত হয়েছিলেন। এই বিপুল পরিমাণ নিষ্কর ভূমি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল রাজানুগ্রহ। বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন বৌদ্ধ বিহারের প্রতি নিষ্কর ভূমিদানের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। প্রতিষ্ঠানগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে নিষ্কর ভূমির মালিকানা সন্দেহাতীত অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি দিয়েছিল। বিভিন্ন পুরালেখে গ্রামদান সংক্রান্ত রাজানুশাসনে 'অচাটভাটপ্রবেশ্য' বা 'চাটভাট অপ্রাবেশ্য' শব্দদুটি নিয়মিতভাবে পাওয়া যায়। 'চাট' ও 'ভাট' মূলত স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তি। তাঁদের প্রবেশ নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে নিষিদ্ধ করে কার্যক্ষেত্রে জমির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দানগ্রহীতার হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনেকক্ষেত্রেই দানগ্রহীতারা

আনাবাদী জমিকে আবাদি করে তুলতেন। ফলত, উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাপও কিছুটা কমত। কিন্তু, স্বাভাবিকভাবেই এই বিপুল পরিমাণ জমিতে তাঁরা নিজেরা চাষ করতেন না। সাধারণভাবে কৃষিকার্যের প্রতি ব্রাহ্মণদের একপ্রকার অনীহাও ছিল। অত এব, এই জমিতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হতেন কৃষকরা। ভূম্যধিকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন এই কৃষকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার ছিল সীমিত। অবশ্য, প্রবল প্রতিপত্তিশালী ভূম্যধিকারীরা কখনও কখনও যে রাজদ্রোহে যুক্ত হতে পারেন এমন ইঙ্গিত সমকালীন কিছু পুরালেখে আছে। রাজদ্রোহে যুক্ত ভূম্যধিকারীদের জমি কেড়ে নেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে রাষ্ট্রের হাতে।[১১১] জমির উপর দানগ্রহীতাদের সম্পূর্ণ অধিকারের সঙ্গেই সুনিশ্চিত করা হচ্ছে জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। অগ্রহার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই দেখা যাচ্ছে 'বিষ্টি' বা বাধ্যতামূলক শ্রমের ধারণা। এইসমস্ত চাপে কৃষকদের অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে ওঠে, স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে বেশ কিছু কৃষকবিদ্রোহ হয়। দক্ষিণাপথ ও দক্ষিণভারতে এইধরনের বিদ্রোহের উদাহরণ বেশি। কৃষকদের পাশাপাশি স্থানীয় কারিগর শ্রেণিগুলিও ভূম্যধিকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কারিগরদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে, সামাজিক মর্যাদাও অনেকখানি চলে যায়। অনেক কারিগর শ্রেণিকেই এসময় 'অস্পৃশ্য' হিসাবে চিহ্নিত হতে দেখছি।[১১২] এই সময়ের একাধিক পুরালেখে রাজাদের বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন বর্ণ ও আশ্রমধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আবার, নিধনপুর প্রশস্তিতে দেখা যাচ্ছে, রাজা ভাস্করবর্মনের জন্ম হয়েছিল বর্ণব্যবস্থার অনাকাঙ্ক্ষিত মিশ্রণ দূর করে সুস্থিত রূপ দেওয়ার জন্য।[১১৩] হিউয়েন সাঙের বিবরণীতেও দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক বর্ণের জন্য পেশা

---

[১১১] তদেব, পৃ. ১৬১-১৬৫

[১১২] Brajadulal Chattopadhyaya, *Studying Early India*, New Delhi: Permanent Black, Third Impression, 2016, pp. 242-244

[১১৩] Sukla Das, *Socio-Economic Life in Northern India*, New Delhi: Abhinav Publications, 1st Edition, 1980, p.47

সুনির্দিষ্ট।[১১৪] বাস্তবের সঙ্গে এই বিবরণগুলির যোগ নিয়ে যদিও সন্দেহ আছে। লক্ষণীয়, যে হর্ষবর্ধনের পরিবারের তরফে রাজ-উদ্যোগে বর্ণব্যবস্থার ঐতিহ্যবাহী রূপটিকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হচ্ছে, সেই হর্ষবর্ধনের পরিবারই বৈশ্য হয়েও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করছেন। আবার, শিবগুপ্ত বালার্জুনের সেনকপত পুরালেখে শিবরক্ষিত নামক ব্রাহ্মণের রাজমর্যাদা লাভের কথা আছে। লোকনাথের তিপেরা লেখে প্রদোষশর্মণ নামক ব্রাহ্মণের মহাসামন্ত পদপ্রাপ্তির উল্লেখটিও খেয়াল করার মতো।[১১৫] হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে মতিপুরের শূদ্র রাজার উল্লেখও আছে।[১১৬]

শূদ্রদের একটা অংশ সম্ভবত কৃষিশ্রমিক থেকে কৃষকে পরিণত হচ্ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণুর স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্রদের কৃষিকাজের জন্য জমি ধার দেওয়ার বিধান আছে। পল্লব বংশীয়দের একটি ভূমিদান লেখে (২৫০-৩৫০ খ্রি.) দেখা যাচ্ছে, একটি জমি ব্রাহ্মণকে দান করার পরেও চারজন শূদ্র ভাগচাষী ওই জমির সঙ্গেই যুক্ত। *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*-এর মতে গ্রাম এমন এক ভৌগোলিক পরিসর যা শূদ্রদের সংখ্যাধিক্য ও কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত। অনুমান করা যেতে পারে, এই কৃষকদের অধিকাংশই শূদ্র। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে শূদ্রদের কৃষক হিসাবেই দেখা যাচ্ছে। *নরসিংহ পুরাণ* বলছে শূদ্রের অন্যতম কর্তব্য কৃষিকাজ।[১১৭] কৃষিকাজের পাশাপাশি ব্যবসাবাণিজ্যও এই পর্বে শূদ্রের স্বাভাবিক পেশা। বোঝা যাচ্ছে, বৈশ্য-শূদ্রের পেশাগত পার্থক্য কমতে কমতে এখন প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে। বৃহস্পতির স্মৃতিগ্রন্থের বিধান অনুযায়ী শূদ্র সমস্তপ্রকার জিনিসের ব্যবসা করতে পারেন। বেশ কিছু বাণিজ্যবৃত্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত লভ্যাংশে শূদ্রদের জীবিকা নির্বাহ করার স্বাধীনতা দেওয়া

---

[১১৪] Kunal Chakrabarti& Kanad Sinha(ed.), *State, Power & Legitimacy: The Gupta Kingdom*, New Delhi: Primus Books, 1st Published, 2019, p. 49

[১১৫] Sukla Das, *Socio-Economic Life in Northern India*, p.51

[১১৬] তদেব, পৃ.৫৯

[১১৭] Ram Sharan Sharma, *Sudras in Ancient India*, pp. 257-260

হয়েছে। কৃষিকাজ-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতাও আলোচ্য পর্বে শূদ্রের হস্তগত হয়েছিল। সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, অর্বুদ, মালব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের রাজাদের 'শূদ্র' বলা হয়েছে। এই রাজাদের 'শূদ্র' তকমা লাভের কারণ তাঁদের বর্ণের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি অনীহাও হতে পারে। খুব আকর্ষণীয় কিছু সামাজিক সচলতার উদাহরণও পাওয়া যাচ্ছে এই পর্বে।

১. অশোকের অনুশাসনগুলিতে লিপিকরদের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যও প্রশাসনিক বিভাগে লিপিকর বা লেখকদের উল্লেখ করেছেন। যদিও *অর্থশাস্ত্র* অনুসারে এঁরা খুবই নিচুতলার কর্মী; বার্ষিক বেতন মাত্র ৫০০ পণ। প্রশাসনে বেতনক্রমের ১১ টি স্তরবিভাগ করেছিলেন কৌটিল্য। লিপিকর বা কায়স্থদের অবস্থান এই ক্রমবিভাগে আট নম্বরে। এই বেতনক্রম থেকে কায়স্থের সামাজিক মর্যাদা আঁচ করা গেছে। তখনও অবধি এটি নিতান্তই একটি পেশাদারি গোষ্ঠী; 'জাত' নয়। মৌর্যদের পতন এবং গুপ্তদের উত্থানের মধ্যবর্তী পর্বে বড়ো মাপের সামাজিক-রাজনৈতিক দোলাচল চলতে থাকে। এই পর্ব থেকেই লেখক বা কায়স্থদের সামাজিক উত্থানের সূচনা। অশোকের পুরালেখগুলিতে যেখানে মাত্র একবারই লেখক বা লিপিকরদের কথা এসেছে, সেখানে মৌর্য পরবর্তী পুরালেখগুলিতে কায়স্থদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পশ্চিম ভারত থেকে প্রাপ্ত লেখমালায় বৌদ্ধ সংঘে লেখকদের দানের কথা পাচ্ছি। লেখকদের বৌদ্ধ সংঘে দানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে নাসিক বা অমরাবতীর পুরালেখেও। খেয়াল রাখা উচিত, অব্রাহ্মণ শিক্ষিতবর্গের প্রতি বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র *উদান*-এ 'লেখাসিপ্প' যাবতীয় শিল্পকর্মের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত। লেখক বা লিপিকর অর্থে 'কায়স্থ' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় মথুরার একটি শিলালেখে। পরে, 'কায়স্থ' শব্দের বহুল প্রচলন ঘটে এবং ধীরে ধীরে, একটি 'জাতি' নাম হয়ে ওঠে। মৌর্য পরবর্তী যুগে বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লেখক ও হিসাবরক্ষকদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা ও কায়স্থদের সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। বঙ্গদেশের দামোদরপুর তাম্রশাসনে জেলা প্রশাসনিক সমিতিতে

কায়স্থরাও গুরুত্বসহ উপস্থিত।[১১৮] রাষ্ট্রব্যবস্থায় গৌণ উপস্থিতি থেকে রীতিমতো প্রভাবশালী হয়ে ওঠা ও 'জাত' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক মর্যাদবৃদ্ধির এই নিদর্শনটি সামাজিক সচলতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. রথকারদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ও অবনতি দুইই আমরা আলোচনা করেছি। বর্তমান পর্বে অবশ্য দক্ষিণ ভারতে রথকারদের যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা লক্ষ করা যাচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশের সালঙ্কায়ন বংশের রাজত্বকালীন একটি ভূমিদান লেখে চতুর্বিদ্যা গোষ্ঠীর অংশ রথকার বংশীয় রথকার অগ্রহরের কথা আছে। দানগ্রহীতারা শাপ ও বরপ্রদানের ক্ষমতাধারী এবং বেদাধ্যয়নে রত। এদিক থেকে রথকারদের সামাজিক মর্যাদা ব্রাহ্মণের সমতুল্য। আধুনিককালেও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জেলার রথকাররা বেদপাঠ করে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস ব্রাহ্মণরাও সামাজিক মর্যাদায় তাঁদের থেকে ন্যূন।[১১৯] দক্ষিণভারতে রথকারদের এই প্রতিপত্তি জাতপাতের আঞ্চলিক রূপটি খেয়াল করিয়ে দিচ্ছে। এই ঘটনাটি সামাজিক সচলতার আঞ্চলিক বৈচিত্রের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

৩. উত্তর বৈদিক পর্ব থেকেই গোত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মচর্চায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। গোত্রহানি সামাজিক মর্যাদাহানির অন্যতম কারণ। যে সমস্ত গোষ্ঠীর জাতিচ্যুতি হয়েছে প্রায়শ্চিত্ত বিধানের মাধ্যমে শাস্ত্রপ্রণেতারা তাঁদের কাশ্যপ গোত্রভুক্ত করেন। চালুক্য রাজা দ্বিতীয় অম্মের রাজত্বকালে একটি দানলেখে বিশুদ্ধতর কাশ্যপ গোত্রভুক্ত এক ব্রাহ্মণ দানগ্রহীতার উল্লেখ আছে। 'বিশুদ্ধতর' শব্দটি বুঝিয়ে দেয় কাশ্যপ গোত্রের মধ্যেও ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। আবার, পারিবারিক পদবি হিসাবে গোত্রনাম ব্যবহারও ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক সচলতার প্রমাণ।

---

[১১৮] Chitrarekha Gupta, ' The Writers' Class of Ancient India- A Case Study in Social Mobility', The Indian Economic and Social History Review, Vol.20, No.2, 1983, pp. 192-196

[১১৯] V.N.Jha, 'Status of the Rathakara in Early Indian History', Proceedings of the Indian History Congress, Vol.34, 1973, pp. 107-108

কল্যাণী বংশের রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের ২৩ তম রাজ্যাঙ্কে প্রকাশিত রাজশাসনপত্রে মনুয়া গোত্রীয় ব্রাহ্মণের কথা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য গোত্রগুলির প্রামাণিক তালিকায় মনুয়া গোত্রের উল্লেখ নেই।[১২০] অর্থাৎ গোত্রনাম ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এই শ্রেণিটি সামাজিক মর্যাদা পেতে চাইছে।

৪. শূদ্র বর্ণের ধর্মীয় অধিকারেও একটা পরিবর্তন আসছে এই সময়ে। *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*-এ শূদ্রের দান এবং যজ্ঞাধিকার স্বীকৃত। পঞ্চমহাযজ্ঞের অধিকারও শূদ্রদের দেওয়া হয়েছে। মনু এবিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি বতে, তবে যাজ্ঞবল্ক্য নমস্কার মন্ত্র সহ শূদ্রকে পঞ্চমহাযজ্ঞ পালনের অধিকার দিয়েছেন। বৃহস্পতির স্মৃতিগ্রন্থ অনুযায়ী শূদ্র কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ—এই দুটি সংস্কার পালন করতে পারে। প্রথম সংস্কারটির কথা প্রাচীন গৃহ্যসূত্রগুলিতে নেই। দ্বিতীয় সংস্কারটির কথা থাকলেও তাতে শূদ্রের অধিকার প্রাচীন সূত্রকাররা এবং মনু স্বীকার করেননি। অর্বাচীন *বৈজবপ গৃহ্যসূত্র*-এ শূদ্রকে আরও কয়েকটি সংস্কার পালনের অধিকার দেওয়া হয়েছে।[১২১]

সামাজিক সচলতার প্রবণতাগুলি খেয়াল করলে বোঝা যাচ্ছে, আর্থিক সমৃদ্ধি সামাজিক সচলতার অন্যতম কারণ। কায়স্থ বা শূদ্রদের আর্থিক প্রতিপত্তির সঙ্গে সামাজিক সচলতার যোগ প্রত্যক্ষ। আবার, শূদ্রদের সচলতার ঘটনাটি খেয়াল করলেই বোঝা যায়, আর্থিক প্রতিপত্তির মাধ্যমে ধর্মীয় অধিকার সুনিশ্চিত করতে না পারলে সচলতাপ্রাপ্তির প্রয়াস সম্পূর্ণ হয় না। ধর্মীয় অধিকার বা মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় চিহ্নগুলি যে সচলতাপ্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় গোত্র ও সামাজিক সচলতার যোগাযোগ থেকেও। ধর্মসূত্র বা ধর্মসূত্রের ভাষ্যগুলি

---

[১২০] R. N. Nandi, ‘Gotra and Social Mobility in the Deccan’, Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 32, 1970, pp. 118-120

[১২১] Ram Sharan Sharma, *Sudras in Ancient India*, pp. 296-298

রথকারদের দ্বিজত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেও দক্ষিণ ভারতের রথকাররা তাঁদের ধর্মীয় অধিকার ধরে রেখেছেন। জাতপাতের কাঠামোর আঞ্চলিক রূপটি এতে যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনই বোঝা যায়, অনুশাসনাত্মক গ্রন্থের বাইরে পুরালেখের মতো বিবরণাত্মক সূত্রগুলি কেন সচলতার ইতিহাস অনুসন্ধানে জরুরি।

খ্রি. সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে সামন্ততন্ত্র। ‘অগ্রহার’ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবকে খুঁজতে চেয়েছেন অনেকে। এই ব্যবস্থা প্রথমে মুলত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি অ প্রতিষ্ঠানও এই ব্যবস্থার আওতায় আসতে থাকে। রামশরণ শর্মার মতো ঐতিহাসিকরা ভারতীয় সামন্তপ্রথার তিনটি পর্যায় লক্ষ করেছেন। উদ্ভবকাল—খ্রি. ৩০০- খ্রি. ৬০০ অব্দ, বিকাশকাল—খ্রি. ৬০০-খ্রি.৯০০ অব্দ, চূড়ান্ত পরিণতি ও ভাঙন—খ্রি.৯০০-খ্রি.১২০০ অব্দ। সামন্তপ্রথার পক্ষে যাঁরা যুক্তি সাজিয়েছেন তাঁদের মতে, ‘অগ্রহার’ ব্যবস্থার ফলে তৈরি হওয়া মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামীরা কৃষকের অশেষ দুর্গতির কারণ। দানগ্রহীতারা ভূমিস্বত্বভোগের পাশাপাশি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলাতেও হাত বসাতে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানে ভূমিদানের প্রবণতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে। বঙ্গদেশে দেবপাল ক্ষমতায় আসার আগেই নালন্দা বিহারের হাতে ২০৯টি গ্রামের মালিকানা ছিল। এভাবে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। দক্ষিণ ভারতেও চোল লেখমালার ভিত্তিতে দেখা যায়, জমি কেনাবেচার মাধ্যমে সম্পদবৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার এক শ্রেণির হাতে যেমন বিপুল সম্পদ এনে দিয়েছিল, তেমনই টান পড়েছিল যৌথ মালিকানায়। *পদ্মপুরাণ*-এ কৃষকদের চূড়ান্ত দারিদ্র্য ও সম্পন্ন ভূস্বামীদের প্রতিপত্তিপূর্ণ সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য উল্লিখিত। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অত্যধিক করের চাপ। এই পরিস্থিতিতে কয়েকটি প্রজাবিদ্রোহও ঘটে। রামশরণ শর্মাদের মতে

এই পর্বে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রভূত বিস্তার ঘটলেও মুদ্রা অর্থনীতি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মুদ্রা অর্থনীতির বিলোপের পাশাপাশি আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবক্ষয়ের কথা বলেন তাঁরা—নগর ও বাণিজ্য অর্থনীতি। রোম-ভারত বাণিজ্যের অবক্ষয়ের ছাপ সার্বিকভাবে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে পড়েছিল বলে তাঁদের অনুমান। এই প্রেক্ষাপটে স্বনির্ভর গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্ম। বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের সঙ্গে মুদ্রা অর্থনীতির বিলোপের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা বলেন এই ঐতিহাসিকরা। হিউয়েন সাঙের বিবরণের সূত্রে তাঁরা বলেন, প্রাচীন নগরগুলির দ্রুত অবক্ষয় হচ্ছিল। প্রমাণস্বরূপ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও উপস্থিত করেন তাঁরা। ফলত, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে জমিতে ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠা, মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামীদের উদ্ভব, কৃষকের অধিকারে হস্তক্ষেপ, কারিগরি শিল্প ও বাণিজ্যের অবক্ষয়, মুদ্রা অর্থনীতির বিলুপ্তি ও স্বনির্ভর এবং বদ্ধ গ্রামসমাজের উত্থানকে তাঁরা চিহ্নিত করছেন।[১২২] রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামী ঐতিহাসিকদের সামন্তপ্রথা বিষয়ক বক্তব্যের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযুক্তিও অবশ্য আছে। 'অগ্রহার' ব্যবস্থার সূত্রে রাজার অর্থনৈতিক ক্ষতি হত কি না সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য লেখমালায় নেই। কর সংগ্রহের প্রশাসনিক অধিকার রাজা দানগ্রহীতাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন—এমন বক্তব্যও খুব সংগত নয়। 'অগ্রহার' ব্যবস্থায় করভোগের যে অধিকার দানগ্রহীতা পেতেন তাতে রাজকোষে কতখানি টান পড়ত তা বলা মুশকিল। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল, পুরালেখগুলিতে জমি হস্তান্তরের যে নজিরগুলি আছে তাতে দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রেই অনাবাদি জমি হস্তান্তরিত হত। অর্থাৎ, দানগ্রহীতারা নিশ্চয় কৃষক নিয়োগ করে জমিগুলিকে চাষযোগ্য করে তুলতেন। অনাবাদি জমিতে চাষ করানোর জন্য বাইরের জনপদ থেকে লোক এনে বসানোর সম্ভাবনাও থাকে। এসবের দরুণ বরং কৃষি অর্থনীতির প্রসারই ঘটেছিল। সমকালীন লেখমালা, সাহিত্যিক সূত্র, বৈদেশিক বিবরণে এই সময়কালে ভারতবর্ষে

---

[১২২] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, পৃ. ১৮২-১৯৪

কৃষি উৎপাদনের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের উল্লেখ যথেষ্ট। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার পণ্যশস্যের উৎপাদন হত এবং তার সঙ্গেই যুক্ত ছিল চিনি বা গুড় তৈরির শিল্প। তৈলবীজের উৎপাদনও এই পর্বে বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্প সহ অন্যান্য কারিগরি শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিও লক্ষণীয়। বিশেষত লোহার ব্যাপক ব্যবহার এ যুগের শিল্প অর্থনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লেখমালার সূত্রে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্র 'হট্ট' বা 'মণ্ডপ' ইত্যাদির উল্লেখ যথেষ্ট। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে অনুরূপ বাণিজ্যকেন্দ্র 'নগর'। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু বাণিজ্যপথ এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রোম-ভারত বাণিজ্যের অবক্ষয় হলেও খ্রি. সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের উদ্ভবের সূত্রে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে আবার জোয়ার আসে। আরব বণিকরা পণ্যবাহী জাহাজ নিয়ে চীনে বাণিজ্যযাত্রা করতেন। ভারতীয় বন্দরগুলি ছিল এই দূরপাল্লার বাণিজ্যের সংযোগস্থল। এছাড়া খ্রি. দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে চোলদের সমুদ্রবাণিজ্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নগরের অবক্ষয় সম্পর্কিত ধারণাটিও কি সম্পূর্ণ ঠিক? ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সূত্রে দেখাচ্ছেন, এই সময়ে কিছু নগরের অবক্ষয় ঘটলেও এটি সার্বিক চিত্র নয়। এই সময়েও বেশ কিছু নগরের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। নতুন নগরও যে তৈরি হচ্ছিল সে বিষয়ে করিতলাই থেকে প্রাপ্ত দশম শতাব্দীর লেখে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় 'পুরপত্তন' শব্দটি খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন।[১২৩] অর্থনৈতিক ইতিহাস এই পর্বেও কৃষি ও বাণিজ্যের বিস্তারের প্রমাণ দেবে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই প্রবণতাগুলির পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি, পূর্ববর্তী সময়পর্বেই বর্ণজাতিকাঠামোর মৌল বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক সচলতার কিছু নির্দিষ্ট প্রবণতা তৈরি হয়ে গেছে। ঋগ্বৈদিক বা পরবর্তী বৈদিক যুগে বর্ণজাতিকাঠামোয় যে আপাত শৈথিল্য ছিল

---

[১২৩] তদেব, পৃ. ১৯৫-২১৭

সূত্রসাহিত্যের যুগ থেকেই তা ক্রমশ অন্তর্হিত হতে শুরু করেছে। গুপ্ত আমলের মধ্যে রচিত হয়ে গেছে *অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*-এর মতো প্রধানতম স্মৃতিশাস্ত্রগুলি। মৌর্য সমসাময়িক মেগাস্থিনিসের বিবরণেই অন্তর্বিবাহ ও বংশানুক্রমিক বৃত্তির মতো বর্ণজাতিব্যবস্থার প্রধান লক্ষণগুলি স্পষ্ট। যদিও এই পর্বে ও পরবর্তী পর্বগুলিতেও শাস্ত্রনির্দিষ্ট বয়ানের সঙ্গে সমসাময়িক বাস্তবতার ফারাক প্রচুর। বর্ণজাতিকাঠামোর ধারণা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত সমসাময়িক *মহাভারত*-এর শান্তিপর্ব ও প্রাচীন পুরাণগুলির মাধ্যমে। পুরাণগুলির মধ্যে ক্রমশ প্রচুর স্মৃতি-উপাদান ঢুকে পড়ে রচনাগুলিকে সম্পূর্ণত ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের ছাঁচে ঢেলে নিয়েছে। বর্ণজাতিকাঠামোর এই শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক রূপের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে সামাজিক সচলতার রাস্তাগুলিও খুলে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে সামাজিক সচলতার যে নিদর্শনগুলি আমরা আলোচনা করেছি, তাতে আর্থিক প্রতিপত্তিকে সামাজিক মর্যাদা বা জাতিমর্যাদবৃদ্ধির অন্যতম নির্ধারক হয়ে উঠতে দেখেছি। রথকাররা যেমন পরবর্তী বৈদিক যুগে বিশেষ পেশাদারি গোষ্ঠী হওয়ার সুবাদে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ও উচ্চ জাতিমর্যাদা অর্জন করেছিলেন, তেমনই উত্তর-বৈদিক যুগে আরো পেশাদারি গোষ্ঠীর উত্থানের পর্বে নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে না পেরে জাতিমর্যাদাকেও প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দেন। অথচ পরবর্তী পর্যায়ে, দক্ষিণ ভারতে রথকারদের যে আধিপত্য ও জাতিমর্যাদা লেখমালা ও অন্যান্য সূত্রে জানা যাচ্ছে তা বর্ণজাতিকাঠামো ও সামাজিক সচলতার আঞ্চলিক চরিত্রকেই চিনিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের পর্বেও দেখা যাচ্ছে বৈশ্য ও শূদ্রদের একাংশ অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা লাভ করছেন। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক আধিপত্য যে জাতিমর্যাদবৃদ্ধির সহায়ক তার অজস্র নিদর্শন আমরা দেখেছি। শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশার বাইরে গিয়েই অনেকসময় এই প্রতিপত্তি অর্জিত। ফলস্বরূপ, সামাজিক সচলতার অনুমোদন দিতে গিয়ে শাস্ত্রকেও পূর্বতন চেহারায় কিছু রদবদল করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রতিপত্তির মাধ্যমে সামাজিক সচলতা লাভের

প্রক্রিয়ায় এই শাস্ত্রীয় রদবদল ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিশেষ চিহ্ন। সামাজিক সচলতার আলোচনায় ধর্মীয় অনুমোদনের প্রশ্নটি তাই এত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সচলতার নানাবিধ নির্ধারকের মধ্যে আর্থ-রাজনৈতিক কারণটির দিকেই আমাদের বিশেষ নজর থাকছে; পরবর্তী আলোচনায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। বর্ণজাতিকাঠামো ও সামাজিক সচলতার যে মৌল প্রবণতাগুলি গুপ্ত আমলের মধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল, পরবর্তী পর্বেও তা লক্ষ করা যায়। একদিকে স্মৃতি-পুরাণের শাস্ত্রীয় ধারা, আরেকদিকে সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া দুইই পরবর্তীকালেও চলেছে। শাস্ত্রীয় ধারায় বা সামাজিক সচলতার ইতিহাসে কোন পরিবর্তন আসেনি বললে ইতিহাসের স্থাণুত্বকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমরা এই আলোচনায় তেমন কোন ধারণা পেশ করতে চাইছি না। তবে একথা ঠিক, ঐতিহাসিক প্রতিবেশের ভিন্নতায় জাতিকাঠামোর নানাবিধ আঞ্চলিক রূপ ও সামাজিক সচলতার অজস্র নিদর্শন তৈরি হলেও আর্থ-রাজনৈতিক দিকটি সামাজিক সচলতার ইতিহাসে বরাবর গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে। আর্থ-রাজনৈতিক দিকের সঙ্গে ধর্মীয় অনুমোদনের প্রশ্নটির সম্পর্ক কীভাবে স্থাপিত হয় সেটিই এই গবেষণার অন্যতম আলোচ্য। সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে আর্থ-রাজনৈতিক দিকের যে গুরুত্ব গুপ্ত আমলের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, সেই প্রবণতাটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরবর্তী পর্বেও যে বজায় ছিল তাঁর কতকগুলি নিদর্শন দেওয়া যায়—

১. শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে বাস্তবের সবসময় সংগতি থাকত না। বাস্তবের সঙ্গে তাল মেলানোর তাগিদে স্মৃতিকেই বরং নিজের বয়ানে অনেক পরিবর্তন আনতে হত। *পরাশর স্মৃতি* ব্রাহ্মণের ষড়বিধ কর্তব্যের পাশাপাশি কৃষিকার্যের বিধানও দিয়েছে। *বিষ্ণু পুরাণ*-এর মতে, কলিতে বৈশ্যরা বাণিজ্য ও কৃষিকর্মের বদলে দাসত্ব ও যান্ত্রিক কলার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করবে। জাতপাতের কাঠামো সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বয়ানে যে বদল আসছে তার কারণ তথাকথিত নিম্নজাতির

মানুষদের একটা বড় অংশের দ্রুত আর্থিক উন্নতি ও পেশাদারি ক্রিয়াকর্মের দক্ষতার দরুণ জাতিকাঠামোয় মর্যাদবৃদ্ধি।[১২৪]

২. আদি মধ্যযুগে রাজপুত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল গুর্জর-প্রতিহাররা। অনেকের বক্তব্য গুর্জর-প্রতিহাররা আদিতে ছিল একটি পশুপালক গোষ্ঠী। রাজ্যশাসক হিসাবে এই গোষ্ঠীর উত্থান অনেক পরে। যদিও সপ্তম শতাব্দীর পুরালেখে নন্দিপুরী গুর্জরদের রাজবংশ হিসাবেই উল্লিখিত হতে দেখা যাচ্ছে। সপ্তম শতাব্দীর বিভিন্ন নথি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে গুর্জরদের একটি অংশ যেভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে, তাতে গুর্জর জনসাধারণের সঙ্গে গুর্জর রাজন্যবর্গের সামাজিক দূরত্ব তৈরি হয়। দেখা যায়, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ স্তরভেদ। *পঞ্চতন্ত্র*-এর একটি ইঙ্গিত থেকে অস্পষ্টভাবে মনে হতে পারে গুর্জরদের একটি অংশ পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত। এক গুর্জর প্রতিহার রাজার অলবর থেকে প্রাপ্ত লেখে দেখা যাচ্ছে গুর্জরদের একটা অংশ কৃষিবৃত্তিতেও যুক্ত। অনুমান করা যেতে পারে গুর্জর জনসাধারণের একটি অংশ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে জনগোষ্ঠীর অন্য অংশের থেকে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন।[১২৫]

৩. একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্রর বর্ণনা অনুযায়ী কায়স্থদের দাপটে ব্রাহ্মণরা সামাজিক পরিসরে বেশ কিছুটা পিছু হঠতে থাকেন। সমাজের অভিজাতমহলে কায়স্থদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়। ব্রাহ্মণদের দান করা জমি কায়স্থরা পুনরাধিকার করতে থাকায় এই দুই গোষ্ঠীর সংঘাত তীব্র আকার নেয়।[১২৬] যে যুগে জমির উপর ব্যক্তি মালিকানার ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ভূস্বামীরা

---

[১২৪] Urmila Bhagowalia, *Vaisnavism and Society in Northern India 700-1200*, New Delhi: Intellectual Book Corner, 1st Published, 1980, p. 70

[১২৫] Brajadulal Chattopadhyaya, *The Making of Early Medieval India*, Delhi: Oxford University Press, 1st Published, 1994, pp. 64-65

[১২৬] B.N.S.Yadava, *Society and Culture in Northern India in the Twelfth Century*, Allahabad: Raka Prakashan, 2nd Edition, 2016, pp. 68-69

হয়ে উঠছেন অমিত ক্ষমতার মালিক, সেই যুগে কায়স্থদের ভূসম্পত্তি দখলের চেষ্টা সমসাময়িক প্রবণতার চিহ্ন বটেই। বর্ণজাতিকাঠামোর রাজনীতিতে সামাজিক সচলতা হস্তগত করার উপায় একটিমাত্র না হতে পারে, কিন্তু অঞ্চলভেদে সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী বিবিধ প্রকারে বস্তুগত ক্ষমতা দখল চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ। এই নিদর্শনটিও আমাদের মন্তব্যকে পুনঃপ্রমাণিত করবে।

২.২ বঙ্গদেশীয় প্রবণতা:

ঐতরেয় আরণ্যক-এ সম্ভবত প্রথমবার 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ আছে।[১২৭] এই উল্লেখের প্রকৃত তাৎপর্য কী সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। আরেকটু স্পষ্ট করে 'বঙ্গ'-এর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে *বৌধায়ন ধর্মসূত্র*-এ। এই গ্রন্থ অনুযায়ী বঙ্গদেশ আর্য পরিমণ্ডল বহির্ভূত; বঙ্গদেশে সাময়িক বসবাস করলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।[১২৮] মৌর্য শাসনকালে বঙ্গদেশের সঙ্গে আর্যাবর্তের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া গেল পুরালেখ থেকে। পুণ্ড্রবর্ধনের মহাস্থানগড় (বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া) থেকে প্রাপ্ত শিলালেখটি বঙ্গদেশের মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার খবর জানায়।[১২৯] আর্যাবর্তের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রমাণ আছে মহাকাব্যগুলিতেও। বাল্মীকি *রামায়ণ*-এ অযোধ্যার অভিজাত মহলের সঙ্গে এই অঞ্চলের লোকজনের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত আছে। নিখোঁজ সীতার সন্ধানে পূর্বদিকে যে দলটি পাঠানো হয়েছিল তার পুণ্ড্র ও মন্দর অঞ্চলে যাবার কথা। ব্যাসদেবের *মহাভারত*-এর বনপর্বের তীর্থযাত্রা অংশে পুণ্ড্রনগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদীর পবিত্রতার কথা আলোচিত।[১৩০] *মহাভারত*-এর উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে বঙ্গদেশ সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গির

---

[১২৭] সুকুমার সেন, *বঙ্গভূমিকা*, কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম আকাদেমি সংস্করণ, পৃ. ৪-৫

[১২৮] R.C.Majumdar(ed.), *The History of Bengal(Vol.1)*, Dacca: The University of Dacca, 1st Edition, 1943, p. 8

[১২৯] সুকুমার সেন, *বঙ্গভূমিকা*, পৃ. ১৭-১৮

[১৩০] R.C.Majumdar(ed.), *The History of Bengal(Vol.1)*, pp.8-9

ক্রমশ পরিবর্তন ঘটছে। আরও একটি খেয়াল করার মতো বিষয়, আলোচ্য পুরালেখ বা সাহিত্যিক উল্লেখগুলি পুণ্ড্রবর্ধন সংশ্লিষ্ট। পুণ্ড্রবর্ধনের বিশেষ গুরত্বপ্রাপ্তির কারণ সম্ভবত ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা। অঙ্গ ও বিদেহ (অধুনা বিহারের পূর্ব ও উত্তরভাগ) সমীপবর্তী পুণ্ড্রবর্ধনে মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রবাহ বঙ্গদেশের অন্যান্য উপ-অঞ্চলের তুলনায় আগে এসে পৌঁছেছিল।[১৩১] ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রসারের পূর্বেই বরং বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মপ্রচারের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন কাহিনি থেকে। *সংযুত্ত নিকায়*-এর তিনটি কাহিনিতে বুদ্ধদেবের সূক্ষ্ম দেশে ধর্মপ্রচারের কথা আছে। জৈন *আচারাঙ্গ সূত্র*-এ রাঢ়দেশে মহাবীর জৈনের ধর্মপ্রচার প্রয়াস ও বিড়ম্বনার উল্লেখ পাওয়া যাবে।[১৩২] ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বঙ্গদেশে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করল মূলত গুপ্ত আমল থেকে। এই পর্বের একাধিক ভূমিদান লেখ থেকে ব্রাহ্মণ্য বসতিবিস্তারের প্রক্রিয়াটির হদিস পাওয়া যায়। এই ভূমিদান লেখগুলির পর্যালোচনা ব্রাহ্মণ্য বসতিবিস্তারের পাশাপাশি বঙ্গদেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক চিত্রটিকেও কিছুটা স্পষ্ট করে। ভূমিদান প্রসঙ্গে তাম্রলেখ জারি করার প্রথাটি সর্বভারতীয়। খ্রি. দ্বিতীয় শতাব্দীর স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়েছিলেন ভূমিদান করলে অবশ্যই বস্ত্রখণ্ড বা তাম্রলেখের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণ প্রয়োজন। পরবর্তীকালের স্মৃতিকাররাও এপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।[১৩৩] এই ঐতিহ্য মেনে জারি করা ভূমিদান লেখগুলি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির রূপরেখা এবং সেই সূত্রে বঙ্গদেশের বর্ণজাতিব্যবস্থাকে বোঝার জন্যও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

---

[১৩১] Ryosuke Furui, ‘Rural Society and Social Networks in Early Bengal from the Fifth to the Thirteenth Century A.D., unpublished Ph.D. thesis submitted at Jawaharlal Nehru University, 2007, p. 34

[১৩২] D.R.Bhandarkar, ‘Aryan Immigration into Eastern India’, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol.12, No.2, 1931, p. 106

[১৩৩] Barrie M. Morrison, *Political Centres and Cultural Regions in Early Bengal*, Arizona: The University of Arizona Press, 1970, p.2

মৌর্য আমলে পুণ্ড্রবর্ধনের মহাস্থানগড় লেখটি থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক। লেখটিতে কোষ্ঠাগার শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। কোষ্ঠাগার বা শস্যাগারটিতে দান,সর্ষে, তিল ইত্যাদি সঞ্চিত হত। আপৎকালে শস্যাগারে সঞ্চিত খাদ্যশস্য বণ্টন করা হত জনগণের মধ্যে। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত এই শস্যাগারটির উপস্থিতি পুণ্ড্রবর্ধনে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের কথা বুঝিয়ে দেয়।[১৩৪] মৌর্য পরবর্তী যুগে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে কৃষিশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির ইঙ্গিত মিলছে চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত একটি টেরাকোটা ফলকেও। ফলকটি তিনজন কৃষকের চাষ করার দৃশ্যকে ধরতে চেয়েছে।[১৩৫] এই বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক সূত্রগুলি বাদ দিলে গুপ্ত আমল থেকেই বঙ্গদেশে পুরালেখগুলির নিয়মিত উপস্থিতি দেখা যায়। বঙ্গদেশের এই পুরালেখগুলি একইসঙ্গে জমি বিক্রয় ও দান লেখ; এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য অঞ্চলে দুর্লভ। খ্রি. ৪০০-৬০০ অব্দের মধ্যে বঙ্গদেশের পুণ্ড্র, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট অঞ্চল থেকে ১৭ টি লেখ পাওয়া যাচ্ছে। লেখগুলির একটা বড়ো অংশ পুণ্ড্রবর্ধন থেকে প্রাপ্ত। গুপ্ত আমলেও পুণ্ড্রবর্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ। সংগত কারণেই এই উপ-অঞ্চলে এই সময়ে দেখা যাচ্ছে ভূমিদানলেখের প্রাচুর্য। এতদিন অবধি মনে করা হত পুণ্ড্রবর্ধন থেকে প্রাপ্ত ধনাইদহ তাম্রশাসনটি বঙ্গদেশের প্রাচীনতম তাম্রশাসন। সম্প্রতি সে ধারণা বদলে গেছে। সমতট থেকে প্রাপ্ত বৈন্যগুপ্তের একটি লেখে (খ্রি. ৫০৪, গুপ্তাব্দ ১৮৪) দেখা যাচ্ছে এটি ৯১ গুপ্তাব্দের (৪১১ খ্রি.) একটি দানলেখের অবিকল প্রতিরূপ (যথাক্ষর)। অর্থাৎ, এই পুরালেখের সাক্ষ্য বুঝিয়ে দিচ্ছে ধনাইদহ তাম্রশাসনের প্রায় ২০ বছর আগে থেকেই বঙ্গদেশে গুপ্ত আমলের পুরালেখ মিলছে।[১৩৬] ৯১/১৮৪ গুপ্তাব্দের ভূমিদান লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে ২৮ টি ভূখণ্ড প্রথমে নগদে কিনে সেগুলি আবার আজীবিক

---

[১৩৪] Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.), *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives(up to c.1200 CE)*, Vol.2, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1st Published, 2018, p.120

[১৩৫] তদেব, পৃ.১২২

[১৩৬] তদেব, পৃ.১২৪-১২৫

বিহারে দান করা হল। এটি বঙ্গদেশের প্রথম ভূমিদান লেখ। জমি কেনা-বেচা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার স্মারক। প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই দান পেয়ে আজীবিক গোষ্ঠীও যথেষ্ট সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করেছিল।[১৩৭] এই আমলের (খ্রি. ৪০০-৬০০ অব্দ) ভূমিদান লেখ থেকে অধিকরণ নামক একটি প্রশাসনিক দপ্তরের কথা পাওয়া যাচ্ছে। ভূমিদান প্রক্রিয়া এই অধিকরণের মাধ্যমেই সংঘটিত হত। এই অধিকরণের সদস্য কুটুম্বিন, মহত্তর, সার্থবাহ, নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ ইত্যাদিরা।[১৩৮] উত্তর ভারতে এই সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে ব্রাহ্মণদের দেখা গেলেও বঙ্গদেশে কিন্তু তেমনটা ঘটছে না। বরং, বণিকশ্রেণিকে প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে পাওয়া যাচ্ছে।[১৩৯] অধিকরণের গঠনতন্ত্রের দিকে চোখ রাখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। অধিকরণের মাধ্যমে সংঘটিত ভূমিদান প্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ বসতি তৈরি হওয়ার কথা জানা যাচ্ছে বঙ্গদেশে। ধনাইদহ তাম্রশাসনে দেখা যাচ্ছে, একজন রাজ-আধিকারিক (আয়ুক্তক) সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে বেশ কিছুটা চাষযোগ্য জমি কিনে বরাহস্বামী নামে এক সামবেদীয় ব্রাহ্মণকে দান করেন। ১২১ গুপ্তাব্দের (৪৪০ খ্রি.) কলাইকুরি তাম্রশাসনে নয় কুল্যবাপ জমি কিনে পুণ্ড্রবর্ধনের তিন ব্রাহ্মণকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ পালন করার জন্য দান করা হয়।[১৪০] ৯১ গুপ্তাব্দের লেখটি থেকে বোঝা যাচ্ছে অব্রাহ্মণরা তাঁদের জমি বেচে দিচ্ছেন। অর্থাৎ, জমির উপর অব্রাহ্মণদের ব্যক্তিগত মালিকানা এই সময়ের বঙ্গদেশে ছিল। ১৮৮ গুপ্তাব্দের গুনাইঘর তাম্রশাসন থেকেও অব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীদের অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়। সমতট থেকে প্রাপ্ত বৈন্যগুপ্তের যে লেখটির কথা আমরা

---

[১৩৭] তদেব, পৃ.১৩০

[১৩৮] Ryosuke Furui, 'Rural Society and Social Networks in Early Bengal from the Fifth to the Thirteenth Century A.D., p. 78

[১৩৯] B.N.Mukherjee & others, *Sri Dinesacandrika: Studies in Indology*, Delhi: Sundeep, 1st Published, 1983, p.215

[১৪০] Puspa Niyogi, *Brahmanic Settlements in Different Subdivisions of Ancient Bengal*, Calcutta: Indian Studies: Past & Present, 1st Published, 1967, pp.4-5

আলোচনা করেছি, তাতে বোঝা যাচ্ছে খ্রি.পঞ্চম শতাব্দীর শুরু থেকেই অন্তত অব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীদের অস্তিত্ব বঙ্গদেশে ছিল।[১৪১] ব্রাহ্মণদের যেসমস্ত উল্লেখ এই পর্বের পুরালেখগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে তাঁরা কেবল ব্রাহ্মণ হিসাবেই পরিচিত। বড়োজোর তাঁদের বাসস্থান এবং বৈদিক শাখার উল্লেখটুকু রয়েছে। একমাত্র একটি পুরালেখেই ব্রাহ্মণ দানগ্রহীতার গোত্র উল্লিখিত।[১৪২] এই পর্বে ব্রাহ্মণদের অনেকসময় কুটুম্বিন হিসাবেই দেখা যাচ্ছে। 'ব্রাহ্মণাদি-গ্রামকুটুম্বিন' (অর্থাৎ ব্রাহ্মণসহ গ্রামের কুটুম্বিনরা) শব্দবন্ধে সেই ইঙ্গিত আছে।[১৪৩] *নারদস্মৃতি* মতে কুটুম্বিন বলতে কৃষক গৃহস্থকে বোঝায়। পুরালেখগুলি থেকেও সেরকম ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে।[১৪৪] অবশ্য ব্রাহ্মণরা নিজে জমি চাষ করতেন কি না তা এই পর্বের পুরালেখগুলি থেকে স্পষ্ট নয়। গুপ্তযুগের বঙ্গদেশীয় লেখমালায় ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের যে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তাতে 'নীবিধর্ম' বা 'অক্ষয়নীবিধর্ম' নীতির কথা আছে। এই নীতি অনুযায়ী দানগ্রহীতা শাশ্বতকালের জন্য ভূমির ভোগদখলের অধিকার লাভ করেন।[১৪৫] কুটুম্বিন বলতে কৃষকদের বোঝানো হলেও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও কর্তৃত্বের তফাত ছিল। আর্থিক প্রতিপত্তিশালী কুটুম্বিনদের কেউ কেউ দান করার জন্য জমি কিনতে পারতেন। এই কুটুম্বিনদের মধ্যেও আবার দুটি স্তর লক্ষ করা যাচ্ছে। বৈগ্রাম পুরালেখ থেকে যেমন ভোয়িলা ও ভাস্কর নামে দুই কুটুম্বিনের কথা জানা যাচ্ছে। তাঁদের পিতা যথেষ্ট ধনী, অর্থ ক্ষমতার জোরে তিনি একটি মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। সন্তানরাও জমি কেনার

[১৪১] Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.), *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives(up to c.1200 CE)*, Vol.2, pp.130-131

[১৪২] Ryosuke Furui, 'Rural Society and Social Networks in Early Bengal from the Fifth to the Thirteenth Century A.D., pp.90-91

[১৪৩] Brajadulal Chattopadhyaya, *Aspects of Rural Settlements and Rural Society in Early Medieval India*, New Delhi: Primus Books, Reprinted, 2017, p.17

[১৪৪] Ryosuke Furui, 'Rural Society and Social Networks in Early Bengal from the Fifth to the Thirteenth Century A.D., pp.85-86

[১৪৫] ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, *গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি(দ্বিতীয় ভাগ)*, কলকাতা: গ্রন্থমিত্র, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ৪১

কাজে ছয় দিনার এবং আট রূপক ব্যয় করতে সক্ষম। আবার, জগদীশপুর পুরালেখের সাক্ষ্যে বোঝা যাচ্ছে তিন কুটুম্বিন, যদিও তাঁরা অন্যদের তুলনায় ধনী, দুই দিনারের বেশি ব্যয় করতে পারছেন না। কুটুম্বিনদের অল্পসংখ্যক একটি অংশই কেবল অধিকরণের সদস্য। এই সমস্ত নমুনা থেকে আমরা কুটুম্বিনদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার নিরিখে একপ্রকার উচ্চাবচতা দেখতে পাচ্ছি। কুটুম্বিনদের সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য সম্বন্ধে আরেকটু হদিস পাওয়া যাবে দামোদরপুর পুরালেখ থেকে। 'অধিকরণ কুটুম্বিন', 'গ্রামিক কুটুম্বিন' ও 'ক্ষুদ্রপ্রকৃতি কুটুম্বিন' নামে তিনটি গোষ্ঠীর কথা পাওয়া যাচ্ছে। 'অধিকরণ কুটুম্বিন' নিঃসন্দেহে অধিকরণের সদস্য, 'গ্রামিক কুটুম্বিন' এই পুরালেখ অনুযায়ী গ্রামের বাসিন্দা কুটুম্বিন আর 'ক্ষুদ্রপ্রকৃতি কুটুম্বিন' আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতায় ন্যূন। মহত্তররা কুটুম্বিনদের মধ্যে অগ্রগণ্য হওয়ার দরুণ আলাদা একটি শ্রেণি। সংখ্যাতেও তাঁরা কুটুম্বিনদের মধ্যে কম। আর্থিক প্রতিপত্তি নিশ্চয় মহত্তরদের বিশিষ্ট লক্ষণ। তবে এই পর্বে কুটুম্বিন আর মহত্তরদের সামাজিক পার্থক্য বিরাট হয়ে দাঁড়ায়নি।[১৪৬]

বণিকদের সমৃদ্ধির যথেষ্ট কারণ ছিল এই পর্বে। তাম্রলিপ্ত বন্দর এই সময়ে অত্যন্ত প্রাণবন্ত। *জাতক*-এর গল্পে বণিকদের তাম্রলিপ্তে যাতায়াতের খবর পাওয়া যায়। এই যাতায়াত হত সম্ভবত প্রাচীন বাণিজ্যপথগুলি দিয়ে। বারাণসী থেকে মগধের ভিতর দিয়ে অঙ্গের রাজধানী চম্পা হয়ে পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত সার্থবাহরা স্থলপথে যাতায়াত করতেন। আবার, চম্পা থেকে গঙ্গা ও ভাগীরথী দিয়ে গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত জলপথও ছিল। কজ্জঙ্গল থেকে পুণ্ড্রবর্ধন হয়ে নদী পার করে কামরূপ যাবার পথ ছিল—হিউয়েন সাঙের সাক্ষ্যে একথা জানা যায়।[১৪৭] এই

[১৪৬] Ryosuke Furui, 'Rural Society and Social Networks in Early Bengal from the Fifth to the Thirteenth Century A.D., pp.85-89

[১৪৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব্ব)*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৫৬

অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের সূত্রে যে অর্থাগম হাতে তার সিংহভাগ যেত বণিকের হাতে।[১৪৮] এই আর্থিক প্রতিপত্তি বণিকের সামাজিক ও প্রশাসনিক মর্যাদার অন্যতম কারণ। অধিকরণ বা অধিষ্ঠানাধিকরণের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়ার সূত্রে নগর সংলগ্ন গ্রামীণ জনপদগুলিতেও বণিকদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। দামোদরপুর থেকে প্রাপ্ত চারটি তাম্রশাসন ও পাহাড়পুর লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ বিষয় এবং দক্ষিণাংশক বীথির অন্তর্গত গ্রামগুলির উপরেও তাঁদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। বুধগুপ্তের সমকালীন নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপালের দামোদরপুর লেখে উল্লেখ থেকে একথা স্পষ্ট। রিভুপাল কোকামুখস্বামী ও শ্বেতবরাহস্বামীর মন্দির নির্মাণের জন্য জমি দান করেন। কোকামুখ সম্ভবত বর্তমান নেপালের পূর্বভাগে অবস্থিত একটি তীর্থ। আন্দাজ করা যেতে পারে, রিভুপাল এই তীর্থে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে নিজের বাসস্থান সংলগ্ন অঞ্চলে কোকামুখস্বামীর মন্দির নির্মাণের জন্য জমি দান করেন। সম্ভবত মন্দিরের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে মন্দিরের আয়ের একটা অংশও রিভুপালের হাতে আসত। সেই অর্থবলে শহরেও বণিক হিসাবে তাঁর গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলেন।[১৪৯]

গুপ্ত পরবর্তী যুগে ভূমিদান অর্থনীতি আরো জোরালো হয়ে ওঠে। এই প্রবণতা সমসাময়িক ভারতবর্ষীয় প্রবণতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। শশাঙ্কের সমকালীন এগরা বা পাঁচরোল তাম্রশাসনে দেখা যাচ্ছে, দ্রোণবাপ পিছু চার পণ খরচ করে ১০০ দ্রোণবাপ জমি কিনে সেই জমি আবার নিষ্কর জমি হিসাবে দান করা হচ্ছে দামস্বামী নামে এক ত্রিবেদী ব্রাহ্মণকে। গুপ্ত

---

[১৪৮] তদেব, পৃ. ১৫৯

[১৪৯] Ryosuke Furui, 'Merchant Groups in Early Medieval Bengal: With Special Reference to the Rajbhita Stone Inscription of the Time of Mahipala I, Year 33', Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol.76, Issue.3. October 2013, pp.399-400

যুগের মতোই এই দান প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মহত্তর, মহামহত্তর ইত্যাদিরা।[১৫০] বটস্বামী নামে এক ঋগ্বেদীয় বহভৃচশাখাভুক্ত, কৌণ্ডিন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের খবর পাওয়া যাচ্ছে মহারাজা গোপচন্দ্রের সমকালীন মল্লসারুল তাম্রশাসন থেকে। ব্রাহ্মণকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ পালনের বন্দোবস্ত করে দিতেই এই ভূমিদান। রাজা সমাচারদেবের ঘুঘরাবাতি তাম্রশাসনে দেখছি সুপ্রতীকস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ কিছু পতিত জমির জন্য আবেদন করেছেন রাজার কাছে। দানপ্রাপ্ত জমিটির সাহায্যে তিনি বলি, চরু, যজ্ঞ ইত্যাদি বৈদিক কর্মে নিযুক্ত থাকতে চাইছেন। লোকনাথের তিপেরা তাম্রশাসন চতুর্বেদে পারদর্শী ১০০ এর বেশি ব্রাহ্মণকে জমি দানের খবর দিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে এক ব্রাহ্মণ জনপদ।[১৫১] গুপ্ত পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ জনপদ ও সন্নিবেশ বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণরাই উদ্যোগী ভূমিকা নেন। ধর্মাদিত্যের শাসনকালীন দ্বিতীয় ফরিদপুর লেখতে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ বাসুদেবস্বামী একটি জমি কিনে দান করেন লৌহিত্য গোত্রীয় কাণ্ব-বাজসনেয় শাখার সোমস্বামী নামক ব্রাহ্মণকে। অনেকক্ষেত্রেই এসব দানে দাতা ও গ্রহীতার আত্মীয়তার সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। এই দানের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণদের নিজস্ব সামাজিক গোষ্ঠী নির্মিত হচ্ছে বঙ্গদেশে।[১৫২] লক্ষণীয়, এই পর্বের দানলেখগুলিতে গ্রহীতার গোত্র, বৈদিক শাখা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত। ব্রাহ্মণ্য পরিচিতির চিহ্নকগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। একদিকে গুপ্ত পরবর্তী যুগে রাজাদের তরফে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্রাহ্মণদের নিজস্ব গোষ্ঠী নির্মাণের প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ও বৈচিত্র বৃদ্ধি পায়। পুরালেখগুলির সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় ও অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে এই পর্বে না থাকলেও অন্যান্য শাখার ব্রাহ্মণ যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। যদিও লোকনাথ ও মরুণ্ডনাথ ত্রিবেদী এবং চতুর্বেদী

---

[১৫০] Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.), *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives(up to c.1200 CE)*, Vol.2, p.133

[১৫১] Puspa Niyogi, *Brahmanic Settlements in Different Subdivisions of Ancient Bengal*, pp.5-6

[১৫২] Ryosuke Furui, 'Brahmanas in Early Medieval Bengal: Construction of Their Identity, Networks and Authority', Indian Historical Review, 40:223, 2013, pp.227-228

ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছিলেন। গুপ্ত পরবর্তী যুগের পুরালেখগুলিতে কৌণ্ডিন্য, কাশ্যপ, লৌহিত্য, অগস্ত্য গোত্রের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের রাঢ়ী ও বারেন্দ্রীরা শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বৎস, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ গোত্রভুক্ত বলে দাবি করেন। কিংবদন্তি অনুসারে এই পাঁচ গোত্রের ব্রাহ্মণকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন রাজা আদিশূর। সেই কিংবদন্তির ঐতিহাসিকতা সংক্রান্ত বিতর্কে না ঢুকেও বলা যায় ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণরা বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ বসতির অন্যতম আদি বাসিন্দা।[১৫৩] বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ জনপদ সৃষ্টির দুটি উপ-আঞ্চলিক প্রবণতা দেখা যায়। রাঢ় ও বঙ্গে মহত্তর ও অন্যান্য প্রভাবশালী ভূম্যধিকারীরা কায়স্থদের সঙ্গে একটি গোষ্ঠী গঠন করে জমি কেনা বেচা বিষয়ে কর্তৃত্ব ফলাতে থাকে। স্থানীয় সামন্তদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধও শুরু হয়। আবার, সমতট ও শ্রীহট্টে সামন্তরাই অরণ্যাঞ্চল পরিষ্কার করে ব্রাহ্মণ জনপদ তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। বঙ্গ ও রাঢ়ে ব্রাহ্মণরা স্থানীয় ভূম্যধিকারী হিসাবে কায়স্থদের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ গড়ে তোলায় সক্রিয় ছিলেন। ভূম্যধিকারী হিসাবে রাঢ়ে তাঁদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাঢ়ে কৃষি অর্থনীতির বিস্তার ও ব্রাহ্মণ জনপদ নির্মাণের প্রক্রিয়া খুব দ্রুত গতিতে চলছিল। সমতট ও শ্রীহট্টের পুরালেখগুলি থেকে দেখা যায় ব্রাহ্মণ দানগ্রহীতারা অরণ্যাঞ্চল কেটে পরিষ্কার করা জমিতে কৃষির সূচনা করছিলেন। এখানেও তাঁরা ক্রমশ প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী হয়ে ওঠেন।[১৫৪]

গুপ্ত পরবর্তী যুগে উপ-আঞ্চলিক রাজত্ব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার বিন্যাসেও পরিবর্তন আসে। জয়রামপুর, মল্লসারুল,এগরা পুরালেখে দেখছি ভূমিদানের ক্ষেত্রে যে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানানো হয়েছে তাঁদের মধ্যে কুটুম্বিনরা নেই। সম্ভবত মহত্তরদের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুটুম্বিনদের সামাজিক-রাজনৈতিক গুরুত্বও কমে গেছে। তাঁদের সঙ্গে

---

[১৫৩]B.N.Mukherjee & others, *Sri Dinesacandrika: Studies in Indology*,' pp. 219-220

[১৫৪] Ryosuke Furui, 'Brahmanas in Early Medieval Bengal: Construction of Their Identity, Networks and Authority', pp.226-228

ভূমিদান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আলোচনা বা রফার প্রয়োজন থাকছে না। প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী হিসাবে মহত্তররা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগের জেরে যে আধিপত্য কায়েম করেন, তাতে সামন্তরাজাদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কুটুম্বিনদের অবস্থার পরিবর্তন তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক সচলতার উল্লেখযোগ্য নমুনা। যদিও এই সচলতার সঙ্গে বর্ণজাতিব্যবস্থার সরাসরি সম্পর্ক নেই।

বঙ্গদেশের পুরালেখগুলিতে ভূমিদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বর্ণ পরিচয় প্রায়শই অনুল্লিখিত। বর্ণ ব্যতীত সামাজিক পরিচয়ের অন্য চিহ্নকগুলিই বরং বেশি ক্রিয়াশীল। ব্যতিক্রম দেখা যাবে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে। তাঁদের বর্ণ পরিচয় বরং ক্রমাগত স্পষ্ট হতে থেকেছে পরবর্তী পুরালেখগুলিতে গোত্র, প্রবর, বৈদিক শাখার পুনঃপুন উল্লেখের মাধ্যমে। শাসকশ্রেণির মধ্যেও সম্ভবত বর্ণ পরিচয় প্রকাশের একটা চেষ্টা শুরু হচ্ছিল। লোকনাথের পিতৃ ও মাতার পিতৃবংশ ব্রাহ্মণ। তাঁর মাতার পিতামহ পারশব। একদিকে লোকনাথ যেমন শাসক হিসাবে তাঁর উচ্চবর্ণের সঙ্গে যোগাযোগ স্পষ্ট করছেন, তেমনই পরিবারে বর্ণসংকরের ইতিহাসও প্রকাশিত হচ্ছে এই লেখটিতে। লোকনাথের রাজা হওয়া বর্ণনির্দিষ্ট পেশার বাইরে যাওয়ার কথা বলে।[১৫৫] রাজা শশাঙ্কের সমকালীন পাঁচরোল তাম্রশাসনে ‘চণ্ডালপুষ্করিণী'-র উল্লেখ আছে। এটি চণ্ডালের পুকুর বা চণ্ডালদের জন্য পুকুর দুই অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। বঙ্গদেশের লেখমালায় এই প্রথম চণ্ডালের উল্লেখ পাওয়া গেল। চণ্ডালের জন্য আলাদা পুকুর সম্ভবত অস্পৃশ্য গোষ্ঠীর থেকে দূরত্ব বজায় রাখার একটি চেষ্টার নিদর্শন।[১৫৬] এই উল্লেখটি থাকা সত্ত্বেও এই পর্বে বঙ্গদেশে বর্ণজাতিব্যবস্থা পাল বা সেনযুগের তুলনায় কতদূর দৃঢ় হয়েছিল

---

[১৫৫] Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.), *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives(up to c.1200 CE)*, Vol.2, pp.50-55

[১৫৬] তদেব, পৃ.৫২

তা নিয়ে ঈষৎ সংশয় আছে। লোকনাথের বৃত্তান্তের সূত্রেই দেখা যাচ্ছে পেশা ও বিবাহের ক্ষেত্রে শাস্ত্রনিয়মের লঙ্ঘন ব্যবহারিক জীবনে ঘটত। ব্রাহ্মণরা নানা পেশায় যুক্ত হয়ে পড়েন। তাত্ত্বিকভাবে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বা আধ্যাত্মিক গুরুত্ব স্বীকার করা হলেও কার্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের চূড়ান্ত সামাজিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনেকে এগুলিকে প্রাক্-পাল যুগের বঙ্গদেশে বর্ণজাতিব্যবস্থার শিথিলতার নির্দেশক বলে মনে করেছেন।[১৫৭]

অষ্টম শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন নতুন রাজশক্তির উত্থান ঘটে। বঙ্গদেশে শশাঙ্ক পরবর্তী সময়ে বড়োমাপের রাজশক্তি হিসাবে পাল রাজাদের দেখা যাচ্ছে। মূলত বঙ্গদেশ ও বিহার পাল রাজাদের অধীনস্থ হলেও উত্তর ভারতের উপরও কখনও কখনও তাঁদের আধিপত্য তৈরি হয়েছিল। পাল রাজাদের আমলের ভূমিদান লেখ থেকে ব্রাহ্মণ বসতি নির্মাণে পাল রাজাদের সক্রিয় ভূমিকার কথা জানা যায়। খলিমপুর শাসন অনুযায়ী ধর্মপাল ৩২ তম রাজ্যাঙ্কে চারটি গ্রাম দান করেন। এই গ্রামগুলির আধুনিক অবস্থান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হওয়া গেলেও দীনেশচন্দ্র সরকারের অনুমান কামরূপ লাগোয়া উত্তরবঙ্গে এই গ্রামগুলি অবস্থিত ছিল। পুরালেখটির সূত্রে জানা যাচ্ছে, বসতিস্থাপনকারী দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণরা লাট দেশ অর্থাৎ গুজরাট থেকে আগত। একই পরিবারের রাজা দ্বিতীয় গোপাল ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে জাজিলপাড়া দানলেখের মাধ্যমে ভট্টপুত্র যাজ্ঞিক শ্রীধরশর্মণকে ভূমিদান করেন। শ্রীধরশর্মণ মুক্তাবাস্তুর বাসিন্দা। মুক্তাবাস্তুকে কখনও মধ্যদেশ, কখনও উত্তরবঙ্গ, কখনও অসমের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। তিনি উক্ত অঞ্চল থেকে এসে বসতি তৈরি করলেন শীহ-গ্রামে। অনুমান করা হয়, শীহ-গ্রাম বর্তমান দিনাজপুরের অংশ। যদি মুক্তাবাস্তু উত্তর বঙ্গে অবস্থিত হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণটি পূর্ববসতি ছেড়ে এলেও খুব দূরে যাননি। প্রথম

[১৫৭]B.N.Mukherjee & others, *Sri Dinesacandrika: Studies in Indology*, p.222

মহীপালের নবম রাজ্যাঙ্কে বাণগড় দানলেখের মাধ্যমে হস্তিপদ গ্রাম থেকে আগত এক ব্রাহ্মণকে চবটি গ্রামে ভুমিদান করা হচ্ছে। চবটি গ্রামের অবস্থান ঠিক করে জানা না গেলেও হস্তিপদ গ্রামের অবস্থান সম্ভবত অধুনা বিহারের মজফফরপুরে।[১৫৮]

পাল পূর্ববর্তী যুগে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণরা সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে শাস্ত্রচর্চায় বিশেষ কোন অবদান রাখেননি। বরং, এই পর্বে বঙ্গদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের খ্যাতি তখন সুবিদিত।[১৫৯] *হরিচরিত* গ্রন্থের রচয়িতা চতুর্ভুজ জানাচ্ছেন, তাঁর পূর্বপুরুষ সুবর্ণরেখ বৈদিক সংহিতা, স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণে সুপণ্ডিত। রাজা ধর্মপালের থেকে তিনি করঞ্জ গ্রামটি দান হিসাবে পেয়েছিলেন। এর সঙ্গে আমরা জুড়ে নিতে পারি লাটদেশ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রচর্চার ধারাকে। পাল আমল থেকে উত্তর ভারতের মতোই প্রশাসনিক পদেও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য করতে দেখছি। বাদাল স্তম্ভলেখ থেকে এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী পরিবারের কথা জানা যাচ্ছে। এই পরিবারেরই সন্তান দর্ভপাণি রাজা দেবপালের মন্ত্রী। তাঁর পৌত্র কেদারমিশ্রও অতি অল্প বয়স থেকে দেবপাল ও সুরপালের রাজসভায় মন্ত্রিত্ব সামলেছেন। এই পরিবারের উল্লেখ আছে ভাগলপুরে নারায়ণপালের দানলেখতেও। সেখানেও দেখা যাচ্ছে কেদারমিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্রের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা।[১৬০] প্রশাসনিক পদ অধিকারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল নিঃসন্দেহে। আরেকটি ব্যাপার ব্রাহ্মণের আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছিল। পূর্ববর্তী যুগে ব্রাহ্মণ দানগ্রহীতাদের কেবল ভূমি দান করা হত। কিন্তু পাল পর্বের লেখগুলি থেকে দেখা যায়, দানগ্রহীতাদের ভূমির পাশাপাশি ভূমি থকে উপার্জন করার অধিকারও দেওয়া হচ্ছে। এই ভূমিখণ্ডগুলিতে শ্রমিকদের বিনা মজুরিতে পাওয়া

---

[১৫৮] Swati Dutta, *Migrant Brahmanas in Northern India,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1st Edition, 1989, pp.21-23

[১৫৯] B.N.Mukherjee & others, *Sri Dinesacandrika: Studies in Indology*,p.220

[১৬০] Puspa Niyogi, *Brahmanic Settlements in Different Subdivisions of Ancient Bengal*, pp.6-7

যাবে, চাট-ভাট অর্থাৎ স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকরা এই জমিতে প্রবেশ করতে পারবেন না। দানকৃত জমিগুলি করমুক্তও বটে। এছাড়াও, ওই ভূমিখণ্ডের কৃষকদের রাজা নির্দেশ দিচ্ছেন দানগ্রহীতার কথা পুরোপুরি মেনে চলতে। এই নির্দেশ দেখা যাবে পাল রাজাদের পাশাপাশি চন্দ্র রাজবংশের লেখমালাতেও। ফলে, এযুগে ব্রাহ্মণের অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে। চন্দ্রবংশের লেখমালায় দেখা যায়, দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের গোত্র, প্রবর, বিদ্যাচর্চার শাখায় বিশেষ মনোযোগ থাকছে। যেমন, ধুল্ল দানলেখের গ্রহীতা ব্যাসগঙ্গশর্মণের বিশদ গোত্র, প্রবর পরিচয়, বৈদিক শাখার উল্লেখ ও বংশবৃত্তান্ত আছে। ব্রাহ্মণ্য পরিচিতি নির্মাণের চিহ্নকগুলির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব লক্ষণীয়।[১৬১] গোত্র-প্রবরের উল্লেখে গুরুত্ব বঙ্গদেশে বিবাহনির্ভর জ্ঞাতিত্ব প্রতিষ্ঠার ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এই পর্বে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের উপ-আঞ্চলিক বিস্তৃতির পাশাপাশি গোত্র-প্রবর নির্ভর জ্ঞাতিত্ব ও বর্ণজাতিপরিচয়ের বিশিষ্টতা নির্মাণের প্রচেষ্টাটি লক্ষণীয়। অবশ্য গোত্র-প্রবরের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বঙ্গদেশের সবকটি উপ-অঞ্চলে একইসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। লেখমালা থেকে সে খবরও পাওয়া যায়। বরেন্দ্র অঞ্চলে যেমন প্রথম গোত্রের উল্লেখ দেখা যায় রাজা বুধগুপ্তের নন্দপুর লেখতে (৪৮৮ খ্রি.)। অন্যদিকে সমতট থেকে প্রাপ্ত লেখগুলির মধ্যে শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ লেখতেই প্রথম গোত্রের উল্লেখ রয়েছে (৯২৯-৯৭৫ খ্রি.)। বরেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত লেখমালার মধ্যে প্রবরের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যাচ্ছে নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজা দ্বিতীয় গোপালের অনুশাসনে। সমতটের দানলেখগুলি অধিকাংশই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে। প্রবরের উল্লেখ সেখানে স্বাভাবিকভাবেই নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ

[১৬১] Ryosuke Furui, 'Brahmanas in Early Medieval Bengal: Construction of Their Identity, Networks and Authority', pp.230-232

দানগ্রহীতাদের ক্ষেত্রেও প্রবরের উল্লেখ এই লেখমালায় পাচ্ছি না। ভাগীরথী-হুগলী অঞ্চলে প্রবরের ব্যবহার শুরু হচ্ছে আরও পরে; একাদশ শতাব্দীতে।[১৬২]

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের পাশাপাশি কায়স্থের গুরুত্বও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গুপ্ত পর্বের লেখমালায় 'প্রথম কায়স্থ' নামে একজন আধিকারিকের নাম জানা যায়। পরবর্তী যুগে এই আধিকারিকের নাম হয় 'জ্যেষ্ঠ কায়স্থ'। প্রথমাবধি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থকার দরুণ কায়স্থদের যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল। যদিও, কায়স্থ বলতে প্রথমদিকে একটি পেশাদারি গোষ্ঠীই বোঝাত। বিভিন্ন বর্ণ ও জাতের মানুষদের অংশগ্রহণ ছিল এই গোষ্ঠীতে। ক্রমশ পেশাদারি গোষ্ঠীটি জাতের চেহারা নিতে থাকে। ঠিক কবে এই বদল সংঘটিত হয় তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* বা চতুর্দশ শতাব্দীর *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ করণ-কায়স্থদের একটি জাত হিসাবেই গণ্য করা হচ্ছে। পাল পর্বে এসে যে কায়স্থদের এই সামাজিক পরিচিতি অনেকটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কায়স্থদের 'জাত' হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়াটি খেয়াল করলে বঙ্গদেশের সামাজিক সচলতার ইতিহাসের একটি অংশ স্পষ্ট হবে। গুপ্ত আমলে ৪৩৯ খ্রিস্টাব্দের কলাইকুরি পুরালেখে কায়স্থ প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, দেবদত্ত, লক্ষ্মণ, কান্তিদেব, শম্ভুদত্ত, কৃষ্ণদাস এবং বীথি কুলিক ভীম, পুস্তপাল সিংহনন্দী,যশোদামন নয় কুল্যবাপ জমি কিনে তিন ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই তিন ব্রাহ্মণের মধ্যে দেবদত্ত নামে চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের জন্য বরাদ্দ হয় পাঁচ কুল্যবাপ জমি। বাকি দুই ব্রাহ্মণকে দুই কুল্যবাপ করে জমি দান করা হয়। ৪৪৮ খ্রিস্টাব্দের জগদীশপুর পুরালেখেও পুস্তপাল সিংহনন্দী, যশোদামন ও কায়স্থ রুদ্রদাসের নাম রয়েছে। প্রশাসনিক কাজের সূত্রে কায়স্থ, পুস্তপাল, কুলিকরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পুস্তপাল পরবর্তীকালে কর্মগত

[১৬২] Suchitra Majumdar,' Agrarian Society in Early Medieval Bengal', Social Scientist, Vol.43, No.5-6, May-June 2015, pp.19-20

সাদৃশ্যের কারণে কায়স্থের সঙ্গে কিছুকাল যুক্ত থাকলেও কুলিকদের মতোই ধীরে ধীরে দূরে সরে যান। ঐতিহ্যবাহী পেশাতে নিযুক্ত থেকে তাঁরা প্রশাসনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেননি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তীকালে উপ-আঞ্চলিক রাজন্যবর্গের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তপালের প্রশাসনিক গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। পরবর্তীকালের পুরালেখগুলিতে পুস্তপালের উল্লেখ নগণ্য। করণ-কায়স্থদের আমরা পরবর্তীকালে অভিন্ন হিসাবে দেখেছি। এই অভিন্নতা স্থাপনও ঠিক কবে হল নিশ্চিত করে বলা যায় না। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত গুপ্ত পুরালেখগুলিতে আধিকারিকদের ক্ষেত্রে 'করণ' শব্দটি প্রযুক্ত না হলেও, দপ্তর প্রসঙ্গে শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে। তিপেরা পুরালেখের রাজা লোকনাথ করণ হলেও এটি কোন জাতিগত পরিচয় ছিল না। এটি নিতান্তই প্রশাসনিক পরিচয়। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর লেখমালতেও করণ-কায়স্থদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক আধিকারিক হিসাবে দেখা গেলেও তারা জাতের চেহারা নিয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে পাল-যুগে এসে করণ-কায়স্থরা যে একটি অভিজাত গোষ্ঠীর রূপ নিয়েছিল তা মনে করার সংগত কারণ আছে। সম্ভবত পেশাগত সাদৃশ্যের কারণে করণ ও কায়স্থরা অভিন্ন সম্প্রদায়ের চেহারা নিচ্ছিলেন। রামপালের রাজসভার সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী *রামচরিত*-এ লিখেছেন তাঁর পিতা ছিলেন 'করণানামগ্রণী' অর্থাৎ করণদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর পিতামহের জন্মও সুবিখ্যাত নন্দী পরিবারে। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা ছিলেন সান্ধিবিগ্রহিক। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার দরুণ তাঁরা অর্থ, দানক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কায়স্থদের বিদ্যাচর্চার ধারা। সবমিলিয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে তাঁদের জাত হিসাবে আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ হয়েছিল। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর জাতিকাঠামোয় তাঁদের স্থান ব্রাহ্মণের পরেই।[১৬৩]

[১৬৩] Chitrarekha Gupta, *The Kayasthas: a Study in the Formation and Early History of Caste*, Calcutta: K P Bagchi & Company, 1st Published, 1996, pp.68-75

বঙ্গদেশে এই সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উত্থান কৈবর্তদের। *মনুসংহিতা* ১০.৩৪ অনুযায়ী আয়োগব নারী ও নিষাদ পুরুষের মিলনে উৎপন্ন প্রতিলোম বর্ণসংকর কৈবর্ত। নৌকর্ম এঁদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট জীবিকা।[১৬৪] বঙ্গদেশে এমনকি পাল আমলের এক পর্বেও কৈবর্তদের সামাজিক অবস্থা খুব একটা উন্নত ছিল না। বর্ণের নিরিখে তো বটেই, এমনকি অর্থের নিরিখেও কৈবর্তদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। নবম শতাব্দীর বারেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত রাজা দ্বিতীয় গোপালের একটি পুরালেখে কৈবর্তদের উল্লেখ ছিল মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডালদের সঙ্গে। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষদিকে প্রথম মহীপালের দুটি পুরালেখ থেকে কৈবর্তদের একটা অংশের ভূম্যধিকারী হয়ে ওঠার খবর পাওয়া যায়। ভীম ও দিব্য নামক কৈবর্ত প্রধানদের বিদ্রোহের সঙ্গে নবার্জিত আর্থিক প্রতিপত্তির সম্ভবত একটা যোগ আছে।[১৬৫] রামশরণ শর্মার অভিমত, একাদশ শতাব্দীর বিদ্রোহের ভিত্তিতে কৈবর্তদের সাধনাধিকারগত মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে, রামশরণ শর্মা উদ্ধৃত করেছেন *বল্লালচরিত*-এর সাক্ষ্য। *বল্লালচরিত* ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। পরবর্তীকালের একটি রচনার ভিত্তিতে একাদশ শতাব্দীতে কৈবর্তদের সাধনাধিকার বৃদ্ধির প্রমাণ মিলতে পারে কি না, সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বরং, দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভবদেব ভট্টের স্মৃতিগ্রন্থে কৈবর্তরা অন্ত্যজই। এমনকি আদি মধ্যযুগে রচিত *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* কৈবর্তদের ধীবর জাতির মানুষ হিসাবে খুব বেশি সাধনাধিকার দেয়নি।[১৬৬] যদিও বেশ কিছু পাল পুরালেখে কৈবর্তদের নিম্নজাতিভুক্ত গোষ্ঠীর তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত, কৈবর্তদের পেশা আর চণ্ডালদের মতো ঘৃণিত ছিল না।[১৬৭] অর্থোপার্জনের পাশাপাশি কৈবর্তদের একটি অংশের বিদ্যাশিক্ষাতেও নিশ্চয় আগ্রহ

---

[১৬৪] মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), *মনুসংহিতা*, পৃ.৪৬৪

[১৬৫] Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.), *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives(up to c.1200 CE)*, Vol.2,,p.60

[১৬৬] Osmund Boperachchi & Suchandra Ghosh(eds.), *Early Indian History and Beyond*, New Delhi: Primus Books, 1st Published, 2019, p.488

[১৬৭] তদেব, পৃ.৫০৮

তৈরি হচ্ছিল। *রামচরিত*-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ২৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে কৈবর্ত প্রধান ভীমের মধ্যে একইসঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বসবাস।[১৬৮] এসব কারণে সাধনাধিকারের বৃদ্ধি না হলেও কৈবর্তদের সামাজিক অবস্থানে একটা বদল আসছিল।

সামাজিক অবস্থানে পরিবর্তন এসেছিল বণিকদের ক্ষেত্রেও। গুপ্ত আমলে ভূমিদানের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে বণিকদের সক্রিয় উপস্থিতি দেখা গেলেও পরবর্তী যুগে এসব কর্মকাণ্ডে বণিকরা ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে পড়েন। বণিকদের বাণিজ্যে খুব ভাটা পড়েছিল এমনটা বলা চলে না। সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং একশত বণিককে তাম্রলিপ্ত থেকে মগধের দিকে যাত্রা করতে দেখেছিলেন। একই বিবরণীতে বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত ও হরিকেলের সঙ্গে সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগের কথা বর্ণিত। তৎসত্ত্বেও, সমকালীন ভূমিদানলেখগুলিতে বণিকের অনুপস্থিতি লক্ষ করার মতো। রাজা ধর্মপালের ২৬ তম রাজ্যাঙ্কে জারি করা একটি তাম্রশাসনে দেখছি, ভদ্রনাগ নামক এক মহাসামন্তের ভূমিদানগ্রহণ। তাম্রশাসন থেকে জানা যাচ্ছে তাঁর প্রপিতামহ বলনাগ ছিলেন সার্থবাহ। অর্থাৎ, বলনাগের সময়কালে অষ্টম শতাব্দীতেও বাংলায় বণিকরা সক্রিয় ছিলেন। বলনাগের পৌত্র উচ্চগনাগের সময়ে তাঁরা মহাসামন্তে পরিণত হন। এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ছিল ভূম্যধিকার ও গ্রামীণ সমাজে আধিপত্য। পূর্ববর্তী যুগের নথির ভিত্তিতে সে ধরনের আধিপত্য যে বণিকদের ছিল তা আমরা আগেই জেনেছি। সব বণিক পরিবারের ক্ষেত্রেই অবশ্য এমনটা ঘটছিল না। নালন্দা স্তম্ভলেখে 'বণিককুল' শব্দটি কিছু পরিবারের বংশানুক্রমিক বাণিজ্যবৃত্তির চিহ্নক। এই বণিক পরিবারগুলির ক্ষেত্রেও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের চিহ্ন স্পষ্ট। এই পর্বের বণিকদের দানকর্মও মূর্তি নির্মাণ বা স্তম্ভ নির্মাণেই সীমাবদ্ধ। পূর্ববর্তী

---

[১৬৮]MM. Haraprasad Sastri(ed.), *Ramacaritam of Sandhyakaranandin*, Kolkata: The Asioatic Society, Reprinted, 2012, p.48

যুগের বণিকদের ব্যাপক দানকর্মের সঙ্গে এর তফাৎ স্পষ্ট। এই বণিকদের ক্রিয়াকর্মের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল হট্ট বা গ্রামীণ বাজারগুলি। রাজা প্রথম মহীপালের ৩৩ তম রাজ্যাঙ্কে জারি করা রাজভিটা প্রস্তরলেখের সূত্রেও বোঝা যাচ্ছে তৎকালীন বণিক সংগঠন 'বণিগগাম'-এর কর্মকাণ্ড গ্রামীণ বাজারকেন্দ্রিক। 'বণিগগাম' নামক বণিক সংগঠনের কথা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে আগে জানা গেলেও বঙ্গদেশে এই ধরনের সংগঠনের উল্লেখ এই প্রথম। রাজভিটা প্রস্তরলেখে যেভাবে বণিক সংগঠনটিকে মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়ায় মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রফা করতে দেখছি, তার সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগের রিভুপালের মতো বণিকদের একক ব্যক্তির ক্ষমতার পার্থক্য লক্ষণীয়।[১৬৯] ভারতবর্ষের ইতিহাসে সামন্তপ্রথা সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রবক্তারা আদি মধ্যযুগে বাণিজ্য অর্থনীতির স্তব্ধতার দিকে ইঙ্গিত করেন। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে এই বক্তব্যটি পুরোপুরি মেনে নেওয়ায় সমস্যা আছে। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের বক্তব্য, প্রাচীন ভারতে যে মিথিলা-তাম্রলিপ্তি বাণিজ্যপথের উল্লেখ ছিল তা এইসময় থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়। সপ্তম শতাব্দীতে ইৎ-সিং তাম্রলিপ্তি বন্দরের সমৃদ্ধির কথা বললেও পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। বন্দর হিসাবে এই সময়ে তাম্রলিপ্তির অস্তিত্ব সম্ভবত ছিল না। নতুন কোন বন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্রও গড়ে ওঠেনি। ফলস্বরূপ, অন্তর্বাণিজ্যেও ভাটা আসে।[১৭০] তাম্রলিপ্তির পতন হলেও অবশ্য অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশে সমুদ্র বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। হরিকেলকে কেন্দ্র করে নবম শতাব্দী থেকে বঙ্গদেশের সঙ্গে দূরপাল্লার সমুদ্রবাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। দশম শতাব্দীর আরব বিবরণীতে হরিকেলের সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে। এই বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রেই হরিকেলে বেশ কিছু রৌপ্যমুদ্রার দেখা

[১৬৯] Ryosuke Furui, 'Merchant Groups in Early Medieval Bengal: With Special Reference to the Rajbhita Stone Inscription of the Time of Mahipala I, Year 33', pp.399-406

[১৭০] Vijay Kumar Thakur, 'Beginnings of Feudalism in Bengal', Social Scientist, Vol.6, No.6/7, pp.75-76

মিলেছিল।[১৭১] যুদ্ধবিগ্রহের জন্য রাজন্যগোষ্ঠীগুলির কাছে অশ্বের চাহিদা ছিল প্রচুর। বহির্বাণিজ্যের সূত্রে বঙ্গদেশে অশ্ব-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। এই অশ্ব-বাণিজ্যের একটা অংশ সংঘটিত হত সমুদ্রবাণিজ্যের মাধ্যমে।[১৭২] খেয়াল রাখতে হবে, বখতিয়ার খলজী ও তাঁর দলবল নদীয়া শহরে প্রবেশ করেছিলেন অশ্ববিক্রেতার রূপেই। ফলে, বাণিজ্যের সামগ্রিক অবক্ষয়ের তত্ত্ব মেনে নেওয়া কঠিন। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বণিকদের অবস্থার কিঞ্চিৎ অবনতি ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ করেছি। তার প্রভাব পরবর্তী যুগের বর্ণজাতিব্যবস্থায় কীভাবে পড়ল তা আমরা একটু পরে আলোচনা করব।

পূর্ববর্তী যুগের মতোই সেন আমলেও ভূমিদানের ধারা অব্যাহত ছিল। রাজা বিজয়সেনের ব্যারাকপুর দানলেখে উদয়কর দেবশর্মণ নামে এক ঋগ্বৈদিক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের কথা জানা যায়। তাঁর প্রপিতামহ রত্নাকর দেবশর্মণ এসেছিলেন মধ্যদেশ থকে। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজকীয় দানগুলির কথাও জানা যায় পুরালেখ থেকে। সুন্দরবন তাম্রশাসনে উল্লিখিত শান্ত্যাগারিক কৃষ্ণধর দেবশর্মণ *ঋগ্বেদ*-এর আশ্বলায়ন শাখার ছাত্র। আনুলিয়া তাম্রশাসনের দানগ্রহীতা রঘু দেবশর্মণ যজুর্বেদীয় কাণ্ব শাখার পণ্ডিত। মাধাইনগর দানলেখে উল্লিখিত গোবিন্দ দেবশর্মণ *অথর্ববেদ*-এর পিপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত। লক্ষ্মণসেনের পরেও রাজা বিশ্বরূপ সেন ও কেশবসেনের নীতিপাঠক অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র আবৃত্তিকারদের জমি দান করা হয়।[১৭৩] এই ভূমিদানগুলির পাশাপাশি এই পর্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বঙ্গদেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমন। সেন রাজারা কর্ণাটদেশীয়; ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়া সমর্থক। তাঁদের সূত্রে বঙ্গদেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের বসবাসের সূত্রপাত বলে অনেকে

---

[১৭১] Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.), *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives(up to c.1200 CE)*, Vol.2, 'pp.171-175 `

[১৭২] Ranabir Chakravarti, 'Early Medieval Bengal and the Trade in Horses: A Note', Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol.42, No.2, 1999, p.208

[১৭৩] Puspa Niyogi, *Brahmanic Settlements in Different Subdivisions of Ancient Bengal*, pp.9-10

মনে করেন। বস্তুত, পাল আমল থেকেই বঙ্গদেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের বসবাস সম্ভবত শুরু হয়ে যায়। ধর্মপালের খলিমপুর তাম্রশাসনে লাট-দ্বিজ অর্থাৎ দক্ষিণ গুজরাটের ব্রাহ্মণের উল্লেখ রয়েছে। তামিল পুরালেখের সাক্ষ্য অনুযায়ী লাটদেশীয় ব্রাহ্মণরা দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের পাঁচটি শাখার অন্যতম। পাল রাজারা অনেক দক্ষিণ ভারতীয় শাসক বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কর্ণাটদেশের বাসিন্দারা সম্ভবত সেই সূত্রেই পাল সেনাবাহিনীতে জায়গা পান। এছাড়া, চোল বা চালুক্য রাজবংশ যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করে তখন সেই আক্রমণের সূত্রেও বেশ কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ পরিবার সম্ভবত বঙ্গদেশে বাস করতে শুরু করেন। অনুমান করা যেতে পারে, সেন রাজাদের ধর্মকৃত্যে পৌরোহিত্য করতেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণরাই।[১৭৪] সেন রাজারা নিজেরাও কি আদিতে ছিলেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ? কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও এবিষয়ে হাতের কাছে কয়েকটি তথ্য আছে। সেন রাজা সামন্তসেনের উপাধি ছিল ব্রহ্মবাদী (অর্থাৎ বেদব্যাখ্যাতা)। সেন রাজাদের বলা হচ্ছে ব্রহ্মক্ষত্রিয়। ড. ভাণ্ডারকরের মতে যাঁরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন অথচ পরে ব্রাহ্মণবৃত্তি ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেন, তাঁদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হয়।[১৭৫] সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্যধর্মানুরাগ ছিল প্রবল। বঙ্গদেশের একাধিক পুরাণ ও উপপুরাণ এই সময়ে রচিত হতে থাকে; বৌদ্ধধর্মের প্রতি সেনরাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়। সেন রাজবংশের আমলে রচিত হয় একাধিক স্মৃতিগ্রন্থ। সেন আমলের স্মৃতিগ্রন্থ প্রসঙ্গে বল্লালসেনের *দানসাগর*-এর কথা বলা যেতে পারে। সেনরাজাদের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরাগের কথা সুবিদিত। বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে বৈষ্ণবশাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রাচীন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি চরিত্রে সম্পূর্ণত বেদবিরুদ্ধ (anti-vedic) না হলেও বেদাতিরিক্ত (extra vedic)।

---

[১৭৪] Kaberi Sanyal, 'Some Social Aspects of the Inscriptions of Bengal(C. 3rd Century B.C to C. 12th Century A.D)', unpublished Ph.D. thesis submitted at the University of Burdwan, 1985, pp.110-112

[১৭৫] R.K.Tripathi, *Social and Religious Aspects in Bengal Inscriptions*, Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd., 1st Published, 1987, p.9

এই বেদাতিরিক্ত শাস্ত্রগুলি নিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মে নানা টানাপোড়েন চলেছে। প্রাথমিকভাবে পুরাণগুলি এই পাঞ্চরাত্র আগমগুলিকে স্বীকার করলেও; পুরাণগুলির স্বীকৃতি নিয়েই অস্বস্তি ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম স্মৃতিকার হিসাবে পুরাণগুলিকে ধর্মের সূত্র বলে স্বীকার করেন। তবে যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষ্যকার বিশ্বরূপ আবার পুরাণগুলিকে এড়িয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে পাঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি স্মৃতিশাস্ত্রে ধীরে ধীরে স্বীকৃত হতে থাকে। স্মার্তসমাজের অস্বস্তি এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে ধীরে ধীরে কাটছিল। এই পরিস্থিতিতেও আমরা দেখছি, বল্লালসেনের *দানসাগর*-এ এই কিছুটা বেদবিরুদ্ধ, কিছুটা বেদাতিরিক্ত পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রগুলির বিরুদ্ধে মনোভাব ছিলবেশ কড়া।[১৭৬] *দানসাগর*-এ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রগুলি সম্পর্কে মনোভাব সেন আমলের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চরিত্রের দিকে কিছুটা ইঙ্গিত করে। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার মন্ত্রী হলায়ুধ রচনা করেন *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামে স্মৃতিগ্রন্থ। হলায়ুধের এই রচনাতেই প্রথম রাঢ়ী ও বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৭৭] হলায়ুধ আক্ষেপসহ জনান, বেদার্থজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ শূদ্রের সমতুল্য। অথচ, বঙ্গদেশে দেখা যাচ্ছে, উৎকল ও পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণরা প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও শ্রদ্ধার অভাবে বেদের অধ্যয়ন মাত্র করেন। রাঢ়ী, বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণরা আবার বেদাধ্যয়ন ছাড়াই কিছু অংশের কর্মমীমাংসা শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যার সাহায্যে যজ্ঞের ইতি-কর্তব্যতা আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু দুটি পদ্ধতির কোনটিতেই বেদার্থজ্ঞান যথাযথ হয় না।[১৭৮] বঙ্গদেশের পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণরা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণদের বেদার্থ অনুধাবনের অদক্ষতা নিয়ে কৌতুক করে থাকেন।[১৭৯] কিন্তু হলায়ুধের বয়ানে দেখছি, পাশ্চাত্য বৈদিকদের বেদজ্ঞান নিয়েও হলায়ুধ বিশেষ সন্তুষ্ট নন। *মনুসংহিতা*-এর ২.১১৮ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন কেবল গায়ত্রী মন্ত্রের

---

[১৭৬] S.C.Bhattacharya(ed.), *Vaishnavism in Eastern India*, Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd., 1st Published, 1995, pp.41-43

[১৭৭] তদেব, পৃ.১১

[১৭৮] শ্রী বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ(অনূদিত), *ব্রাহ্মণসর্বস্ব(প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা: শ্রীগুরু প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.১১

[১৭৯] Pramode Lal Paul, *The Early History of Bengal'*, Calcutta: Satis Chandra Seal, 1st Published, 1940, p.31

মাধ্যমেই ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা সম্ভব। বেদপাঠ আবশ্যক নয়। হলায়ুধ প্রত্যুত্তরে বলেন, স্নানাদি মন্ত্রে যাঁর অধিকার নেই, তিনি গায়ত্রী জপে অযোগ্য। শুচিতার জন্য স্নান ইত্যাদি অবশ্যকর্তব্য; আবার বেদজ্ঞান না হলে স্নান ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় বেদমন্ত্র জানা সম্ভব হয় না। পরিণামে গায়ত্রীজপ হয় নিষ্ফল।[১৮০] *যমসংহিতা* বচন উদ্ধৃত করে হলায়ুধ বলেন, শূদ্র প্রকৃতপক্ষে বৃষল নয়। বেদকে 'বৃষ' বলা হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানরহিত, তিনিই বৃষল। অর্থাৎ, বেদজ্ঞানের অভাবে ব্রাহ্মণও শূদ্রে পরিণত হয়—এসম্পর্কে হলায়ুধ নিঃসংশয়। আচারনিষ্ঠার অভাবের কারণে ব্রাহ্মণদের একাংশ ব্রাহ্মণ সমাজেই ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছেন—এ ধরনের উদাহরণ ভারতবর্ষীয় প্রবণতার আলোচনায় আমরা একাধিকবার দেখেছি। বঙ্গদেশেও হলায়ুধের মাধ্যমে মান্যতা পাচ্ছে সেই ব্যবস্থা। হলায়ুধের এই মন্তব্যের একটি সমকালীন প্রেক্ষাপট যে ছিল তা বোঝা যায় সেন আমলের পুরালেখগুলির সূত্রে। পুরালেখগুলিতে উল্লিখিত দানগ্রহীতাদের কেউ কেউ বেদজ্ঞানরহিত বা আংশিক বেদার্থজ্ঞানের অধিকারী।[১৮১] রাঢ়ী ও বারেন্দ্রীদের বেদজ্ঞান সম্পর্কে হলায়ুধ যে প্রশ্নই তুলুন না কেন; রাঢ়ী ও বারেন্দ্রীরা আবার এদেশের স্থানীয় ব্রাহ্মণ সপ্তশতীদের থেকে নিজেদের উঁচু বলে মনে করেন। কুলজিশাস্ত্রের প্রামাণিকতা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে এবং যথাস্থানে আমরা সেগুলি আলোচনাও করব, আপাতত এটুকু জানিয়ে রাখা দরকার, কুলজিশাস্ত্রের বয়ান অনুযায়ী রাঢ়ী ও বারেন্দ্রীরা নিজেদের কান্যকুব্জ থেকে আগত ব্রাহ্মণ বলে দাবি করেন। তাঁদের মতে, একারণেই তাঁরা স্থানীয় ব্রাহ্মণদের থেকে উঁচু সারির। যদিও, রাঢ়ী ও বারেন্দ্রীদের 'উপাধ্যায়' উপাধি দেখে অনুমান করা হয়, তাঁরা প্রথম সারি নয়, আদতে মাঝারি সারির ব্রাহ্মণ।[১৮২] আবার দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণদের একটি অংশ গ্রহবিপ্ররা

---

[১৮০] শ্রী বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ(অনূদিত), *ব্রাহ্মণসর্বস্ব(প্রথম খণ্ড)*, পৃ.১৪-১৫

[১৮১] Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.),*History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives(up to c.1200 CE)*, Vol.2 p.276

[১৮২] Jogendranath Bhattacharya, *Hindu Castes and Sects*, New Delhi: Kalpaz Publications, Indian Reprint, 2017, p.37

সামাজিক মর্যাদায় নিচু সারির। পেশাগত কারণে সমাজমানসে তাঁদের সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই। সমকালীন সাহিত্যেও এর উল্লেখ আছে। রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি গোবর্ধন আচার্যের *আর্যাসপ্তশতী*-তে গ্রহবিপ্রদের 'কপট' বলা হয়েছে (আর্যা ৬৮৪)।[১৮৩] ব্রাহ্মণদের মধ্যে একাধিক উপ-শ্রেণির সৃষ্টি ক্রমবর্ধমান উচ্চাবচতার ইঙ্গিত দেয়। উচ্চাবচতার প্রমাণ পাওয়া যাবে সেন আমলের পুরালেখগুলিতেও। বর্মন এবং সেন রাজবংশের পুরালেখগুলিতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণোত্তর শব্দদুটি পাওয়া যাচ্ছে। 'ব্রাহ্মণোত্তর' শব্দটির অর্থ উচ্চতর ব্রাহ্মণ।[১৮৪] ক্রমবর্ধমান উচ্চাবচতা ও উপ-শ্রেণি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হচ্ছে পারস্পরিক আধিপত্য স্থাপনের প্রবল প্রয়াস যার ছাপ আছে পরবর্তীকালের কুলজিশাস্ত্রগুলিতে। অবশ্য উচ্চাবচতা বা ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা যতই চলুক না কেন, সমাজমনে ব্রাহ্মণ সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণার অস্তিত্বও ছিল পাশাপাশি। সেন আমলে সংকলিত *সুভাষিত রত্নকোষ*-এর কয়েকটি প্রকীর্ণ কবিতায় তার নজির মিলবে। ২৯১ ও ২৯২ নং শ্লোকে দেখছি, ধনী ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়ায় নিমন্ত্রণ পেতে ব্রাহ্মণরা খুবই উদগ্রীব। শরৎকালে ধনী ব্যক্তির বাড়িতে এধরনের নিমন্ত্রণ পেলে ব্রাহ্মণরা ভরপেট খেয়ে আসেন।[১৮৫] জাতপাতভিত্তিক সমাজে অর্থের গুরুত্ব কেমন ছিল? *সুভাষিত রত্নকোষ*-এর প্রকীর্ণ কবিতায় তার উল্লেখও মিলবে। ভর্তৃহরির একটি শ্লোকে দেখছি, পয়সা না থাকলে যাবতীয় সৎগুণ, পারিবারিক ও জাতিগত মর্যাদা তুচ্ছ হয়ে যায়।[১৮৬] মূল শ্লোকটি অনেক প্রাচীন হলেও সমকালীন সংকলনে ঠাঁই পাওয়ায় মনে করা যেতে পারে, এই সময়েও শ্লোকটির প্রাসঙ্গিকতা ছিল। জাতপাতের পাশাপাশি বিত্তও

---

[১৮৩] জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী(সম্পা.), *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, কলকাতা: রবীন্দ্রনাথ সান্যাল, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭, পৃ.২৯৮

[১৮৪] Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.),*History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives(up to c.1200 CE)*, Vol.2,p.63

[১৮৫] Daniel H.H.Ingalls, *An Anthology of Sanskrit Court Poetry: Vidyakara's Subhasitaratnakosa*, Harvard oriental Series Vol.44, Massachusetts: Harvard University Press, 1st Published, 1965, p.141

[১৮৬] তদেব,পৃ.৩৮৭

যে ব্রাহ্মণের পরিচয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তার নমুনা আছে সমকালীন শ্লোক সংকলনগুলিতে। *সুভাষিত রত্নকোষ*-এর ১৩৯০ নং শ্লোকে ব্রাহ্মণের সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে। এককালে যে নিঃস্ব ব্রাহ্মণের কুঁড়েঘরের চাল থেকে হাওয়ায় পাতা খসে উঠোন ভরিয়ে রাখত, আজ সে তাঁর কৃপায় (ঈশ্বর বা রাজা) ধনী হয়ে প্রাসাদে বাস করছে। গলার রত্নখচিত হার থেকে মুক্তো খসে পড়ে আজ তার উঠোনে।[১৮৭] সমৃদ্ধির পাশেই আবার গরিব ব্রাহ্মণের ছবি আছে *আর্যাসপ্তশতী*-এর ৪১০ নং আর্যায়।[188]

আর্যাসপ্তশতী-এর সূত্রে আরো দুটি বিষয় আমাদের নজরে আসে। ইতিপূর্বে একটি পুরালেখে 'চণ্ডালপুষ্করিণী'র উল্লেখ ছিল। অনেকেই সেটিকে অস্পৃশ্যতার চিহ্ন হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। *আর্যাসপ্তশতী*-এর ২৬২ নং আর্যায় আমরা আরো স্পষ্ট করে দেখতে পারছি, চণ্ডাল, শ্বপচরা গ্রামের যে অংশে বাস করে সেটি 'কুগ্রাম' নামে চিহ্নিত। 'কুগ্রাম'-এ অন্য কারো বাস করা অনুচিত। অস্পৃশ্যদের সঙ্গে দূরত্ববৃদ্ধির এটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। পূর্ববর্তী যুগের মতোই বণিকের গুরুত্ব যে সমাজে ক্রমশ কমছে তার মোক্ষম প্রমাণ আছে এই গ্রন্থের দুটি আর্যায়। ৪০৫ নং আর্যায় গর্বভরে এক শ্রেষ্ঠী নিজের ক্ষমতার বড়াই করলে তাঁর পত্নী উপহাসভরে সম্মুখে উপস্থিত মানুষদের দিকে তাকান।[১৮৯] ২৬৯ নং আর্যায় দেখছি, এককালে বৈশ্যরা শক্রধ্বজপূজার (ইন্দ্রপূজা) আয়োজন করত। এখন সেই বৈশ্যদল হারিয়ে গেছে। শক্রধ্বজপূজার দণ্ড এখন লোকে চাষের কাজে বা গোরু বেঁধে রাখার খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে।[১৯০] বণিকের সমৃদ্ধিহ্রাসের জোরালো প্রবণতাটির পাশাপাশি অল্প হলেও অন্তত কিছু ক্ষেত্রে বণিকের সমৃদ্ধি বজায় রাখার সাক্ষ্যও সম্ভবত আছে। এ প্রসঙ্গে সেন রাজসভার সঙ্গে

---

১৮৭ তদেব, পৃ.৩৭৪

188 জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী(সম্পা.), *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, পৃ.২৩৮

১৮৯ তদেব, পৃ.২৩৭

১৯০ তদেব, পৃ.২০৭

যুক্ত হলায়ুধ মিশ্রের নামে প্রচলিত *সেকশুভোদয়া*-র কথা বলা যেতে পারে। *সেকশুভোদয়া*-র বর্তমান রূপটি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত। কিন্তু গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিচারে বলা যেতে পারে বর্তমান রূপটি সম্ভবত প্রাচীন পদ্য রূপকে বদলে তৈরি করা হয়েছে।[১৯১] এদিক থেকে গ্রন্থের আদিরূপের রচনাকাল *আর্যাসপ্তশতী*-র সমাসাময়িক না হলেও ঈষৎ পরবর্তী। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের বিবরণ অনুসারে এক স্বর্ণকার তথা সুবর্ণবণিকের ধনসম্পদের পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা।[১৯২]

এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গদেশের দুটি জাতিকাঠামোর পরিচয় মিলছে *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ। জাতিকাঠামো দুটির বিশদ আলোচনায় আমরা পরে আসছি। তবে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে, বঙ্গদেশে চতুর্বর্ণের বদলে দ্বিবর্ণ ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। দক্ষিণ ভারতেও অনেকজায়গাতেই আছে দ্বিবর্ণ কাঠামো। বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় বর্ণদুটি কেন এই কাঠামোয় দেখা যাচ্ছে না—সে প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুবীরা জায়সবালের একটি মত আছে। যেসময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, সেসময়ে বাণিজ্যের একপ্রকার অধোগতি দেখা যাচ্ছে। এপ্রসঙ্গে যোগ করা যেতে পারে, যদিও হরিকেল বন্দর এবং অশ্ববাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারার উল্লেখ আমরা করেছি, তবুও একটু হলেও বণিকের অবস্থার পতনের ইঙ্গিত আছে বণিকদের গ্রামীণ হট্টকেন্দ্রিক বাণিজ্যে। *আর্যাসপ্তশতী*-এর দুটি আর্যাতেও বণিকদের সাবেক সমৃদ্ধির অস্তমিত দশার উল্লেখ ইতিপূর্বেই আলোচিত। ফলত, আর্থিক সমৃদ্ধির অভাবে উত্তর ভারতের মত এখানে বণিকরা বৈশ্য বর্ণের চেহারা নিয়ে উঠতে পারেননি। পরবর্তীকালের আখ্যান, যেমন: *বল্লালচরিত* ইত্যাদিতে সুবর্ণবণিকদের বৈশ্যত্বের দাবি করতে শুনলেও সে দাবি খুব বেশি মান্যতা পায়নি। বণিকরা

---

[১৯১] Sukumar Sen, *Sekasubhodaya*, Kolkata: The Asiatic Society, Reprinted, 2002, pp. xviii-xix

[১৯২] তদেব, পৃ.১৫২

বঙ্গদেশে শূদ্র বর্ণভুক্ত হয়েই আছেন। আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাবে সম্ভবত বঙ্গদেশের বণিককুল বৈশ্য বর্ণের সৃষ্টি করে উঠতে পারেনি। ক্ষত্রিয়বর্ণও নেই বঙ্গদেশে। অধ্যাপক জায়সবাল মনে করেছেন, বঙ্গদেশে ও দক্ষিণ ভারতে প্রবল পরাক্রান্ত রাজন্যবংশের ক্ষত্রিয় মর্যাদা দাবির তেমন কোন জোরালো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। বিবাহ-সম্পর্কের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ত্ব ধরে রাখার তেমন কোন প্রয়াস নেই এই অঞ্চলের রাজন্যবর্গের মধ্যে। প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশগুলির অনুপস্থিতির সুবাদে এই অঞ্চলে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করার তেমন কোন ধারাও তৈরি হয়নি; হলেও তা একেবারেই ধোপে টেকেনি।[১৯৩] পাল রাজাদের পুরালেখগুলিও এই রাজবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পেশ করে না।[194] *বল্লালচরিত*-ধৃত *ব্যাস পুরাণ*-এও পাল রাজাদের নিকৃষ্টতম ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে।[১৯৫] ব্রাহ্মণ-শূদ্রে দ্বিভাজিত এই সমাজব্যবস্থায় শূদ্র বর্ণের মর্যাদাতেও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসে। আদতে দ্বিবর্ণ সমাজ মনে হলেও কার্যক্ষেত্রে সমাজে মোটা দাগে তিনটি স্তর দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, সৎ শূদ্র আর অসৎ শূদ্র। সৎ শূদ্র আর অসৎ শূদ্রের ভাগটিই *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-মতে উত্তম, অধম ও মধ্যম সংকরের রূপ নিয়েছে। কার্যক্ষেত্রে, শূদ্র বর্ণভুক্ত প্রথম সারির জাতিগুলির সামাজিক মর্যাদা যথেষ্ট উন্নত ছিল। পুরালেখগুলি এবিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ সাক্ষ্য দেবে। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-ও উত্তম সংকরদের শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যলাভের অধিকার করে দিয়েছে। এমনকি, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেও বৈদ্য বা কায়স্থদের শূদ্র হিসাবে পরিচিত হতে লজ্জা ছিল না।[১৯৬]

---

[১৯৩] Suvira Jaiswal, 'Changes in the Status and Concept of the Sudra Varna in Early Middle Ages', Proceedings of the Indian History Congress, Vol.41, 1980, pp.115-116

[১৯৪] Narottam Kundu, 'Caste and Class in Pre-Muslim Bengal', unpublished Ph.D. thesis submitted at University of London, 1963, p.138

[১৯৫] MM. Haraprasad Sastri(ed.), *Ramacaritam of Sandhyakaranandin*, p.xxii

[১৯৬] Suvira Jaiswal, 'Changes in the Status and Concept of the Sudra Varna in Early Middle Ages', pp.116-118

বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* দুটিই বঙ্গদেশে রচিত। দুটি পুরাণের রচনাকালই দ্বাদশ শতকের আগে নয় ও চতুর্দশ শতকের পরে নয়।[১৯৭] এই পর্বের বঙ্গদেশের বর্ণজাতিব্যবস্থার ইঙ্গিত আছে গ্রন্থদুটিতে। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এর বয়ান অনুসারে, রাজা বেণ চূড়ান্ত ধর্মহীন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সদুপদেশে তিনি কান দেন না। প্রজাদের উপর রাজা বেণের চূড়ান্ত অত্যাচার দেখে তাঁর পিতা অঙ্গ রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হলেন। তাতেও বেণের মতি ফিরল না। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ উপেক্ষা করে বর্ণসংকর দোষ ঘটাতে লাগলেন। শেষ অবধি ব্রহ্মশাপে রাজা বেণ ভস্মীভূত হলে তাঁর অঙ্গ থেকেই ধর্মপরায়ণ রাজা পৃথুর জন্ম। পৃথু যথাবিধি ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করেও কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন অন্নাভাবে রোজ প্রজাদের মৃত্যু হচ্ছে। ধর্মনিষ্ঠ রাজা পৃথু ব্রাহ্মণদের ডেকে এই দুর্বিপাকের কারণ জিজ্ঞসা করলেন। ব্রাহ্মণরা উত্তরে জানালেন, রাজা বেণের দোষে যে বর্ণসংকরদের উৎপত্তি হয়েছিল তাঁদের উপস্থিতির কারণেই পৃথিবী অন্ন উৎপাদন করতে পারছেন না।[১৯৮] নিশ্চিতভাবেই শাস্ত্রের চোখে বর্ণসংকরই ব্রাহ্মণ্য বর্ণজাতিব্যবস্থার প্রধানতম দুশ্চিন্তা। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র প্রত্যেক বর্ণ ও জাতির জন্য নির্দিষ্ট পেশা অবলম্বনের নিদান দিয়েছে। জাতিনির্দিষ্ট পেশার অনুসরণের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক উৎপাদনব্যবস্থা জারি রাখতে চায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম। বর্ণসংকর দোষ ঘটে জাতিনির্দিষ্ট পেশাগত কাঠামোর সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হলে সামগ্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় প্রভাব পড়ে। বর্ণজাতিব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদনব্যবস্থার এই সম্পর্কটি লক্ষণীয়। খেয়াল করা উচিত, *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* বর্ণসংকরদের বিনাশের নিদান দেয়নি। বরং, বলেছে বিধাতাই তাঁদের সৃষ্টি করেছেন। অত এব, রাজার উচিত নতুন বর্ণসংকররোধে সচেতন হওয়া এবং বর্তমান বর্ণসংকরদের বিনাশ না করে তাঁদের জন্য পেশা নির্দিষ্ট করা।[১৯৯] রাজা বেণের আখ্যান কেবল

---

[১৯৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব্ব)*, পৃ. ২১১

[১৯৮] পঞ্চানন তর্করত্ন(সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, কলকাতা: নবভারত, দ্বিতীয় নবভারত সংস্করণ, ১৪২০, পৃ. ৩৩৭-৩৪১

[১৯৯] তদেব, পৃ.৩৪৩

বৃহদ্ধর্মপুরাণ নয়, একাধিক পুরাণে আছে। *মৎস্য পুরাণ*-এর বেণ আখ্যানে রাজা বেণের শরীর থেকে প্রথমে ম্লেচ্ছদের উৎপত্তি হল, পরে তাঁর শরীর থেকেই নির্গত হলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মানুরাগী রাজা পৃথু। এই আখ্যানটি সম্ভবত উপজাতি সমাজ ও বর্ণসমাজের বিপরীত অবস্থানের ইঙ্গিতবাহী। প্রায় একই চেহারায় আখ্যানটি পাওয়া যাবে *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এও। পুরাণগুলির মাধ্যমে প্রান্তিক অঞ্চলে যেভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল তার নিরিখে এই ইঙ্গিতটিকে পড়া যেতে পারে।[২০০] *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এও দেখছি রাজা পৃথু ব্রাহ্মণ্য নির্দেশ অনুযায়ী জাতিবর্ণকাঠামো প্রতিষ্ঠায় তৎপর। অবশ্য জাতিবর্ণকাঠামোর প্রতিষ্ঠা খুব মসৃণভাবে হয়নি। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এর আখ্যানে সেই ইঙ্গিত আছে। ব্রাহ্মণদের নির্দেশে রাজা পৃথু যখন দরবারে বর্ণসংকরদের তলব করলেন, তখন প্রাথমিকভাবে বর্ণসংকররা রাজা পৃথুর বিরোধিতা করেছিলেন। ক্রোধে আকুল হয়ে রাজা তাঁদের যথোচিত দণ্ডবিধান করলে তাঁরা শেষ অবধি আনুগত্য স্বীকার করেন। বর্ণসংকরদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজানুগত্য স্বীকার করেন করণরা। ফলত, ব্রাহ্মণের পরেই সমাজে করণের স্থান নির্দিষ্ট হল। তারপরেই, স্থান হল অম্বষ্ঠের।[২০১] ব্রাহ্মণ, করণ (কায়স্থ) ও অম্বষ্ঠ (বৈদ্য)—এই হল বাংলার ‘উচ্চজাতি’। আখ্যানটি খেয়াল করলে দেখা যায়, ব্রাহ্মণরাই এই আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র।[২০২] রাজা প্রশাসনিক কাজেও সর্বতোভাবে ব্রাহ্মণের নির্দেশ মেনে চলছেন। পূর্ববর্তী যুগগুলিতেই ব্রাহ্মণের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের যে ইঙ্গিত লক্ষ করা গিয়েছিল, *বৃহদ্ধর্ম*-এর আখ্যানেও তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উপস্থিতি বঙ্গদেশের বর্ণজাতিকাঠামোতে নেই। কারণটি ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। এই পুরাণ উত্তম, মধ্যম ও অধম সংকর—এই ত্রিবিধ পর্যায়ে যে জাতিকাঠামো প্রস্তাব

---

[২০০] Vijay Nath, ‘King Vena, Nisada and Prthu: A Recurrent Puranic Myth Re-Examined’, Indian Historical Review, Vol.XXIX, No.1-2, January and July, 2002, pp.58-59

[২০১] পঞ্চানন তর্করত্ন(সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

[২০২] Suchandra Ghosh & others.(eds.), *Revisiting Early India: Essays in Honour of D.C.Sircar*, Kolkata: R.N.Bhattacharya, 1st Published, 2013, p.206

করেছে তার সঙ্গে সাধনাধিকারের সম্পর্কটিও স্পষ্ট। উত্তম সংকরের মর্যাদাভুক্ত জাতিগুলি শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য লাভ করবে। বাকি সংকরভুক্ত জাতিগুলির পৌরোহিত্য করবেন পতিত ব্রাহ্মণরা। এই বিধানের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদাসৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত গুরুত্ব সৃষ্টি হল। লক্ষণীয় যে, মলিন, কুরূপ বর্ণসংকরগোষ্ঠীগুলি ব্রাহ্মণের নির্দেশমাফিক নির্দিষ্ট পেশায় নিযুক্ত হতেই 'চারুরূপ' ও 'সুবুদ্ধি' প্রাপ্ত হলেন।[২০৩] কেউ কেউ মনে করেন, জাতিগত পেশা নির্দিষ্টকরণের অন্য অভিপ্রায়ও ছিল। *বৃহদ্ধর্ম*-এ স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিকদের প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন স্বর্ণদ্রব্য নিরূপণ ও পরীক্ষাকে পেশা হিসাবে বলা হলেও স্বর্ণদ্রব্যভিত্তিক বাণিজ্যের কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবত এটি সুবর্ণবণিকদের আর্থিক প্রতিপত্তি রোধের শাস্ত্রীয় প্রচেষ্টা।[২০৪] *বৃহদ্ধর্ম* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* অনুযায়ী সুবর্ণবণিক মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র। অর্থাৎ, দুটি পুরাণের বয়ান অনুসারেই শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য পাওয়ার কথা নয় সুবর্ণবণিকের। উনিশ শতকে সুবর্ণবণিকরা নিজেদের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনে যতই তৎপর হয়ে উঠুন না কেন, প্রাক্-চৈতন্যযুগে সে দাবি বোধহয় ছিল না। *সেকশুভোদয়া*-র তৃতীয় অধ্যায়ে স্বর্ণকার তথা সুবর্ণবণিকের স্ত্রী নিজেকে শূদ্র নারী বলেই পরিচয় দিয়েছে।[২০৫] *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*-এর ব্রহ্মখণ্ডের দশম অধ্যায়ের জাতিনিরূপণ অংশেও মোটামুটিভাবে *বৃহদ্ধর্ম* বর্ণিত কাঠামোটিই অনুসৃত। ত্রিবিধ সংকরের বদলে *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্রে সমাজকে ভাগ করেছে।[২০৬] এই দুটি পুরাণের মাধ্যমে বঙ্গদেশের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বর্ণজাতিকাঠামোটি দানা বাঁধল।

বঙ্গদেশের বর্ণজাতিব্যবস্থার আরেকরকম পরিচয় আছে কুলজিশাস্ত্রগুলিতে। কুলজিশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা সংক্রান্ত বিতর্কটি এখনও জায়মান। সাধারণভাবে মনে করা হয়,

---

[২০৩] তদেব, পৃ.২০৭-২০৮

[২০৪] তদেব, পৃ.২০৯

[২০৫] Sukumar Sen, *Sekasubhodaya*, p.151

[২০৬] পঞ্চানন তর্করত্ন(অনুবাদিত ও সম্পাদিত), *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, কলকাতা: নবভারত, নব সংস্করণ, ১৩৯১, পৃ.২১-২৮

কুলজিশাস্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন রচনা। সম্ভবত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে কুলজিশাস্ত্রগুলি রচিত হতে শুরু করে। সময়ের হিসাবে সেদিক থেকে কুলজিশাস্ত্রগুলি বর্তমান অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কালপর্বের বাইরে হলেও, কুলজিশাস্ত্রগুলির অভ্যন্তরীণ বয়ান অনুসারে, এগুলি প্রাক-দ্বাদশ শতাব্দীর ঘটনার বিবরণী। রাজা আদিশূর নামক রাজার সূত্রে কান্যকুব্জ থেকে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে বঙ্গদেশের কুলজিশাস্ত্রগুলি যোগ স্থাপন করে। রাজা আদিশূরের কোন পরিচয় সমকালীন সাহিত্য বা লেখমালায় না থাকার দরুণ এই কাহিনির ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আদিশূরের আগে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ বসতি বা বেদচর্চা ছিল না—এমনটাও নয়। খ্রি. পঞ্চম শতক থেকেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ বসতির লিপিপ্রমাণ আছে। কুলজির আরেকটি আলোচ্য বিষয় কৌলীন্য প্রথা। কুলজির বয়ান অনুসারে, সেন বংশীয় রাজা বল্লালসেনের নেতৃত্বে কৌলীন্যপ্রথার সূত্রপাত। যদিও সেন আমলের লেখমালায় কৌলীন্যপ্রথার কোন উল্লেখ নেই। কাজেই, আদিশূর সংক্রান্ত কাহিনির মতোই এই বিবরণটির ঐতিহাসিকতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও লোকস্মৃতির অস্তিত্ব সম্ভবত কুলজিতে ছিল। কুলজিগ্রন্থগুলি সেন, বর্মণ বা শূরবংশের মতো ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সঙ্গেই নিজেদের সংযুক্ত করে, পাল বা চন্দ্র বংশীয় রাজবংশগুলির সঙ্গে নয়—এটি লক্ষ করার মতো।[২০৭] বর্ণজাতিকাঠামোর যে রূপটি আমরা বঙ্গদেশীয় পুরাণে পাই, কুলজিতে আছে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ উপবিভাগ। যেমন: রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের পাঁচটি ক্রমের অন্তর্গত ৯৫টি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থরা তিনটি ক্রমে মোট ৮৩টি শাখায় বিভক্ত।[২০৮] ব্রাহ্মণ ঘটক নির্মিত কুলজিগ্রন্থগুলি বঙ্গদেশের সামাজিক কাঠামোকে অনেক জটিল করে দেয়। এই সামাজিক কাঠামোয় শুদ্ধতারক্ষায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মেলের ধারণা। একই মেলে বিবাহ করলে কুলীনের

---

[২০৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব্ব)*, পৃ.২১৩-২১৫

[২০৮] Ronald B. Inden, *Marriage and Rank in Bengali Culture*, California: The University of California Press 1st Published, 1976, p.1

কৌলীন্য নষ্ট হবে। এদিক থেকে বিবাহসংশ্লিষ্ট সাংকর্য দোষ বিচার কুলজিশাস্ত্রের অন্যতম বিষয়।[২০৯] বিবাহবিধি লজ্ঘিত হলেই পাতিত্যদোষের বিধান দিয়েছে কুলজিশাস্ত্র। অবশ্য কেবল বিবাহবিধিই যে সামাজিক শুচিতা বা মর্যাদারক্ষার একমাত্র মাপকাঠি নয়, তেমন উদাহরণও আছে কুলজিতে। সামাজিক ক্ষমতার জোরে বিবাহবিধিকেও বদলে নেওয়া যেত। গাঙ্গবংশীয় নবাব কর্মচারী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের পরিবার বংশজ। তিনি কুলীন পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হলে কুলীনদের কৌলীন্যরক্ষা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে যায়। তাঁর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা অস্বীকার করতে না পেরে কুলাচার্যরা শেষ অবধি তাঁকে গোষ্ঠীপতি পদে অভিষিক্ত করেন এবং বিধান দেন, গোষ্ঠীপতি নিজের কন্যা কুলীন বংশে দান করতে পারেন। আবার, গোষ্ঠীপতির কন্যাগ্রহণ ও অন্নগ্রহণ করলে কুলীনেরও কুলক্ষয়ের সম্ভাবনা নেই। *কুলার্ণব*-এ বলা হল—"কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্বে যস্যান্নং ভুঞ্জতে মুহঃ।/ কুলীনায় সুতাং দত্বা স গোষ্ঠীপতিরুচ্যতে।।"[২১০] বিবাহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'জাতে ওঠা'র এই এক নিদর্শন। এদিক থেকে কুলজিশাস্ত্রও শাস্ত্রবিধানে পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক সচলতাকে স্বীকার করেছে।

কুলজিশাস্ত্রের পর প্রাক্-চৈতন্যযুগের তিনটি রচনার সাক্ষ্যে বঙ্গদেশের বর্ণজাতিব্যবস্থার আলোচনা করা যেতে পারে। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের একটিমাত্র পুথিই পাওয়া গেছে। ১৯১৬ সালে প্রাপ্ত পুথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। পুথিটিতে কিছুটা প্রক্ষেপ থাকলেও সাহিত্যের ইতিহাসকাররা মোটের উপর এটিকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের রচনা বলেই স্বীকার করেন। কৃষ্ণ-

[২০৯] Narottam Kundu, 'Caste and Class in Pre-Muslim Bengal', pp.167-170

[২১০] নগেন্দ্রনাথ বসু, *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ*, কলকাতা: দে;জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩৪-২৩৭

রাধার প্রণয়কাহিনি কেন্দ্রিক আখ্যান হওয়ায় গ্রন্থটিতে বারেবারে এসেছে গোপজাতির প্রসঙ্গ। জাতিনির্দিষ্ট পেশার যে ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল তার নিরিখেই আমরা দেখতে পাচ্ছি গোপ বা গোয়ালা জাতির পেশা দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রি।[২১১] পেশাগুলি যে ক্রমশ বংশানুক্রমিক হয়ে উঠছিল তার ইঙ্গিতও আছে। পথে কৃষ্ণের অত্যাচারে রাধা দুধ-দই ইত্যাদি বিক্রি করতে যেতে রাজি না হলে অন্যান্য গোপবধূরা রাধার পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তাঁরা জানায় গোয়ালার কুলে জন্মে দুধ-দই বিক্রি করতে না চাওয়া বেদস্তুর কাজ।[২১২] ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ও স্মার্ত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশে ছাপ ফেলছিল—সেই ইঙ্গিতও আছে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ। মদনবাণে কৃষ্ণ যখন রাধাকে প্রায় মৃত্যুযন্ত্রণা দিচ্ছে তখন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-কার জানিয়েছেন স্ত্রীবধ শত ব্রাহ্মণবধ বা গোবধের চাইতেও পাপকর্ম।[২১৩] স্বাভাবিকভাবেই *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ এসেছে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের কথা। আক্ষেপের সুরে রাধা জানিয়েছে পূর্ব জন্মগুলিতে ব্রাহ্মণকে দুঃখ দেওয়ার ফলেই ইহজন্মে বিধাতা তাঁকে এত দুঃখ দিচ্ছেন।[২১৪] *আর্যাসপ্তশতী*-তে আমরা চণ্ডালের সঙ্গে সামাজিক দূরত্বরক্ষার প্রয়াস দেখেছিলাম। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এও দেখছি চণ্ডাল ঘৃণাবাচক শব্দ। ক্ষিপ্ত রাধা কৃষ্ণের সম্বন্ধে বলেছে—“এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে।/ চাণ্ডাল কাহ্নাঞি এবেঁ বল করে।“[২১৫]

মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* সংশয়াতীতভাবে প্রাক্-চৈতন্যযুগের কাব্য। কালজ্ঞাপক শ্লোক অনুযায়ী গ্রন্থটির রচনাসমাপ্তিকাল ১৪৮০ খ্রি.। কলিযুগ বিবরণ অংশে মালাধর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনেকটাই পৌরাণিক বর্ণনার গতে বাঁধা। প্রায় অনুরূপ বিবরণ

---

[২১১] বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ(সম্পা.), *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৮

[২১২] তদেব, পৃ.৬৭

[২১৩] তদেব, পৃ.১১১

[২১৪] তদেব, পৃ.১৫

[২১৫] তদেব, পৃ.২০

আছে চৈতন্য পরবর্তী কবি জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল*-এও। কলিকালে সত্ত্বগুণ হ্রাস পাবে, লোকে অল্পবুদ্ধি হবে, ব্রাহ্মণ বেদাচার পরিত্যাগ করবে, সামাজিক সুস্থিতি বলে কিছুই থাকবে না। ম্লেচ্ছ রাজার রাজত্বে রাজধর্ম হবে অস্তমিত।[২১৬] বোঝা যাচ্ছে, *ভাগবত*-এর অনুবাদ হওয়ার দরুণ পুরাণ বর্ণিত ম্লেচ্ছ রাজার বর্ণনা এখানে এসেছে বটে, তবে একইসঙ্গে সম্ভবত কার্যকর থেকেছে মালাধরের সমকালীন ইসলামি শাসনের স্মৃতি।[২১৭] তবে সামাজিক সচলতার একটি নির্ধারক উঠে এসেছে মালাধরের বিবরণে। যে বলবান সেই প্রধান হয়ে উঠবে—"জেই বলবন্ত হব সেই প্রধান হইব"।[২১৮] নিশ্চিতভাবেই এটি কেবল মালাধরের সমকালীন বিবরণ নয়, যুগে যুগেই সত্য। তবুও প্রতিপত্তির মাধ্যমে সামাজিক সচলতা অর্জনের প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি দেখছি মালাধরেও।

এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করব বিজয় গুপ্তের *মনসামঙ্গল*-এর কথায়। কালজ্ঞাপক শ্লোক অনুযায়ী কাব্যটির রচনাকাল ১৪৮৪ খ্রি., অর্থাৎ চৈতন্যদেবের জন্মের মাত্র দু'বছর আগে কাব্যটি রচিত। মঙ্গলকাব্যে নানা সময়ের আখ্যান মিশে থাকে। বিশেষত, বাণিজ্যযাত্রার যে বিবরণ আমরা মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখতে পাই সেগুলি সমকালীন ঘটনা নয়; বরং বাণিজ্যিক স্মৃতি মাত্র। যাত্রাপাটন পালায় কৈবর্তদের প্রসঙ্গ এসেছে। কৈবর্তরা নৌচালনার সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তীকালে কৈবর্তদের একটি অংশ পেশা বদলে কৃষিজীবী হয়ে মাহিষ্য হিসাবে উচ্চতর জাতিমর্যাদা দাবি করেছে। যদিও সেরকম কোন ইঙ্গিত আমরা বিজয় গুপ্তের রচনায় পাই না। হতদরিদ্র 'কাঙাল' কৈবর্তদের উপর শারীরিক অত্যাচারের বিবরণ আছে যাত্রাপাটন পালায়।[২১৯] স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার ধারণাও প্রবল হচ্ছিল। ডোম নারীর বেশে বেহুলা হাজির

---

[২১৬] খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, [], ২০১১, পৃ.৬৫৮-৬৬০

[২১৭] অর্জুনদেব সেনশর্মা, *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ: আদি-মধ্যযুগ*, কলকাতা; ভারবি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, পৃ.২০২

[২১৮] খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, পৃ.৬৫৯

[২১৯] অচিন্ত্য বিশ্বাস(সম্পা.), *বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল*, কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, পৃ.২০৭

হওয়ায় সনকার মনে হয় বেহুলা নিশ্চয় ডোমের ঘরে জাত দিয়ে এসেছে। গন্ধবণিক ঘরের নারীর এহেন পরিণতি আশঙ্কা করে সনকা অত্যন্ত হতবাক।[২২০] বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসরণের ধারা তৈরি হওয়ার ইঙ্গিত ছিল *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ। ব্যতিক্রমও কি ছিল না? টেটন জাতিতে মালাকার, কিন্তু কৌলিক বৃত্তি ছেড়ে ঘাট ডেকে অর্থোপার্জন করাই ছিল তাঁর পেশা।[২২১]

বঙ্গদেশের বর্ণজাতিব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কতকগুলি স্তর স্পষ্ট হয়। ব্রাহ্মণরা বঙ্গদেশে ক্রমশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছেন। ভূম্যধিকারের সূত্রে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তাঁদের প্রশাসনিক-রাজনৈতিক গুরুত্ব। তাঁদের হাত ধরেই বর্ণজাতিব্যবস্থার প্রণালীবদ্ধ রূপ বঙ্গদেশে তৈরি হচ্ছে। ব্রাহ্মণের পাশাপাশি যেসমস্ত গোষ্ঠীগুলি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বলে পরিচিত হচ্ছে তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের মূলেও আছে আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতা। এই মর্যাদার আরেকরকম চিহ্নক সাধনাধিকার এবং ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই তার ছাপ আছে সমকালীন স্মৃতিগুলিতে। তবে আর্থিক প্রতিপত্তি কি ধর্মীয় মর্যাদাকে নিশ্চিত করতে পারে সর্বক্ষেত্রে? সুবর্ণবণিকদের ইতিহাসের সূত্রে প্রশ্নটি খতিয়ে দেখার সুযোগ আছে। কিন্তু শেষ অবধি ধর্মকৃত্যের সঙ্গে যে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটি জড়িয়ে গেল তাতেই সমাজজীবনে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্পষ্ট। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে বর্ণজাতিব্যবস্থার সর্বভারতীয় রূপটি বঙ্গদেশে প্রবেশ করল বটে, অথচ কাঠামোতে বেশ কিছুটা রদবদল এল। বর্ণজাতিব্যবস্থার আলোচনায় এই আঞ্চলিক বিশিষ্টতাটি প্রণিধানযোগ্য। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবার উপ-আঞ্চলিক চরিত্র তৈরি হচ্ছে কি না—তা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচ্য।

---

[২২০] তদেব, পৃ.৩২০

[২২১] তদেব, পৃ.২৬

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: সুবর্ণবণিক

৩.১ বঙ্গদেশীয় পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থে সুবর্ণবণিক

৩.২ সপ্তগ্রাম বন্দর ও বাঙালি বণিক

৩.৩ নিত্যানন্দের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও সপ্তগ্রামী সুবর্ণবণিক সমাজ

৩.৪ সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতা ও বৈশ্যত্ব: পরবর্তী প্রকল্প

অধ্যায়: ৩

বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: সুবর্ণবণিক

Hindu Castes and Sects (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬ খ্রি.) বইতে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, সুবর্ণবণিকদের মত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, আর্থিক প্রতিপত্তিশালী জাত খুব কমই আছে। পূর্বার্জিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়ে নিজেদের আর্থিক দাপট সুবর্ণবণিক বা সোনার বেনেরা ধরে রেখেছেন। বাড়ি, গাড়ির কোন অভাব নেই। অথচ, জাতের মর্যাদার নিরিখে তাঁদের অবস্থান নিচের দিকে। সুবর্ণবণিকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাঁরা পৌরোহিত্য করেন তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত।[১] স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সুবর্ণবণিকদের আর্থিক প্রতিপত্তির সঙ্গে জাতিগত মর্যাদার সামঞ্জস্য তৈরি হয়নি। অথচ জাতিগত মর্যাদা ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিরিখে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। সুবর্ণবণিক সমাজও এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মধ্যযুগ জুড়ে তো বটেই, এমনকি উনিশ-বিশ শতকেও আর্থিক প্রতিপত্তির পাশাপাশি জাতিগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সুবর্ণবণিকদের তৎপরতা দেখা যায়। ষোড়শ শতকে সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক সমাজ বৈষ্ণব গুরু নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। বৈষ্ণব সমাজে সাধনাধিকারও লাভ করেন। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল সপ্তগ্রাম বন্দরও। সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতা লাভের প্রয়াসকে বুঝতে গেলে সপ্তগ্রাম বন্দরের ইতিহাসকেও বুঝতে হয়। সামাজিক সচলতা লাভের প্রয়াস কতখানি সফল হল সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। সফলতা বিচারের আগে প্রক্রিয়াকে বোঝা জরুরি;

---

[১] Jogendranath Bhattacharya, *Hindu Castes & Sects*, New Delhi: Kalpaz Publications, Indian Reprint, 2017, p.199

আর প্রক্রিয়া বিচার করতে গেলে জরুরি হয়ে ওঠে স্থান, কাল, পাত্রের বিশদ আলোচনা। চারটি উপ-অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম উপ-অধ্যায়ে আমরা বঙ্গদেশীয় পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থে সুবর্ণবণিকের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করব। বঙ্গদেশের শাস্ত্রনির্দিষ্ট জাতিকাঠামোয় সুবর্ণবণিকের 'নিচু' অবস্থানটি আমাদের নজর কাড়ে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে স্বর্ণালংকার নির্মাতা ও স্বর্ণব্যবসায়ীদের জাতিকাঠামোগত অবস্থানের সঙ্গে বঙ্গদেশের সুবর্ণবণিকের অবস্থানকে পাশাপাশি রেখে পড়ার মাধ্যমে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের প্রতি সামাজিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। সুবর্ণবণিকের 'পাতিত্য' সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় বয়ান ও আখ্যানগুলিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমরা বিচার করব। দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ে সপ্তগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যুক্ত সুবর্ণবণিকের সমৃদ্ধিলাভের ইতিহাস আমাদের বিচার্য। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য, বিদেশি পর্যটকদের বয়ান ইত্যাদির মাধ্যমে এই পর্বের সপ্তগ্রাম বন্দরের ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়াই আমাদের লক্ষ্য। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্যের সূত্রে অর্জিত আর্থিক প্রতিপত্তি কীভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাধ্যমে জাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা লাভের পুঁজি হয়ে উঠল—তৃতীয় উপ-অধ্যায়ে তা আমাদের আলোচ্য। এই অংশের আলোচনা মূলত নিত্যানন্দ পরম্পরার রচিত চরিতগ্রন্থকেন্দ্রিক। সামাজিক সচলতা লাভের প্রক্রিয়া সচরাচর একটা যুগ পেরিয়ে আরেকটা যুগেও চলতে থাকে। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, নতুন শাসনকাঠামোয় সামাজিক সচলতার দাবিকে নতুন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ঔপনিবেশিক যুগে আদমসুমারির কালে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের দাবিই এই অধ্যায়ের শেষ অংশের উপজীব্য। পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে ঔপনিবেশিক কালে সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতা লাভের প্রক্রিয়ার পার্থক্য, বিশিষ্টতা আমাদের আলোচ্য। আদমসুমারি প্রতিবেদন, সুবর্ণবণিক সমাজের পত্র-পত্রিকা, সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষদের রচনার মাধ্যমে এই

প্রক্রিয়াটিকে আমরা বুঝতে চাইব। আপাতত চোখ ফেরানো যাক আমাদের আলোচনার প্রথম অংশে।

৩.১ বঙ্গদেশীয় পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থে সুবর্ণবণিক:

ভারতীয় সমাজের চতুর্বর্ণের কাঠামোটা বঙ্গদেশে দেখা যায় না। চতুর্বর্ণের বদলে বঙ্গদেশে দেখছি ব্রাহ্মণ-শূদ্রে দ্বি-বিভাজিত সমাজ। খ্রি. দ্বাদশ-খ্রি. চতুর্দশ শতকের মধ্যে রচিত *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর বয়ানে তেমনটাই দেখা যাবে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিস্তার আর সংস্কৃতি নির্মাণের যে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া চলছিল, তার প্রায় চূড়ান্ত রূপ আছে এই পুরাণদুটিতে। এই পুরাণদুটির বয়ান অনুযায়ী বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বর্ণ লুপ্ত। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুবীরা জায়সবালের পর্যবেক্ষণ—আদি মধ্যযুগে বৈশ্য বর্ণের প্রথাগত ধারণায় একটা বদল আসছিল। সাধারণভাবে কৃষিকাজ, পশুপালন, বাণিজ্য বৈশ্যবৃত্তি হিসাবে পরিচিত হলেও শূদ্রদের একটা বড়ো অংশ যুক্ত হয়ে পড়ছিল কৃষিকাজে। এদিক থেকে বৈশ্য আর শূদ্রের পার্থক্য তৈরি করা বেশ কঠিন। এইসময় থেকে পেশার নিরিখে বাণিজ্যই হয়ে উঠেছিল বৈশ্যবৃত্তির স্বলক্ষণ।[২] বঙ্গদেশে যেসময় *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* রচিত হচ্ছে তখন বাণিজ্য অর্থনীতির একটু পড়তি দশা। *আর্যাসপ্তশতী*-র ২৬৯ ও ৪০৫ নং আর্যায় বণিকের অস্তমিত গৌরবের নজির আছে। পড়তি দশায় বঙ্গদেশের বণিকরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বৈশ্য বর্ণের চেহারা নিয়ে উঠতে পারেননি। *বৃহদ্ধর্ম* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত*-দুটি পুরাণেই বণিকরা শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। আর্যাবর্তের নিরিখে প্রান্তিক বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবেশ করেছিল কিছুটা

---

[২] Suvira Jaiswal, 'Caste in the Socio-Economic Framework of Early India', Proceedings of the Indian History Congress, Vol.38, 1977, pp.40-41

দেরিতে। বঙ্গদেশে প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশের অস্তিত্বও ছিল না। পাল রাজারা প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করেছেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি পাল লেখমালায় আদৌ স্পষ্ট নয়। ক্ষত্রিয় বর্ণও তাই বঙ্গদেশে দানা বাঁধেনি।[৩] ব্রাহ্মণ-শূদ্রে দ্বি-বিভাজিত সমাজ হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতিমর্যাদা বা সাধনাধিকারের মর্যাদার নিরিখে ভাগ তিনটি—ব্রাহ্মণ, সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্র। সাধারণভাবে বঙ্গদেশের বণিকরা সকলেই শূদ্র হলেও মর্যাদার তারতম্য আছে। গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক ইত্যাদি সৎশূদ্র হলেও সুবর্ণবণিক অসৎশূদ্র। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য পাওয়ার কথা নয় সুবর্ণবণিকের। ব্রাহ্মণ, সৎশূদ্ররা শাস্ত্রনিয়ম অনুযায়ী সুবর্ণবণিকের হাতের অন্ন-জল নিতে পারে না। সহজ কথায়, সুবর্ণবণিক জল-অচল।

আর্থিক প্রতিপত্তিশালী হয়েও সুবর্ণবণিকরা কেন ‘নিচু’ জাত হিসাবে ছিলেন? এপ্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি গল্পের কথা শোনা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর রচনা *বল্লালচরিত* অনুযায়ী বল্লাল সেনের রাজ্যে বল্লভানন্দ নামে এক ধনী বণিক ছিলেন। রাজা মাঝেমধ্যেই ধার নিতে বল্লভানন্দের দ্বারস্থ হন। পূর্বের ধার শোধ না করেই ফের বল্লভানন্দের কাছে যুদ্ধযাত্রার জন্য দেড় কোটি সুবর্ণমুদ্রা ধার চেয়ে পাঠালে বল্লভানন্দ ধার দিতে রাজি হন বটে; কিন্তু পরিবর্তে দাবি করেন হরিকেলের রাজস্ব। ক্ষুব্ধ রাজা সুবর্ণবণিকদের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট করতে উঠেপড়ে লাগেন। সুবর্ণবণিকদের উপবীত ধারণের অধিকার রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হল। সুবর্ণবণিকের পৌরোহিত্য বা দানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণরাও নিদান অনুযায়ী সমাজে পতিত হলেন।[৪] *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস* প্রণেতা দুর্গাচন্দ্র সান্যালের রচনায় সুবর্ণবণিকদের পাতিত্যের আরেকরকম আখ্যান আছে। দুর্গাচন্দ্র লিখেছেন, কুন্দন আচার্য নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে

---

[৩] Suvira Jaiswal, ‘Changes in the Status and Concept of the Sudra Varna in Early Middle Ages’, Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 41, 1980, pp.114-116

[৪] নীহাররঞ্জন রায়ের মতে *বল্লালচরিত*-এর ঐতিহাসিক যাথার্থ্য সম্পুর্ণত স্বীকার না করা গেলেও গ্রন্থটিকে ‘জাল’ বা অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়াও ঠিক নয়। দ্র. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব্ব,* কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১২

অনেক রাতে হঠাৎ করেই এক অতিথি এসে হাজির হন। কুন্দন বাড়িতে ছিলেন না; ঘরে নগদ টাকারও অভাব ছিল। অতিথির খাদ্যের বন্দোবস্ত করার জন্য কুন্দনের স্ত্রী রাজার থেকে উপহার পাওয়া স্বর্ণধেনু মণিদত্ত নামে এক সুবর্ণবণিকের কাছে বন্ধক দিয়ে নগদ টাকার ব্যবস্থা করেন। পরদিন কুন্দন আচার্য বাড়ি ফিরে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে নগদ টাকা নিয়ে মণিদত্তের কাছে গেলেন ও বন্ধক রাখা স্বর্ণধেনু ফেরত চাইলেন। এদিকে লোভের বশে মণিদত্ত স্বর্ণধেনু ফেরত দিতে পারলেন না। তিনি স্বর্ণধেনু ভেঙে একটি ঢেঁপা তৈরি করে ফেলেছিলেন। কুন্দন আচার্য মণিদত্তের কথা রাজদরবারে জানালে মণিদত্তকে তলব করা হয়। মোকদ্দমা শুরু হল; বল্লাল নিজে বসলেন বিচারে। সুবর্ণবণিকদের পতিত করা বল্লালসেনের দীর্ঘদিনের অভিপ্রায় ছিল। তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন। এদিকে মণিদত্ত বণিকদের নেতা বল্লভানন্দের ভাগ্নে। বল্লাল বল্লভানন্দকে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন, সোনার গোলাতে কিছু মেশানো আছে কিনা। বল্লভানন্দ স্নেহের বশে মিথ্যা বললেন। অন্যান্য সুবর্ণবণিকরাও সহমত হলেন বল্লভানন্দের সঙ্গে। রাজা এরপর ডেকে পাঠালেন গন্ধবণিক, শঙ্খবণিকদের। তাঁরা জানালেন, স্বর্ণপরীক্ষার ক্ষমতা তাঁদের নেই। স্বর্ণকাররাই একাজ করতে পারেন। বল্লাল ডেকে পাঠালেন স্বর্ণকারদের। বল্লভানন্দ অবশ্য আগেই স্বর্ণকারদের ঘুষ দিয়ে হাত করেছিলেন। সুতরাং, বল্লালের কার্যসিদ্ধি হল না। তখন কাশী থেকে স্বর্ণকারদের ডেকে আনা হল। তাঁরা সোনার মধ্যে খাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। বল্লাল কাশীর স্বর্ণকারদের পুরস্কৃত করলেন; কুন্দন আচার্যকে ক্ষতিপূরণ দিলেন। তারপর নিদান দিলেন—আজ থেকে সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকাররা পতিত।[৫] *বিশ্বকোষ*-এ নগেন্দ্রনাথ বসু লিখছেন—সুবর্ণবণিক জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী, ডোমকন্যা গ্রহণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বল্লাল সেন ব্রাহ্মণদের কতকগুলি স্বর্ণধেনু দান করেন। ব্রাহ্মণরা আবার স্বর্ণধেনুগুলি বিক্রি করতে যান সুবর্ণবণিকের ঘরে। চক্রান্ত করে ধেনুগুলির ভিতরে আলতা

[৫] দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস*, কলকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩৬-৩৭

পুরে রাখা হয়েছিল। সোনা পরীক্ষার জন্য স্বর্ণধেনুর শরীরে চাপ দিতেই রক্তধারার মত আলতা বেরিয়ে আসতে থাকে। জনমানসে প্রচার হয়ে যায়, রাজার পুণ্যে ধেনুগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। সুবর্ণবণিক সেই ধেনু বধ করে গো-হত্যার দায়ে জড়িয়েছেন। আবার, আরেক সুবর্ণবণিক অভিযুক্ত হন সোনা চুরির দায়ে। এসবই নাকি বল্লাল সেনের চক্রান্ত![৬] উনিশ শতকে আদমসুমারির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তা এইচ.এইচ.রিজলি অবশ্য এইসব আখ্যানের সত্যতায় বিশ্বাস করেননি। তাঁর মনে হয়েছিল রাজা নিশ্চয় ক্ষমতাপ্রয়োগে একটি জাতির অবনমন ঘটাতে পারেন; যদি গোষ্ঠীটি ক্ষুদ্র ও প্রভাবহীন হয়। কিন্তু, সুবর্ণবণিকদের মতো প্রভাবশালী একটি গোষ্ঠীকে রাজা মর্জিমাফিক পতিত করছেন—এহেন আখ্যান রিজলির বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। বরং, তাঁর মনে হয়েছিল, সুবর্ণবণিকরা হিন্দুস্থানি বেনিয়া; বঙ্গদেশে বাস করার কারণে তাঁরা পতিত হয়েছেন।[৭] খেয়াল করা দরকার, সুবর্ণবণিকদের সম্বন্ধে প্রচলিত আখ্যানগুলি ছলে-বলে-কৌশলে পাতিত্যের কথা বলে। রিজলি সেইসমস্ত আখ্যানের সত্যতায় ভরসা রাখতে পারেননি। কিন্তু হিন্দুস্থানি বণিকদের বঙ্গদেশে বাস করার কারণটিকে তুলে এনে তিনিও জাতিকাঠামোয় সুবর্ণবণিকদের 'পড়ে যাওয়া'র গল্প শুনিয়েছেন। বাস্তবিকই, সুবর্ণবণিকরা কি জাতিকাঠামোয় উঁচু আসন থেকে বিভিন্ন কারণে 'পড়ে' গিয়েছিলেন? নাকি আগাগোড়াই তাঁদের অবস্থান নিচেই ছিল?

মনুসংহিতা-র ৯.২৯২ শ্লোকে বলা হচ্ছে স্বর্ণকার অত্যন্ত পাপিষ্ঠ; সে যদি অলংকারে খাদ মিশিয়ে সোনা চুরি করে তাহলে ক্ষুর দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কাটা উচিত। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেছেন প্রথমবার সোনা চুরির দায়ে অভিযুক্ত হলে স্বর্ণকারের অর্থদণ্ড হবে। দ্বিতীয়বারেও এই অপরাধ করতে দেখা গেলে শারীরিক দণ্ড ভোগ

---

[৬] নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ(২২ ভাগ)*, কলিকাতা: বিশ্বকোষ প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭৮

[৭] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Bengal(Vol.2)*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1st Edition, 1892, p.262

অনিবার্য। অর্থাৎ স্বর্ণকারদের সম্বন্ধে সোনা চুরির অভিযোগটি প্রাচীন। বল্লাল পূর্ববর্তী বঙ্গদেশের স্মৃতিকার ভবদেব ভট্টের এবিষয়ে অবস্থান *মনুসংহিতা*-র মতোই। ভবদেবের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে সুবর্ণকৃৎ অন্ত্যজ তালিকাভুক্ত।[৮] সুবর্ণকৃৎ বা স্বর্ণকার আর সুবর্ণবণিক কি একই? মনু বা ভবদেবের রচনায় সরাসরি সুবর্ণবণিক শব্দটি নেই। এখানে দুটি বিষয় লক্ষ করা দরকার। এক, সোনা চুরির অভিযোগ যে বারবার সুবর্ণবণিকের বিরুদ্ধেও উঠত তার প্রমাণ আছে *সেক শুভোদয়া*-তেও।[৯] মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-এও সুবর্ণবণিকের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উঠেছে—

সুবর্ণ বণিক বৈসে রজত কাঞ্চন কষে পোড়ে ফোড়ে করিঞা সংশয়।

কিছু বেচে কিছু কেনে নিত্য নিত্য বাড়ে ধনে পুরমধ্যে যাহার নিলয়।।

নিবসে পশ্যতোহর পুরমধ্যে যার ঘর নির্মাণ করএ অভরণে।

দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে পরের ধন হাথ বদলিতে ভাল জানে।।[১০]

অলংকারে খাদ মিশিয়ে সোনা চুরির অভিযোগই যদি স্বর্ণকারের পাপের কারণ হয়, তাহলে সুবর্ণবণিকও কার্যত একই পাপের শরিক। সুবর্ণবণিকরা যে স্বর্ণালংকার তৈরির কাজেও যুক্ত থাকতেন—সে প্রমাণ *সেকশুভোদয়া*-তেও আছে। দ্বিতীয়ত, *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এর উত্তরখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিকের উভয়েরই উৎপত্তি অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে।[১১]

---

[৮] অর্জুনদেব সেনশর্মা, *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ,* কলকাতা: ভারবি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, পৃ.৩৩৭-৩৪১

[৯] Sukumar Sen(ed.), *Sekasubhodaya*, Kolkata: The Asiatic Society, Reprint, 2002, p.148

[১০] পঞ্চানন মণ্ডল(সম্পা.), *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,* কলকাতা: ভারবি, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.১৫৮

[১১] পঞ্চানন তর্করত্ন(সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণ,* কলকাতা: নবভারত, দ্বিতীয় নবভারত সংস্করণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩৪৩

অর্থাৎ, সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকারের গোষ্ঠীগত নৈকট্য ছিলই। পরে সম্ভবত, এই গোষ্ঠীর মধ্যে দুটি ভাগ তৈরি হয়ে যায়—একদল স্বর্ণনির্মাণে যুক্ত হয়ে পড়েন আর একদল স্বর্ণব্যবসায়।[১২]

অধ্যাপক নৃপেন্দ্র কুমার দত্ত অবশ্য সুবর্ণবণিক আর স্বর্ণকারকে এক করে দেখতে চান না। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এ স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিকের উৎস এক হলেও অধ্যাপক দত্ত সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকারকে এক বলে মেনে নিতে নারাজ। তাঁর যুক্তি দুটো—এক, সুবর্ণবণিক আর স্বর্ণকাররা নিজেদের আলাদা গোষ্ঠী হিসাবেই দেখতে চান। দুই, স্বর্ণকারদের ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা সুবর্ণবণিকদের থেকে বেশি।[১৩] সুবর্ণবণিক আর স্বর্ণকাররা বস্তুতই এখন নিজেদের পরস্পর সম্পর্করহিত আলাদা গোষ্ঠী হিসাবেই দেখতে চান। কিন্তু, কোন ঐতিহাসিক পর্বেই যে তাঁরা একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না—এমন নিশ্চয়াত্মক প্রমাণও নেই। দ্বিতীয়ত, স্বর্ণকার আর সুবর্ণবণিকের ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার পার্থক্য বঙ্গদেশীয় পুরাণে একেবারেই স্পষ্ট নয়। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এ স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক উভয়েই মধ্যম সংকর; শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য থেকে বঞ্চিত। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ দেখা যাচ্ছে, স্বর্ণকার বিশ্বকর্মার পুত্র হলেও স্বর্ণচুরির অপরাধে ব্রহ্মশাপে পতিত হয়েছে। পতিত স্বর্ণকারের সঙ্গে সংসর্গের কারণে এবং স্বর্ণচুরির দোষে কোন বণিক বিশেষও ব্রাহ্মণের শাপে পতিত হয়েছিলেন।[১৪] অর্থাৎ, স্বর্ণকার ও বণিক (সম্ভবত সুবর্ণবণিক) দুজনেই স্বর্ণচুরির দোষে দুষ্ট ও পতিত। আবার, স্বর্ণকারের সঙ্গে সুবর্ণবণিকের 'সংসর্গ'ও ছিল। এগুলি নিশ্চয় দুই গোষ্ঠীর নৈকট্যের ইঙ্গিত।

---

[১২] অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে অনেকসময় স্বর্ণব্যবসায়ী বা সুবর্ণবণিকরাও পেশা বদলে স্বর্ণকার বা স্যাকরা হয়ে যেতেন। অর্থাৎ, সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকারের সংসর্গ যথেষ্টই ছিল। দ্র. মাণিকলাল সিংহ, *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি(২য় খণ্ড)*, বিষ্ণুপুর: প্রণবকুমার সিংহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ.২২৭

[১৩] N.K. Dutt, *Origin and Growth of Caste in India*, Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd., First Combined Reprint Edition, 1986, pp.276-277

[১৪] পঞ্চানন তর্করত্ন(সম্পা.), *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, কলকাতা: নবভারত, নব সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ.২৫

দীর্ঘদিন ধরেই স্বর্ণকারদের খারাপ চোখে দেখা হচ্ছে। সমাজ-প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী স্বর্ণকাররা চোর। একাদশ শতাব্দীতে ভোজের রচনায় নগরবিন্যাস সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, স্বর্ণকারদের বাসস্থান নগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নির্দিষ্ট। স্বর্ণকারদের সঙ্গে একই জায়গায় বাস করবেন জুতা-নির্মাতারা। স্বর্ণালংকার নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অভিজাত ব্যক্তিদের সঙ্গে স্বর্ণকারদের সম্পর্ক ছিল। ব্যবহারিক জগতে এই গুরুত্বও শাস্ত্রীয় পরিসরে স্বর্ণকারের মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে পারেনি।[১৫]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় স্বর্ণকারদের ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। মহারাষ্ট্রে স্বর্ণকাররা শূদ্র পর্যায়ভুক্ত। স্বর্ণকারদের এই গোষ্ঠীতে পশুপালক আহীররাও একসময় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা 'আহীর সোনার' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, 'আহীর সোনার'রা মহারাষ্ট্রে স্বর্ণকারদের একটি উপবিভাগ। পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রের স্বর্ণকাররা ব্রাহ্মণত্বের দাবি করতে থাকেন।[১৬] দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু জায়গায়, বিশেষত তামিলনাডু ও কেরলে, স্বর্ণকাররা বিশ্বকর্মা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। বিশ্বকর্মা গোষ্ঠীতে পাঁচটি শিল্পী সম্প্রদায় যুক্ত—স্বর্ণকার, কর্মকার, পিতল নির্মাতা, ছুতোর ও রাজমিস্ত্রি বা স্থপতি। সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী এরা সকলেই বিশ্বকর্মার সন্তান। এই সৃষ্টিতত্ত্ব তামিল ভাষায় অর্বাচীন *বিশ্বকর্মা পুরাণ*-এ পাওয়া যাবে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণদের মতোই যজ্ঞোপবীত ধারণ করে থাকেন। এই কাহিনিটির সূত্র ধরেই বিশ্বকর্মা গোষ্ঠীভুক্ত স্বর্ণকার ও অন্যান্য শিল্পীরা উপবীত ধারী। বিশ্বকর্মার সন্তান হওয়ার সূত্রে উপবীত ধারণের মাধ্যমে তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার ।[১৭] দক্ষিণ ভারতের আরেক রাজ্য কেরলেও দেখা যাচ্ছে প্রায় একইরকম ঘটনা। কেরলের

---

[১৫] স্বর্ণা, 'প্রাচীন ভারত মে স্বর্ণকার: এক অধ্যয়ন, পটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, ২০১৮, পৃ.৪৯-৫০

[১৬] Stella Kramrisch, 'Tradition of the Indian Craftsman', The Journal of American Folklore, Vol.71, No.281, Jul-Sep. 1958, p.225

[১৭] Vijaya Ramaswamy, 'Viswakarma Craftsmen in Early Medieval Peninsular India', Journal of the Economic and Social History of the Orient', Vol.47, No.4, 2004, pp.563-564

বিশ্বকর্মা গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীরা—স্বর্ণকারও যার অন্তর্ভুক্ত, বহু শতাব্দী ধরে ব্রাহ্মণত্বের দাবি করে আসছেন। জাত হিসাবে তাঁদের মর্যাদা খুব উঁচু নয়; সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের ২৪ ফুট দূরত্ব রাখার কথা। স্থপতি, অলংকার নির্মাতা, মূর্তি নির্মাতা হিসাবে বিশ্বকর্মা গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীরা বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত; অথচ যে মুহূর্তে নির্মাণকর্ম শেষ হচ্ছে, শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁরা অপবিত্র। ব্রাহ্মণত্বের দাবি সেকারণে খুব বেশি সামাজিক মান্যতা পায়নি। যদিও ব্রাহ্মণত্বের দাবি বহুদিন যাবৎ বিশ্বকর্মাগোষ্ঠীর প্রধান অবলম্বন।[১৮] বঙ্গদেশের স্বর্ণকারদের মতোই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেই স্বর্ণকাররা ঘৃণিত; অথচ বিভিন্ন স্থানেই ব্রাহ্মণত্বের দাবি প্রবল। লক্ষণীয়, বঙ্গদেশের সুবর্ণবণিকরা সরাসরি ব্রাহ্মণত্বের দাবি না করলেও বৈশ্যত্ব বা দ্বিজত্বের দাবি করে থাকেন। 'রাজাজ্ঞা'য় যজ্ঞোপবীত ধারণ নিষিদ্ধ হওয়ায় যজ্ঞোপবীতের পরিবর্তে গলায় একটি সোনার হার পরে থাকতে দেখা যায় সুবর্ণবণিকদের।[১৯] ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। আদি মধ্যযুগের কর্ণাটকে কোলার স্বর্ণখনির সূত্রে দীর্ঘদিন ধরেই প্রচুর স্বর্ণকারের বসবাস। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে স্বর্ণকারদের অস্পৃশ্য মনে করা হলেও অন্তত আদি মধ্যযুগের কর্ণাটকে বাস্তব ছবিটা অন্যরকম ছিল। বরং, কর্ণাটকে এই পর্বে স্বর্ণকারদের সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদার অভাব দেখা যায় না। সাধারণভাবে, অস্পৃশ্য জাতিগুলির মন্দিরে প্রবেশাধিকার থাকে না। আদি মধ্যযুগের কর্ণাটকে স্বর্ণকারদের অবশ্য এইসব অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়নি। বিভিন্ন রাজবংশের আমলে বহু স্বর্ণকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে ছিলেন। মন্দিরে প্রবেশাধিকার তো ছিলই; বিভিন্ন মন্দিরে তাঁদের দাতা হিসাবেও দেখা যাচ্ছে।[২০] আদি মধ্যযুগের কর্ণাটকে স্বর্ণকারদের এই প্রতিপত্তি জাতপাতের

---

[১৮] George Varghese K, 'Globalisation Traumas and New Social Imaginary: Visvakarma Community of Kerala, Economic and Political Weekly, Vol. 38, No.45, Nov.8-14, 2003, pp.4794-4796

[১৯] N.K. Dutt, *Origin and Growth of Caste in India*, p.281

[২০] Om Prakash Prasad, 'Position of Goldsmiths in Early Medieval Karnataka(11th -13th Century AD), Proceedings of the Indian History Congress, Vol.42, 1981, p.134

কাঠামোর আঞ্চলিক বিশিষ্টতার প্রমাণ। এই নিদর্শনগুলিকে দেখলে নৃপেন্দ্রকুমার দত্তের সুবর্ণবণিকের তুলনায় স্বর্ণকারের উচ্চ মর্যাদা সংক্রান্ত মন্তব্যটি প্রশ্নের মুখে পড়ে। সম্ভবত, পেশার কারণে সোনার মত মূল্যবান জিনিসের কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় নানাবিধ অসততার অভিযোগ ও প্রবল সন্দেহের দরুণ স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিকরা জাতিকাঠামোয় খুব উঁচু আসন আদায় করে নিতে পারেননি। অবশ্য, স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিকের গোষ্ঠীগত দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে কালক্রমে দুটি আলাদা গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ঘনরামের *ধর্মমঙ্গল* ও ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এ সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকার দুটি আলাদা জাতি।[২১]

সুবর্ণবণিকদের 'পাতিত্য' এর আরেকটা কারণ হিসাবে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত বঙ্গদেশের বণিকদের সমুদ্রযাত্রাকে দেখেছেন।[২২] *বৌধায়ন ধর্মসূত্র*-এ সমুদ্রযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ধর্মজীবনের নিরিখে সমুদ্রযাত্রা বৌধায়নের মতে পাতিত্যের কারণ। অবশ্য, শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করলে এই পাতিত্য থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। অধ্যাপক পি.ভি.কানের মতে এই নিষেধাজ্ঞা কোন্ শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* থেকে স্পষ্ট না হলেও পরবর্তী ভাষ্যগুলোর সূত্রে মনে হচ্ছে এই নিষেধাজ্ঞা দ্বিজাতির জন্য। যাজ্ঞবল্ক্য *বৌধায়ন ধর্মসূত্র*-এর এই বচনটিকে *মিতাক্ষরা*-য় উদ্ধৃত করেছেন। *মনুসংহিতা*-এর তৃতীয় অধ্যায়েও সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গটি আছে। মনুর বিবরণ থেকে মনে হয়, সমুদ্রযাত্রার নিষেধাজ্ঞা কেবল ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমুদ্রযাত্রাকারী ব্রাহ্মণও আবার নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে ধর্মকৃত্যের অধিকার ফিরে পান। এই অবধি দেখে বণিকের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা কতদূর ছিল—এই প্রশ্ন উঠতে পারে। অনেক পরবর্তীকালে হেমাদ্রির *চতুর্বর্গ চিন্তামণি*, *বৃহন্নারদপুরাণ*

---

[২১] চন্দ্রিমা সিনহা, 'ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় বাংলায় জাতি আন্দোলন ও বর্ণ সমাজের পুনর্বিন্যাস: মাহিষ্য ও সুবর্ণবণিক সমাজ', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অপ্রকাশিত গবেষণাসন্দর্ভ, ২০১৩, পৃ.৩৩

[২২] N.K. Dutt, *Origin and Growth of Caste in India*, p.273

ও *আদিত্যপুরাণ*-এ সমুদ্রযাত্রাকে কলিবর্জ্য বলা হয়েছে।[২৩] অবশ্য, শাস্ত্রে কলিবর্জ্য হওয়ায় রাতারাতি সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হয়ে গেল—এমন মনে করার কোন কারণ নেই। লক্ষণীয়, যে সময়ে শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রাকে কলিবর্জ্য বলে ঘোষণা করা হচ্ছে, সেইসময়ে সমুদ্রবাণিজ্যে আরব বণিকের অপ্রতিহত দাপট। আবার, এই যুগেই চোল নৌশক্তির বিকাশ।[২৪] ফলে, শাস্ত্র আর বাস্তবের সবসময় সংগতি ছিল না। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত বঙ্গদেশের বণিকদের সমুদ্রযাত্রার কথা বলেছেন। খেয়াল রাখা দরকার, মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত বঙ্গদেশীয় বণিকরা সকলেই গন্ধবণিক। নিখাদ ধর্মশাস্ত্রের কড়া দৃষ্টিতে সমুদ্রযাত্রা যদি অনিবার্যত পাতিত্যের কারণ হয়, তাহলে সুবর্ণবণিকদের আগে গন্ধবণিকদের পতিত হওয়ার কথা। অথচ, বঙ্গদেশীয় পুরাণমতে, গন্ধবণিকরা সৎশূদ্র আর সুবর্ণবণিক অসৎশূদ্র। সুতরাং, সমুদ্রযাত্রাকে সুবর্ণবণিকের 'পাতিত্য' এর কারণ বলে মেনে নেওয়া কঠিন।[২৫]

সুবর্ণবণিকদের 'পাতিত্য' এর কারণ হিসাবে আরেকটি অনুমানের কথাও আলোচনায় উঠে আসে। পাল-পরবর্তী যুগে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদের দ্বিবর্ণব্যবস্থা প্রচলনের বিরুদ্ধে সম্ভবত রুখে দাঁড়িয়েছিলেন প্রভাবশালী সুবর্ণবণিকরা। কাজেই, ব্রাহ্মণদের তরফে তাঁদের জন্য সাধারণ শূদ্রের তুলনায় নিচু স্থান নির্দিষ্ট করা হয়।[২৬] এই বক্তব্যের সাপেক্ষে কোন সাহিত্যগত বা লেখমালাগত প্রমাণ হাতে না থাকায় মন্তব্যটিকে নিছক অনুমান হিসাবে দেখাই শ্রেয়।

---

[২৩] S. C. Bindra, 'Notes on Religious Ban on Sea Travel in Ancient India', Indian Historical Review, Vol.XXIX, No. 1-2, 2004, pp.34-37

[২৪] Lotika Varadarajan, 'Indian Seafaring: The Precept and Reality of Kalivarjya', The Great Circle, Vol.5, No.1, April 1983, p.3

[২৫] ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কালপর্বে বঙ্গদেশের সুবর্ণবণিকরা সমুদ্রবাণিজ্যে যেতেন না। তবে, তার আগে হয়তো সুবর্ণবণিকের সমুদ্রবাণিজ্যের রেওয়াজ ছিল। কিছু সুবর্ণবণিকের পদবি 'পোদ্দার' অর্থাৎ বাণিজ্যপোতের মালিক। দত্ত ও সেন বংশীয় সুবর্ণবণিকেরা বহির্বাণিজ্যে যেতেন। দ্র. মাণিকলাল সিংহ, *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি(২য় খণ্ড)*, পৃ.২২৭। এই বক্তব্যকে মেনে নিলেও সুবর্ণবণিকের তুলনায় গন্ধবণিকের অপেক্ষাকৃত উঁচু অবস্থানের ব্যাখ্যা মেলে না। সমুদ্রযাত্রা পাতিত্যের কারণ হলে দুটি বণিক সম্প্রদায়েরই একই অবস্থানে থাকার কথা।

[২৬] N.K. Dutt, *Origin and Growth of Caste in India*, p.280

অনেকে মনে করেছেন, বঙ্গদেশের বণিকরা বৌদ্ধ সংসর্গের কারণে ব্রাহ্মণ্য সমাজকাঠামোয় শূদ্র হিসাবে পরিচিত হয়েছেন।[২৭] এই ব্যাখ্যাটি মেনে নিলেও বঙ্গদেশের অন্যান্য বণিকদের তুলনায় সুবর্ণবণিকরা কেন অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে রইলেন—এই তর্কের সমাধান হয় না। তাহলে কি বল্লাল কর্তৃক নিপীড়ন বা চক্রান্তের গল্পটিকেই মেনে নেব? নীহাররঞ্জন রায় মনে করেছেন *বল্লালচরিত*-এর কাহিনির মধ্যে সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে সুবর্ণবণিকের পাতিত্যের ইঙ্গিত আছে। সেন আমলের পুরাণ-স্মৃতিতে সুবর্ণবণিকের অবস্থানের সঙ্গে কাহিনিটির যোগ খুঁজতে চেয়েছেন তিনি।[২৮] এদিকে যদি আমরা স্বর্ণকার-সুবর্ণবণিকের সম্পর্ক স্বীকার করি, তাহলে সেন আমলের আগে থেকেই জাতিকাঠামোয় সুবর্ণবণিকের অবস্থান নিচেই ছিল। কাজেই, সুবর্ণবণিকের জাতিকাঠামোয় নিচু অবস্থান বা 'পাতিত্য' এর কারণ সম্বন্ধে অনেকগুলি অনুমান, যুক্তি, প্রতিযুক্তি প্রচলিত। এক, পেশাগত কারণে স্বর্ণচুরির সম্ভাবনায় বা অভিযোগের দরুণ স্বর্ণকাররা এবং স্বর্ণকারদের সঙ্গে সংসর্গ ও 'স্বভাবগত' সাদৃশ্যের কারণে সুবর্ণবণিকরাও ধর্মশাস্ত্রের দৃষ্টিতে 'পতিত'। দুই, সমুদ্রযাত্রা সুবর্ণবণিকের পাতিত্যের কারণ। তিন, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জড়িত থাকায় এই বণিক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে 'পতিত'। চার, রাজনৈতিক চক্রান্তে সুবর্ণবণিকরা পতিত। উপযুক্ত পাথুরে প্রমাণের অভাবে কিছু যুক্তি বা ব্যাখ্যা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া কঠিন। কিছু ব্যাখ্যা বেশ কিছুদূর অবধি ঘাতসহ। 'নিচু' অবস্থানের কারণ সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না গেলেও আমাদের আলোচ্য কালপর্বে জাতিকাঠামোয় সুবর্ণবণিকের 'নিচু' অবস্থান সম্পর্কে সংশয় ছিল না। এই প্রেক্ষাপটটিকে মাথায় রেখে পরবর্তী কালপর্বে সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতা লাভের প্রয়াসকে বোঝা

---

[২৭] তদেব, পৃ.২৮১, নগেন্দ্রনাথ বসু, *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস(বৈশ্য-কাণ্ড),* প্রথম ভাগ, কলকাতা: বিশ্বকোষ প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৯৩

[২৮] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব্ব,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৩

দরকার। পরবর্তীকালে সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতা লাভের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সপ্তগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্য। এবার সেদিকে তাকানো দরকার।

৩.২ সপ্তগ্রাম বন্দর ও বাঙালি বণিক:

অষ্টম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তের পতনের পর বঙ্গদেশে সমুদ্রবাণিজ্যের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বন্দরের প্রাধান্যের সূত্রপাত। মুসলিম অধিকারের মধ্য দিয়েই সপ্তগ্রামের বন্দর শহর হিসাবে অগ্রগতির সূচনা। বখতিয়ার খলজি নদীয়া দখল করেন ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। সপ্তগ্রাম দখল করতে অবশ্য লেগে যায় প্রায় এক শতাব্দী। ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে জাফর খাঁ গাজি সপ্তগ্রাম দখল করেন। মুসলিম রাজশক্তির তরফে সপ্তগ্রাম দখলের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবত ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই সপ্তগ্রামের দিকে নজর পড়েছিল রাজশক্তিগুলির। ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা নরসিংহদেব ভাগীরথী পর্যন্ত চলে এসেছিলেন। উড়িষ্যার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যই সপ্তগ্রামের নিয়ন্ত্রণ জরুরি ছিল মুসলিম শাসকদের কাছে। মুসলিম অধিকারের পূর্বে পাল-সেন আমলেও সপ্তগ্রাম বেশ উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ছিল। পাল-সেন আমলের বহু মূর্তি এখান থেকে পাওয়া গেছে।[২৯] শহর হিসাবে সপ্তগ্রামের উত্থান-পতনের সংবাদ পাওয়ার একটা উপায় পুরালেখ ও মুদ্রার সাক্ষ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বাংলার শাসক রুকনুদ্দিন কৈকুসের আমলে সপ্তগ্রাম থেকে প্রাপ্ত একটি আরবি পুরালেখে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যাচ্ছে। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সংবাদ সপ্তগ্রামে একটি মুসলিম বসতির অস্তিত্ব জানান দেয়।[৩০] সপ্তগ্রাম থেকে প্রাপ্ত শিলালেখগুলি ছাড়া সপ্তগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ আছে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের

[২৯] অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, কলকাতা: আনন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ.১৫৩

[৩০] Syed Ejaj Husain & Syed Ejaj Hussain, 'Rise and Decline of Bandar Satgaon: Based on Numismatic Evidence, Proceedings of the Indian History Congress, Vol.58, 1997, p.322

সময়কালীন *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* বইতে। মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে সপ্তগ্রামে টাঁকশাল চালু হয়। এই টাঁকশাল থেকে প্রথম মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে ১৩২৯ খ্রিস্টাব্দে। সম্ভবত ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দ অবধি এই টাঁকশাল চলেছিল।[৩১] সপ্তগ্রাম টাঁকশাল থেকে উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলিতে 'আরসা', 'মুল্ক', 'বন্দর'—এই বিশেষণগুলি পাওয়া যাচ্ছে। 'আরসা' শব্দটির অর্থ ভূখণ্ড; 'মুল্ক' শব্দের মানে দেশ বা শহর। শাহ জালালের সমকালীন মুদ্রাগুলিতে 'মুল্ক' শব্দটির ব্যবহারই বেশি। আবার, সম্রাট আকবরের সময়ে উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলিতে 'বন্দর' শব্দের প্রাধান্য। মুদ্রায় উৎকীর্ণ 'বন্দর' শব্দটি বাণিজ্যক্ষেত্রে সপ্তগ্রামের গুরুত্বের প্রমাণ।[৩২] টাঁকশালের পত্তন নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে সপ্তগ্রামের গুরুত্বের চিহ্নক। অনুমান করা চলে, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেও জাফর খাঁ গাজির সপ্তগ্রাম দখল করতে চাওয়ার একটা কারণ।[৩৩] চতুর্দশ শতকের শেষদিকে দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যে রূপার অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। রৌপ্যমুদ্রার অভাব এই অনুমানকে জোরালো করে তোলে। পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্কে যুক্ত গুজরাটেও খাঁটি রৌপ্যমুদ্রার অভাব দেখা দেয়। এই আকালেও কিন্তু বঙ্গদেশে অল্প পরিমাণে হলেও রৌপ্যমুদ্রার অস্তিত্ব ছিল। এই রূপা আসছিল সম্ভবত আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাণিজ্যের সূত্রে। অনেকে অনুমান করতে পারেন, এই রূপার ভাণ্ডার কব্জা করার উদ্দেশ্যেই ফিরোজ শাহ তুঘলক দু'বার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। সপ্তগ্রামের উত্থানের নেপথ্যে চট্টগ্রাম বন্দরেরও পরোক্ষ হাত ছিল। চট্টগ্রাম বন্দরের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া অস্থিরতাও সপ্তগ্রামের প্রতি বণিকসমাজের আকর্ষণবৃদ্ধির

[৩১] Rakhal Das Bandyopadhyaya, 'Saptagrama or Satganw', Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, 1909, p.249

[৩২] Syed Ejaj Husain & Syed Ejaj Hussain, 'Rise and Decline of Bandar Satgaon: Based on Numismatic Evidence, p.326

[৩৩] Aniruddha Ray, 'The Rise and Fall of Satgaon: An Overseas Port of Medieval Bengal', *The Indian Trade at the Asian Frontier*, ed. S. Jeyaseela Stephen, New Delhi: Gyan Publishing House, 1st Edition, New Delhi, 2008, pp.70-71

কারণ হতে পারে।[৩৪] পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই চট্টগ্রামে ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজনৈতিক শক্তির আক্রমণ শুরু হয়। শুরু হয় বাংলা, ত্রিপুরা ও আরাকানের এক দীর্ঘমেয়াদি ত্রিপাক্ষিক সংঘাত। ষোড়শ শতাব্দীতে এই পটভূমিতে এসে যোগ দেয় পর্তুগিজরা। স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গদেশের সুলতান একটু নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাণিজ্যের উপযোগী বন্দরের খোঁজ করতে থাকেন।[৩৫] এদিকে পর্তুগিজরাও ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড় বাড়ছে। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে ১৮টি পর্তুগিজ বাণিজ্যতরী চট্টগ্রাম বন্দরে এসে হাজির হয়েছিল। এদিকে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের পতন হয়। গৌড়ের সঙ্গে চট্টগ্রামের নিবিড় সংযোগ ছিল। গৌড়ের পতনের পরে পর্তুগিজদের বাণিজ্যের অভিমুখ ঘুরে যায় সপ্তগ্রামের দিকে। পর্তুগিজরা ক্রমশ বাণিজ্যক্ষেত্রে বঙ্গদেশের সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারছিলেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বেসরকারি পর্তুগিজ বাণিজ্য উদ্যোগকে অনেকবেশি করে ছাড়পত্র দেওয়া হতে থাকে।[৩৬] পর্তুগিজ আগমনের পূর্বেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে সপ্তগ্রাম যে রীতিমত বড়ো শহর হয়ে উঠেছিল তার উল্লেখ আছে বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের *মনসামঙ্গল*-এ। বিপ্রদাসের রচনায় কথকদের সূত্রে পরবর্তী প্রক্ষেপ কিছুটা ঘটলেও কাব্যটি আদতে ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত। বিপ্রদাস লিখেছেন—

অভিনব সুর পুরী		দেখি ঘর সারি সারি

প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।

নানা রত্ন অবিশাল		জ্যোতির্ময় কাঁচ ঢাল

[৩৪] তদেব, পৃ.৭৫-৭৬

[৩৫] Aniruddha Roy, 'Morphology of Medieval Saptagram or Satgaon', সপ্তগ্রাম -স্মৃতিপত্র, অগস্ট ২০০৮, পৃ.১২

[৩৬] Sanjay Subrahmanyam, 'Notes on the Sixteenth Century Bengal Trade', The Indian Economic and Social History Review, Vol.24, No.3, 1987, p.273-274

গজ মুক্ত-প্রলম্বিত বারা।।[৩৭]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে টোমে পিরেস তাঁর বিবরণীতে সপ্তগ্রামকে বড়ো বন্দর হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। পিরেসের হিসাব অনুযায়ী সপ্তগ্রামে প্রায় দশ হাজার মানুষের বাস। এই হিসাবটিতে সম্ভবত একটু গণ্ডগোল আছে। পর্তুগিজরা অনেকসময় জনসংখ্যাকে পরিবারের সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। যেসময় রাজধানী গৌড়ের জনসংখ্যা প্রায় দু' লক্ষ, সেখানে সপ্তগ্রামের জনসংখ্যা মাত্র ১০০০০ হতে পারে না। পরিবার পিছু ৫ জন লোক ধরলে সপ্তগ্রামের মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৫০০০০। এই সংখ্যা সমসাময়িক অন্যান্য বিবরণীর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।[৩৮]

বিপ্রদাস যখন কাব্য রচনা করছেন তখন সপ্তগ্রাম বন্দরের সোনালি দিন। এই বন্দরের বাণিজ্যের একটা বড়ো অংশ তখন ছিল মুসলমান বণিকদের হাতে। বিপ্রদাসের রচনায় সপ্তগ্রামের যবন বসতির উল্লেখ আছে।[৩৯] টোমে পিরেসের বিবরণী থেকে জানা যাচ্ছে, বঙ্গদেশের বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক মূলত ফারসি, তুর্ক, আরব বণিক। আরেক পর্যটক বারবোসা গৌড় এবং চট্টগ্রামে আরব, ফারসি, আবিসিনীয় বণিকদের বসতি দেখেছিলেন। পর্তুগিজ বিবরণীতে বেশ কিছু ফারসি বণিকের উল্লেখও আছে।[৪০] ভারত মহাসাগরের ভারতীয় উপকূলের বন্দরগুলিতে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক থেকেই বিদেশাগত মুসলমানরা বাণিজ্যসূত্রে বসতি গড়ে তোলেন। সপ্তগ্রামও এর ব্যতিক্রম নয়। চিনা পর্যটক মাহুয়ানের বিবরণে দেখা যাচ্ছে, বাংলার মুসলিম ধনী বণিকদের বহির্বাণিজ্যের জন্য নিজস্ব জাহাজও আছে।[৪১] অশীন

[৩৭] অচিন্ত্য বিশ্বাস(সম্পা.), *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*, কলকাতা: রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ.১৩৫

[৩৮] Aniruddha Roy, 'Morphology of Medieval Saptagram or Satgaon', p.21

[৩৯] অচিন্ত্য বিশ্বাস(সম্পা.), *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*, পৃ.১৩৫

[৪০] Sanjay Subrahmanyam, 'Notes on the Sixteenth Century Bengal Trade', p.282

[৪১] সুশীল চৌধুরী, *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য*, কলকাতা: আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.৩৪

দাশগুপ্ত এদেরই বলেছেন জাহাজি-বণিক। সপ্তগ্রামে 'হিন্দু' বণিকদের বসবাস ছিল যথেষ্ট সংখ্যায়। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব জাহাজ ছিল বলে জানা যায় না। বরং, মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল* পড়লে মনে হয় বাঙালি বণিকরা বহির্বাণিজ্য থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন। শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে মুকুন্দ জানিয়েছেন—সপ্তগ্রামের বণিক বাইরে যায় না; ঘরে বসেই সুখ, মোক্ষ লাভ করে।[৪২]

আবার আসা যাক পর্তুগিজদের প্রসঙ্গে। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে পর্তুগিজরা বঙ্গদেশে বাণিজ্যের অনুমতি পাওয়ার জন্য রাজদরবারে তদ্বির শুরু করে। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে দিয়েগো রেবেল্লো সপ্তগ্রামে পা রাখেন। তাঁর প্রতিনিধিরা যান গৌড়ে সুলতানের দরবারে। গৌড়ের সুলতান মামুদ শাহের সঙ্গে তখন আফগান নৃপতি শের শাহের প্রবল বচসা চলছে। মামুদ শাহ যুদ্ধের আশঙ্কায় মিত্রশক্তি খুঁজছিলেন। কাজেই দিয়েগো রেবেল্লোর প্রতিনিধি মার্টিন আফোন্সো রাজদরবারে বেশ খাতির পেলেন। পরবর্তীকালে যুদ্ধে মামুদ শাহের পক্ষে পর্তুগিজরা বেশ বীরত্ব দেখালেও শেষ অবধি মামুদ শাহকে শত্রুপক্ষের শর্ত অনুযায়ী শান্তিচুক্তিতে সই করতে বাধ্য হতে হয়। কিছুদিন পরেই অবশ্য শের শাহের আক্রমণে মামুদ শাহ গৌড় ছাড়া হন। দিল্লিতে হুমায়ুন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। শের শাহ দিল্লি ও বাংলার দখল নেন। এতে অবশ্য পর্তুগিজদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। মামুদ শাহ পর্তুগিজদের সমর্থন নিশ্চিত করতে তাঁদের চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে কারখানা বা আড়ত তৈরির অনুমতি দিয়েছিলেন। এই সুযোগে পর্তুগিজরা শুল্ক ভবন তৈরি করেন সপ্তগ্রামে।[৪৩] ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সপ্তগ্রাম পর্তুগিজ বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। পর্তুগিজ জবানিতে সপ্তগ্রাম পরিচিত ছিল 'পোর্তো পিকুয়েনো' নামে। পর্তুগিজরা যেসময় থেকে সপ্তগ্রামে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

---

[42] পঞ্চানন মণ্ডল(সম্পা.), *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, পৃ.৩০৭

[৪৩] Jadunath Sarkar(ed.), *The History of Bengal Volume II Muslim Period*, Delhi: B.R.Publishing Corporation, Reprint, 2003, p.357

করছিলেন, তখন সরস্বতীর প্রবাহ নাব্যতা হারাতে শুরু করেছে। ১৫১২-১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত বিবরণীতে টোমে পিরেস লিখেছিলেন—

> The Other port is Satgaon (*Sadegam*) over against Orissa. It has a good port; it has a good entrance.[88]

অথচ বছর কুড়ি পরে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে ডা বারোস লক্ষ করেছিলেন সপ্তগ্রাম বন্দর জাহাজ ঢোকা-বেরোনোর পক্ষে ঠিক অনুকূল নয়। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে বড়ো জাহাজের পক্ষে সপ্তগ্রামে ঢোকা মুশকিল হচ্ছিল।[৮৫] বন্দর হিসাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করলেও সপ্তগ্রামের তখনও বেশ রমরমা। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে সিজার ফ্রেডরিক সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে লেখেন—প্রতি বছর তিরিশ-পঁয়তিরিশটা জাহাজ সপ্তগ্রামে নানা পণ্যদ্রব্য নিয়ে ভিড় জমায়। ফ্রেডরিকের মনে হয়েছিল সপ্তগ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত শহর।[৮৬] কী ধরনের পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হত এই বন্দর থেকে? বাংলা থেকে সমুদ্রবাণিজ্যে রপ্তানি হত মূলত চাল প্রভৃতি খাদ্যশস্য, চিনি, নানা ধরনের কাপড়। আমদানি হত ঘোড়া, নানা মূল্যবান রত্ন, মশলা ইত্যাদি।[৮৭] ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে এসেছিলেন র‍্যালফ ফিচও। তিনি নুন, আফিম, হিং, কার্পেট বোঝাই একশো আশিটি নৌকা সহযোগে আগ্রা থেকে সপ্তগ্রামের দিকে এসেছিলেন। ফ্রেডরিকের মতোই ফিচেরও মনে হয়েছিল এই বন্দরের প্রধান বণিক মুসলমানরা।[৮৮] প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, সপ্তগ্রাম বন্দরের রপ্তানি-আমদানি পণ্যের সঙ্গে মিল ছিল বাংলার অন্য বন্দরগুলিরও। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের পর্যটক ভারথেমা 'বেঙ্গালা'র কথা বলেছেন। বেঙ্গালা থেকেও রপ্তানি হত আদা, চিনি,

---

88 Armando Cortesao(tr.), *The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Francisco Rodrigues*, London: The Haklyut Society, [], 1944, p.91

৮৫ Sushil Chaudhury, *Companies, Commerce and Merchants*, Delhi: Manohar, 1st Published, 2015, p.3

৮৬ D.G.Crawford, 'Satgaon and Tribeni', Bengal Past & Present, Vol. III, No.1, Serial No.7, January-March, 1909, p.18

৮৭ সুশীল চৌধুরী, *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য*, পৃ.৩৩, ৪০-৪১

৮৮ William Foster(ed.), *Early Travels in India 1583-1619*, London: Oxford University Press, 1st Edition, 1921, p.18

সুতির বস্ত্র। এসব আমদানি-রপ্তানিতে বেঙ্গালা বন্দরে লাভের কড়ি আসছিল নিশ্চয়। ভারথেমা বেঙ্গালার ধনী বণিকদের কথা বলেছেন।[৪৯] বোঝা যাচ্ছে, মূলত এগুলিই বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্য পণ্য। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে রচিত বিবরণে বারবোসা জানিয়েছেন বাংলার চিনি মালাবার ইত্যাদি অঞ্চলে বিক্রি করে বিপুল লাভ হত।[৫০] সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন বঙ্গদেশে ডাচদের আধিপত্য তৈরি হচ্ছে তখনও বাংলার চিনি সিংহল, পারস্য, বাটাভিয়া, হল্যান্ডে রপ্তানি হত। পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও পশ্চিমবঙ্গের হুগলি ছিল চিনির প্রধান বাজার।[৫১] প্রাক-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই বস্ত্র উৎপাদনে বাংলার খ্যাতি ছিল। তুর্কি বিজয়ের পর বাংলার বস্ত্র উৎপাদনের মাত্রা ও বৈচিত্র বৃদ্ধি পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈনিকদের নজর পড়েছিল বাংলার বস্ত্রশিল্পে। ভারথেমার বিবরণ থেকেও বাংলার বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধির কথা জানা যাচ্ছে।[৫২] বস্ত্রশিল্পের অন্যতম ঘাঁটি ছিল সপ্তগ্রাম।[৫৩] বাংলার বস্ত্র নিয়মিত লিসবনে রপ্তানি করা হত। এমনকি, পর্তুগিজরা যখন ব্রাজিলের পারায় বস্ত্র উৎপাদন শুরু করতে চান, তখন বাংলার বস্ত্রশিল্পীদের ব্রাজিলে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়েছিল।[৫৪] বাংলার বাণিজ্যের এই বিস্তার খেয়াল রাখলে বাঙালি বণিকদের সমৃদ্ধির আন্দাজ পাওয়া যায়।

বন্দর হিসাবে সমস্যাবহুল হতে শুরু করলেও বাজার হিসাবে সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি ষোড়শ শতাব্দীতে মোটের উপর অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ল্য ব্লঁ সপ্তগ্রামে এসেছিলেন।

---

[৪৯] John Winter Jones(tr.), *The Travels of Ludovico Di Varthema*, London: The Haklyut Society, [], 1863, p.212

[৫০] Mansel Longworth Dames(tr.), *The Book of Duarte Barbosa*, Vol.II, London: The Haklyut Society, [], [], pp.146-147

[৫১] Anjali Chatterjee, *Bengal in the Reign of Aurangzib 1658-1707*, Calcutta: Progressive Publishers, 1st Edition, 1967, pp.81-82

[৫২] Reena Bhaduri, *Social Formation in Medieval Bengal*, Kolkata: Bibhasa, 1st published, 2001, p.176

[৫৩] Syed Ejaz Hussain, *The Bengal Sultanate: Politics, Economy and Coins(AD 1205-1576)*, New Delhi: Manohar, 1st Published, 2003, p.261

[৫৪] Pius Malekandathil, *The Mughals, The Portuguese and the Indian Ocean*, Delhi: Primus Books, Reprint, 2014, pp.191-192

মন্দিরে পুজো হতে দেখেছেন, বাজারে ঘুরেছেন। কিন্তু বন্দরের কথা তিনি বলেননি। মুকুন্দের রচনাতে দেখা যায় ধনপতি ত্রিবেণীতে নৌকা বেঁধে সপ্তগ্রামে বাজার করতে আসছে।[৫৫] ১৫৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দ্বিজ মাধব *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* রচনা করেন। দ্বিজ মাধবের রচনাতেও দেখা যাচ্ছে, ধনপতি সপ্তগ্রামে আসছেন; কিন্তু নৌকা রাখছেন ত্রিবেণীতে।[৫৬] *মনসামঙ্গল* ও *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের অধিকাংশ কবিরাই বণিকদের বাণিজ্যপথে সপ্তগ্রামের উল্লেখ করেছেন। বিজয় গুপ্ত প্রমুখ পূর্ববঙ্গের কবিরা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা বাহিত বাণিজ্যপথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবে যাত্রাপথের বিশদ বিবরণ দেননি[৫৭]; কিন্তু পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন কবি, যেমন—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি নারায়ণ দেবের *পদ্মাপুরাণ*-এ চাঁদ সওদাগর সপ্তগ্রাম হয়েই বাণিজ্যযাত্রা করেছিলেন।[৫৮] বিপ্রদাসের রচনায় চাঁদ সওদাগর সপ্তগ্রামে দু'দিন যাত্রাবিরতির কথা পাচ্ছি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-এও দেখছি ধনপতি দু'দিন যাত্রাবিরতি করেছে সপ্তগ্রামে। সপ্তগ্রামের মতো বাণিজ্যকেন্দ্রে সওদাগরদের দু'দিনের যাত্রাবিরতি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ—

> রাঢ়া মাঝে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম। দিনা দুই তথি সাধু করিল বিশ্রাম।
>
> কিন্যা বেচ্যা নানা ধন নায়ে দিল ভরা। বাহ বাহ বল্যা ঘন নায়ে হৈল ত্বরা।।[৫৯]

বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সপ্তগ্রামের মহিমা যতই অটুট থাকুক না কেন, পতুর্গিজদের বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল নতুন বন্দর। বড়ো জাহাজকে বেতোড়ে নোঙর করে আসতে হত

---

[৫৫] অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, পৃ.১৫৫-১৫৭

[৫৬] সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য(সম্পা.), *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫, পৃ.২২০

[৫৭] পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ(সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান-৩২*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ.১৫৬

[৫৮] তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, *সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ*, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃ.১৮৯

[৫৯] পঞ্চানন মণ্ডল(সম্পা.), *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, পৃ.২৭৫

সপ্তগ্রামে। এই অবস্থায় পর্তুগিজদের নজর পড়েছিল সপ্তগ্রাম সংলগ্ন হুগলির দিকে। হুগলিতে পর্তুগিজ আধিপত্য তৈরি হওয়ার সঙ্গে মুঘল সম্রাট আকবরের সরাসরি যোগাযোগ আছে। ইবাদতখানায় আকবর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করছিলেন। আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকরাও। এই আলোচনা সভায় পর্তুগিজদের অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। খেয়াল রাখা দরকার, বিশ্বের সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিরা কিন্তু আকবরের ইবাদতখানায় ডাক পাননি। চিনের কনফুসিয়াস মতাবলম্বী, জাপানের শিন্টো ধর্মের প্রতিনিধি বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠীর ধর্মপ্রচারকদের এই সভায় কখনও দেখা যায়নি। আকবরের অধীনস্থ ভূখণ্ডে যেসমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য বা আর্থ-রাজনৈতিক আধিপত্য আছে—সেই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গেই আকবর বিশেষভাবে আলোচনায় রত ছিলেন। বঙ্গদেশ এবং গুজরাট জয়ের পর আকবর বিশেষভাবে পর্তুগিজদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন অনুভব করেন। গুজরাট এবং বঙ্গদেশের উপকূলে সমুদ্রবাণিজ্যে পর্তুগিজদের আধিপত্য ছিল। এই উপকূলগুলি ধরে মুঘল শাসনাধীন অঞ্চলে নানা মূল্যবান দ্রব্য প্রবেশ করছিল। এই অঞ্চলে আধিপত্য রাখা অর্থনৈতিক কারণে মুঘল সম্রাটের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। এই অঞ্চলে আধিপত্য ধরে রাখতে হলে পর্তুগিজদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পাশে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। পর্তুগিজদের এককালীন পৃষ্ঠপোষক বিজয়নগর রাজশক্তির পতনের পর তাঁদেরও একটি প্রতাপশালী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।[৬০] এই সুবাদে পর্তুগিজরা আকবরের থেকে একটি ফরমান পেয়েছিলেন। ফরমান লাভের পরপরই তাঁরা ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের কারখানা ও শুল্কভবন সপ্তগ্রাম থেকে হুগলিতে সরিয়ে নিয়ে যান। আকবরও মনে করেছিলেন পর্তুগিজদের

[৬০] Pius Malekandathil, *The Mughals, The Portuguese and the Indian Ocean*, pp.13-20

সামরিক শক্তি এই অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে।[৬১] পর্তুগিজদের অধীনে হুগলি দ্রুত উন্নতি করতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে র‍্যালফ ফিচ লক্ষ করেছিলেন হুগলি পর্তুগিজদের দুর্গ। ১৫৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত *আইন-ই-আকবরি* স্পষ্টই বলে দেয় সপ্তগ্রামের চেয়ে হুগলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।[৬২] ধীরে ধীরে সপ্তগ্রামের জায়গা নিয়ে নিল হুগলি। হুগলিতেই পর্তুগিজরা প্রথম স্থায়ী বসতি তৈরি করে। আগে পর্তুগিজরা বর্ষাকালে বাংলায় জিনিসপত্র কেনাবেচা করে বর্ষা শেষ হলে ফিরে যেত। এবার হুগলিতে বসতি নির্মাণ করে এক-দুই বছরের জন্য থাকা শুরু হয়।[৬৩] ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হুগলির পর্তুগিজরা মুঘলদের ১ লক্ষ টাকা শুল্ক দিতেন।[৬৪] হুগলির সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কারণে ধনাঢ্য বণিকরাও উঠে এলেন এই নতুন বন্দরে।[৬৫] হুগলির সমৃদ্ধির যুগেও শহর এবং বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পুরনো মর্যাদা কিছুটা হলেও ধরে রেখেছিল। সেবাস্তিয়ান মানরিক ১৬২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রামকে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেই দেখেছিলেন। সপ্তদশ শতকের আরেক পর্যটক পিটার মুণ্ডিও লক্ষ করেছিলেন বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে সপ্তগ্রামের যোগাযোগ।[৬৬]

প্রশ্ন হচ্ছে, সপ্তগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্যপ্রক্রিয়ায় বাঙালি বণিকের ভূমিকা কী ছিল? সুবর্ণবণিক এবং অন্যান্য বাঙালি বণিকরা এই বন্দর থেকে বিদেশে বাণিজ্যে গেছেন বলে খুব একটা জানা যায় না। তাঁরা ঠিক জাহাজি বণিকও নন। ফলে জাহাজ ভাড়া খাটিয়ে আয় করার সুযোগ নেই। তাহলে বাঙালি বণিকদের অর্থের উৎস কী? অশীন দাশগুপ্তের রচনার সূত্রে আমরা জানি, সমুদ্রবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নথিপত্রের অধিকাংশই বিদেশি

---

[৬১] Jadunath Sarkar(ed.), *The History of Bengal Volume II Muslim Period*, pp.365-366

[৬২] Sushil Chaudhury, *Companies, Commerce and Merchants*, p.7

[৬৩] শানজিদ অর্ণব(অনূদিত), *হিস্টরি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল,* ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ.৬৭

[৬৪] Pius Malekandathil, *The Mughals, The Portuguese and the Indian Ocean*, p.187

[৬৫] ত্রিপুরা বসু, 'প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর', সমকালীন, আষাঢ়, ১৩৮০, পৃ.১২১

[৬৬] Syed Ejaz Hussain, *The Bengal Sultanate: Politics, Economy and Coins(AD 1205-1576)*, pp.250-251

কোম্পানির নথিপত্র বা বিদেশি পর্যটকের বয়ান হওয়ায় ভারতীয় সওদাগরদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য সেখানে কম। প্রাপ্ত তথ্যসূত্রগুলোর উপর ভরসা করে, কিছুটা অনুমান করে এক্ষেত্রে ভারতীয় বণিকদের অবস্থা বুঝে নিতে হয়।[৬৭] এই পদ্ধতিতেই বাঙালি বণিকদের তথা সুবর্ণবণিকদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা দরকার।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে বঙ্গদেশের সমুদ্রবাণিজ্য অনেকটাই চলে গিয়েছিল পর্তুগিজদের হাতে। হুগলিতে প্রায় স্বাধীনভাবে পর্তুগিজরা রাজ্যপাট চালাচ্ছিল। পর্তুগিজ সরকার ও সিংহলের পর্তুগিজ প্রতিনিধির কাছে তারা নামমাত্র দায়বদ্ধ। ভারতীয় বণিক, বিশেষত বাঙালি বণিকদের ভূমিকা ছিল মূলত মধ্যসত্ত্বভোগী বা দালালের।[৬৮] বঙ্গদেশে পর্তুগিজদের মুনাফায় সাহায্য করেছিল এই মধ্যসত্ত্বভোগীরা। এই মধ্যসত্ত্বভোগীরাই বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমনকি আগ্রায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন।[৬৯] সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন বঙ্গদেশে ডাচদের আধিপত্য তৈরি হল, তখনও বাঙালি বণিকদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। পরাক্রমশালী নৌশক্তির জোরে ডাচরা অনেকসময়ই ভারতীয় বণিকদের বহির্বাণিজ্যে বাধা দিতেন। সমুদ্রবাণিজ্য করার জন্য ডাচদের কাছ থেকে ভারতীয় বণিকদের ছাড়পত্র নিতে হত। নানাবিধ রাজনৈতিক কারণে ডাচরা অনেকসময়ই ভারতীয় বণিকদের জাহাজগুলির বাণিজ্যে বিধিনিষেধ আরোপ করতেন। সমুদ্রবাণিজ্যের বদলে বঙ্গদেশের বণিকদের অনেকবেশি মনোযোগী হতে হয়েছিল উপকূলবর্তী বাণিজ্যে।[৭০] এই পর্বে বঙ্গদেশে যেসব জাহাজি বণিক ছিলেন তাঁরা মূলত মুসলমান, 'হিন্দু',

---

[৬৭] অশীন দাশগুপ্ত, *প্রবন্ধসমগ্র*, কলকাতা: আনন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ.৪৩৪-৪৩৫

[৬৮] Tapan Raychaudhuri, *Bengal Under Akbar and Jahangir*, Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1966, p. 95, 103

[৬৯] Amiya Kumar Banerji, *West Bengal District Gazetteers Hooghly*, Calcutta: Government of West Bengal, 1st Published, 1972, p.114

[৭০] Om Prakash, 'The European Trading Companies and the Merchants of Bengal 1650-1725, The Indian Economic and Social History Review, 1, 1964, p.47

আর্মেনিয়ান। মুসলিম বণিকরা সংখ্যায় 'হিন্দু' বণিকদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। 'হিন্দু' বণিকরা মূলত তাঁদের বাণিজ্য পরিচালনা করতেন বালেশ্বর বন্দর থেকে। বালেশ্বরের 'হিন্দু' বণিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন গুজরাটি শাহরা। জাহাজি বাঙালি বণিকের দেখা মিলত না—এমন নয়। কল্যাণ রায় ও যদু রায় নামে দুজন বাঙালি বণিকের নাম এপ্রসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। যদিও, বাঙালিরা 'হিন্দু' বণিককুলে ছিলেন নিতান্তই সংখ্যালঘু। সপ্তদশ শতাব্দীর একদম শেষে বেণী দাস ও ভবানী দাস যৌথভাবে হুগলি থেকে কালিকটে একটি জাহাজ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, এসব উদাহরণ সামান্যই।[৭১] এথেকে মনে করা চলে, বাঙালি বণিকদের মূল ভূমিকা ছিল দালাল বা মধ্যসত্ত্বভোগীর। ঠিক কী ছিল দালালদের ভূমিকা? জাহাজ বিদেশ থেকে এসে বন্দরে পা রাখা মাত্রই দালালের কাজ শুরু হয়ে যেত। কোন জিনিস কীভাবে বিক্রি করা হবে তা দালালই একপ্রকার ঠিক করে দিতেন। বন্দরে ঢোকা থেকে শুরু করে টাকা ধার করা—সবকাজেই দালালকে দরকার। স্থানীয় দালাল ছাড়া বিদেশি কোম্পানির কাজ চালানোও মুশকিল। দালালদের মধ্যেও আবার রকমফের ছিল। প্রধান দালাল, স্থানীয় দালাল ইত্যাদি। প্রধান দালালের গুরুত্বই ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাঁকেও অনেকসময় তাকিয়ে থাকতে হত স্থানীয় দালালের দিকে। গ্রামের স্থানীয় দালালের সূত্রেই প্রধান দালাল মালপত্র কিনে এনে বেচতেন বিদেশি বণিকের কাছে।[৭২] বাঙালি বণিকরা যে ইউরোপীয় কোম্পানির দালাল হিসাবে কাজ করছিলেন তার প্রমাণ আছে বিদেশি নথিপত্রেও। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত কোম্পানির ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দের একটি কাগজে দেখা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন গে ও ক্যাম্পবেল সাহবের মাধ্যমে।[৭৩] দালালদের প্রতিপত্তি

---

[৭১] Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal 1630-1720*, Delhi: Manohar, Indian Edition, 2012, p.33

[৭২] অশীন দাশগুপ্ত, *প্রবন্ধসমগ্র*, পৃ.৪৪৩-৪৪৫

[৭৩] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, বর্ষ ২৯ সংখ্যা.৩, পৃ.১১০

কেমন ছিল তারও একটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে সমকালীন নথি থেকে। *আইন-ই-আকবরি* জানাচ্ছে, স্থানীয় বাজারে বেচাকেনা চলত দালালের তত্ত্বধানে। তার নজর এড়িয়ে কিছুই করার জো ছিল না। টাভার্নিয়ের তাঁর স্বদেশবাসীদের মুসলিম দালালদের বদলে স্থানীয় মূর্তিপূজক দালাল নির্বাচন করার উপদেশ দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে, দালালির কারবারে 'হিন্দু'রা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন। জাহাজ বন্দরে ভিড়লেই দালালরা যে হাজির হয়ে যায়—সেকথা লিখেছেন সিজার ফ্রেডরিকও।[৭৪] সুতরাং, জাহাজি বণিক হিসাবে প্রসিদ্ধ না হলেও দালাল হিসাবে বাঙালি বণিকেরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। ভালো অর্থও আসছিল তাঁদের হাতে। একটু আগে বঙ্গদেশের বিভিন্ন বন্দর থেকে রপ্তানি-আমদানিকৃত পণ্যের ঈষৎ বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলাম। আসলে রপ্তানি- আমদানির পণ্যের তালিকার বহর দেখলে দালালের কর্মক্ষেত্রের ব্যাপকতা বোঝা যেতে পারে। আন্দাজ পাওয়া যাবে অর্থ রোজগারের সম্ভাবনারও। মুকুন্দ যে বলেছিলেন—সপ্তগ্রামের বণিক ঘরে বসেই সুখ, মোক্ষ পায়, সেকথার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। অর্থাৎ, সপ্তগ্রামী বণিকসমাজের কারবার মুখ্যত বহির্বাণিজ্য নয়; বরং দালালি। বাসু ঘোষের কড়চাতেও সপ্তগ্রামের বাঙালি বণিকগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির বিবরণ আছে। সংগতভাবে অনুমান করা চলে, দালালিই মুখ্যত এই সমৃদ্ধির উৎস। অনিরুদ্ধ রায় মনে করেছেন, সুবর্ণবণিক সমাজের কুলজিতে সুবর্ণবণিক সমাজের মধ্যে কর্জনা সমাজ ও সপ্তগ্রামী সমাজ নামে দুটো ভাগ তৈরি হয়ে গেল—তার কারণ সম্ভবত পর্তুগিজদের সহায়তা প্রদানকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য।[৭৫] এই সহায়তার অর্থ সম্ভবত দালালি। একটা উদাহরণ দিলে দালালির সুবাদে অর্জিত সমৃদ্ধি ও প্রভাবের কথা বোঝানো যাবে। একবার সুবর্ণবণিকদের কর্জনা সমাজের একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ৭৯২ ঘর সুবর্ণবণিকের মধ্যে ২৯০ ঘর

---

[৭৪] Syed Ali Nadem Rezavi, 'Urban Middle Classes in Mughal India', Unpublished Ph.D. thesis submitted at Aligarh Muslim University, 2006, pp.71-73

[৭৫] Aniruddha Roy, 'Morphology of Medieval Saptagram or Satgaon', p.20

সুবর্ণবণিক উপস্থিত হননি। এই ২৯০ ঘর সুবর্ণবণিককে নিয়ে তৈরি হল সপ্তগ্রামী সুবর্ণবণিক সমাজ। নবার্জিত প্রতিপত্তির জোরে সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকদের যে অহংকার তৈরি হয়েছিল— সেটাই এই পৃথক সমাজ গঠনের কারণ বলে অনেকে মনে করেন। সপ্তগ্রামী বণিকসমাজের প্রভাবের চিহ্ন পাওয়া যাবে আরেকভাবেও। পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ছাড়িয়ে পুরুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সুবর্ণবণিকরা সপ্তগ্রামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেন।[৭৬] ঠিক এই প্রেক্ষিতে সপ্তগ্রামের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন ও সুবর্ণবণিকের সামজিক সচলতাকে বোঝা দরকার। দালালির ফলে অর্জিত অর্থের পুঁজিকে ভিত্তি করে সুবর্ণবণিকরা জাতিকাঠামোতে উঠতে চাইছিলেন। ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার নিরিখে জাতে ওঠার প্রবণতা খুব স্বাভাবিক। তবে দালালির কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকলে 'জাতে ওঠা'র চেষ্টা আরও প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। দালাল হিসেবে সুবর্ণবণিকদের যোগ রাখতে হচ্ছিল দেশীয় পণ্য উৎপাদক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে। জাতপাত ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদানপ্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'নিচু' জাতের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদানপ্রদানে অনেক গোষ্ঠীরই কুণ্ঠা থাকতে পারে। তাতে দালালির কারবারে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা। আরেকটি দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। ধর্মান্তরণকারী হিসাবে পর্তুগিজদের বেশ নামডাক ছিল। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই গোয়াতে স্থানীয় বাসিন্দাদের পর্তুগিজরা ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করেন। একই সময়পর্বে কেরলে উচ্চবর্ণের মধ্যে ধর্মান্তরণের ক্ষেত্রে খুব একটা সাড়া না পেলেও, 'নিম্ন'বর্ণের মানুষ অর্থনৈতিক কারণে ও সামাজিক সচলতার অভিপ্রায়ে পর্তুগিজদের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।[৭৭] কিন্তু, এহেন পর্তুগিজদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেও বঙ্গদেশের সুবর্ণবণিকরা ধর্মান্তরিত হওয়ার

---

[৭৬] মনস্বিতা সান্যাল, 'সপ্তগ্রাম(আঃ ১৩০০-১৬৩২), ঐতিহাসিক: প্রবন্ধ সংকলন, ৪, মাঘ, ১৩৮৩, পৃ.২০-২১

[৭৭] https://books.google.co.in/books?id=39HVDwAAQBAJ&pg=PT190&lpg=PT190&dq=portuguese+proselytization+in+kerala&source=bl&ots=ALbT0MOAxH&sig=ACfU3U1wvGTEjdQMb0aV0Zb4ktdzw9O1jQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjh8tvkjszxAhWrH7cAHcY5ALQQ6AEwFnoECDAQAg#v=onepage&q=portuguese%20proselytization%20in%20kerala&f=false, accessed on 01.07.2021

চেষ্টা করেননি। তাঁরা চেষ্টা করেননি ধর্মান্তরণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য জাতিকাঠামোয় তাঁদের ঘৃণিত অবস্থান পরিত্যাগ করতে। বরং, ধর্মান্তরণের বদলে তাঁরা 'জাতে উঠতে' আগ্রহী। ধর্মান্তরণে এই অনাগ্রহের সঙ্গেও অর্থনৈতিক কারণটি জড়িত। প্রথমত, 'বিধর্মী' মানুষ হিসাবে মধ্যস্বত্বভোগীর পক্ষে দেশীয় 'হিন্দু' জনগণের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে কিছুটা জটিলতা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, টাভার্নিয়েরের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারছি, বিদেশি বণিকরা দালাল হিসাবে 'হিন্দু'দের বেশি পছন্দ করতেন। সম্ভবত, হিন্দুরা 'নিরীহ' এবং দেশীয় উৎপাদক গোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে বিদেশি বণিকের মুনাফায় সাহায্য করতে পারবে—এমন একটা বিশ্বাস ক্রিয়াশীল ছিল। এসব কারণে, ধর্মান্তরণের বদলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যন্তরীণ জাতিকাঠামোয় ওঠার চেষ্টা করলে 'জল-অচল' সুবর্ণবণিকদের অর্থনৈতিক কারবার অক্ষুণ্ণ ও গতিপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। জাতে 'উঠতে' গেলে আবার ধর্মসম্প্রদায়ের অনুমোদন জরুরি। সেকারণে সুবর্ণবণিকদের প্রয়োজন হয়েছিল নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর আশ্রয়। অন্যান্য অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের মতোই নিত্যানন্দ গোষ্ঠীরও প্রয়োজন ছিল অর্থবান গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা। অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে একারণে ধর্মীয় ইতিহাস জুড়ে যায়। অর্থনীতি, ধর্ম এবং জাতপাতের সম্পর্ককে আমরা পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে বুঝতে চাইব মূলত ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের সাক্ষ্যে।

৩.৩ নিত্যানন্দের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও সপ্তগ্রামী সুবর্ণবণিক সমাজ :

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পর বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন নিত্যানন্দ। প্রথম যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম 'নিচুজাতি'র মধ্যে প্রবেশ করেনি। একটি তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ৪৯০ জন শিষ্যের মধ্যে

ব্রাহ্মণ ২৩৯ জন, কায়স্থ ও বৈশ্য যথাক্রমে ২৯ ও ৩৭ জন।[৭৮] সন্ন্যাসগ্রহণের পর চৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থান ও চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর 'নিচুজাতি'র মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার বাড়ে। এই প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল নিত্যানন্দের। নিত্যানন্দই জল-অচল সুবর্ণবণিকদের দীক্ষা দিয়ে 'উদ্ধার' করেছিলেন। সপ্তগ্রাম ও সংলগ্ন অঞ্চলে, মোটের উপর হুগলি জেলাতেই বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের নিবিড় যোগ। রিজলির ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী হুগলি জেলার ৮২ টি জাতি ও উপজাতির মধ্যে ৪০ টি জাতি ও উপজাতি সম্পূর্ণ বা আংশিক বৈষ্ণব। রিজলির তালিকাভুক্ত বৈষ্ণব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তাম্বুলিবণিকদের উপস্থিতি স্পষ্ট।[৭৯] বস্ত্রশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র সপ্তগ্রাম সংলগ্ন অঞ্চলের বিত্তশালী তাঁতিদের দীক্ষা দিয়েছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরামদাস। খেয়াল রাখা দরকার, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত নথিটিতে যে দু'জন বাঙালিকে আমরা বাণিজ্যিক চুক্তিপত্রে সই করতে দেখছি তাঁদের নামেও বৈষ্ণব অনুষঙ্গ স্পষ্ট—শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস। বণিকসমাজের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের যোগ নেহাত আপতিক নয়। পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক নিশ্চয় এর সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন বৈষ্ণব গুরুদেরই বিত্তশালী শিষ্য ছিল। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বিষ্ণুপুর রাজ পরিবার শ্রীনিবাসের বিয়ে ও মায়ের শ্রাদ্ধে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছিল। এই বিপুল অর্থব্যয়ে শ্রীনিবাস কোন আপত্তির কারণ দেখেননি। *চৈতন্য ভাগবত*-এর বয়ান অনুযায়ী নিত্যানন্দ রাজসিক জীবনযাত্রা করতেন। বৈষ্ণব গুরু নরোত্তমেরও প্রচুর বিত্তশালী শিষ্য ছিল।[৮০]

---

[৭৮] অর্জুনদেব সেনশর্মা, *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ*, পৃ.১৬৮

[৭৯] সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হুগলী জেলায় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন ১৪৮৬-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অপ্রকাশিত পিএইচডি গবেষণা সন্দর্ভ, ১৯৯৯, পৃ.১৩-১৫

[৮০] প্রভাতকুমার সাহা, 'বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজপরিবার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম', ঐতিহাসিক:প্রবন্ধ সংকলন, ৬, জুলাই ১৯৭৮, পৃ.১৮

বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য ভাগবত*-এর সূত্রে জানা যাচ্ছে নিত্যানন্দ কিছুদিন খড়দহে কাটিয়ে পার্ষদ সহ সপ্তগ্রামে আসেন। চৈতন্য-নিত্যানন্দ পরিকর বাসু ঘোষের নামে প্রচলিত কড়চা থেকেও নিত্যানন্দের সপ্তগ্রামে আগমন ও সুবর্ণবণিক সমাজে ভক্তি প্রচারের বিশদ খবরাখবর পাওয়া যায়। বাসু ঘোষ বা বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যদেবের পার্ষদ। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে পুরীতে চলে গেলে বাসুদেব ঘোষ ও তাঁর দুই ভাই—গোবিন্দ ও মাধব নিত্যানন্দের সঙ্গেই থাকতেন।[৮১] *বাসু ঘোষের কড়চা*-য় দেখা যাচ্ছে ত্রিবেণী ছাড়িয়ে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে পা রাখলেন। তীর্থ হিসাবে সপ্তগ্রাম ইতিমধ্যেই বেশ পরিচিত। নানা জাতির বাস সপ্তগ্রামে; বণিক-সওদাগররাও তার মধ্যে আছেন। বণিকদের আর্থিক সমৃদ্ধি ও দেব-দ্বিজে ভক্তির কথা আছে এই কড়চায়—

যত বণিক সওদাগর কমলার কিঙ্কর

ভারে ভারে তঁখা ঘরে তোলে।

দেব দ্বিজে সদা ভক্তি দান করে যথাশক্তি

তেঞি লোক সাধু সাধু বলে।।[৮২]

কড়চা অনুসারে, নিত্যানন্দ উদ্ধারণ দত্ত (পূর্বনাম-দিবাকর দত্ত)কে বলছেন—তাঁকে ‘উদ্ধার’ করতেই নিত্যানন্দের গৌড়ে আসা।[৮৩] ‘ভারে ভারে তঁখা ঘরে তোলা’ বণিকের যথাশক্তি দান করার ক্ষমতা আর বণিককুলকে উদ্ধার করতে নিত্যানন্দের গৌড়ে আসা—এ দু’য়ের কি সম্পর্ক আছে? বস্তুত, কেবল উদ্ধারণ দত্ত নয়; সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক সমাজই নিত্যানন্দের কাছে

---

[৮১] হরিদাস দাস, *শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন*, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৩৮

[৮২] নরেন্দ্রনাথ লাহা, *সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি(২য় খণ্ড)*, কলিকাতা: কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪১, পৃ.২০৭

[৮৩] তদেব, পৃ.২১১

নিজেদের সঁপে দিল। *চৈতন্য ভাগবত*-কার লিখেছেন—সপ্তগ্রামের বণিককুল নিত্যানন্দের শরণাগত হয়ে পড়ল—

বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।

সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ।।

ভক্ত বৃন্দাবন দাসের মনে হয়েছে নিত্যানন্দর অপার মহিমাতেই বণিককুল 'নিস্তার' পেল।[৮৪] ভক্তিসাহিত্যের পরিভাষায় 'উদ্ধার', 'নিস্তার' শব্দগুলি খুব চেনা। ঈশ্বর বা ঈশ্বরের মানবমূর্তি অবতার বা গুরু ভক্তকে কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তির পথে নিয়ে এসে মুক্তির পথ দেখালেন। সোজা কথায়, এই 'উদ্ধার' বা 'নিস্তার' এর তাৎপর্য। কিন্তু ঘটনাভেদে এই চেনা তাৎপর্যের বাইরেও কি অন্য অর্থ তৈরি হয়? এখানে আবার বাসু ঘোষের নামে প্রচলিত কড়চার দিকে তাকানো যাক। নিত্যানন্দ আলাপ-পরিচয় সাঙ্গ হলে উদ্ধারণ দত্তকে জানালেন—তিনি আজ উদ্ধারণের ঘরেই ভিক্ষাগ্রহণ করবেন। কৃতার্থ উদ্ধারণ নিত্যানন্দকে ভোগ সাজিয়ে দিতে প্রস্তুত। গুরুর প্রতি ভক্তের এ অতি স্বাভাবিক আচরণ। কিন্তু, আরেকটু পরেই কড়চা ভিক্ষান্ন গ্রহণের অন্য তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবে। সেপ্রসঙ্গে যাবার আগে দু'একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সাধারণভাবে সন্ন্যাসীর অন্নদোষ হয় না। তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমের বাইরের মানুষ; গৃহীর জন্য তৈরি করা শাস্ত্রনিয়ম সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এককথায় বর্ণাশ্রম সম্পর্কিত নিয়মকানুন মেনে চলার কোন দায় সন্ন্যাসীর নেই। 'নান্নদোষেণ মস্করী' শাস্ত্রবচন অনুসারে, সন্ন্যাসী বর্ণাশ্রমের নিয়মকানুন না মেনে যে কারো ঘরে এক পঙ্‌ক্তিতে অন্নগ্রহণ করতেই পারেন। সেদিক থেকে ঘটনাক্রম অনুযায়ী নিত্যানন্দ এখনো সন্ন্যাসী; যদিও কিছুকাল পরেই তাঁর বিবাহ হবে বসুধা ও জাহ্নবার সঙ্গে। উদ্ধারণ দত্ত জল-অনাচরণীয় সুবর্ণবণিক হলেও তাঁর ঘরে

---

[৮৪] সুকুমার সেন(সম্পা.), *চৈতন্যভাগবত*, নয়া দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ.২৬৬

অন্নগ্রহণে নিত্যানন্দের দোষ থাকার কথা নয়। তত্ত্বত এরকম হলেও বাস্তবে ব্যাপারটা আলাদা। বর্ণাশ্রম ধর্ম মানার দায় না থাকলেও সন্ন্যাসীরা সচরাচর বর্ণাশ্রমধর্ম মেনেই চলেন। নাথযোগী, কাপালিক বা পাশুপতরা বাদ দিলে বেশিরভাগ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের জাতিগত সংস্কার মেনে চলার; অন্নগ্রহণে বাছ-বিচার করার রেওয়াজ আছে।[৮৫] কড়চা বলছে, উদ্ধারণের ঘরে একদিন নিত্যানন্দের সঙ্গে তর্ক করতে এলেন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তর্কে বেলা গড়াল; নদীতে স্নান করতে গেলেন দু'জনে। নিত্যানন্দ নির্দেশ দিলেন উদ্ধারণকে দু'জনের জন্য খিচুড়ি রান্না করতে। উদ্ধারণকে অন্ন পরিবেশন করতে দেখে ব্রাহ্মণ হতবাক। উদ্ধারণের হাতের অন্ন খেলে তাঁর জাত যাবে। ব্রাহ্মণের মনের ভাব আঁচ করতে পেরে নিত্যানন্দ বললেন—সন্ন্যাসীর অন্নদোষ হয় না; উপরন্তু ভাগবত মতে, গুণ-কর্ম থেকেই জাতির উৎপত্তি। পরম ভক্ত উদ্ধারণ ভক্তিগুণে উচ্চজাতি পেয়েছে। এই ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণের মোটেই সন্তুষ্টি হয় না। উদ্ধারণের হাত থেকে পরিবেশনের হাতা ছুঁড়ে ফেলে দেন ব্রাহ্মণ; সেখান থেকেই জন্ম নেয় এক তরুলতা।[৮৬] অলৌকিকতায় শেষ হয় আখ্যান। যে সুবর্ণবণিকের ভাত খাওয়ায় ব্রাহ্মণ সমাজের এত সংকোচ; সেখানেই ভাত খেয়ে নিত্যানন্দ সত্যিই সুবর্ণবণিক সমাজকে একপ্রকার 'নিস্তার' করলেন বটে।

নিত্যানন্দের স্বর্ণবণিকের ঘরে অন্নগ্রহণ করা স্মার্ত সমাজের দৃষ্টিতে তো বটেই, এমনকি বৈষ্ণব সমাজের দৃষ্টিতেও একটু অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুযায়ী, বৈধী মার্গের ভক্তের বর্ণাশ্রমসম্মত নিয়ম মেনে চলারই কথা। রাগমার্গের ক্ষেত্রে অবশ্য বর্ণাশ্রমের নিয়ম কার্যকর নয়। চৈতন্যচরিতগুলিতে দেখা যায়, চৈতন্যদেব স্বয়ং সন্ন্যাসী হয়েও 'লোকশিক্ষা'র উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম মেনে চলেছেন। ব্রাহ্মণেতর জাতির বাড়িতে

---

[৮৫] Romila Thapar, *Ancient Indian Social History: Some Interpretations*, New Delhi: Orient Longman, 1st Published, 1978, p.75

[৮৬] নরেন্দ্রনাথ লাহা, *সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি(২য় খণ্ড)*, পৃ.২১৫-২১৭

চৈতন্যদেব অন্নগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় না। জগন্নাথক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে বিভিন্ন জাতির ভক্ত পঙ্‌ক্তিভোজনে বসেছেন বটে—কিন্তু তা মূলত মহাপ্রসাদের সম্মানার্থে। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে চৈতন্যদেবের সময়েও বিভিন্ন জাতির লোক এক সারিতে খেতে বসেছেন—এমন নজির নেই। *চৈতন্যচরিতামৃত*- এ বৈষ্ণবসমাজের পঙ্‌ক্তিভোজনে হরিদাসকে দূরে বসে থাকতে দেখা যায়। নিত্যানন্দ নিজে উদ্ধারণের ঘরে ভাত খেলেও বিবাহের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বর্ণাশ্রমধর্মকে মেনে চলেছেন। স্বজাতি, স্বশ্রেণির কন্যাই নিত্যানন্দের স্ত্রী।[৮৭] পরবর্তীকালেও কন্যা গঙ্গাদেবীর বিয়ের জন্য কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান পেতে যথেষ্ট বেগ পাওয়ায় শেষ অবধি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ পরিবার মেয়ের বিয়ে দেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাধব আচার্যের সঙ্গে। রাঢ়ী-বারেন্দ্রীতে সাধারণভাবে বিয়ে হয় না। আবার, মাধব আচার্য নিত্যানন্দের শিষ্য; সুতরাং গঙ্গাদেবী-মাধব আচার্য গুরু-পরম্পরামতে ভাই-বোন। এদিক থেকে বিয়েতে স্মার্ত নিয়মের উল্লঙ্ঘন হয়েছিল।[৮৮] তথাপি, কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে কন্যাদানের চেষ্টাটি লক্ষণীয়। বর্ণাশ্রম মেনে চলা বৈষ্ণবসমাজের কাছে উদ্ধারণ দত্তের হাতে নিত্যানন্দের অন্নগ্রহণ একটু অস্বাভাবিক বটে। নিত্যানন্দ এপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসীর অন্নদোষ না থাকার কথা, গুণ-কর্মের নিরিখে জাতির উৎপত্তির কথা বললেও দেখা যাচ্ছে, বারংবার তিনি এজাতীয় ঘটনা ঘটাননি। বরং, বিবাহের ক্ষেত্রে তো জন্মগত জাতির ধারণাকেই বারবার স্বীকার করেছেন। উদ্ধারণ প্রসঙ্গে নিত্যানন্দের এই যুক্তি তাঁর অন্যান্য কার্যকলাপের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। একারণেই কি বিশেষ গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতালাভের প্রশ্নটি জরুরি হয়ে ওঠে?

[৮৭] বিমানবিহারী মজুমদার, 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃ.১২৬

[৮৮] তুহিন মুখোপাধ্যায়, *চৈতন্য আন্দোলন, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈষ্ণবীয় বিবাহবিচিত্রা*, কলকাতা: পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ.২৪-২৫

উদ্ধারণ প্রসঙ্গে নিত্যানন্দকে বারবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। একদিন ব্রাহ্মণরা নিত্যানন্দকে তাঁর খাদ্যগ্রহণের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে জানতে চান। উত্তরে নিত্যানন্দ বলেন, কখনও তিনি নিজেই রান্না করেন; কোন কোন দিন ভক্ত উদ্ধারণের হাতের রান্না খান। সংশয়ী ব্রাহ্মণরা জানতে চান উদ্ধারণের জাতি পরিচয়। নিত্যানন্দ জানান, উদ্ধারণের বসবাস ত্রিবেণীতে; জাতিতে সুবর্ণবণিক। এর পরে ব্রাহ্মণদের প্রতিক্রিয়াটি তাৎপর্যপূর্ণ—

এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল।

ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল।[৮৯]

সুবর্ণবণিকের হাতের অন্নগ্রহণ সন্ন্যাসীর কাছেও নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু, মূর্তিমান ঈশ্বর নিত্যানন্দের অন্য 'অভিপ্রায়' আছে—এমনটাই ব্রাহ্মণরা এক্ষেত্রে ভেবে নিয়েছেন। অন্য একটি রচনায় অবশ্য কিছুটা আলাদা বর্ণনা রয়েছে। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যাকে বিবাহ করার সংকল্প নিয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির হলে নিত্যানন্দের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের আলাপচারিতা জমে ওঠে। কথায় কথায় ব্রাহ্মণরা জানতে চান নিত্যানন্দের রান্নাবান্না কে করে দেন? নিত্যানন্দ প্রত্যুত্তরে জানান জাতিতে সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ তাঁর হয়ে কখনও কখনও রান্না করেন। একথা শুনে ব্রাহ্মণরা পরিহাসচ্ছলে, শ্লেষ করে বলেন— সূর্য্যদাস 'সুকুলীন জামাতা' পেলেন! সূর্য্যদাসও নিত্যানন্দের এহেন কর্মকাণ্ডে বিচলিত হয়ে নিত্যানন্দকে 'সমাজবিরোধী' মনে করে কন্যা না দিতে মনস্থ করেছিলেন।[৯০] বিবরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতার পথে কতখানি বাধা ছিল—তা এই বিবরণ নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণসমাজের চোখে এই যেখানে

---

[৮৯] কিশোরীদাস বাবাজি(সম্পা.), *শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ বংশবিস্তার*, হালিশহর: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.৮

[৯০] ''উদ্ধারণ সোনার বেনে/ বন্ধনেতে প্রতিদিনে/যার ডালে সদা দেয় কাটি।।/ পরিহাস করি কয়/ গৌরী দাস মহাশয়/ সুকুলীন জামাতা পাইলা।/ সমাজ বিরোধী হেরি/ সূর্য্যদাস শঙ্কা করি/ নিত্যানন্দে কন্যা নাহি দিলা।। — কিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা), *সপ্তগ্রামের শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ*, চৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট, [], ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪-১৫

সুবর্ণবণিকের ধর্মকৃত্যগত অবস্থান, সেই সমাজে নিত্যানন্দের তরফে উদ্ধারণ তথা সুবর্ণবণিকের অন্নগ্রহণের স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈকি! নিত্যানন্দ পরম্পরার গ্রন্থগুলি বারবার উদ্ধারণকে এই স্বীকৃতি দিয়ে গেছে। নিত্যানন্দ দাসের *প্রেমবিলাস*-এ উদ্ধারণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে—

স্বর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোত্তম।

যাহার পক্কান্ন নিতাই করেন ভক্ষণ।।[৯১]

অন্নভক্ষণের প্রসঙ্গের ঠিক আগেই উদ্ধারণের জাতিপরিচয়ের উল্লেখটি খেয়াল করার মতো। ভক্তের দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, উদ্ধারণ পরমভক্ত বলেই নিত্যানন্দের কাছে তাঁর জন্মগত জাতিপরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। আবার, এও মনে করা যেতে পারে, স্বর্ণবণিক হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু নিত্যানন্দ উদ্ধারণের হাতে অন্ন খেয়েছেন—সেকারণেই উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোত্তম। ‘ভক্তোত্তম’ উদ্ধারণ দত্ত যে কেবল ব্যক্তি নিত্যানন্দের নয়; নিত্যানন্দ বংশ ও পরম্পরার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ ও ভরসাযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন তারও নানা প্রমাণ আছে। নিত্যানন্দের ‘দ্বাদশ গোপাল’এর অন্যতম উদ্ধারণ দত্ত। নিত্যানন্দের নেতৃত্বে হুগলি ও সংলগ্ন অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে উদ্ধারণ দত্তের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সুবর্ণবণিকদের পাশাপাশি গন্ধবণিক ও নবশাখদেরও উদ্ধারণ দত্ত বৈষ্ণব করেন।[৯২] *চৈতন্যচরিতামৃত* উদ্ধারণ দত্তকে ‘মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ’ আখ্যা দিয়েছে।[৯৩] অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা *মুরলীবিলাস*-এ দেখা যাচ্ছে জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তীর্থের উপযুক্ত সঙ্গী ও পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন

[৯১] শ্রী নিত্যানন্দ দাস, *প্রেমবিলাস*, কলকাতা: যশোদালাল তালুকদার, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৪৯

[৯২] তুহিন মুখোপাধ্যায়, *চৈতন্য আন্দোলন, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈষ্ণবীয় বিবাহবিচিত্রা*, পৃ.১৭

[৯৩] শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮, পৃ.১৩৬

পড়ে। এক্ষেত্রেও জাহ্নবা দেবীকে বৃন্দাবনে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পান 'মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ', 'ভক্তোত্তম' উদ্ধারণ দত্ত—

> পূর্ব্বে প্রভু সঙ্গে তিঁহ সর্ব্বতীর্থে গেলা,
>
> তিঁহ সঙ্গে লয়ে যেতে না করিবে হেলা।[৯৪]

বোঝা যাচ্ছে, নিত্যানন্দ বংশে অত্যন্ত আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন উদ্ধারণ দত্ত। এপ্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার, পরম ভক্ত হয়তো উদ্ধারণ নিজেই। কিন্তু উদ্ধারণের স্বীকৃতি কেবল ব্যক্তি উদ্ধারণের স্বীকৃতি হয়ে থাকেনি। এ আদতে সমগ্র সুবর্ণবণিক সমাজেরই বৈষ্ণব মহলে; অন্তত নিত্যানন্দ পরম্পরায় স্বীকৃতি।

শোনা যায়, উদ্ধারণ নিজে নিত্যানন্দের বিবাহে দশহাজার টাকা খরচ করেন।[৯৫] নিত্যানন্দের রাজসিক জীবনযাত্রার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। বিত্তশালী ভক্তের দান ছাড়া সেসব নিশ্চয় সম্ভব ছিল না। উদ্ধারণ দত্তের বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। উদ্ধারণ নিজেও বাংলার নবাবের অধীনে নৈহাটিতে দেওয়ান হিসাবে কাজ করতেন। উদ্ধারণ দত্ত বিয়ে করেছিলেন হলধর সেনের ভগ্নি সুপ্রসন্না দেবীকে। হলধর সেনের বংশেই জন্মছিলেন প্রবাদপ্রতিম অর্থের অধিকারী গৌরী সেন।[৯৬] এই বিপুল সম্পত্তি উদ্ধারণ ব্যয় করেছিলেন নিত্যানন্দ গোষ্ঠীতে। উদ্ধারণ তথা সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকদের ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে নিত্যানন্দ যখন দীক্ষা দেন তখনও সপ্তগ্রামের সুদিন, সমৃদ্ধি বজায় ছিল। হিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ১৭৫০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুবর্ণবণিকরা ৫৩ টি মন্দির

---

[৯৪] রাজবল্লভ গোস্বামী, *শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস*, মথুরা: শ্রী কৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা সংস্থান, প্রথম প্রকাশ, ৪০৯ চৈতন্যাব্দ, পৃ.১১২

[৯৫] সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হুগলী জেলায় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন ১৪৮৬-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ', পৃ.১৩৫

[৯৬] মাণিকলাল সিংহ, রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি(২য় খণ্ড), পৃ.২২৩

তৈরি করেছিলেন।[৯৭] অনুমান করা যেতে পারে, এগুলির বেশিরভাগই বৈষ্ণব মন্দির। উনিশ-বিশ শতকেও কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজের বৈষ্ণবতা ও নিত্যানন্দ বংশের সঙ্গে যোগাযোগ লক্ষণীয়। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, উনিশ শতকের কলকাতায় সুবর্ণবণিকদের বাড়িতে এসে বৈষ্ণবগুরুরা যথেষ্ট হুজ্জুতি করতেন।[৯৮]

স্মার্ত সমাজ অবশ্য সুবর্ণবণিককে ভালো চোখে দেখেনি। নিত্যানন্দ পরম্পরার বাইরে সুবর্ণবণিকের ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি—তার প্রমাণ আছে ঘনরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল*-এও। ঢেকুর পালায় ঘনরাম লিখেছেন—

এই সবাকার নাহি ব্যবহার

হেন হীন জাতি কত।।

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পল্লবাদি গোপ

সুবর্ণবণিক কলু।

কেওট কৈবর্ত্ত স্বর্ণকার ধূর্ত্ত

ছুতার বাইতি জালু।।[৯৯]

রিজলি জানিয়েছেন অদ্বৈত আচার্যের পরম্পরাতেও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ইত্যাদি উচ্চজাতিরই দীক্ষা হয়। এদিক থেকে নিত্যানন্দের শরণ সুবর্ণবণিকদের পক্ষেও প্রায় অনিবার্য ছিল। রিজলি এও জানিয়েছেন, নিত্যানন্দ পরম্পরা 'নিচু' জাতের মধ্যেই বেশি জনপ্রিয়।[১০০] খেয়াল করব, রিজলি

---

[৯৭] Hitesranjan Sanyal, 'Temple Building Activities in Bengal: A Social Study From C.1450 to C.1900 A.D., unpublished Ph.D. thesis submitted at the University of Calcutta, [], p.481

[৯৮] মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা,* কলকাতা: মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ২য় সংস্করণ,১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৯-৮১

[৯৯] পীযূষকান্তি মহাপাত্র, *ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ৫৮

[১০০] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Bengal(Vol.II)*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1892, p.343

নিজেও সুবর্ণবণিকদের বৈশ্য হিসাবে স্বীকার করতে চাননি। উনিশ বা বিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজের তাতে প্রবল আপত্তিও ছিল।[১০১] নিত্যানন্দ পরম্পরার বৈষ্ণব গ্রন্থ অবশ্য সুবর্ণবণিকদের রাজকোপে পাতিত্যের গল্প এবং সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বকে স্বীকার করেছে। সুবর্ণবণিকদের বয়ানের সঙ্গে বৈষ্ণব গ্রন্থের এই মতসাম্যটি খেয়াল করার মতো—

পিতা শ্রীকর দত্ত মাতা ভদ্রাবতী।
যোগ্য পুত্র উদ্ধারণ সদানন্দ মতি।।
রাজকোপে বঙ্গদেশী বৈশ্য বেনেগণ।
অধম জাতিতে তারা হইল গণন।।
সেই বৈশ্য কুল এবে উদ্ধার কারণ।
সুবাহু উদ্ধারণ নামে লভিল জনম।।[১০২]

মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তা মুকুন্দদাসও উদ্ধারণ দত্তের 'বৈশ্যকুলেতে উৎপত্তি'[১০৩] বলেছিলেন। তবে সে দাবি আদমসুমারি আধিকারিকদের কাছে খুব বেশি মান্যতা পায়নি। উনিশ শতকেও সেন্সাস রিপোর্টে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের দাবি খারিজ হয়ে যায়। কাজেই, নিত্যানন্দ পরম্পরার গুরুত্ব সুবর্ণবণিক সমাজে প্রবল। ধর্মকৃত্যের বিচারে বলতে গেলে এটাই একমাত্র সম্বল। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় বলে থাকেন—

মোদের কুলের দেবা শ্রীনিত্যানন্দ।
মোরা গরব করে বলতে পারি।।[১০৪]

---

[১০১] কুঞ্জলাল ভূতি, *সুবর্ণবণিক*, কলকাতা: কুঞ্জলাল ভূতি, প্রথম প্রকাশ, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.৮৫

[১০২] কিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা.), *শ্রীশ্রী গৌরভক্তামৃত লহরী,(শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর শাখা)*, হালিশহর: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.৫৪

[১০৩] যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, *নিত্যানন্দ-চরিত*, কলকাতা: পাতাবাহার/খোয়াবনামা, পাতাবাহার/খোয়াবনামা সংস্করণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৩৬

[১০৪] উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা চরিত সাহিত্যে নিত্যানন্দ*, সোদপুর: এষা মুখার্জি, প্রথম প্রকাশ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩১৭

বিশ শতকের শুরুর দিকেও সুবর্ণবণিক সমাজের প্রতিনিধি লেখেন—নিত্যানন্দ সুবর্ণবণিক সমাজের উদ্ধারকর্তা। সমগ্র সুবর্ণবণিক সমাজ নিত্যানন্দের কাছে ঋণাবদ্ধ।[১০৫] ব্যবসায়িক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত সুবর্ণবণিকের মুখে 'ঋণাবদ্ধ' শব্দটি বেশ আকর্ষণীয়। অর্থনীতির ভাষাতেই তাঁরা এই ধর্মীয় স্বীকৃতিকে পড়তে চেয়েছেন। প্রায় অপরিশোধ্য এই ঋণ মেটানোর চেষ্টা তাঁরা বহুদিন ধরে চালিয়ে গেছেন অক্লান্ত পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে। বিশ শতকেও সেই চেষ্টা জারি ছিল। নিত্যানন্দ গোষ্ঠীকে ধরেই তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে উপনিবেশের শাসনকর্তাদের তৈরি করে দেওয়া ছক অনুযায়ী সামাজিক সচলতার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। নিত্যানন্দ গোষ্ঠী সেই সচলতার চেষ্টায় সমর্থন যুগিয়ে বোধহয় তাঁদের আরও বেশি করে 'ঋণাবদ্ধ' করেছেন। সেই পারস্পরিক সমর্থনের ইতিহাসকেই উনিশ-বিশ শতকের পটভুমিতে আমরা পড়তে চাইব পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে।

৩.৪ সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতা ও বৈশ্যত্ব: পরবর্তী প্রকল্প :

ব্রিটিশ প্রশাসন জাতপাত নামক ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় প্রাথমিকভাবে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। বম্বে প্রদেশের একটি নথি থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে, আদালত জাতপাত সংক্রান্ত প্রশ্নে মাথা ঘামাবে না। সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটি জাতিব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিষয়। জাত থেকে বহিষ্কারের ফলে কেউ সম্পত্তি ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হলে কোন মোকদ্দমা আদালতের বিচারাধীন হতে পারে। এদিক থেকে জাতপাত নামক ব্যবস্থার আপাত স্বাধীনতা ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। এই আপাত স্বাধীনতা থাকলেও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সূত্রে জাতিব্যবস্থার গুরুত্ব কিছুটা কমতে থাকে। ব্রিটিশ আদালতের পত্তন, জাতভিত্তিক বিচারের

---

[১০৫] দীননাথ ধর, *ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত*, কলিকাতা: রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭৫-৭৬

বদলে সাধারণ ফৌজদারি আইন (uniform criminal law) প্রচলন দৈনন্দিন পরিসরে জাতের গুরুত্ব হ্রাসের একটা প্রমাণ।[১০৬] আম্বেদকর তাঁর একটি রচনায় লিখেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের আইন ভারতবর্ষে প্রচলিত জাতিব্যবস্থাকে আইনি স্বীকৃতি দেয় না। Civil procedure Code এর **১১** নং সেকশন অনুযায়ী একজন ভারতীয়ের পক্ষে আদালত থেকে বর্ণগত পরিচয় সম্বলিত ঘোষণাপত্র আদায় করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে আদালত বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি প্রসঙ্গেই কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বর্ণ নিয়ে চিন্তিত। আম্বেদকর এপ্রসঙ্গে আরও জানান; এতদসত্ত্বেও ব্রিটিশ ভারতে বর্ণব্যবস্থার অনুসরণ 'অপরাধ' বলে বিবেচিত হবে না। দ্বিতীয়ত, আইনিভাবে ভারতবর্ষে বর্ণব্যবস্থার বিলুপ্তিও ঘোষণা করা হয়নি। কেবল, ব্রিটিশ ভারতে বর্ণব্যবস্থার আইনি বৈধতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। কিন্তু, আইনি বৈধতা চলে গেলেও বর্ণজাতিপ্রথার ধর্মীয় ও সামাজিক বৈধতা ব্রিটিশ ভারতে অক্ষুণ্ণই ছিল। ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুমোদনই ব্রিটিশ ভারতে বর্ণজাতিপ্রথাকে সক্রিয় রেখেছে।[১০৭] যে ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুমোদনের কথা আম্বেদকর বলেছেন, সেই কারণেই ব্রিটিশ ভারতে আদমসুমারির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের দাবি ও পালটা দাবির তরজা শুরু হয়। ব্রিটিশ ভারতে সুবর্ণবণিকদের সামাজিক সচলতার অংশ হিসাবে বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও আদমসুমারির প্রসঙ্গটি অতীব জরুরি।

ভারতবর্ষে আদমসুমারির পরিকল্পনা ব্রিটিশ শাসকদের মনে বেশ কিছুদিন ধরেই ঘুরছিল। উপমহাদেশের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রশাসন পরিচালনার জন্য অত্যন্ত দরকারি। সিপাহি বিদ্রোহের দরুণ আদমসুমারির কাজ আটকে যায়। কিন্তু, সিপাহি বিদ্রোহ ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসকদের বুঝিয়ে দিয়েছিল এই বিরাট উপমহাদেশ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের ভাঁড়ার

[১০৬] G.S.Ghurye, *Caste, Class and Occupation*, Bombay: Popular Book Depot, [], 1956, p.179

[১০৭] B. R. Ambedkar, *Who Were The Shudras?*, Bombay: Thacker & Co. Ltd., 1st Edition, 1946, pp.vi-vii

বেশ ফাঁকা। যতটুকু তাঁরা জানেন, ততটুকুও প্রণালীবদ্ধ নয়।[১০৮] ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের জনগণনার প্রতিবেদনে ডেনজিল ইবেটসন জানালেন—ভারতীয়দের প্রথা, আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত অজ্ঞতার কারণে ইউরোপীয়দের জাগতিক বিজ্ঞান তো ক্ষতিগ্রস্থ্ হচ্ছেই, প্রশাসনিক স্তরেও ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।[১০৯] এইসমস্ত কারণে সিপাহি বিদ্রোহের উত্তেজনা স্তিমিত হলে ১৮৭১ সালে ভারতবর্ষে জনগণনার কাজ শুরু হয়। প্রশাসনিক জটিলতায় বাংলায় অবশ্য আদমসুমারির কাজ শুরু হয়েছিল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে।

ভারতবর্ষে আদমসুমারির পূর্বসূত্র হিসাবে দেখা উচিত ইউরোপীয় আদমসুমারিগুলিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে মূলত দুটি কারণে একধরনের আদমসুমারির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। দারিদ্র্যের মাত্রা নির্ধারণ এবং দারিদ্র্য নিবারণে ত্রাণের প্রয়োজনীয়তা। যুদ্ধবিগ্রহের কারণে জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপও জনগণনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মূলত এই কারণে আদমসুমারির কাজ প্রথমদিকে শুরু হয়।[১১০] ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, খাদ্য সরবরাহ, বিচার বিভাগীয় ও পুলিশি সংগঠন তৈরিতে বিশদ তথ্যের চাহিদা শাসকবর্গকে আদমসুমারিমুখী করে তুলেছিল।[১১১] অবশ্য একারণে ভারতীয় আদমসুমারিকে ব্রিটিশ আদমসুমারির অবিকল প্রতিলিপি মনে করার কারণ নেই। লক্ষণীয়, ব্রিটিশ জনগণনায় ধর্ম সম্পর্কিত তথ্যের প্রতি বিশেষ ঔদাসীন্য ছিল। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ—এই দীর্ঘ সময়পর্বে ব্রিটিশ আদমসুমারিতে মাত্র একবারই ধর্ম সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল। যদিও, এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না। ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের

---

[১০৮] Nicholas B. Dirks, *Castes of Mind*, Delhi: Permanent Black, 1st Indian Edition, 2001, p.198

[১০৯] শুচিব্রত সেন, 'হাবার্ট হোপ রিসলে; জাতিতত্ত্ব: উৎপত্তি ও পরিণাম', অনুষ্টুপ, ৫২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, প্রাক-শারদীয় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৮, পৃ.১৭৪

[১১০] N. Gerald Barrier, *The Census in British India: New Perspectives*, New Delhi, 1st Published, 1981, p.75

[১১১] চন্দ্রিমা সিনহা, 'ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় বাংলায় জাতি আন্দোলন ও বর্ণ সমাজের পুনর্বিন্যাস: মাহিষ্য ও সুবর্ণবণিক সমাজ', পৃ.৯৭

প্রক্রিয়াটি বেশ বিতর্কিত এবং বিপজ্জনক মনে হওয়ায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ব্রিটিশ সরকার বিষয়টিকে সচেতনে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। ভারতবর্ষে অবশ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার হিসাবে প্রশাসনিক কাজকর্মের দায়িত্বে না থাকায়, ব্রিটিশ সরকারের ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে কোন দ্বিধা ছিল না। প্রথমাবধি, ভারতবর্ষে আদমসুমারিতে ব্রিটিশ প্রশাসন ধর্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিল। প্রায় শুরুর দিক থেকেই একইভাবে জাতের প্রশ্নেও আদমসুমারির ক্ষেত্রে নজর পড়তে থাকে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় 'জাতি' ও 'পেশা' সম্পর্কে তথ্য প্রথমবার সংগৃহীত হয়।[১১২] প্রশাসনিক কারণেও জাতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ খুব জরুরি ছিল। ধরা যাক, দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণের আগে সেই অঞ্চলে বসবাসকারী জাতিগুলির পেশা, সামাজিক মর্যাদা, পারস্পরিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্য জেনে নিতে হত। বিভিন্ন জাতিরই আপত্তি ছিল ত্রাণশিবিরে অজানা লোকের হাতের রান্না খেয়ে জাত খোয়াতে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার জনগণনায় ছত্তরখাই নামে এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জাতির লোকজন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এক ত্রাণশিবিরে অন্নগ্রহণ করে জাত খোয়ায়। বিবাহবিধি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা বিচারের ক্ষেত্রেও প্রশাসনিক আধিকারিকদের জাতি সংক্রান্ত জ্ঞান খুব জরুরি মনে হয়েছিল।[১১৩] ব্রিটিশদের আদমসুমারির নথি অনেক জাতির ক্ষেত্রেই, বিশেষত পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির কাছে, খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে আদমসুমারির নিরিখে জাতিগত মর্যাদাপ্রাপ্তির চেষ্টা ছিল প্রবল। আদমসুমারির ভারপ্রাপ্ত কর্তাদের কাছে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের তরফে দাবিসম্বলিত অজস্র চিঠি জমা পড়তে থাকে। প্রায় প্রত্যেক জাতিই নিজের জাতিগত মর্যাদা প্রতিপাদনে তৎপর হয়ে অজস্র বইপত্র, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে থাকে। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ক্যাটালগ থেকে দেখা যাচ্ছে,

---

[১১২] N. Gerald Barrier, *The Census in British India: New Perspectives*, p.76-79

[১১৩] চন্দ্রিমা সিনহা, 'ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় বাংলায় জাতি আন্দোলন ও বর্ণ সমাজের পুনর্বিন্যাস: মাহিষ্য ও সুবর্ণবণিক সমাজ', পৃ.৯৯-১০০

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ‘Castes and Tribes’ তালিকায় নথিভুক্ত বইয়ের সংখ্যা ২৪। ১৯০৫ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই সংখ্যাই বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১৪০। ১৯০১ এর আদমসুমারির প্রতিবেদনে কেবলমাত্র বঙ্গদেশ থেকেই উচ্চতর জাতিমর্যাদার দাবিসহ ১১টি বিতর্কিত আবেদন জমা পড়ে। এই তথ্যগুলি ভারতীয় জনমানসে আদমসুমারির গুরুত্বের নিশ্চিত প্রমাণ।[১১৪]

এখানে ব্রিটিশ আধিকারিকদের আদমসুমারির ক্ষেত্রে বর্ণজাতিপ্রথা সম্পর্কিত তথ্য আহরণের পদ্ধতিটি আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৮১ সালে জনগণনা আধিকারিক প্লাউডেন জাতি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগ দেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল—এবিষয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হোক, কমিটিতে প্রত্যেক প্রদেশের উপযুক্ত প্রতিনিধি থাকুন, এই কমিটি জনগণনা থেকে প্রাপ্ত জাতপাত সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের দায়িত্ব নিক। বিভিন্ন জাতিকে সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী বিন্যস্ত করার অভিপ্রায় থাকলেও প্লাউডেন বুঝেছিলেন কাজটি বেশ কঠিন। অজস্র দাবিসম্বলিত চিঠিপত্রের চাপে প্রাথমিক পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। ১৮৮১ সালেই মাদ্রাজের জনগণনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক লুইস ম্যাকআইভার জাতিগুলিকে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসে সাজাতে চাননি। তাঁর মনে হয়েছিল, কতকগুলি ‘পতিত’ জাতি ছাড়া শূদ্র বর্ণের বাকি জাতিগুলি যেভাবে পরস্পরের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় অবিচল, তাতে কাজটি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রিটিশ গণনাকারীরা বর্ণের নিরিখে জাতগুলিকে সাজানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেই চেষ্টাও খুব একটা সফল হয়নি।[১১৫] এতদসত্ত্বেও, ব্রিটিশ জনগণনায় ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের ধারণাটি রয়েই গিয়েছিল। বরং, রিজলির তত্ত্বাবধানে এবিষয়ে আরেকটু জোর পড়ে। ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের আলোচনায় রিজলি ও ব্রিটিশ আধিকারিকরা বারবার ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের প্রতি ঝুঁকেছেন। ১৮৮১ এর জনগণনার সময়

---

[১১৪] Sumit Sarkar, *Beyond Nationalist Frames*, New Delhi: Permanent Black, 1st edition, 2002, pp.40-43

[১১৫] Nicholas B. Dirks, *Castes of Mind*, pp.207-210

থেকেই দেখা যাচ্ছিল, জনগণনা আধিকারিকরা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বয়ানের উপর ভরসা করছেন। **১৮৮১** এর আদমসুমারির ক্ষেত্রে যেমন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বয়ানের উপর ভরসা করেছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্পষ্টই মনে করেছিলেন শাস্ত্রকে অনুসরণ করাই জনগণনাকর্মীদের কাজ। বর্ধমানের বৈদ্য বা সুবর্ণবণিকদের উচ্চতর জাতিমর্যাদার দাবির প্রতি কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজন নেই। রিজলিও দায়িত্ব নিয়ে সরকারি চাকুরিরত ভারতীয় আধিকারিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতীয়দের মতামত নেন। রিজলির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁর ভারতীয় সহযোগীরা কেবল প্রত্যেকটি জাতের পাশে ক্রম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং, বিভিন্ন জাতের দাবির সমর্থনে অগ্নিবর্ষী চিঠি লেখেন।[১১৬] বাবু তারাপ্রসাদ চ্যাটার্জি *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর উপর ভিত্তি করে রিজলিকে তাঁর রিপোর্ট জমা দেন।[১১৭] উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভারতবর্ষীয় জাতপাতের আলোচনায় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের প্রতি অটুট আস্থা রাখতে দেখেছিলাম। শতাব্দীর শেষেও দেখছি, সেই আস্থা মোটের উপর অটুট। উচ্চতর জাতিমর্যাদার দাবিদার বিভিন্ন গোষ্ঠীও ব্রিটিশ প্রশাসনের এই ঝোঁক বুঝতে পেরেছিলেন। সুবর্ণবণিকরাও শামিল হয়েছিলেন সেই প্রচেষ্টায়। এবার আমরা ব্রিটিশ শাসনপর্বে সুবর্ণবণিকদের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের প্রকল্পটিকে লক্ষ করতে পারি।

ব্রিটিশ ভারতে আদমসুমারি শুরু হওয়ার আগে থেকেই উনিশ শতকের কলকাতায় শিক্ষিত সুবর্ণবণিকরা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহযোগে নিজেদের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আদমসুমারি শুরু হওয়ার আগেই **১৮৫৮** সালে ভৈরবচন্দ্র দত্তের *সুবর্ণবণিক বিষয়ক পুস্তক* আর **১৮৭০** সালে বলাইচন্দ্র সেনের *সুবর্ণবণিক* বইদুটি প্রকাশিত হয়।

---

[১১৬] Ishita Banerjee-Dube, *Caste in History*, New Delhi: Oxford University Press, Second Impression, 2008, pp.34-35

[১১৭] Nicholas B. Dirks, *Castes of Mind*, p.216

আদমসুমারি শুরু হলে এধরনের বইয়ের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। জাতির পাতিত্যের পরিচিতি ক্ষালন করতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বৈশ্যত্বের পরিচিতি জাহির করার। নতুন যুগের সুবর্ণবণিকরা সেই প্রকল্পে ব্রতী হয়েছিলেন।[১১৮] ভৈরবচন্দ্র দত্ত *সুবর্ণবণিক বিষয়ক পুস্তক*-এ স্পষ্ট জানিয়েছেন, *মনুসংহিতা* প্রভৃতি শাস্ত্রে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যেসমস্ত শাস্ত্রে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ববিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়—তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। ভৈরবচন্দ্রের মতে, শাস্ত্রকাররা বিদ্বেষবশত শাস্ত্রে সুবর্ণবণিকদের সম্বন্ধে এমন অপমানজনক কথা লিখে রেখেছেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখান, *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* অনুসারে অম্বষ্ঠ পুরুষ ও বৈশ্য কন্যার ঔরসে সুবর্ণবণিকের জন্ম। আবার, অন্য শাস্ত্রে ঠিক বিপরীত মত আছে। এ অবস্থায় এই সিদ্ধান্তগুলি কতদূর গ্রাহ্য হতে পারে সেবিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শেষ অবধি সিদ্ধান্তে এসেছেন—শাস্ত্রগুলি নিশ্চয় মান্য; কিন্তু শাস্ত্রবর্ণিত জাতিমালা কল্পিত। *অমরকোষ* ইত্যাদি গ্রন্থ যখন রচিত হয় তখন সুবর্ণবণিক নামে কোন আলাদা জাতি ছিল না। বৈশ্যদের মধ্যে যাঁরা সোনার ব্যবসা করেছেন তাঁরাই সুবর্ণবণিক।[১১৯] এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেই ভৈরবচন্দ্রকে সুবর্ণবণিকের 'পাতিত্য' এর ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হয়। তিনি *বল্লালচরিত*-এর প্রসঙ্গ এনে দেখানোর চেষ্টা করেন—বল্লাল সেনের চক্রান্তেই সুবর্ণবণিকের জাতিগত মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। *বল্লালচরিত*-এর প্রসঙ্গটি ভৈরবচন্দ্রের মতো পরবর্তীকালের সুবর্ণবণিকদের রচনাতেও বারবার দেখা যাবে। এভাবেই তৈরি হচ্ছে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূলত তিনটি দিক— **১**। শাস্ত্রপ্রমাণ সংগ্রহ,

---

[১১৮] সুবর্ণবণিক ছাড়াও বেশ কিছু জাতি উচ্চতর জাতিমর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে আদমসুমারি শুরু হওয়ার আগে থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। দ্রষ্টব্য: Sekhar Bandyopadhyay, 'Social Mobility in Bengal in the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries', unpublished Ph.D. thesis submitted at the University of Calcutta, 1985, p.166-167

[১১৯] কুঞ্জলাল ভূতি, *সুবর্ণবণিক(২য় খণ্ড)*, কলকাতা: কুঞ্জলাল ভূতি, প্রথম প্রকাশ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৫-২৭

২। *বল্লালচরিত* ইত্যাদির সূত্রে রাজনৈতিক চক্রান্তে পাতিত্যের ইতিহাস বর্ণনা, ৩। স্মার্ত পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র। এই তিনটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে উনিশ শতক এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে সুবর্ণবণিকরা জনগণনা আধিকারিকদের কাছে একের পর এক আবেদনপত্র পাঠাতে থাকেন। খেয়াল রাখা দরকার, সুবর্ণবণিকরা যতই রাজচক্রান্তে শাস্ত্রীয় বিদ্বেষের কথা বলুন না কেন; জাতিগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাঁদের শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারস্থ হতেই হয়েছে। শাস্ত্রীয় প্রমাণকে নতুনভাবে ব্যাখ্যাও করতে হয়েছে ব্রাহ্মণসমাজের সাহায্যে। উনিশ শতকের শেষদিকে কন্দর্পমোহন বিদ্যারত্ন *সুবর্ণবণিকের কুলজী* (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭ খ্রি.) গ্রন্থে বলেন—*ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ স্বর্ণকারের সঙ্গে সংসর্গদোষে পতিত 'কশ্চিদ্বণিগ্বশেষশ্চ'-র কথা আছে। অনেকেই এই উক্তির সাপেক্ষে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়কে 'পতিত' বলে দাবি করেন। কন্দর্পমোহনের দাবি, 'কশ্চিদ্বণিগ্বশেষশ্চ'-এর কথা বলায় আদতে সমগ্র সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের পাতিত্যের কথা বলা হয়নি; ব্যক্তিবিশেষ সুবর্ণবণিকের কথাই বলা হয়েছে।[১২০] এই ব্যাখ্যা আরোপিত। কিন্তু, উনিশ শতকের সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতার প্রচেষ্টার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পাতিত্য দোষ খণ্ডনের চেষ্টা দেখা যাবে বৈষ্ণবচরণ মল্লিকের *সুবর্ণবণিক বৈশ্য* (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ) বইতেও। লেখক বলেছেন—নৃপঞ্জয় পোতাদার নামক যে সুবর্ণবণিককে বল্লাল সেন সুবর্ণচুরির দায়ে ফাঁসিয়ে সমগ্র সুবর্ণবণিক জাতিকে পতিত ঘোষণা করেছিলেন, তা অশাস্ত্রীয়। প্রমাণস্বরূপ তিনি পরাশরবচন উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন—সত্য যুগে পতিত ব্যক্তির সঙ্গে সম্ভাষণের দরুণ, ত্রেতাযুগে পতিতকে স্পর্শ করলে, দ্বাপরে পতিত ব্যক্তির অর্থ গ্রহণ করলে এবং কলিযুগে পতিতের কর্ম করলে পতিত হতে হয়। অর্থাৎ, সংসর্গদোষে

[১২০] কন্দর্পমোহন বিদ্যারত্ন, *সুবর্ণবণিকের কুলজী*, হুগলি: শ্রী অক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রথম প্রকাশ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.৯-১০

পাতিত্য কলিতে ঘটতে পারে না। সুতরাং, কোন এক সুবর্ণবণিকের সোনা চুরির অপরাধ যদি ঘটনাচক্রে সত্যিও হয়; তাহলেও সংসর্গদোষে সমগ্র গোষ্ঠীর পাতিত্য অসম্ভব।[১২১]

আদমসুমারি শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই সুবর্ণবণিকরা বৈশ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর হলেও প্রাথমিকভাবে খুব একটা লাভ হয়নি। **১৮৯০-৯১** এর আদমসুমারিতে সুবর্ণবণিকদের চাষি কৈবর্তদের তুলনায়ও নিচে জায়গা দেওয়া হয়েছিল।[১২২] রিজলিও আবার জাতপাত সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয় সহযোগীদের মত চেয়ে পাঠান। এবিষয়ে রিজলির অন্যতম সংবাদদাতা ছিলেন ঢাকার সরকারি আধিকারিক দীননাথ ধর। দীননাথ ধর জাতিতে সুবর্ণবণিক। রিজলিকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানান—ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণ আছে। রাজনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, পেশাগত কারণের উপর ভিত্তি করে যে সামাজিক ক্রম তৈরি হয়েছে তার ভিত্তিতেই এই শ্রেণিবিভাগ। দীননাথ ধরের মতে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র এবং আধুনিক ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদদের মত অনুযায়ী সুবর্ণবণিকদের বৈশ্য মনে করাই সংগত। আদমসুমারির প্রতিবেদনেও এই তথ্যটি থাকা উচিত। রিজলির আরেক উপদেষ্টা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অবশ্য এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বর্ধমানের বৈদ্যদের ব্রাহ্মণত্ব, কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্ব, সুবর্ণবণিকদের বৈশ্যত্ব বিষয়ে তঁর আপত্তি ছিল। খানিকটা কটাক্ষের সুরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র জানান—যে সুবর্ণবণিকদের হাতের জল উঁচু জাত নেয় না, তারা এখন বৈশ্যত্বের দাবি করছে।[১২৩] রিজলি নিজেও সুবর্ণবণিকদের বৈশ্য হিসাবে স্বীকার করতে চাননি। উনিশ বা বিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজের তাতে প্রবল আপত্তিও

---

[১২১] বৈষ্ণবচরণ মল্লিক, *সুবর্ণবণিক বৈশ্য,* হুগলি: গোপালচন্দ্র পাল, প্রথম প্রকাশ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৫

[১২২] চন্দ্রিমা সিনহা, 'ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় বাংলায় জাতি আন্দোলন ও বর্ণ সমাজের পুনর্বিন্যাস: মাহিষ্য ও সুবর্ণবণিক সমাজ', পৃ.১২০

[১২৩] Nicholas B. Dirks, *Castes of Mind,* p.217

ছিল।[১২৪] ফলস্বরূপ ১৯০১ এর আদমসুমারিতে 'Disputed Points of Social Precedence' অংশে রাখা হয় সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের দাবিকে। প্রতিবেদনে লেখা হয়—একাধিক দাবিপত্রে সুবর্ণবণিকরা নিজেদের বৈশ্য বলে দাবি করেছেন। এই সম্প্রদায় যথেষ্ট ধনশালী। বল্লালসেনের চক্রান্তে পতিত হওয়ার আগে তাঁরা যথেষ্ট সম্মানজনক অবস্থায় ছিলেন। এদিক থেকে হয়তো দ্বিতীয় বর্গেই তাঁদের স্থান প্রাপ্য। কিন্তু, হিন্দু জনমতই জাতিমর্যাদা বিচারের কষ্টিপাথর এবং সেই মত মানলে সুবর্ণবণিকরা যে নবশাখদেরও নিচে অবস্থান করছেন—তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।[১২৫] রিজলি জাতপাত সংক্রান্ত বিতর্কের মীমাংসায় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকলেও, এক্ষেত্রে হিন্দু জনমতকেই কষ্টিপাথর ধরা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই অবস্থানের মধ্যে বিরোধ লক্ষ করা গেলেও আদতে কোন বিরোধ নেই। প্রথমত, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও হিন্দু জনমত—দুইই কোন একটি দাবির প্রতি অনুকূল হলে জনগণনা আধিকারিকদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে, জনমতের আনুকূল্য তো নেইই, উপরন্তু, শাস্ত্রেও বিরোধী বয়ান রয়েছে। দ্বিতীয়ত, জনমতও প্রভাবিত হয় শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা। সুবর্ণবণিকরাও নিশ্চয় সেটা বুঝতেন। শাস্ত্রপ্রমাণ জোগাড় করে তাঁরা কেবল জনগণনা আধিকারিকদের উপর চাপ দিতে চাননি; সঙ্গে সঙ্গে জনমতকেও নিজেদের দিকে আনতে চেয়েছিলেন।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কুঞ্জলাল ভূতির *সুবর্ণবণিক* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির উপশিরোনাম-'অর্থাৎ এই জাতির পুরাবৃত্ত, বৈশ্যত্ব, নির্যাতন, সংস্কারব্যবস্থা ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ক গ্রন্থ'। ১৯০১ এর আদমসুমারির প্রতিবেদনের পরেও সুবর্ণবণিকদের বৈশ্যত্বের দাবি বহাল ছিল। কুঞ্জলাল ভূতিও পূর্ববর্তী লেখকদের মতোই *বল্লালচরিত* এর সাক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজনৈতিক চক্রান্তে পতিত হওয়ার আগে সুবর্ণবণিকরা যে বৈশ্য ছিলেন—তা প্রমাণ

---

[১২৪] কুঞ্জলাল ভূতি, *সুবর্ণবণিক*, কলকাতা: কুঞ্জলাল ভূতি, প্রথম প্রকাশ, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.৮৫

[১২৫] E.A.Gait, *Census of India(Vol. VI)*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1st Edition,1902, p.384

করতে এই গ্রন্থটি তাঁর অন্যতম প্রধান অবলম্বন। *বল্লালচরিত* সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের বৈশ্যত্বের প্রকল্পে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তার প্রমাণ আছে দীননাথ ধরের *বল্লালচরিত* অনুবাদেও। অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় দীননাথ ধর লিখেছেন—সুবর্ণবণিক সমিতি গেট সাহেবের কাছে যে দুইটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন তার সঙ্গে সংস্কৃত *বল্লালচরিত* আর এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদও পাঠানো হয়েছিল। সঙ্গে পাঠানো হয় ভরতচন্দ্র শিরোমণির *মনুসংহিতা*-র টীকা ও বঙ্গানুবাদ ও ভবশঙ্কর শর্মা প্রমুখ বঙ্গদেশের পাঁচজন প্রধান পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র।[১২৬] ভরতচন্দ্র শিরোমণির *মনুসংহিতা*-র অনুবাদ বইতে ব্যবহার করেছিলেন কুঞ্জলাল ভূতিও। ভরতচন্দ্র শিরোমণি *মনুসংহিতা*-র সপ্তম অধ্যায়ের ১২৭ নং শ্লোকের অনুবাদে লেখেন বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, কতদূর থেকে আনা হচ্ছে, পাথেয় ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনা করে বাণিজ্যদ্রব্যের উপর রাজা বণিকদের থেকে কর নেবেন। অনুবাদের সূত্রে তিনি জুড়ে দেন ১২৭ নং শ্লোকের 'সাকাঙ্ক্ষ' ও ১৩০ নং শ্লোকের 'পশু-হিরণ্য' শব্দের দরুণ বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে বণিক অর্থে সুবর্ণবণিক ধরতে হবে। আবার, ১৩১ নং শ্লোকে 'গন্ধ ঔষধি' শব্দ বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে গন্ধবণিক বোঝাচ্ছে। এই উদাহরণগুলির সাহায্যে তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বর্ণের মতো বঙ্গদেশে বৈশ্যবর্ণও আছে। সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক বঙ্গদেশে বৈশ্যবর্ণের প্রতিনিধি।[১২৭] ভরতচন্দ্র শিরোমণির এই মতটি কুঞ্জলাল ভূতি তাঁর বইতে উদ্ধৃত করেছেন। ভরতচন্দ্র শিরোমণি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক। ১৮৪০ খ্রি. থেকে দীর্ঘ ৩১ বছর তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন।[১২৮] বিভিন্ন মোকদ্দমায় স্মার্ত বিধান সংক্রান্ত তর্ক তৈরি হলে আদালতের তরফে স্মার্ত পণ্ডিতদের মত নেওয়া হত।

---

[১২৬] দীননাথ ধর(অনুবাদিত), *শ্রীমদানন্দ ভট্ট-বিরচিত সংস্কৃত বল্লাল-চরিতের বঙ্গানুবাদ*, কলকাতা: আর দত্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯০৪, পৃ.ভূমিকা

[১২৭] ভরতচন্দ্র শিরোমণি(অনূদিত), *মনুসংহিতা*, কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৩৬, পৃ.৫৫৪

[১২৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাত(সম্পা.), *কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস(১ম খণ্ড)*, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে জয়ন্তী গ্রন্থ, ১৯৪৮, পৃ.২৫-২৬

দত্তকপুত্র সম্পর্কিত এরকমই এক মোকদ্দমায় বিভিন্ন স্মার্ত পণ্ডিতের মতের মধ্যে ভরতচন্দ্র শিরোমণির মতই গৃহীত হয়েছিল।[১২৯] ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে ভরতচন্দ্র শিরোমণির এই গুরুত্ব বুঝেই সুবর্ণবণিক সমাজও বারেবারে তাঁর মন্তব্যটি নিজেদের রচনায় ও আবেদনপত্রে ব্যবহার করেছিলেন।

সুবর্ণবণিকদের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের প্রকল্পে নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণব সমাজের ভূমিকা কী? *সম্বন্ধ নির্ণয়* রচয়িতা লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছিলেন—সুবর্ণবণিকরা সাধারণভাবে জল-অনাচরণীয়। বৈষ্ণব গোস্বামীদের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের সুবাদে সেখানে তাঁরা জল অনাচরণীয় নন।[১৩০] লালমোহন বিদ্যানিধি উদ্ধারণ দত্ত ও নিত্যানন্দের কথা টেনে বলেছেন—উদ্ধারণ দত্ত পরম ভাগবত। নিত্যানন্দ উদ্ধারণ দত্তের হাতে প্রস্তুত অন্নগ্রহণ করেছেন। তারপরেও সুবর্ণবণিকরা অন্ত্যজ শূদ্র হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের![১৩১] লালমোহন বিদ্যানিধির এই বক্তব্যটি খুব গুরুত্বসহ কুঞ্জলাল ভূতি তাঁর বইতে উদ্ধৃত করেছেন। সুবর্ণবণিক সমাজের আরেক প্রতিনিধি লেখেন—

> "উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দ প্রভুর ডেলে কাঠি দিতেন। বিবেচনা করুন, উদ্ধারণ দত্ত নীচ জাতি থাকিলে কদাচই তাঁহাকে এতাদৃশ অধিকার দিতেন না।"[১৩২]

বাসু ঘোষের কড়চা-য় দেখেছি, নিত্যানন্দ বলেছেন উদ্ধারণ দত্ত পরম ভাগবত; ভক্তিগুণেই তিনি উচ্চজাতি পেয়েছেন। উনিশ শতকের সুবর্ণবণিকের রচনায় অবশ্য ব্যাখ্যা ঈষৎ বদলে গেছে। নতুন বয়ানে, উদ্ধারণ জন্মসূত্রে বৈশ্য বলেই নিত্যানন্দ তাঁর হাতের অন্ন খেয়েছেন।

---

[১২৯] শ্রী হরিশচন্দ্র কবিরত্ন, 'সেকালের সংস্কৃত কলেজ', পাতাবাহার, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৮, পৃ.২০

[১৩০] লালমোহন বিদ্যানিধি, *সম্বন্ধনির্ণয়,* [], তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৯৪

[১৩১] তদেব, পৃ.১৯৯

[১৩২] কুঞ্জলাল ভূতি, *সুবর্ণবণিক(২য় খণ্ড),* কলকাতা: কুঞ্জলাল ভূতি, প্রথম প্রকাশ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭৩

যুগচাহিদা বদলালে ব্যাখ্যাও বদলে যায়। সে ব্যাখ্যা মানলে অবশ্য নিত্যানন্দের সাধনার ধারা, ব্যক্তিগত প্রভাবে 'নিচু' জাতকে সাধনাধিকার দেওয়াও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। বদলে যায় 'উদ্ধার' এর তাৎপর্যও। দীননাথ ধরের মতো উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ সুবর্ণবণিকই এই নতুন ব্যাখ্যায় সহমত। দীননাথ ধর সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বে বিশ্বাস করেন। সেবিষয়ে চিঠিও লিখেছেন রিজলিকে। কিন্তু, নিত্যানন্দের উদ্ধারণ দত্তের হাতে ভাত খাওয়াকে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের প্রমাণ বলে মানতে চান না। তাঁর আক্ষেপ—অনেক সুবর্ণবণিকই এই ব্যাপারটাকে খুব বড়ো করে তুলেছেন। অথচ, এটিকে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের খুব জোরালো প্রমাণ বলা চলে না। উদ্ধারণ দত্ত 'পরম ভাগবত', 'বিশুদ্ধতার প্রতিকৃতি', 'মহা সদাচারী' মানুষ বলেই নিত্যানন্দ তাঁর হাতের ভাত খেয়েছেন। তিনি আরও খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন—উদ্ধারণ দত্তের হাতের ভাত নিত্যানন্দ খেয়েছেন সন্ন্যাসী দশায়।[১৩৩] প্রকারান্তরে, 'নান্নদোষেণ মস্করী' শ্লোকের কথা খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন তিনি। শাস্ত্রসম্মত হলেও, উনিশ-বিশ শতকের সুবর্ণবণিক সমাজ এই ব্যাখ্যা শুনতে খুব প্রস্তুত ছিলেন না।

উনিশ-বিশ শতকের সুবর্ণবণিক সমাজের একটা বড়ো দাবি—যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকার। এপ্রসঙ্গে তাঁরা স্মার্ত পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্রও জোগাড় করেছেন। ব্যবস্থাপত্রটি লিখে দিয়েছেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মধুসূদন দেবশর্মা, হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর বিদ্যারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত অধ্যাপক ভবশঙ্কর শর্মা প্রমুখ। প্রশ্ন উঠেছিল দীর্ঘকাল উপনয়ন সংস্কার বর্জিত সুবর্ণবণিকের উপনয়ন কি আদৌ সম্ভব? *মনুসংহিতা*-কে উদ্ধৃত করে ব্যবস্থাপত্রটি জানিয়েছে তপঃপ্রভাবে যাবতীয় দুষ্কর্ম অতিক্রম করা যায়। বৈশ্যদের ক্ষেত্রে তপ বাণিজ্য; আর সুবর্ণবণিকরা চিরকালই বাণিজ্যকর্মে যুক্ত। যজ্ঞোপবীত ধারণ ছাড়া

---

[১৩৩] দীননাথ ধর, *ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত*, পৃ.৩৫-৩৬, ৪৯

যাবতীয় দান-ধ্যান সুবর্ণবণিকরা দীর্ঘদিন করে আসছেন। এছাড়া সুবর্ণবণিকরা 'পরম বৈষ্ণব', চিরকালই তাঁরা হরিনামসংকীর্তন করেন। হরিনাম সংকীর্তনের চাইতে বড়ো কোন প্রায়শ্চিত্ত হয় না। সুতরাং, এতদিন যজ্ঞোপবীত ধারণ না করার জন্য সুবর্ণবণিকদের আলাদা করে কোন প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন নেই।[১৩৪] 'জন্মভূমি' পত্রিকার ১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় হারাধন দত্ত উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। একটি কিংবদন্তি অনুসারে তিনি বলেন—নিত্যানন্দ সুবর্ণবণিক সমাজের নেতা, পরম বৈষ্ণব উদ্ধারণ দত্তকে যজ্ঞোপবীত ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ বলেছিলেন শুধু উপবীত ধারণে কোন লাভ হয় না। মালা-তিলক ধারণ করলে তবেই দেহ পবিত্র হয়। চেনা বামুনের পৈতায় কী কাজ?[১৩৫] এই ইঙ্গিতে উদ্ধারণ দত্ত তাঁর জ্ঞাতিসহ উপবীত ত্যাগ করেন।[১৩৬] এই কিংবদন্তি হারাধন দত্ত তুলে এনেছিলেন সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের প্রমাণ হিসেবে। প্রায় একইরকম কথা ইতিপূর্বে বলেছিলেন নিমাইচাঁদ শীল *সুবর্ণবণিক* (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ)বইতে। তাঁর যুক্তি ছিল, কুলাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র মিশ্র উদ্ধারণ দত্তের যজ্ঞোপবীতের কথা লিখেছেন। মাধবের পুত্র বিক্রমেরও উপনয়ন হয়েছিল। কিন্তু, তখন চৈতন্যদেব যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করায় চৈতন্য মতাবলম্বী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরাও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। উদ্ধারণ দত্তও সেই পথে হেঁটেছিলেন।[১৩৭] অর্থাৎ, সুবর্ণবণিকরা এককালে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতেন; পরে চৈতন্যদেবের অনুসরণে অথবা মতান্তরে নিত্যানন্দের পরামর্শক্রমে তা ত্যাগ করেন—এই হল কিংবদন্তির সারমর্ম। অথচ উনিশ-বিশ শতকে বৈশ্যত্বের দাবি প্রতিষ্ঠায় তৎপর 'পরম বৈষ্ণব' সুবর্ণবণিকরা যেন নিত্যানন্দের পরামর্শটিকেও উপেক্ষা করলেন। এই বোধহয় যুগপ্রয়োজন।

[১৩৪] কুঞ্জলাল ভূতি, *সুবর্ণবণিক*, পৃ.১৪৯-১৫১

[১৩৫] হারাধন দত্ত, 'শ্রীমদ্দত্ত-উদ্ধারণ-ঠাকুর', জন্মভূমি, ৫ম ভাগ, দ্বাদশ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩০২, পৃ.৭২১

[১৩৬] দীননাথ ধর, *ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত*, পৃ.২২

[১৩৭] নিমাইচাঁদ শীল, *সুবর্ণবণিক*, চুঁচুড়া: [], প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৫,পৃ.৬৮-৬৯

তাহলে কি নিত্যানন্দকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে, প্রয়োজনে উপেক্ষা করে উনিশ-বিশ শতকে সামাজিক সচলতার প্রকল্প তৈরি করতে চাইলেন নতুন সুবর্ণবণিকরা? তা বোধহয় নয়। বরং, নিত্যানন্দ বংশের উত্তরাধিকারীদের দিয়েই তাঁরা নিজেদের দাবির সমর্থনসূচক মন্তব্য প্রকাশ করালেন। কুঞ্জলাল ভূতি তাঁর বইতে নিত্যানন্দ বংশধর শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামীর বক্তৃতা মুদ্রিত করেছেন। নিত্যানন্দ বংশধর শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী সুবর্ণবণিক সভার বক্তৃতায় বলেছেন—মনোযোগের সঙ্গে বিচার করলেই বোঝা যায় সুবর্ণবণিকরা বৈশ্যজাতি; কোনমতেই নিচুজাতি নন।[১৩৮] ইতিপূর্বে মহেন্দ্রনাথ দত্তের বয়ানে উনিশ-বিশ শতকের কলকাতায় সুবর্ণবণিকদের বাড়িতে বৈষ্ণব গুরুদের হুজ্জুতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি। দেখা যাচ্ছে, বৈষ্ণব গুরুরা সুবর্ণবণিকদের বাড়িতে কেবল হুজ্জুতিই করতেন না; সময়ে সময়ে নতুন যুগে সুবর্ণবণিকদের নতুন দাবির সমর্থনেও এগিয়ে এসেছেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ নাগাদ কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সুবর্ণবণিকরা বৈশ্যত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে উপনয়ন যজ্ঞের আয়োজন করে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতেন। এরকমই এক উপনয়ন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল খড়দহে নিত্যানন্দের পাটবাড়িতে।[১৩৯] যে নিত্যানন্দ উদ্ধারণ দত্তকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে নিষেধ করেছিলেন, সেই বংশের উত্তরপুরুষ, সুবর্ণবণিকদের গুরুবংশই এগিয়ে এলেন সুবর্ণবণিকদের নতুন সামাজিক দাবির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। সামাজিক সচলতার প্রকল্পটি কতদূর সফল হয়েছিল তা নিয়ে নিশ্চয় তর্ক আছে। কিন্তু এভাবেই তৈরি হয়েছিল বৈষ্ণব গুরুদের, বিশেষত নিত্যানন্দের বংশপরম্পরার সঙ্গে সুবর্ণবণিকদের মিথোজীবিতার সম্পর্ক।

---

[১৩৮] কুঞ্জলাল ভূতি, *সুবর্ণবণিক(২য় খণ্ড)*, পৃ.৪৬

[১৩৯] রাসবিহারী মল্লিক, *বৈশ্য ইতিহাস(প্রথম ভাগ)*, কলকাতা: আর মল্লিক, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩৩

সুবর্ণবণিকদের সূত্র ধরে আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক সচলতার একটি দীর্ঘ অধ্যায়কে বুঝতে পারছি। মোটের উপর দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত বঙ্গদেশীয় পুরাণগুলি থেকে শুরু করে বিশ শতকীয় আদমসুমারি পর্যন্ত পর্বটি সুবর্ণবণিকদের সামাজিক সচলতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে 'পতিত' আখ্যা পাওয়া সুবর্ণবণিকরা সপ্তগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্যে মধ্যস্বত্বভোগীরূপে যথেষ্ট আর্থিক প্রতিপত্তি অর্জন করে 'পতিত' তকমা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেন। 'জাতে ওঠা'র জন্য প্রয়োজন ছিল কোন ধর্মসম্প্রদায়ের আনুকূল্য। সুবর্ণবণিকদের ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করেন নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর বৈষ্ণবরা। ঔপনিবেশিক পর্বে শাসনব্যবস্থার ও প্রশাসনিক রীতি-নীতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণবণিকদের আবার নতুন করে সামাজিক সচলতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নামতে হয়। নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামাজিক সচলতার নতুন অভিব্যক্তি খুঁজে নিয়েছিলেন তাঁরা। নিত্যানন্দ পরম্পরাও সুবর্ণবণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তির ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গুরু পরম্পরার পূর্বতন বক্তব্যকে সরিয়ে রেখে শামিল হয়েছিলেন সুবর্ণবণিকদের নতুন প্রকল্পে। আসলে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মূল সমস্যা হচ্ছে তাঁদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির সঙ্গে জাতিগত মর্যাদার সামঞ্জস্য তৈরি হয়নি। দীর্ঘ বহু শতাব্দী ধরে বিপুল অর্থনৈতিক সম্পত্তির মালিক হয়েও সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের জাতিকাঠামোয় স্থান ছিল প্রায় তলানিতে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, নিত্যানন্দ পরম্পরায় স্বীকৃতির পরেও ঘনরামের *ধর্মমঙ্গল*-এ সুবর্ণবণিকদের 'ব্রাত্য' হিসাবেই দেখা হয়েছে। উনিশ শতক বা বিশ শতকের গোড়ার দিকে আদমসুমারির সময়ে সুবর্ণবণিকরা জনগণনা আধিকারিকদের কাছে প্রচুর চিঠিপত্র লিখেছিলেন; টোল-চতুষ্পাঠীর স্মার্ত পণ্ডিতদের থেকে 'বৈশ্যত্ব' প্রমাণের জন্য ব্যবস্থাপত্র জোগাড় করেছেন। তারপরেও কি খুব লাভ হচ্ছিল? ব্রাহ্মণ্যসমাজের একটা বড়ো অংশের কাছে বিশ শতকের গোড়াতেও সুবর্ণবণিক সমাজের মানুষজন যথেষ্ট হেয় প্রতিপন্নই হতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চতুরঙ্গ* (প্রথম প্রকাশ ১৯১৬ খ্রি.)উপন্যাসের সূত্র ধরে প্রসঙ্গটি

শেষ করা যেতে পারে। কলেজে পড়তে এসে শ্রীবিলাসের সঙ্গে আলাপ হয় শচীশের। ক্রমে শ্রীবিলাস জানতে পারেন শচীশ সুবর্ণবণিক। তাতে শ্রীবিলাসের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল দেখা যাক—

> শচীশ সম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মস্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম, সে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা-পাথরে কোঁদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক; আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক-উপাধিধারী এক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি, শচীশ সোনার-বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর— জাতিহিসাবে সোনার-বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি।[১৪০]

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে চতুরঙ্গ প্রকাশের আগেই সুবর্ণবণিকদের 'জাতে ওঠার' একাধিক প্রচেষ্টার কথা আমাদের জানা। তারপরেও 'নিষ্ঠাবান কায়স্থের' চোখে সুবর্ণবণিক ঘৃণার পাত্র হয়েই ছিল। দেখতে-শুনতে ব্রাহ্মণের মতো, 'দেবমূর্তির মতো' হলেও বিশ শতকেও সুবর্ণবণিকদের জাতিকাঠামোয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের থেকে অনেকটাই দূরে থাকতে হল।

[১৪০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চতুরঙ্গ*, কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ.৯

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: মল্লরাজবংশ

৪.১ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় কৌম জনগোষ্ঠীর রাজ্যস্থাপন এবং মল্লরাজবংশ

৪.২ বর্ণজাতিকাঠামোয় মল্ল রাজবংশ: বাগদি উৎস বিষয়ক তর্ক

৪.৩ শ্রীনিবাস আচার্য ও মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্ম

৪.৪ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও মল্ল রাজবংশ: ক্ষত্রিয় মর্যাদার দাবি ও সাংস্কৃতিক নির্মিতি

অধ্যায়: ৪

বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: মল্লরাজবংশ

অর্থনৈতিক ক্ষমতায় বলবান হয়েও সুবর্ণবণিকদের জাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতার চেষ্টা করতে হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতাও এসে যুক্ত হয়; তাহলেও কি প্রয়োজন পড়ে সামাজিক সচলতার? নাকি তখন এমনিতেই যে সর্বাতিশায়ী আধিপত্য তৈরি হয়, তাতে জাতপাতের কাঠামোয় সামাজিক সচলতার দাবি তোলার প্রয়োজন থাকে না? আদৌ কি জাতপাত বিভক্ত সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিরঙ্কুশ আধিপত্য দেয়? নাকি প্রয়োজন হয়ে পড়ে ধর্মীয় স্বীকৃতির? জাতিগত পরিচিতি নির্মাণ বা জাতিগত মর্যাদা উন্নয়ন যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন প্রক্রিয়া নয়; বরং অন্যান্য কারণের সঙ্গে সম্বন্ধিত। বিশেষত প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে জাতের সম্পর্কের প্রকৃতি কীরকম?—এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমরা এই অধ্যায়ে খোঁজার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, *Hindu Society at Crossroads* বইতে কে.এম.পানিক্কর বলেছিলেন—মহাপদ্মনন্দের সময় থেকেই বিখ্যাত রাজবংশগুলি অ-ক্ষত্রিয়। মৌর্যরা শূদ্র; গুপ্তরা বৈশ্য। এমনকি, পরবর্তীকালের বিখ্যাত রাজপুতরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করলেও সে দাবি পেশাগত কারণেই খাটে; জন্মসূত্রে নয়।[১] তবে জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় না হলেও রাজবংশগুলি অনেকসময়ই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করেছে। পারিপার্শ্বিকের নিরিখে নিশ্চয় সে দাবির প্রয়োজন হয়েছিল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে রাজার

---

[১] K.M.Panikkar, *Hindu Society at Crossroads*, Bombay: Asia Publishing House, 3rd Edition, 1961, p.31

হাতে বিপুল ক্ষমতা ছিল। তার একটি—জাতে তোলা বা নামানোর ক্ষমতা। এই ক্ষমতা অবশ্য রাজা একা ব্যবহার করতেন না। ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিতের সহযোগিতায় রাজা এই কাজটি করে থাকতেন। প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষীয় বর্ণজাতিকাঠামোয় ব্রাহ্মণ-রাজার এই সম্পর্কটি লক্ষণীয়। ঔপনিবেশিক ভারতেও যে কিছু ক্ষেত্রে রাজার সেই ক্ষমতা ছিল, উড়িষ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সেই উদাহরণ দিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়।[২] কিন্তু, রাজার নিজেরও কি প্রয়োজন পড়ে না জাতে ওঠার? রাজপুতদের সূত্রে সেই ইঙ্গিত আমরা আগেই দিয়েছি। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেও কি সেরকম হচ্ছিল? দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সূত্রে সেই প্রক্রিয়াটি খতিয়ে দেখার সুযোগ আছে। ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, প্রশাসনিক আধিকারিকদের অনেকেই বলে থাকেন, মল্লরাজারা বাগদি; 'নিচু' জাত। অথচ, উনিশ শতকে হান্টার ব্রাহ্মণ সভাপন্ডিতের যে বিবরণ পেয়েছিলেন, তাতে তাঁরা ক্ষত্রিয় বলেই পরিচিত। সামাজিক সচলতার এই প্রক্রিয়াটি এই অধ্যায়ে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সামাজিক সচলতার প্রয়াসে বৈষ্ণবধর্মের অবদান কতখানি সেই প্রশ্নটিও এপ্রসঙ্গে জরুরি। একটি সাধারণ গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার প্রচেষ্টার সঙ্গে একটি রাজবংশের সামাজিক সচলতার প্রচেষ্টার কি তফাত আছে? দুটি ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার অভিব্যক্তিগুলি কি আলাদা? মূলত এই প্রসঙ্গগুলিই বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। আমাদের আলোচনা চারটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম উপ-অধ্যায়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও সংলগ্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠীর রাজ্যস্থাপনের প্রক্রিয়ার নিরিখে মল্লরাজবংশের ঐতিহাসিক পূর্বসূত্রটিকে চেনার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ে মল্লরাজাদের বাগদি উৎস সংক্রান্ত বিতর্কের পর্যালোচনা করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক আখ্যান ও নথিপত্রের সাহায্যে। মল্লরাজাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাটির গতিবিধিও এই অংশে আলোচ্য। তৃতীয় উপ-অধ্যায়ের বিষয়বস্তু মল্লরাজবংশের বৈষ্ণবতার

[২] অন্নদাশঙ্কর রায়, *জীবনযৌবন*, কলকাতা: আনন্দ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ.২০

ইতিহাস, শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষাগ্রহণ ও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি মল্লরাজাদের দানধ্যানের ইতিহাস। এসবের সূত্রেই কীভাবে সামাজিক সচলতার বুনিয়াদ তৈরি হচ্ছিল—তা আমরা বোঝার চেষ্টা করব। চতুর্থ অধ্যায়ে সামাজিক সচলতা জাত পরিবর্তনের অভিব্যক্তি, সাংস্কৃতিক নির্মিতি আমাদের অন্বিষ্ট। মল্লরাজারা ক্ষত্রিয়ত্ব, রাজপুত পরিচয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টার পাশাপাশি অভিজাত রাজরুচি নির্মাণেও সচেষ্ট ছিলেন। ক্ষত্রিয়ত্ব ও দরবারি সংস্কৃতির নির্মাণের অনিবার্য যোগ সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ায় কীভাবে জরুরি হয়ে উঠেছিল—তা এই অংশে আলোচিত হবে। এবার প্রথম উপ-অধ্যায়ের আলোচনায় আসা যাক।

৪.১ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় কৌম জনগোষ্ঠীর রাজ্যস্থাপন এবং মল্লরাজবংশ :

দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমাংশ মূলত মালভূমি ও জঙ্গল অধ্যুষিত। কেবল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ নয়; বিহার ও অধুনা ঝাড়খণ্ডের কিছুটা অংশও এই মালভূমি-জঙ্গলঘেরা অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। সাঁওতালভূম, মানভূম, সিংভূম, ধলভূম ইত্যাদির পাশাপাশি বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার একাংশ, পুরুলিয়া, বীরভূম জেলা ও বর্ধমানের কিছুটা অংশও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকালের মতোই এই অঞ্চল এখনও বেশ কিছুটা পরিমাণে জঙ্গলময়, খনিজ সম্পদে পূর্ণ এবং সাধারণভাবে অনুর্বর। ভট্ট ভবদেবের একাদশ শতকের ভুবনেশ্বর শিলালিপিতেও রাঢ়ের এই অজলা, জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের উল্লেখ আছে। এই ভূখণ্ডই সম্ভবত য়ুয়ান-চোয়াং এর রচনায় উল্লিখিত কজঙ্গল। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এও কজঙ্গলের উল্লেখ আছে।[৩] দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমদিককে অনেক গবেষকেরা দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়; অনেকে পশ্চিম রাঢ় বলে থাকেন।[৪]

---

[৩] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.৯৯-১০০

[৪] তুলসীদাস মাইতি, 'রাঢ়বঙ্গের রাজভূমি', টেরাকোটা, শরৎ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৮

রাঢ়ের এই অংশের রাজনৈতিক ইতিহাসও বেশ পুরনো; যদিও বিক্ষিপ্ত তথ্যপ্রমাণ ছাড়া বিশেষ কিছু মেলেনি। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হলে উত্তর রাঢ়ের প্রায় পুরোটাই তাঁর অধিকারে চলে আসে। দক্ষিণ রাঢ়ের এবং তাম্রলিপ্তের বড়ো অংশও শশাঙ্কের হস্তগত হয়। দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমাংশের কিছু অঞ্চল (পুরুলিয়া ইত্যাদি) শশাঙ্কের হাতে এলেও খুব সক্রিয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখানে তৈরি হয়নি। খাতায় কলমে শশাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও এই অঞ্চলের বাসিন্দারা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের চাপ সেভাবে অনুভব করেননি।[৫] সম্ভবত পাথুরে, জঙ্গলময়, কিছুটা অনুর্বর ভূখণ্ডের উপর কেন্দ্রীয় আধিপত্য তৈরির প্রবল আগ্রহ শশাঙ্কের ছিল না। পরবর্তীকালেও আমরা দেখব, ভৌগোলিক পরিস্থিতির এই সুবিধাটুকু গ্রহণ করে দক্ষিণ-পশ্চিম বা পশ্চিম রাঢ়ের স্থানীয় রাজশক্তি খাতায়-কলমে বড়ো রাজশক্তিকে নামমাত্র স্বীকার করে স্থানীয়স্তরে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছে। শশাঙ্কের পরে পাল রাজাদের আমলেও এই অঞ্চলে স্থানীয় রাজশক্তির পরাক্রম ছিল। কৈবর্তদের সঙ্গে পাল রাজাদের সংঘাত বাধলে রামপালের সাহায্যে এগিয়ে আসেন পশ্চিমরাঢ় বা দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের সমরকুশল স্থানীয় রাজারা। এই রাজাদের মধ্যে তৈলকাম্পী (বর্তমান তেলকুপি)র রাজা রুদ্রশিখরের কথা আছে *রামচরিত*-এ। তেলকুপি (প্রাচীন তৈলকাম্পী) শিখরভূমের অন্তর্গত। শিখরভূম একটি ছোট স্থানীয় রাজত্ব; শিখরবংশীয় রাজাদের নামেই এই ভূখণ্ডের নামকরণ।[৬] পুরুলিয়ার দেউলঘাটা বা বোড়ামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে 'রুদ্রশিশু যুবরাজ' এর কথা পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে মনে করেছেন, *রামচরিত*-এর রুদ্রশিখর আর বোড়াম লিপির রুদ্র একই ব্যক্তি। বোড়াম লিপির সময়কাল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী।[৭] পাল রাজাদের এই অঞ্চলের স্থানীয় রাজশক্তির সাহায্য

---

[৫] Birendra Kumar Bhattacharya & others(eds.), *West Bengal District Gazetteers Puruliya*, Calcutta: [], 1st Edition, 1985, p.76

[৬] Debala Mitra, *Telkupi*, New Delhi: Archaeological Survey of India,1st Published, 1969, p.1

[৭] সুভাষ রায়, *পুরুলিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, সিউড়ি: রাঢ়, প্রথম প্রকাশ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩১

প্রয়োজন হয়েছিল; আবার উড়িষ্যার রাজশক্তিরও নজর ছিল এই অঞ্চলের দিকে। পাল রাজাদের পর বঙ্গদেশীয় সেন রাজারা রাঢ়ের এই অংশে বিশেষ আধিপত্য তৈরি করতে পারেননি। বরং, নবম শতাব্দীতে উড়িষ্যার ভৌমকর রাজবংশের চতুর্থ রাজা প্রথম শিবকরের সময় থেকেই এই অঞ্চলের প্রতি উড়িষ্যার আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। ভৌমকর রাজবংশের পরবর্তী গঙ্গ রাজবংশের অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ, প্রথম নরসিংহদেব ও দ্বিতীয় নরসিংহদেবের সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপর উড়িষ্যার আধিপত্য তৈরি হয়। তবে, এই পার্বত্য-জঙ্গলময় অঞ্চলকে তাঁরা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে উঠতে পারেননি। স্থানীয় শাসক বা সামন্ত বা আঞ্চলিক অথবা কৌম প্রধানরা করের বিনিময়ে নামমাত্র আধিপত্য স্বীকার করে প্রায় স্বাধীনভাবে তাঁদের শাসন এখানে কায়েম রেখেছিলেন। বড়ো রাজশক্তির প্রভাবে তাঁদের নিজস্ব, অভ্যন্তরীণ শাসন কাঠামো বিপর্যস্ত হয়নি।[৮] প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুর্গম অঞ্চলের উপর বিভিন্ন রাজশক্তির এত আগ্রহ কেন? প্রথমত, পশ্চিমরাঢ় লোহা ও তামার মতো গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর উৎসস্থল। উত্তরে বীরভূম থেকে দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত অঞ্চলে একাধিক জায়গায় লোহা ও তামার আকর আছে। এইসব জায়গায় লোহা ও তামা উৎপাদনের কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার আধিকারিকদের গবেষণা থেকে দেখা গেছে পশ্চিমরাঢ়ে দেশীয় পদ্ধতিতে ধাতু নিষ্কাশন প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়ত, অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম রাঢ় বাংলার গাঙ্গেয় বদ্বীপের প্রধান প্রবেশপথ ছিল। পশ্চিমে উত্তরভারত ও দক্ষিণে উড়িষ্যার সঙ্গে গাঙ্গেয় বদ্বীপের যোগাযোগ হত এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। বাণিজ্যপথ হিসাবে এই অঞ্চলটির গুরুত্ব তো ছিলই; একইসঙ্গে বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নিরিখেও এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উত্তর ও দক্ষিণভারত থেকে বঙ্গদেশে মার্গ-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে এই অঞ্চল ধরেই।

[৮] Birendra Kumar Bhattacharya & others(eds.), *West Bengal District Gazetteers Puruliya*, pp.77-79

পশ্চিমরাঢ়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল কৌম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। কিন্তু, এই কৌম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের চতুর্দিকে স্থায়ী বসতিভিত্তিক আর্য সংস্কৃতির বিস্তার। আকরিক সম্পদের প্রাচুর্যের দরুণ স্থায়ী বসতিভিত্তিক সমাজ রাঢ়ের এই অংশে আধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিল। এই সূত্রে পশ্চিমরাঢ়ে আর্য সংস্কৃতি বিস্তৃত হচ্ছিল। আর্য সংস্কৃতি বলতে এখানে কেবল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বুঝছি না। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আগেই বরং পশ্চিমরাঢ়ে জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল। রাঢ়ের এই অংশে ধাতু উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের কারণে রাজনৈতিক প্রাধ্যান্য আরোপের চেষ্টাও হয়েছিল নানা সময়ে।[৯]

জি.ডি.বেগলার এই অঞ্চল ধরে ভ্রমণ করার সময়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন পুরাতাত্ত্বিক নজিরগুলি। 'Report of A Tour Through the Bengal Provinces' বইতে আছে সেসব কথা। তেলকুপির মন্দিরগুলি প্রসঙ্গে বেগলার জানিয়েছিলেন কিংবদন্তি অনুযায়ী মন্দিরগুলি রাজা-রাজড়া নয়, বণিকদের তৈরি।[১০] তেলকুপির বেশিরভাগ মন্দিরই নদীর ধারে। বাণিজ্যপথের ধারে বণিকরাই সম্ভবত মন্দিরগুলি তৈরি করেছিলেন। শুধু তেলকুপি নয়; এই অঞ্চল ধরে ঘুরতে ঘুরতে বেগলার বুঝতে পেরেছিলেন পুরাকীর্তিকেন্দ্রগুলি প্রাচীন বাণিজ্যপথের ধারে। রাঢ়ের এই অংশে প্রচুর জৈন স্থাপত্যও ছিল। বেগলার নিজেও প্রচুর জৈন স্থাপত্য দেখেছেন। জৈন ধর্মের সূত্র ধরেই আর্যসংস্কৃতি প্রাথমিকভাবে পশ্চিমরাঢ়ে প্রবেশ করতে শুরু করে। জৈন ধর্মের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক বণিক সম্প্রদায় নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সূত্রে নদীর তীরে বিশ্রামস্থল ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার পাশাপাশি

[৯] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, কলকাতা: সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যাণ্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪, পৃ.৮৩-৮৪

[১০] J.D.Beglar, *Report of A Tour Through the Bengal Provinces*, Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, 1st Edition, 1878, p.177

উপাসনাকেন্দ্রও তৈরি করেছিলেন।[১১] এসব ঘটছিল আনুমানিক নবম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। পশ্চিমরাঢ়ের অন্যতম প্রাচীন জনপদ পুরুলিয়ায় আজও জৈনধর্মের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে প্রচুর সরাক প্রধান গ্রাম রয়েছে। সরাকরা নিজেদের জৈন বলেই অভিহিত করেন। সরাক শব্দটি 'শ্রাবক' শব্দের অপভ্রংশ রূপ।[১২] লক্ষণীয়, প্রাচীন মানভূম বা পুরুলিয়া অঞ্চলে যেখানে মাংসভোজী, সেখানে সরাকরা একেবারেই মাংসাহারী নয়। জৈন সংস্কৃতির রেশ বোধহয় এভাবে রয়ে গেছে।[১৩] পাশাপাশি এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবও যথেষ্টই ছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া থেকে প্রাপ্ত রাজা চন্দ্রবর্মার যে লিপিটি পাওয়া গেছে তাতে রাজা চন্দ্রবর্মা নিজেকে 'চক্রস্বামীর দাস' বলে ঘোষণা করেছেন। চক্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণু। এটি রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অস্তিত্বের একেবারে পাথুরে প্রমাণ। লিপির ভাষা ও রাজার নাম ইত্যাদি থেকেও আর্যসংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব স্পষ্ট।[১৪] বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর ও পশ্চিমরাঢ়ের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ধারাবাহিকভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অগ্রগতি বৃদ্ধি পেয়েছিল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক থেকে তৈরি হওয়া পশ্চিমরাঢ়ের বিভিন্ন কৌম রাজশক্তির সাহায্যে। এই রাজশক্তিগুলির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কৌমজন অধ্যুষিত রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৌম জনগোষ্ঠী থেকে উঠে আসা রাজশক্তির মধ্যে কৌম উপাদান ছিল যথেষ্ট; আবার ব্রাহ্মণ্যকরণের ঝোঁকও ছিল প্রবল। চতুর্দশ-ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝে রাঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও বিহারের পূর্ব-দক্ষিণে ছোটনাগপুর মালভূমির সীমানায় অনেকগুলি ছোটো-বড়ো রাজ্য গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেকটি রাজ্যের নামের শেষেই ছিল 'ভূম' শব্দটি- মল্লভূম, গোপভূম, শিখরভূম, সামন্তভূম, ব্রাহ্মণভূম ইত্যাদি। একসঙ্গে এই রাজ্যগুলিকে

---

[১১] সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *দক্ষিণ পশ্চিম রাঢ় পরিক্রমা(প্রথম খণ্ড)*, বিষ্ণুপুর: টেরাকোটা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৬, পৃ.৩৮

[১২] সুভাষ রায়, *মন্দিরনগরী তেলকূপি: সেকাল একাল*, বিষ্ণুপুর: টেরাকোটা, প্রথম প্রকাশ, ২০২১, পৃ.১৬

[১৩] কমল চৌধুরী(সম্পা.), *পুরুলিয়ার ইতিহাস*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ.১৯০

[১৪] তরুণদেব ভট্টাচার্য, বাঁকুড়া, কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা.লি., প্রথ ম প্রকাশ, ১৯৮২, পৃ.৬০

অনেকেই ‘ভূম রাজ্য’ বলে থাকেন। ভূম রাজ্যের রাজারা স্থানীয় কৌমগোষ্ঠী থেকে উঠে এলেও নিজেদের পরিচয় দিতেন রাজপুত এবং ক্ষত্রিয় হিসাবে। পরিচিতি প্রতিষ্ঠার তাগিদে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সাংস্কৃতিক স্তরেও তাঁরা ছিলেন উচ্চমার্গের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধ্বজাধারী। কৌম সংস্কৃতির উপাদানকে তাঁরা পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি; কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আবহ নির্মাণে তাঁরা ছিলেন সচেষ্ট।[১৫] কম-বেশি সমস্ত ভূম রাজ্যের মধ্যেই এই প্রচেষ্টা ছিল।

পশ্চিমরাঢ়ে ভূমরাজ্যগুলি পত্তনের অর্থনৈতিক তাৎপর্যও ছিল। এই অঞ্চলের রাজাদের সঙ্গে প্রজাদের একটা সময় পর্যন্ত খুব সরল অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল। রাজাকে কেউ খাজনা হিসাবে অল্প পরিমাণ শস্য দিতেন, কেউ নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য সামান্য পরিমাণে দিতেন, কেউ বা দিতেন বেগার শ্রম। নগদে রাজস্ব দেওয়ার চল বিশেষ ছিল না। কিন্তু, রাজাদের ব্রাহ্মণ্যকরণের ঝোঁক বাড়তে থাকলে উৎসব-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকাণ্ড, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদিও বাড়তে থাকল। সামান্য উপঢৌকনে তখন আর রাজার পোষাল না; প্রয়োজন পড়ল নগদে খাজনা আদায় বৃদ্ধির। আবার, কর আদায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজকর্মচারীর সংখ্যাও অনেক বাড়াতে হল। বৃহৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সামলাতে প্রয়োজন হল বিভিন্ন দপ্তরের ও অধিক সংখ্যক কর্মচারীর। প্রশাসনের খরচ বাড়তে লাগল। সেই চাপ গিয়ে পড়ল প্রজাদের উপর। কর্মচারীদের ভরণপোষণের জন্য ছোটনাগপুরের রাজা সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুঘল শাসনব্যবস্থার অনুকরণে জায়গিরদারি চালু করলেন। লক্ষণীয়, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে মুঘলরা বাংলা দখলের সময় রাঢ়ের এই অংশের রাজাদেরও বাগে আনতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমরাঢ়ের ভূম অঞ্চলের রাজারা তখন প্রাথমিকভাবে মুঘলের

---

[১৫] চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, *বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা*, বিষ্ণুপুর: টেরাকোটা, প্রথম টেরাকোটা সংস্করণ, পৃ.ভূমিকা

বশ্যতা স্বীকার করে নেন এবং কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। মুঘলদের সূত্রেই এই অঞ্চলের রাজারা ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি মুঘল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে যান। মুঘল সংস্কৃতির দ্যুতিতে তাঁরা চান নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনকেও ঢেলে গড়ে নিতে । পাশাপাশি প্রশাসনেও পড়ে মুঘল শাসনব্যবস্থার ছাপ।

মুঘলদের সঙ্গে ওঠা-বসার সূত্রে বাইরের সংস্কৃতির প্রভাব তো এই অঞ্চলে এসে পড়েছিলই। একইসঙ্গে এইসময় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অঞ্চলগুলিতে বসতি গড়ে তুলেছিলেন বাইরের লোকজন। উৎকল ব্রাহ্মণ, বাঙালি রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও গ্রহবিপ্ররা। কনৌজিয়া ব্রাহ্মণরাও এসেছিলেন বসতি গড়তে। এই ব্রাহ্মণগোষ্ঠীকে রাজারা বিপুল পরিমাণে নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের ভূমিদানের আতিশয্য নানা রসিকতার জন্ম অবধি দিয়েছিল। প্রশাসনিক কাজ সামলানোর জন্য বাইরে থেকে আনতে হয়েছিল কাজ জানা লোক। এই সূত্রে এসেছিলেন বৈদ্য, কায়স্থ, ওড়িয়া ব্রাহ্মণ ও করণরা। রাঢ়ে বহিরাগত মানুষরা হয়তো রাঢ়ের আদি বাসিন্দাদের একটু নিচু চোখেই দেখতেন; তবে তাঁদের সংস্পর্শে পশ্চিমরাঢ়ের সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক বদল আসে।[১৬]

পূর্বভারতের এই কৌম জনগোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ্য মনোভাবাপন্ন রাজারা কৌম সমাজের প্রধান ছিলেন। কৌম সমাজের বিভিন্ন বিবাদ-বিসংবাদের সমাধান রাজা করতেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা উপদেশকের সহায়তায়। মল্লভূম, বরাহভূম, শিখরভূম ইত্যাদি অঞ্চলে রাজারাই ছিলেন সামাজিক নীতি-নিয়মের ধারক-বাহক। এইসমস্ত কৌম রাজ্যের বিভিন্ন পার্বণে-দুর্গাপূজা ইত্যাদি, রাজাকে প্রায় ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হত। প্রজাদের কাছে রাজার গুরুত্ব বাড়িয়ে তলার এই কৌশলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের যোগ উড়িয়ে দেওয়া কঠিন।

[১৬] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ.৯৩-৯৬

আবার, একদিকে যেমন রাজা বাড়তি কর চাপাচ্ছেন প্রজাদের উপর; উদ্বৃত্ত সংগ্রহে বাড়তি মনোযোগী হচ্ছেন; ঠিক তেমনই প্রজাদের সামাজিক উন্নতি বা জীবনযাপনের উন্নতিতেও নজর রাখার চেষ্টা করছেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারাই যেমন কূপ খনন করেছেন, বাঁধ ও সেচের প্রতি নজর দিয়েছেন।[১৭] আবার, এইসব কূপ বা বাঁধের নামকরণে থাকত ব্রাহ্মণ্য বা বৈষ্ণবীয় ছাপ। এভাবেই রাজা-প্রজার সম্পর্কে একটা স্থিতাবস্থা রাখার চেষ্টা চলছিল।

ভূম রাজ্যের কৌম রাজশক্তিগুলি মুঘল সংস্কৃতির ছাঁচে নিজেদের গড়তে চেয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের পাশাপাশিই প্রয়োজন ছিল জাতের আভিজাত্য। প্রায় প্রতিটি রাজবংশই চন্দ্র বংশীয় বা সূর্য বংশীয় রাজপুত বলে নিজেদের পরিচয় দিত। এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা সভাপণ্ডিতের সহায়তা। রাজপুত পরিচিতি প্রদানের সূত্রেই আরেকটি প্রবণতা লক্ষ করা উচিত—নিজেদের কৌম পরিচিতি মুছে বহিরাগত হিসাবে প্রমাণ করা। মল্লভূম, মানভূম ইত্যাদি ভূম রাজ্যে এই প্রবণতা প্রকট।[১৮] এই প্রবণতা যে কেবল রাঢ়ের ভূম রাজ্যগুলিরই ছিল তা নয়। অন্যান্য অঞ্চলেও কৌম রাজশক্তির রাজপুত বা ক্ষত্রিয় পরিচিতি লাভের প্রচেষ্টা দেখা যায়। ছোটনাগপুরের নাগ রাজবংশের কুলবৃত্তান্ত ধরা আছে মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বেণী রামের *নাগবংশাবলী*-তে। বিবরণটিতে ব্রাহ্মণ্য ছাপ স্পষ্ট। নাগবংশীয় রাজারাও ক্ষত্রিয় হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে উৎসুক।[১৯] উল্লেখ্য, রাঢ়ের ভূম অঞ্চলের মধ্যে কৌম জনগোষ্ঠী-উদ্ভূত রাজবংশগুলি রাজপুত বা ক্ষত্রিয় পরিচয় স্থাপনে ব্যগ্র হলেও রাঢ়ের পূর্বদিক এসে বসতি ও সাম্রাজ্য গড়ে

---

[১৭] Surajit Sinha(ed.), *Tribal Polities and State Systems in Pre-Colonial Eastern and North Eastern India*, Calcutta: K P Bagchi & Company, 1st Published, 1987, p.xv

[১৮] H.Coupland, *Bengal District Gazetteers Manbhum*, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1st Published, 1911, p.47

[১৯] Surajit Sinha(ed.), *Tribal Polities and State Systems in Pre-Colonial Eastern and North Eastern India*, p.64

তোলা গোপরা কখনও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেননি। তাঁরা বরং বাংলার অভ্যন্তরীণ জাতিমর্যাদায় উচ্চস্থান দখলের চেষ্টা করেছিলেন গোপ থেকে সদগোপ পরিচিতি লাভের মাধ্যমে। বাংলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ভূস্বামীরাও সামাজিক সচলতার জন্য নতুন জাতিমর্যাদা লাভে তৎপর ছিলেন। কিন্তু, ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি তাঁদের মধ্যেও দেখা যায়নি।[২০] অথচ, গোপভূম সংলগ্ন আরেকটি ভূম রাজ্য বীরভূমের ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে কৌম রাজশক্তির ক্ষত্রিয় পরিচিতি লাভের প্রয়াস। কিংবদন্তি অনুযায়ী, পশ্চিম প্রদেশ(কারো কারো মতে পঞ্জাব) থেকে বীরসিংহ ও চৈতন্যসিংহ নামে দুই ভাই এসে এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করেন। বীরসিংহের নামে রাজ্যের নাম হয় বীরভূম। বীরসিংহই নাকি বীরভূমের 'আদি হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা'।[২১]

রাঢ়ের এই কৌম রাজবংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ছিল; বিশেষ করে বড়ো রাজ্যগুলি অনেকসময় ছোটো রাজ্যকে গিলে নিয়ে আয়তন বাড়াতে চেয়েছে। তৎসত্ত্বেও, রাঢ়ের কৌম জনগোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে অনেক মিল ছিল। মল্লভূম বা শিখরভূমের সঙ্গে অন্যান্য ভূমরাজ্যের বৈবাহিক সম্পর্কের জানা যায় ।[২২] আবার শিখরভূমের রাজা দামোদরশেখরের বিবাহ হয়েছিল ছোটনাগপুর রাজের কন্যার সঙ্গে। শিখরভূমের আরেক রাজা চন্দনশেখর বিয়ে করেছিলেন উড়িষ্যার খুর্দার মহারাজা গজপতি মুকুন্দদেবের মেয়েকে।[২৩] এই সূত্রেই সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও চলত। আবার, উড়িষ্যার প্রাচীন

---

[২০] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ.৯২-৯৩

[২১] অরুণ চৌধুরী(সম্পা.), *গৌরীহর মিত্র সঙ্কলিত বীরভূমের ইতিহাস*, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা. লি., প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ২০০০, পৃ.১৬-১৭

[২২] মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের যেমন বিয়ে হয়েছিল তুঙ্গভূমের রাজা রঘুনাথ তুঙ্গের কন্যার সঙ্গে। আরেক মল্লরাজা ফতে সিংহ বিয়ে করেছিলেন ধলভূমের রাজকন্যাকে।

[২৩] দিলীপকুমার গোস্বামী(সম্পা.), *রাজপুরোহিত রাখাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত পঞ্চকোট ইতিহাস*, পুরুলিয়া: বজ্রভূমি প্রকাশনী, নবম প্রকাশ, ২০১৯, পৃ.২৪,৪৩

রাজপরিবারগুলির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকেও শক্তিশালী করেছিল। বৈষ্ণবীয় প্রভাবও এই কৌম রাজ্যগুলির আরেকটি চরিত্রলক্ষণ। বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে সাংস্কৃতিক আভিজাত্য নির্মাণের চেষ্টা আর বৈষ্ণবদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে জাতিমর্যাদা লাভের চেষ্টা— দুইই চলেছিল একসঙ্গে। নির্বাচিত কয়েকটি ভূম রাজ্যের এই প্রবণতাটিকে আমরা একটি ছকের সাহায্যে চিনে নিতে পারি।[২৪]

ভূম রাজ্য	**ভৌগোলিক অবস্থান**	**সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ**	**বৈষ্ণবতার ইতিহাস**	**অন্যান্য তথ্য**
শিখরভূম	বর্তমান পঞ্চকোট বা পাঞ্চেত শিখরভূমের কেন্দ্রস্থল। বাঁকুড়ার গঙ্গাজলহাটি থানার একটি অংশও শিখরভূমের অন্তর্গত ছিল।	*রামচরিত*-এ তৈলকাম্পী (বর্তমান তেলকুপি)র রাজা রুদ্রশিখরের কথা আছে। অনেকে মনে করেন তখন থেকেই এই ভূম রাজ্যের সূত্রপাত।	শিখরভূমের রাজাকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন তামিলনাড়ুর এক গুরু।[২৫] কোন কোন মতে,	শিখরভূম ভূম রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন। তাঁদের হাতের টীকা না পেলে কেউ রাজা হতে পারত না।[২৭]

[২৪] উপরোক্ত ছকের মূল তথ্যগুলি মূলত গৃহীত হয়েছে— P.Acharya, 'A Note on the 'Bhum' Countries in Eastern India, Indian Culture, Vol.12, No.2, 1945, pp.37-46

[২৫] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ.৯৬

[২৭] তদেব, পৃ.৪৪

			শিখরভূমের রাজারা রামভক্ত। শিখরভূমের রাজার ভণিতায় একটি রামবন্দনার পদ পাওয়া গেছে।[২৬]	
ভঞ্জভূম	আধুনিক উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায়।	‘উপজাতি’ অধ্যুষিত অঞ্চলে দশম শতাব্দী থেকে ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত ভঞ্জ রাজারা রাজত্ব করেছেন।[২৮]	রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ বৈষ্ণব গুরু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের কাছে বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নেন।[২৯]	*মাদলাপাঁজি, রসিকমঙ্গল* ইত্যাদি গ্রন্থে ভঞ্জভূমের উল্লেখ আছে।

[২৬] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(২য় খণ্ড),* কলকাতা: আনন্দ, দশম মুদ্রণ, ১৪১৮, পৃ.১৪

[২৮] Chhatish Chandra Dhal, ‘History of Mayurbhanj 1882-1949’, unpublished Ph.D. thesis submitted at Utkala University, 2006, p.8

[২৯] Maitrayee Mohanty, “Harpura Gada: The Bhanja Capital in Ruins’, Odisha Review, August 2015, p.43

বরাভূম	মানবাজারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমান পুরুলিয়ার অন্তর্গত।	পাতকুম রাজবংশের শাখা বরাভূম শাসন করতেন। বিক্রমাদিত্যকে পরিবারের আদি পুরুষ মনে করেন।	উৎকল ব্রাহ্মণদের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন।[৩০]	নৃতাত্ত্বিকদের মতে বরাভূমের রাজবংশ রাজপুত-ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করলেও আদতে ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত।
সামন্তভূম	বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বাঁকুড়ার ছাতনা থেকে শিলদা পর্যন্ত এলাকা একসময় সামন্তভূমের অন্তর্গত ছিল।[৩১]	'ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়'এ সামন্তভূমের বৃত্তান্ত আছে। বিবরণটি কিংবদন্তিকেন্দ্রিক।	সামন্তভূমের রাজা লছমীনারায়ণ রাধা-কৃষ্ণ লীলাগীত রচনা করেছেন।[৩২] রাজপরিবারের সদস্যদের নামগুলিও	পরবর্তীকালে শিখরভূমের অন্তর্গত হয়ে যায়।

[৩০] Birendra Kumar Bhattacharya & others(eds.), *West Bengal District Gazetteers Puruliya*, p.93

[৩১] তরুণদেব ভট্টাচার্য, 'মানা মানা মানভূম ও ভূমযুক্ত অঞ্চল', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ.৩৬

[৩২] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, '"ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়" ও চণ্ডীদাস', প্রবাসী, আষাঢ় ৩৬ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩৪৫

			বৈষ্ণব অনুষঙ্গযুক্ত।	
মল্লভূম	ষোল শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের গোড়ায় মল্লভূমের উত্তর সীমা ছিল সাঁওতাল পরগণার দামিন-ই-কোহ, দক্ষিণসীমা বর্তমান মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিমাংশ, পূর্বসীমা বর্ধমানের কিছুটা অংশ, পশ্চিমে ছোটনাগপুর লাগোয়া পাঁচেত রাজ্য।[৩৩]	মল্ল রাজবংশের বিবরণ হান্টার সংগ্রহ করেছিলেন। বংশ বিবরণে রাজপুত পরিচয় দেওয়া হলেও অনেকের মতে মল্লরাজারা আদতে বাগদি।	বিখ্যাত বৈষ্ণব গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে মল্লরাজ বীর হাম্বির দীক্ষাগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মচর্চার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল বিষ্ণুপুর।	মুঘল রাজাদের কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মল্লরাজারা। তবে ভৌগোলিক দুর্গমতার সুযোগে কর ফাঁকি দিয়ে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালাতেন। বাগদি রাজা হিসাবেই জনসমাজে পরিচিত।[৩৪]

[৩৩] তরুণদেব ভট্টাচার্য, 'মানা মানা মানভূম ও ভূমযুক্ত অঞ্চল', পৃ.৩৬-৩৭

[৩৪] Abhaya Pada Mallik, *History of Bishnupur-Raj*, Calcutta: Abhaya Pada Mallick, 1st Edition, 1921, p.10

বীরভূম	বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলা	বীরসিংহ ও চৈতন্যসিংহ নামে দুই ভাই পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের হারিয়ে রাজ্য পত্তন করেন। এই কিংবদন্তী অনুযায়ী বীরসিংহ বীরভূমের প্রথম ‘হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা’।	বীরসিংহ একটি গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বীরসিংহপুরে। সংলগ্ন জঙ্গলটির নাম দেওয়া হয় বৃন্দাবন।[৩৫]	বীরসিংহ কালীর উপাসনাও করতেন। কিংবদন্তি থেকে জানা যায় তিনি একটি কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।[৩৬]
ধলভূম	পূর্বতন বিহারের সিংভূম জেলা, অবিভক্ত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার কিছু অংশ নিয়ে ধলভূম রাজ্য গঠিত ছিল।	ধলভূমের রাজাদের উপাধি ধল। কটকের দামপাড়ার জমিদাররাও ধল উপাধিধারী। ধলভূমের রাজারাও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করেন।	ধলভূমের রাজা নবীনকিশোর ধল রঙ্কিণীদেবীর উপাসক হলেও শ্যামানন্দ তাঁকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন।	*ভবিষ্যপুরাণ*-এ ধবলভূমির উল্লেখ আছে।

[৩৫] W.W.Hunter, *Annals of Rural Bengal(Vol.1)*, London: Smith, Elder & Co., 1st Published, 1868, p.429

[৩৬] তদেব

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার অনেক ভূম রাজ্যের মতোই মল্লরাজবংশও নিজেদের অতীতকে অনেক পিছনে টেনে নিয়ে যেতে চায়। এমন একটা অতীতের কথা তাঁরা বলেন যখন হিন্দু রাজারা দিল্লিতে রাজত্ব করছেন এবং মুসলমান শাসনের নামগন্ধও ছিল না। মল্লরাজাদের পারিবারিক বিবৃতি অনুযায়ী বখতিয়ার খলজির বাংলা দখলের আগেই তাঁরা ৫০০ বছর রাজত্ব চালিয়েছেন। পারিবারিক বিবরণ অনুযায়ী এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদি মল্ল। সামরিক কুশলতায় তিনি পঞ্চমগড়ের 'উপজাতি' রাজার নজর কাড়েন। রাজার সহায়তায় আদি মল্ল জয়পুর সংলগ্ন লাউগ্রামের অধিপতি হয়ে বসেন। সেই থেকে মল্ল রাজবংশের সূত্রপাত।[৩৭] এই বিবরণের স্বপক্ষে অবশ্য কোন ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ নেই। লাউগ্রামে মল্লরাজবংশের প্রাচীন স্থাপত্য বা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদিও পাওয়া যায়নি। সেদিক থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে বীর হাম্বীরের সময়কাল থেকেই বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশের ঐতিহাসিক খবরাখবর মিলতে থাকে। এই পর্বেই বৈষ্ণবধর্মের বিষ্ণুপুরে অনুপ্রবেশ এবং মল্লরাজাদের সাংস্কৃতিক আভিজাত্য নির্মাণের সূত্রপাত। ক্ষত্রিয়ত্বের বা রাজপুত উৎসের দাবির জন্ম ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী এই সময়েই। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কৌম রাজবংশের প্রবণতা থেকে এক্ষেত্রে মল্ল রাজবংশ দূরে থাকেনি। আবার, পরবর্তীকালে অর্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তির দৌলতে মল্লরাজাদের পারিবারিক প্রবণতা অন্যান্য ভূমরাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কৌম রাজ্যগুলির পটভূমিতে পরবর্তী উপ-অধ্যায়গুলিতে মল্ল রাজবংশের সামাজিক সচলতার দাবি, প্রক্রিয়া ও অভিব্যক্তিকে বুঝতে চেষ্টা করব।

[৩৭] Amiya Kumar Banerjee, *West Bengal District Gazetteers Bankura*, Calcutta: [], 1st Published, 1968, pp.88-91

৪.২ বর্ণজাতিকাঠামোয় মল্ল রাজবংশ: বাগদি উৎস বিষয়ক তর্ক

এই উপ-অধ্যায়ে আমরা মল্ল রাজবংশের বাগদি উৎস বিষয়ক তর্কটি পর্যালোচনা করব। এই অংশে আমাদের মূল অবলম্বন মল্লরাজবংশের ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিতদের তৈরি করা বয়ান, বিভিন্ন কিংবদন্তি, বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকদের লেখালেখি, নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণা, স্থানীয় ইতিহাসবিদদের রচনা।

হান্টারের পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজদরবারের বিভিন্ন নথিপত্রের সাহায্যে বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশের একটি বিবরণ প্রস্তুত করেছিলেন। বিবরণের শুরুতেই আছে একটি কিংবদন্তি। বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহের পূর্বপুরুষ বৃন্দাবন সংলগ্ন জয়নগরের রাজা ছিলেন। জয়নগরের রাজা একবার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তীর্থ করতে মনস্থ করেন। যাবার পথে বিষ্ণুপুরের কাছে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। সদ্যোজাত সন্তানসহ এই দুর্গম পথে চলা অসম্ভব বুঝে মা ও সন্তানকে এখানে ছেড়ে রাজা যাত্রা করেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের পথে। গভীর জঙ্গলে বিপন্ন বোধ করে মা'ও সম্ভবত সদ্যোজাত সন্তানকে ছেড়ে চলে যান। পরিতক্ত্য শিশুটিকে কিছু পরেই দেখতে পান কুশমেটে বাগদি নামের এক আদিবাসী। পিতৃ-মাতৃহীন শিশুটিকে কুশমেটে বাগদি নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং যত্নে সাত বছর বয়স পর্যন্ত বড়ো করেন। বালকের সাত বছর বয়সে এক ব্রাহ্মণ বালকের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়েন; বালকের শরীরে ভবিষ্যতে রাজা হওয়ার উপযুক্ত কিছু লক্ষণ দেখতে পান। ব্রাহ্মণ বালককে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। বালকটি সেখানেই বড়ো হতে থাকে। মাঠে ব্রাহ্মণের গোরুগুলি চরানো ছিল তাঁর দায়িত্ব। একদিন গোরু চরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটি গোরু হঠাৎ দলছুট হয়ে গেলে বালক তাকে খুঁজতে গভীর জঙ্গলে ঢোকে। ক্লান্তিতে আর না পেরে সেখানেই এক গাছের তলায় সে ঘুমিয়ে পড়ে। তাঁর পালক পিতা তাকে খুঁজে না পেয়ে এদিক-

ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখে বালকটি পথের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে আর সূর্যের রশ্মি থেকে বালকটিকে ছায়া দিচ্ছে এক প্রকাণ্ড সাপ তাঁর বিস্তৃত ফণা মেলে ধরে। সকলকে আরও অভিভূত করে বালক একদিন জলাশয় থেকে একটি স্বর্ণগোলক উদ্ধার করে। এমন সময়ে হঠাৎ অঞ্চলের রাজা (আদিবাসী রাজা সম্ভবত) মারা যান। তাঁর শ্রাদ্ধে বিস্তর লোকের জমায়েত হয়। ব্রাহ্মণটিও তাঁর পালিত সন্তানসহ সেই শ্রাদ্ধে হাজির হয়েছিলেন। হঠাৎ রাজহস্তী এই পালিত সন্তান রঘুকে শুঁড়ে তুলে নেয়। সকলেই যখন ভয়ে হতবাক, তখনই রাজহস্তী রঘুকে বসিয়ে দেয় সিংহাসনে। সেই থেকে রঘু হয়ে উঠলেন দেশের রাজা। প্রাচীন রাজ্যগুলোতে এই প্রথা ছিল। রাজা মারা গেলে রাজহস্তীকে ছেড়ে দেওয়া হত। সেই খুঁজে নিয়ে আসত যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই প্রথাকে সম্মান দিয়েই রঘুকে রাজা হিসাবে মেনে নেয় সকলে। সেই থেকে মল্ল রাজবংশের সূত্রপাত।[৩৮] এই কাহিনিটির সূত্রেই বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশ দাবি করেন, তাঁরা উত্তর ভারত থেকে আগত রাজপুত-ক্ষত্রিয় পরিবার। শুধু তাই নয়, অঞ্চলের আদিবাসী রাজা মারা গেলে তাঁর শ্রাদ্ধে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে থেকে রাজহস্তীর রঘুকে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়ার কাহিনি ফেঁদে বোঝানোর চেষ্টা হল, বহিরাগত হলেও স্থানীয় স্তরে প্রচলিত প্রথার অনুসরণেই মল্লরাজাদের রাজত্বপ্রাপ্তি হয়েছে। এই কাহিনির সূত্রেই স্থানীয় মানুষজনের উপর মল্লরাজাদের আধিপত্যের বৈধতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করা হল। স্থানীয় কৌম জনগোষ্ঠী প্রধান অঞ্চলের উপর শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা যে মল্লরাজাদের একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল—সেকথা আমরা পরে আলোচনা করব। এই কিংবদন্তির মধ্যেও সুকৌশলে সেই বৈধতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে।

[৩৮] W.W.Hunter, *Annals of Rural Bengal(Vol.1)*, pp.439-442

হান্টারের বইতে এই কাহিনি প্রকাশিত হলে অনেকেই নড়েচড়ে বসেন। ১৮৮২ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি এই কিংবদন্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন। কুশমেটে বাগদি যদি শিশুকে পরিতক্ত্য অবস্থাতেই পেয়ে থাকেন, তাহলে তিনি জানলেন কী করে যে শিশুটি জয়নগরের রাজপুত রাজার সন্তান? দ্বিতীয় প্রশ্ন—সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে পথচলা যদি দুরুহই হয়, তাহলে রাজা কেন কিছু অর্থব্যয় করে তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত মা ও সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব কাউকে সঁপে দিলেন না? কী করে নিঃসংশয়ে জানা গেল তাহলে বাগদি পরিবারে বড়ো হয়ে ওঠা সন্তানটি বাগদি নন, ক্ষত্রিয়?[৩৯] এরপরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে যখন ও'ম্যালির বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়, তখন সেখানেও ছিল বিষ্ণুপুরের রাজবংশের উৎস সংক্রান্ত বিবরণ। ও'ম্যালির সংগৃহীত বৃত্তান্তটি এক জেলা আধিকারিক তৈরি করেছিলেন রাজবংশের নথিপত্রের ভিত্তিতে। হান্টারের বিবরণের সঙ্গে এই বিবরণটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য চোখ এড়ানোর নয়। কতকটা যেন রমেশচন্দ্র দত্তের আপত্তির উত্তর দেওয়ার সুরেই এই বিবরণটিতে বলা হল উত্তর ভারতীয় রাজপরিবারের রাজা গর্ভবতী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের পথে যাত্রা করেন। স্ত্রী আসন্নপ্রসবা দেখে রাজা মনস্থির করেন তিনি একাই যাবেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে। যাবার আগে তিনি ব্যবস্থা করে যান পঞ্চানন নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে স্ত্রী সন্তান প্রসব করবেন এবং সন্তান জন্ম নিলে সন্তানের দেখাশোনার ভার নেবেন ভগীরথ গুহ নামে এক কায়স্থ ।[৪০] পুরনো কিংবদন্তিটি এইভাবে সময়ে সময়ে চেহারা পাল্টেছে। ফাঁকফোকর বুজিয়ে চেষ্টা করেছে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি আরও জোরদার করার। লক্ষণীয়, বাগদি সংস্রবও মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে পরবর্তী বয়ানে। যদিও বিদ্দ্বজ্জনমহলে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিটি বিশেষ স্বীকৃত

[৩৯] R.C.Dutt, 'The Aboriginal Element in the Population of Bengal', Calcutta Review. 1882, p.242

[৪০] L.S.S. O"Malley, *Bengal District Gazetteers Bankura*, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1st Published, 1908, pp.23-24

হয়নি। রমেশচন্দ্র দত্ত তো স্পষ্টই বলেছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজাদের ক্ষত্রিয় বলা যেতেই পারে—কিন্তু সেটা তাঁদের পেশার কারণে; জন্মসূত্রে নয়।[৪১] ব্রিটিশ আধিকারিক ওল্ডহ্যামও বলেছিলেন বাগদি অধ্যুষিত বিষ্ণুপুর রাজ্যের রাজাও বাগদি।[৪২]

ওল্ডহ্যাম তাঁর বর্ধমান বিষয়ক পুস্তিকায় লিখেছিলেন বর্ধমান অঞ্চলে বাগদিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী। বর্ধমান বলতে আধুনিক বর্ধমান জেলাকে বুঝলে চলবে না। একসময় বর্ধমান রাজার জমিদারি হুগলি, মেদিনীপুর থেকে বিষ্ণুপুর, পাঁচেত, বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট অঞ্চলে বাগদিদের বিপুল সংখ্যায় দেখা যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সামাজিক জীবনে বাগদিরা প্রান্তিক। ওল্ডহ্যাম দেখেছিলেন গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে বাগদিদের পড়ার অধিকার দেওয়া হয় না। সমাজের চোখে তারা খুবই ঘৃণিত।[৪৩] *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর জাতিকাঠামোতেও বাগদিদের স্থান খুবই নিচে। *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ বঙ্গ, বগধ ও চেরো জাতির কথা আছে। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'বগধ' জাতিকে আজকের বাগদিদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করেছেন। তাঁর বিচারে 'বগধ' শব্দের রূপান্তর বাগড। বগধ থেকেই বাগদি শব্দের উৎপত্তি। বাগদিরা কোন দেশ থেকে বঙ্গদেশে এসেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে তাঁরা দ্রাবিড়। বাগদিদের একটা অংশ বোধহয় অনেকদিন থেকেই ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আওতায় আসছিল।[৪৪] বিদেশি নৃতাত্ত্বিক ডালটনও মনে করেছিলেন—বাগদিরা আসলে একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক

---

[৪১] R.C.Dutt, 'The Aboriginal Element in the Population of Bengal', p.243

[৪২] J.C.K.Peterson, *Bengal District Gazetteers Burdwan*, Calcutta: Government of West Bengal, West Bengal Govt. Reprint, 1997, p.283

[৪৩] তদেব, পৃ.২৬৫-২৬৬

[৪৪] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী(৩য় খণ্ড)*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০, পৃ.২৯৪

সম্পর্কের দরুণ তাঁরা প্রাচীন কৌমচেতনা থেকে একটু একটু বেরিয়ে আসছিলেন।[৪৫] সংখ্যার বিচারে রাঢ়ে বাগদিরা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য জাতি। সাহসের বিচারেও। বাগদিদের সম্বন্ধে একটি ছড়া প্রচলিত ছিল—"বাঘ বাগতি হড়িয়াল পাখী।/ পোষ মানে না এ তিন জাতি।।" সাহসের কারণেই বাগদিরা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা।[৪৬] বাগদিদের সঙ্গে মাল জাতিরও একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। মালরাও দ্রাবিড়দেশীয়। আজও বাগদি ও মালরা একই হুঁকোয় তামাক খায়। মাল ও বাগদিরা মনে করে তাঁদের উৎপত্তি একই সূত্র থেকে। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশকে দুই জাতিই নিজেদের রাজা বলে মনে করে।[৪৭] মল্ল রাজবংশ বাগদিদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করলেও বাগদিরা বিশ্বাস করেন মল্লরাজারা স্বজাতীয়। বাগদিদের সঙ্গে কি আদৌ মল্লরাজবংশের সম্পর্ক থাকা সম্ভব?

শৌর্য-বীর্যের কারণে বাগদিরা রাঢ়ের বিভিন্ন রাজার সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতেন। বাগদিদের রাউত, প্রতিহার, সর্দার ইত্যাদি পদবি সেই চিহ্ন বহন করছে। এমন কোন বাগদি সেনাপ্রধান কি কালক্রমে রাজত্ব দখল বা স্থাপন করেছিলেন? মল্ল রাজবংশের ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা থাকলেও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে, ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে রাজ্য স্থাপনের আরেকটি সম্ভাবনার কথা আমরা তুলনায় জোর দিয়ে বলতে পারি। শৌর্য-বীর্যের সুবাদেই বাগদিদের মধ্যে দস্যুবৃত্তির প্রবণতা ছিল। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়কালে মহারাজা নন্দকুমারের রাজ্যে বিশু ডাকাত নামে এক প্রতাপশালী ডাকাত ছিলেন। বিশু ডাকাত জাতে বাগদি।[৪৮] ডাকাতিতে বাগদিদের প্রসিদ্ধি অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণও স্বীকার করেছেন।[৪৯]

---

[৪৫] E.T.Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta : Office of the Superintendent of Government Printing, 1st Published, 1872, p.327

[৪৬] মাণিকলাল সিংহ, *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি(১ম খণ্ড)*, পৃ.২২২

[৪৭] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী(৩য় খণ্ড)*, পৃ.২৯৩

[৪৮] রামরঞ্জন রায়, *প্রসঙ্গ ঘাটাল*, কলকাতা: [], প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ.১৭

[৪৯] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী(৩য় খণ্ড)*, পৃ.২৯৭

বাগদিদের এই দস্যুবৃত্তি মল্লরাজাদের মধ্যেও ছিল। মল্লরাজ বীর হাম্বীরের দস্যুদল শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁর সঙ্গীদের জিনিসপত্র লুঠ করেছিল। এছাড়াও আরেকটি কিংবদন্তি এপ্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের উৎপত্তির একটি বিবরণ জে.সি.ফ্রেঞ্চ সংগ্রহ করেছিলেন। মল্লরাজাদের রাজপুত উৎস ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য ও কাহিনির মূল কাঠামো এক রেখে ঈষৎ আলাদা বয়ান এই কাহিনিতে আছে। মল্ল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনাথ বালকটি (গোপাল) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী যুবকে পরিণত হলেন। এক ডাকাতের দলে মিশে অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন দলপতি। ডাকাতদলের দৌরাত্ম্য গ্রামবাসীদের এবং রাজার বিশেষ মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠল। গোপালকে ধরতে না পেরে রাজা তাঁর পালক পিতা ব্রাহ্মণটিকে বন্দি করলেন। গোপালও ঠিক করল যেভাবেই হোক ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতেই হবে। এই উদ্দেশ্যে সে সাঁওতালদের সাহায্য চাইল। দলবল নিয়ে এরপর গোপাল রাজাকে আক্রমণ করে। রাজা ভয়ে নিরুপায় হয়ে এক পুকুরে ঝাঁপ দেন এবং প্রাণত্যাগ করেন। গোপাল তখন পুকুর থেকে সেই মৃতদেহ তুলে এনে সৎকারের ব্যবস্থা করে। রাণী সহমৃতা হলেন। গোপাল এই সুযোগে রাজকন্যাকে বিয়ে করে রাজা হয়ে বসলেন। তাঁর নাম হল আদিমল্ল। এরপর থেকে আদিমল্লের বংশধররা রাজত্ব করতে থাকেন।[৫০] বাগদিদের দস্যুবৃত্তিতে ভর করেই কি তাহলে মল্লরাজ্যের প্রতিষ্ঠা? সম্ভাবনাটি উড়িয়ে দেওয়া কঠিন।

বাগদিদের মধ্যে প্রচলিত আরও কয়েকটি কিংবদন্তি বেশ জোর দিয়ে বাগদি-মল্ল সম্পর্কের কথা বলে। জনগণনা আধিকারিক রিজলি বাগদিদের বেশ কিছু কিংবদন্তি সংগ্রহ করেছিলেন। একটি কিংবদন্তিতে দেখা যাচ্ছে, কোচবিহারে শিবের অনেকগুলি কোচ বংশীয় উপপত্নী ছিল। ঈর্ষান্বিত পার্বতী কোচদের শস্য নষ্ট করতে থাকলে শিব কিছুতেই সামাল দিতে

---

[৫০] অনাথনাথ ঘোষ, 'মল্লভূমি', বিচিত্রা, ১/২/১, পৌষ ১৩৩৪, পৃ.১৩৯

পারলেন না। শেষে শিব-পার্বতীর চুক্তি হয় যে তাঁদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মাবে। পার্বতীর যমজ সন্তান হয়। যমজ ভাই-বোন পরস্পরকে বিয়ে করে। এই বিবাহের ফলেই বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের জন্ম।[৫১] কিংবদন্তি থেকে বেরিয়ে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের দিকে তাকালেও বাগদিদের সঙ্গে মল্লরাজবংশের একটা ঘনিষ্ঠতা চোখে পড়তে পারে। মল্লভূমের দুটি জনপ্রিয় উৎসব—মনসাপূজা ও ঝাপান। দুটিই সর্পদেবী সংক্রান্ত উৎসব। মল্লভূমের কৈবর্ত, জেলে, বাগদি, মাঝি ইত্যাদি জাতির কুলদেবী মনসা। মৎস্যজীবী গোষ্ঠীর সর্পভীতি থেকেই এই অঞ্চলে মনসাপূজার সূত্রপাত। ক্রমে এই পূজা অন্যান্য জাতির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে সাপ-খেলানো হয়। এটিই ঝাপান উৎসব। ঝাপানের শ্রেষ্ঠ গুণীকে স্বয়ং মল্লরাজ একসময় জমিজমা বা টাকাকড়ি দিয়েও সম্মানিত করতেন।[৫২] অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, এই ঝাপান উৎসবে বাগদিরাও অংশ নিতেন। মল্লরাজারা বৈষ্ণবীয় প্রভাবে মার্গ সংস্কৃতির চর্চা করেও এই কৌম সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে ছাড়েননি। বরং, বৈষ্ণব দেব-দেবীর উপাসনার পাশাপাশিই মল্লরাজারা সক্রিয়ভাবে নাগপঞ্চমী ব্রত পালন করেছেন। মল্লরাজাদের দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানেও বাগদিদের যোগ থাকে।[৫৩] মনে রাখতে হবে, মল্লরাজ বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরের কেওট পাড়ায় মনসাপূজার জন্য ভূমি ও জলাশয় দান করেছিলেন। রাজপরিবার-পোষিত মৃন্ময়ী মন্দিরেও মৃন্ময়ীর পাশে মনসা পূজিত হন।[৫৪] বাগদিদের মতোই মল্লরাজাদেরও মনসা সংক্রান্ত বিশ্বাস প্রবল। এইসব অনুষঙ্গের কারণেই

---

[৫১] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Bengal(Vol.1)*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1st Published, 1892, p.37

[৫২] মাণিকলাল সিংহ, *পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি*, বিষ্ণুপুর: চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.২১৭-২২২

[৫৩] Surajit Sinha(ed.), *Tribal Polities and State Systems in Pre-Colonial Eastern and North-Eastern India*, pp.78-79

[৫৪] প্রদীপ কর(সম্পা.), বাঁকুড়া জেলার লোকপার্বণ, বিষ্ণুপুর: টেরাকোটা, প্রথম প্রকাশ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.৬৭

মল্লরাজাদের বাগদি উৎস সংক্রান্ত জনরব চিরকাল বজায় থেকেছে। এমনকি, ইদানীং কালের বাগদি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও বিশ্বাস করেন মল্লরাজবংশ বাগদি রাজাদের রাজ্য।[৫৫]

মল্ল রাজবংশের তরফে এসব দাবিকে মোটেই পাত্তা দেওয়া হয়নি। বরাবরই তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল রাজপুত-ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার। মল্লরাজারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা এবং চৌহান বংশীয় রাজপুত বলেই নিজেদের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। ছোটনাগপুর অঞ্চলে ক্ষত্রিয়রা দুটি স্তরে বিভক্ত-নয়মহল এবং দশমহল। জাতিগত মর্যাদায় নয়মহল শ্রেষ্ঠতর। সম্ভবত নয়মহলভুক্ত গোষ্ঠীগুলি আগে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। এই ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির ক্ষত্রিয়ত্ব নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। কয়েক প্রজন্ম আগেও নাকি রাজবংশের লোকেরা জনান্তিকে কৌম-উৎসকে স্বীকার করতেন। মল্লরাজারা নিজেদের নয়মহল গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন। মল্লরাজাদের বৈবাহিক সম্পর্ক এই গোষ্ঠীর মধ্যেই হয়ে থাকে। যদিও কিছু ছত্রি বা ক্ষত্রিয় পরিবার বিশ্বাস করেন মল্লরাজারা ছত্রিদের মধ্যে নিচুস্তরের।[৫৬] মাণিকলাল সিংহের বই প্রকাশিত হলে মল্লরাজাদের বাগদি উৎস সম্পর্কে আবার রব ওঠে। মাণিকলাল সিংহের বইপ্রকাশের পরের বছরই ফকিরনারায়ণ কর্মকারের *বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী*-এর একটি নতুন সংস্করণ বেরিয়েছিল। ফকিরনারায়ণ মল্লরাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের সমর্থক। ফকিরনারায়ণের বইয়ের নতুন সংস্করণের জন্য শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের তৎকালীন মহারাজ। শুভেচ্ছাবার্তায় মাণিকলাল সিংহের 'অপচেষ্টা'কে ধিক্কারও জানিয়েছিলেন।[৫৭] কেবল মল্ল রাজবংশের লোক নয়; মল্ল রাজসভার সঙ্গে যুক্ত অমাত্যবংশ থেকেও মল্লরাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতি জোর সওয়াল করা হয়েছে। মল্লরাজ তৃতীয় দুর্জন সিংহদেব, মল্লরাজ তৃতীয় রঘুনাথ

---

[৫৫] শ্যামচাঁদ বাগদী, 'রাঢ়-বাঙলা ও বহির্বঙ্গে প্রাচীন গ্রামীণসভ্যতার[যৎ] বাগতি জাতির অবস্থান', আত্মশক্তি, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ? পৃ.৭৭

[৫৬] Surajit Sinha(ed.), *Tribal Polities and State Systems in Pre-Colonial Eastern and North-Eastern India*, pp.105-106

[৫৭] ফকিরনারায়ণ কর্মকার, *বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় দে'জ পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১৮, পৃ.১৯

সিংহ এবং মল্লরাজ প্রথম গোপাল সিংহের মহামন্ত্রী পীতাম্বর পাত্রের (শর্মার) ষষ্ঠ প্রজন্মের বংশধর প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত (পাত্র) ২০১৭ সালে *বিষ্ণুপুরের রান্দেল রাজবংশ ও বিষ্ণুপুরের ইতিহাস* নামে একটি বই লেখেন। মল্লরাজাদের বাগদি উৎস সংক্রান্ত 'অপবাদ' দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত ক্ষত্রিয়ত্বের পক্ষে সওয়াল চালিয়ে বলেন—মল্ল রাজবংশ রান্দেল বংশীয়। রান্দেলরা আদতে চৌহান রাজবংশের একটি গোষ্ঠী। চৌহানরা বাৎস্যগোত্রীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়; কিন্তু রান্দেল বংশীয়রা চন্দ্র বংশীয় ও রাজর্ষি গোত্রভুক্ত। প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত স্পষ্টই জানান—

> বিষ্ণুপুর রান্দেল রাজবংশকে অবনমনকারী ও কালিমালিপ্তকারী গোষ্ঠীটির মতে বিষ্ণুপুর রাজবংশ মূলতঃ বাগদী অথবা মল্লমেটেই তাঁহারা দৈহিক শক্তি ও অর্থবলে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ে উন্নীত হইয়াছেন এবং বর্তমানে তাঁহারা নিজেদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলে দাবী করিতেছেন। ঐ গোষ্ঠীটির এই যুক্তি কপটতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে।[৫৮]

প্রিয়ব্রত দাশগুপ্তের বইটি বুঝিয়ে দেয় বিতর্কটি এখনও জায়মান। তিনিও অবশ্য বাগদি বিতর্ক উড়িয়ে দিতে গিয়ে একজায়গায় একটু সমস্যায় পড়েছেন এবং সমস্যায় পড়েছেন বুঝেই সম্ভবত সেই প্রসঙ্গে আর আলোচনা বাড়াননি। চৌহানরা বাৎস্য গোত্রীয় অথচ রান্দেল রাজবংশ রাজর্ষি গোত্রভুক্ত। গোত্রে এই ফারাক কেন? প্রিয়ব্রত বাবু লিখেছেন, চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দের কেউ গোত্র হারালে নিজেকে রাজর্ষি বা কাশ্যপ গোত্রীয় বলে পরিচয় দিতে পারেন।[৫৯] কিন্তু, গোত্র হারানো তো সহজ বিষয় নয়। রান্দেল রাজবংশের গোত্রহানি হলই বা কেন? প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত এপ্রসঙ্গে নীরব। এইসব তর্কের মাঝেই আবার দেখা যায় বাগদিদের প্রধান চারটি

[৫৮] প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত, *বিষ্ণুপুরের রান্দেল রাজবংশ ও বিষ্ণুপুরের ইতিহাস*, বাঁকুড়া: অলক কুমার চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ.১৮

[৫৯] তদেব, পৃ.১৪-১৫

উপবিভাগের অন্যতম কুশমেটেরা বাগদি সম্প্রদায়ের ভিতরে নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়; কারণ কুশমেটেদের বিশ্বাস মল্লরাজারাও কুশমেটে সম্প্রদায়ের।[৬০]

রাজপুত-ক্ষত্রিয় পরিচয় নিয়ে আগ্রহ ভূম রাজ্যের কৌম রাজবংশগুলির মধ্যে ছিলই। নৃতাত্ত্বিক ডালটন লক্ষ করেছিলেন—পাঁচেত অর্থাৎ শিখরভূমের রাজাও পরিতক্ত্য শিশুর কুর্মি জনগোষ্ঠীর হাতে বেড়ে ওঠা এবং শেষ অবধি রাজবংশ পত্তনের কাহিনি বলে থাকেন। রাজপুত বলে দাবি করলেও ডালটনের মনে হয়েছিল শিখরভূম রাজবংশ কুর্মি গোষ্ঠী উদ্ভূত।[৬১] মানভূমের রাজবংশের মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা যায়।[৬২] ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করলেও সেই দাবির ভিত যে খুব মজবুত ছিল না তা বোঝার একটা উপায় আছে। ভাদ্র সংক্রান্তিতে বাঁকুড়া ও মানভূমের বাগদিরা ভাদু প্রতিমা নিয়ে উৎসব করে। ভাদু পঞ্চকোট বা পাঁচেত রাজার কন্যা ছিলেন। বিয়ে করেননি; আজীবন ব্রহ্মচারিণী। ভাদু পূজায় উদ্দাম নাচ-গান হয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই উৎসবে যোগদান করে। এই উৎসবের মূল আখ্যানটি তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় জাতিগত কারণে ছদ্ম-রাজপুত রাজপরিবারের কন্যাদের পাত্রস্থ করা মুশকিল হচ্ছিল।[৬৩] কৌম রাজবংশের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি যে শুধু রাঢ়বঙ্গেই সীমিত ছিল তা নয়। বরেন্দ্র অঞ্চলে কোচ রাজাদের মধ্যেও একই প্রবণতা লক্ষণীয়।[৬৪] কোচবিহার রাজবংশের ক্ষেত্রেও রাজস্থানের রাজপুত পরিবারের কন্যাদানের রেওয়াজ আছে। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে জাতে ওঠার চেষ্টাটি এসব ক্ষেত্রে প্রকট।

[৬০] তদেব, পৃ.৭৯

[৬১] E.T.Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, p.318

[৬২] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী(৩য় খণ্ড)*, পৃ.২৯৬

[৬৩] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Bengal(Vol.1)*, p.41

[64] J.C.K.Peterson, *Bengal District Gazetteers Burdwan*, p.302

দুটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে ইতি টানব। প্রথমত, ভূমরাজ্যগুলির অনেক কৌম রাজশক্তির মতোই মল্লরাজারাও নিজেদের রাজপুত বলে দাবি করেছেন। বিশেষ করে রাজপুত সম্বন্ধ স্থাপনে এই গোষ্ঠীগুলি এত ব্যগ্র কেন? দ্বিতীয়ত, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি গোষ্ঠীর সঙ্গে 'বাগদিরাজা'দের জাতে ওঠার চেষ্টার কি কোন তফাত আছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আসা যাক। রাজপুতদের উৎপত্তি বা পরিচয় নিয়েও নানা তর্ক আছে। কেউ কেউ গুপ্ত পরবর্তী যুগের বিদেশাগত যোদ্ধৃগোষ্ঠীগুলির মধ্যে রাজপুতদের উৎস খুঁজতে চেয়েছেন। আবার অনেক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক মনে করেছেন রাজপুতরা বৈদিক আর্যদের বংশধর। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও নথিপত্রের মাধ্যমে রাজপুতদের উদ্ভব সংক্রান্ত গবেষণা হয়নি। *কুমারপালচরিত* ও *বর্ণরত্নাকর* গ্রন্থে রাজপুতদের মধ্যে ৩৬টি গোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে। একই কথা আছে *রাজতরঙ্গিণী*-তেও। রাজপুত নামক একটি বৃহৎ গোষ্ঠী পরিচয় যখন নির্মিত হচ্ছিল; তখন সেই সময়কার রাজনৈতিক আধিপত্যের ভিত্তিতে অনেক বংশ সেই গোষ্ঠীর অংশ হয়ে যায়। রাজপুতদের মধ্যেও এমন অনেক গোষ্ঠী ছিল যাদের একটি স্পষ্ট কৌম উৎস আছে। এপ্রসঙ্গে মেদদের উল্লেখ করা যেতে পারে। মেদরা কৌম উৎস থেকে উঠে এসে রাজপুত মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। আরেক রাজপুত শাখা গুর্জর-প্রতিহাররা ছিল পশুপালক গোষ্ঠী। পশুপালক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কৌম সংস্কৃতির যোগ থাকা অসম্ভব নয়। কৌম সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা অনেকগুলি রাজপুত গোষ্ঠী ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিকে পুষ্ট করেছিল রাজপুতদের শৌর্য-বীর্য ও রাজ্যশাসনের দক্ষতা। ক্রমশ মধ্যযুগের ভারতবর্ষেও রাজপুতরা নিজেদের গুরুত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন। রাজপুত ধীরে ধীরে যেন একটি বর্ণের তকমা হয়ে ওঠে। অনেক কৌম গোষ্ঠীই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপুত পরিচয় জাহির করতে শুরু করে। বস্তুত এটিই হয়ে ওঠে কৌম শাসনব্যবস্থা (tribal polity) থেকে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (state polity) প্রতিষ্ঠার একটি

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[৬৫] ভূম রাজ্যগুলোর মতোই মল্লরাজবংশও কৌম শাসনব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্তরে তাই রাজপুত পরিচয় প্রতিষ্ঠায় উৎসুক ছিলেন। লক্ষণীয়, মল্লরাজারা যখন রাজপুত পরিচয় প্রতিষ্ঠায় তৎপর তখন ভারতে মুঘল শক্তির রমরমা। মুঘল দরবারে রাজপুতদের প্রতিপত্তির সঙ্গে পরিচয় হচ্ছিল পূর্বভারতের কৌম রাজ্যগুলিরও। মুঘলদের পাশাপাশি রাজপুত সংস্কৃতির আত্তীকরণও চালাচ্ছিলেন কৌম রাজশক্তিগুলি। মুঘল ভারতে ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির প্রায় পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠেছিলেন রাজপুতরা। সেকারণে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আওতায় আসতে থাকা পূর্বভারতের কৌম রাজ্যগুলি ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠায় রাজপুতদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যগ্র ছিল। উপরন্তু, প্রবল পরাক্রমশালী রাজপুতরা ভাগ্যান্বেষণে অনেকসময় পূর্বভারত অবধিও এসেছিলেন। কবে থেকে রাজপুতরা আসতে শুরু করেছিলেন তা নিশ্চিত করে না জানা গেলেও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা চলেছিল। বহিরাগত রাজপুতরা নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্ধমানে বেশ কিছু জমিদারি ও তালুকদারি গড়ে তোলেন।[৬৬] বহিরাগত রাজপুতদের স্রোতে কৌম রাজশক্তিরাও নিজেদের মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—এমনটা ঘটে থাকাও অসম্ভব নয়।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যেতে পারে। সুবর্ণবণিক ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলির সামাজিক সচলতা রক্ষার প্রক্রিয়ায় দেখা যায় সুবর্ণবণিকরা নিজেদের জাতিমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর। জাতিমর্যাদা স্থাপনে তাঁরা শাস্ত্র, সাহিত্য ঘেঁটে আত্মপরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। পাতিত্যের কাহিনি তুলে এনে রাজচক্রান্তে জাতিচ্যুত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু, কখনও সুবর্ণবণিক পরিচয়কে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। এদিক থেকে তাঁরা জাতিগর্বে গর্বিত।

---

[৬৫] Brajajadulal Chattopadhyaya, *The Making of Early Medieval India*, Delhi: Oxford University Press, 1st Edition, 1994, pp.59-65

[৬৬] Surajit Sinha(ed.), *Tribal Polities and State Systems in Pre-Colonial Eastern and North-Eastern India*, p.132

মল্লরাজাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ঘটনা দেখা যাবে না। তাঁরা তাঁদের কৌম উৎসকে স্পষ্টতই অস্বীকার করে রাজপুত পরিচয় স্থাপনে ব্যগ্র। বাগদি সংস্রব স্বীকার করতে তাঁরা নারাজ। সম্ভবত, মল্লরাজারা বুঝতে পেরেছিলেন বাগদিরা সমাজে এতটাই প্রান্তিক অবস্থানে আছেন যেখান থেকে একটা কৌমের সামাজিক সচলতা লাভ কার্যত অসম্ভব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামাজিক সচলতার আলোচনায় আমরা বলেছিলাম সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর পূর্ব অবস্থান বিশেষ জরুরি। একদম প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলি সামাজিক সচলতা লাভে প্রায়শই ব্যর্থ হয়। মল্লরাজারাও বাগদিদের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে রাজপুত পরিচয় তৈরি করতে চান। তৈরি হয় একটি পরিবারের সামাজিক সচলতা। রাজপুত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গুর্জরদের ক্ষেত্রেও এমন প্রবণতা দেখা যায়। গুর্জরদের একটি অংশ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে জনগোষ্ঠীর অন্য অংশের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেন এবং উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন।[৬৭] অবশ্য দূরদেশের গুর্জরদের মধ্যে কেবল নয়, ভূম রাজ্যের অন্তর্গত খোদ বরাভূমেই এই প্রবণতা দেখা যায়। বরাভূম রাজবংশ ভূমিজ সম্প্রদায়ের। ভূমিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক সচলতার দুটি প্রবণতা নৃতাত্ত্বিকরা লক্ষ করেছিলেন। ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত রাজা বা জমিদাররা ভূমিজদের থেকে নিজেদের বিযুক্ত করে পৃথক একটি গোষ্ঠী হিসাবে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করতে চান। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ভূমিদান তাঁদের সামাজিক সচলতার সোপান। এই দাবির সঙ্গে ভূমিজ জনসাধারণের কোন যোগ তাঁরা স্বীকার করতে নারাজ। সাধারণ ভূমিজরাও পাশাপাশি পৃথক একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। সেটি সমগ্র ভূমিজ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি।[৬৮] মল্লরাজাদের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা তাই একেবারেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিভিন্ন কৌম রাজবংশের মধ্যে সামাজিক সচলতার এই

---

[৬৭] Brajajadulal Chattopadhyaya, *The Making of Early Medieval India*, p.64-65

[৬৮] Surajit Sinha, 'Bhumij-Kshatriya Social Movement in South Manbhum', Bulletin of the Department of Anthropology, Vol.VIII, No.2, 1959, p.11

প্রবণতা বরং একটা প্রচলিত পথের সন্ধান দেয়। ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের জন্য ধর্মীয় অনুমোদন জরুরি। সেদিক থেকেই ভূমরাজ্যগুলির মধ্যে বৈষ্ণবতায় আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মল্লরাজারাও সেই প্রবণতার অনুসারী ছিলেন। পরবর্তী অংশে মল্লরাজাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যোগাযোগ আমরা পর্যালোচনা করব।

৪.৩ শ্রীনিবাস আচার্য ও মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্ম:

শ্রীনিবাস আচার্যের মল্লভূমে আগমন ও বীর হাম্বীরকে দীক্ষাদানের সাল-তারিখ নিয়ে নানা তর্ক আছে। সে তর্কে প্রবেশ করার আগে এটুকু বলা যায় মল্লভূমে শ্রীনিবাস আচার্যের পূর্বে বৈষ্ণবধর্ম অপরিচিত ছিল না। বৈষ্ণব গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুযায়ী শ্রীনিবাস আচার্য বীর হাম্বীরের সভাপণ্ডিতকে ভ্রমর গীতা (মতান্তরে রাসপঞ্চাধ্যায়ী) পড়তে দেখেছিলেন। এই গল্পের সত্যতা কতখানি সে সম্পর্কে পরবর্তীকালেও নানা কথা উঠেছে। সেসব সরিয়ে রেখেও নিতান্ত পাথুরে প্রমাণের জোরেই বলা যায় শ্রীনিবাস আচার্যের পূর্বেই মল্লভূমে বৈষ্ণবতার একটা প্রাক্-ইতিহাস আছে। মল্লরাজাদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে শক্তিদেবীর উপাসনার প্রচলন ছিল। মল্লরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ মল্ল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাঁকুড়া ও হুগলি সীমান্তের ৬টি গ্রামের জায়গির লাভ করেন এবং রাজধানী স্থাপন করেন লাউগ্রামে। রঘুনাথ মল্ল গ্রামটি উৎসর্গ করেন কুলদেবী দণ্ডেশ্বরীর উদ্দেশে। লাউগ্রাম মৌজার বার্ষিক আয়ে দণ্ডেশ্বরীর সেবা, উৎসব-অনুষ্ঠান চলত। রঘুনাথ মল্লের পরবর্তী রাজা জয়মল্লের আমলে মল্ল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। দ্বারকেশ্বর নদের তীরের কান্তোড় গ্রামের দেবী ষড়চক্রবাহিনী জয়মল্লের সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং দেবীর পূজার্চনার জন্য রাজা কান্তোড় মৌজার ২৫ বিঘা জমি দান করেন। এগুলি মূলত শক্তিদেবীর উদ্দেশে মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। আরেকটু পরে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মল্লরাজা দুর্জয় মল্ল ও যদুমল্ল শ্যামপুর মৌজায় শ্যামচাঁদ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামচাঁদ বৈষ্ণব দেবতা হলেও

মল্লরাজাদের এই পর্বে দীক্ষিত বৈষ্ণব বলা চলে না। পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবের রাধা-কৃষ্ণ উপাসনার ধরনের থেকেও শ্যামচাঁদের পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব দেবতা হলেও শ্যামচাঁদের পূজায় মৎস্যভোগ নিবেদন করা হয়। ১৩০৯-১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মল্লরাজ জগন্নাথমল্ল সিহড়ে শান্তিনাথ শিবের প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনাথ শিব আদতে জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ।[৬৯] ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বী মল্ল ডিহরে শৈলেশ্বর ও ষাঁড়েশ্বর মন্দির তৈরি করেন। আবার শৈলেশ্বর মন্দিরে দেখা যায় বংশীবাদনরত কৃষ্ণের মূর্তি। ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ পতিত মল্ল বিষ্ণুপুরে একটি জগন্নাথ মন্দির তৈরি করেন। বীর মল্ল ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে একই জায়গায় তৈরি করেন একটি গোপাল মন্দির।[৭০] সম্ভবত এই সময়েই বীরমল্ল রাজহাট বীরসিংহপুরের কাছে দ্বারকেশ্বর নদের বাঁকি গ্রাম সংলগ্ন মৌজায় গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গোপীনাথের উদ্দেশে নির্মিত হয় একটি রেখ দেউল; মৌজাটিও পরিচিত হয় গোপীনাথপুর নামে। বড়জোড়া থানার ঘুটগাড়িয়ায় বীরমল্ল আরেকটি শ্যামচাঁদ বিগ্রহ স্থাপন করেন। দেবতার সম্মানার্থে তৈরি করেন ল্যাটারাইট পাথরের একটি রেখ দেউল। এই রেখদেউলে উড়িষয়ার স্থাপত্যরীতির প্রভাবও আছে। বীরমল্লই বিষ্ণুপুর গড়ের ভিতরে কুলদেবতা অনন্তবিষ্ণুকে প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তবিষ্ণু ও ইন্দ্রধ্বজ পূজার জন্য তিনি অনন্তডিহি, চেঁচুড়, রাধাশ্যামপুর ইত্যাদি মৌজাগুলি দান করেন।[৭১] অনন্তবিষ্ণুর পাশাপাশি ইন্দ্রপূজার জন্যও অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন বীরমল্ল। কেবল বৈষ্ণব দেবতার পূজার্চনা নয়, বীরমল্ল এক্তেশ্বর শিবের মন্দিরেরও প্রতিষ্ঠাতা। এক্তেশ্বরের পূজা-পার্বণের জন্য বীরমল্ল তিনটি মৌজা উৎসর্গ করেন।[৭২] বোঝা যাচ্ছে, মল্লরাজারা বিভিন্ন

---

[৬৯] মাণিকলাল সিংহ, 'মল্লভূমের মল্লরাজা দেবতাদের আদিবৃত্তান্ত', কৌশিকী, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮১, পৃ.২০৫

[৭০] Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal 1486-1900*, Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1st Published, 1985, p.222

[৭১] মাণিকলাল সিংহ, *পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি*, পৃ.১৫১-১৫৫

[৭২] মাণিকলাল সিংহ, 'মল্লভূমের মল্লরাজা দেবতাদের আদিবৃত্তান্ত', পৃ.২০৬

দেব-দেবীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তবে, বীরমল্লের মধ্যে বৈষ্ণবতার প্রতি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। বীরমল্লের পরে তাঁর পুত্র ধাড়ী মল্ল রাজা হলেও বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। বীর হাম্বীর রাজ্য পরিচালনার ভার নেন। বীর হাম্বীরের সময় থেকে মল্লরাজারা ঘোষিত এবং দীক্ষিত বৈষ্ণব। যদি বীর হাম্বীরের রাজসভায় সভাপণ্ডিতের *ভ্রমরগীতা* (মতান্তরে রাসপঞ্চাধ্যায়ী) পাঠের বিবরণটিকে মেনে নিই, তাহলে বুঝতে হবে বীরমল্লের বৈষ্ণবতার প্রতি ঝোঁকটি বীর হাম্বীরের মধ্যেও দেখা যাচ্ছিল।

বীর হাম্বীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মকাল, বিষ্ণুপুরে আগমন বৃত্তান্ত, বীর হাম্বীরের দীক্ষাগ্রহণকাল ইত্যাদি নিয়ে তর্ক আছে। বিভিন্ন মতামতের মধ্যে বিমানবিহারী মজুমদার ও জীমূতবাহন রায়ের সিদ্ধান্তগুলি অনেক জোরালো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দু'জনের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ মতপার্থক্য নেই। এই বিচারে শ্রীনিবাস আচার্যের জন্ম ১৫১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীনিবাস আচার্য সম্ভবত প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রা করেন ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ; তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে শ্রীনিবাস আচার্য বীর হাম্বীরকে দীক্ষা দিয়েছিলেন কি না তা নিয়েও তর্ক আছে। মতপার্থক্য আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যেই। কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থের বয়ান অনুযায়ী বঙ্গদেশ থেকে নীলাচলে যাবার পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরকে শ্রীনিবাস আচার্য দীক্ষিত করেন। জীমূতবাহন রায় এই মতটিকেই সমর্থন করেছেন। বীর হাম্বীরের দীক্ষাগ্রহণকাল সম্ভবত ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ।[৭৩] শ্রীনিবাস আচার্য ও বীর হাম্বীরের বৃত্তান্ত অনেকগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়—কর্ণপূর কবিরাজের *শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য পাদানাং গুণলেশ সূচকম,* মনোহর দাসের

[৭৩] Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal 1486-1900*, p.208-21

অনুরাগবল্লী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দন দাসের *কর্ণানন্দ,* নরহরি চক্রবর্তীর *ভক্তিরত্নাকর* ও *নরোত্তমবিলাস,* নিত্যানন্দ দাস রচিত *প্রেমবিলাস,* তিলকরাম দাসের *অভিরামলীলামৃত*। এই গ্রন্থগুলির সূত্রে আমরা মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের ইতিহাসকে বুঝতে চাইব।

শ্রীনিবাস আচার্য রাঢ়ীয় ঘণ্টেশ্বরী কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতার নাম চৈতন্যদাস। পরিবারে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি ঝোঁক ছিলই। অল্প বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যও একাকী বেরিয়ে পড়েছিলেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের পথে চৈতন্যদেব দর্শন করতে। পথে যেতে যেতেই শ্রীনিবাস চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের খবর পান। খবর শুনেই তিনি আকুল হয়ে পড়েন। তারপরেও মনের জোর সম্বল করে এগিয়ে যেতে থাকেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের পথে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা নীলাচলে গদাধর পণ্ডিতের কাছে *ভাগবত* পাঠের ইচ্ছাও শ্রীনিবাস আচার্যের ছিল। কিন্তু নীলাচলে পৌঁছে শুনতে পান গদাধর পণ্ডিত বয়সজনিত কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। *ভাগবত* পাঠদানে তিনি অপারগ। তিনিই শ্রীনিবাস আচার্যকে নির্দেশ দেন চৈতন্যপার্ষদ গদাধর দাসের সঙ্গে দেখা করতে। গদাধর দাসের সঙ্গে দেখা করে শ্রীনিবাস সব কথা বিস্তারিত জানালে গদাধর তাঁকে নির্দেশ দেন বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ-সনাতনের শরণাপন্ন হতে।[৭৪] এই সূত্র ধরেই শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবন যাত্রা। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগেই রূপ ও সনাতন গোস্বামী প্রয়াত হয়েছেন। যদিও সেই খবর শ্রীনিবাসের কাছে পৌঁছয়নি।[৭৫] বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে জীব গোস্বামীর পরিচয় হয়। জীব গোস্বামীই তাঁকে আলাপ করিয়ে দেন ষড়গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের সঙ্গে। গোপাল ভট্টই তাঁকে দীক্ষা দেন।[৭৬] জীব গোস্বামী

---

[৭৪] হরিদাস দাস(সম্পা.), *শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা,* []: [], [], [], পৃ.৪১-৪২

[৭৫] জীমূতবাহন রায়, শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪, পৃ.৯৯

[৭৬] প্রসন্নকুমার গোস্বামী(সংকলিত), *শ্রীঅভিরামলীলামৃত,* কলিকাতা: জি. সি. বসু এণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৩৭

ও গোপাল ভট্টের কাছে শাস্ত্রানুশীলন করে দক্ষতা অর্জন করা মেধাবী শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের তরফে 'আচার্য' উপাধিও দেওয়া হয়। এরপরে স্বয়ং জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্যকে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তনের এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ও গ্রন্থ প্রচারের আজ্ঞা দেন।[৭৭] বৃন্দাবন থেকে শ্রীনিবাস ১৫৭০ খ্রি. নাগাদ ফিরে আসেন বঙ্গদেশে।[৭৮] ঐতিহাসিক বিচার অনুযায়ী প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রন্থ ইত্যাদি খোয়া যায়নি। কর্ণপূর কবিরাজের *শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য পাদানাং গুণলেশ সূচকম*, নরহরি চক্রবর্তীর *ভক্তিরত্নাকর* ও নিত্যানন্দ দাসের *প্রেমবিলাস*-এ বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে ফেরার পথ বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। সবদিক বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, বৃন্দাবন থেকে বঙ্গদেশে ফেরার পথে গ্রন্থ চুরি যায়নি। বরং, গ্রন্থ চুরি গিয়েছিল বঙ্গদেশ থেকে নীলাচলে যাবার পথে। কর্ণপূর কবিরাজের রচনাতেও তেমনই উল্লেখ আছে। যদুনন্দন দাসের *কর্ণানন্দ*-এও এই বিবরণের সমর্থন মিলবে। আসলে বৃন্দাবন থেকে নীলাচলের পথে বিষ্ণুপুর পড়ে না। তবে, বঙ্গদেশ থেকে নীলাচল যেতে গেলে বিষ্ণুপুর হয়ে যাওয়া সম্ভব। চৈতন্যদেব থেকে শুরু করে অন্যান্য বৈষ্ণব তীর্থযাত্রী ও সন্তরা যে পথে বঙ্গদেশ থেকে নীলাচলে যেতেন সেই পথটি শ্রীনিবাস বেছে নেননি। বনবিষ্ণুপুরের পথটি বেছে নেওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীনিবাসের নীলাচলে যাত্রাকালে বায়াজিদ কারনানি ও দাউদ কারনানির রাজত্ব চলছিল। দাউদের রাজত্বকালে বাংলার শাসকদের সঙ্গে মুঘল রাজশক্তির সংঘর্ষ শুরু হয়। এইসময় রাজা তোডরমল্ল যুদ্ধের কারণে বর্ধমান থেকে মান্দারণে এসে পৌঁছান। যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই সম্ভবত শ্রীনিবাস প্রচলিত পথ ছেড়ে বনবিষ্ণুপুরের পথ ধরেছিলেন।[৭৯] এই বিষ্ণুপুরের কাছেই শ্রীনিবাস আচার্যের বইপত্র খোয়া যায় এবং বই খুঁজতে খুঁজতে শ্রীনিবাস

[৭৭] হরিদাস দাস(সম্পা.), *শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা*, পৃ.৪৭-৪৮

[৭৮] জীমূতবাহন রায়, শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, পৃ.১১৭

[৭৯] তদেব, পৃ.১৫১-১৫২

এসে পৌঁছান রাজদরবারে। রাজদরবারে তখন সভাপণ্ডিতের *ভ্রমরগীতা* (মতান্তরে রাসপঞ্চাধ্যায়ী) পাঠ চলছিল। শ্রীনিবাসের সেই ব্যাখ্যা মনঃপুত হয়নি। তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীমত অনুযায়ী শাস্ত্রব্যাখ্যা করে রাজার মন জিতে নেন। বিহ্বল রাজা সপরিবারে দীক্ষা নেন তাঁর কাছে।[৮০]

বৃন্দাবন থেকে ফেরার পর শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যকুল এমনিতেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বীর হাম্বীরের সঙ্গে যোগাযোগের পর তাঁর ভক্তসংখ্যা এবং সমৃদ্ধি দুইই বৃদ্ধি পায়। কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় দেখা যাচ্ছে মল্লভূমের বহু লোক শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব নিয়েছিল।[৮১] রাজগুরু হওয়ার সুবাদে সমৃদ্ধিও বেড়েছিল পাল্লা দিয়ে। বীর হাম্বীর রাজগুরুর সম্মানার্থে বিষ্ণুপুরে একটি বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস আচার্যের সেবা ও অভ্যর্থনার কোনদিনই অভাব হয়নি।[৮২] নরহরি চক্রবর্তীর *নরোত্তমবিলাস*-এর তৃতীয় বিলাসে বীর হাম্বীর প্রসঙ্গ আছে। দেখা যাচ্ছে, বীর হাম্বীর গ্রহরত্ন উপহার দিয়ে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব নিচ্ছেন।[৮৩] কর্ণানন্দ-এর মতে বীর হাম্বীর রাজগুরুর কাছে 'সব রাজ্য ব্যবহার' সঁপে দিয়েছিলেন।[৮৪] বীর হাম্বীর ও শ্রীনিবাস আচার্যের প্রসঙ্গ সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে আছে নরহরি চক্রবর্তীর *ভক্তিরত্নাকর*-এ। এই বইয়ের সপ্তম তরঙ্গে দেখা যাচ্ছে, কেবল শ্রীনিবাস আচার্য নয়; বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহলের সঙ্গেও বীর হাম্বীর যোগাযোগ রাখছেন। বৃন্দাবনের গোবিন্দদেব, গোপীনাথ ও মদনমোহন মন্দিরের জন্য বিপুল পরিমাণ দ্রব্য গাড়ি ভর্তি করে পাঠাচ্ছেন

---

[৮০] *ভক্তিরত্নাকর* মতে দীক্ষান্তে রাজার নাম হয় চৈতন্যদাস। *প্রেমবিলাস*-এ অবশ্য রাজার দীক্ষাপরবর্তী নাম হরিচরণ দাস। দ্র. নিত্যানন্দ দাস, *প্রেমবিলাস*, কলিকাতা: যশোদালাল তালুকদার, প্রথম প্রকাশ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ.১০১

[৮১] হরিদাস দাস(সম্পা.), *শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা*, পৃ.৫২

[৮২] মনোহর দাস, *অনুরাগবল্লী*, কলিকাতা: তড়িৎকান্তি বিশ্বাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪২৪ শ্রীগৌরাব্দ, পৃ.৯৫

[৮৩] "গ্রহরত্ন দিয়া রাজা লইলা শরণ।/ গোষ্ঠীসহ হইলা মহাভক্তি পরায়ণ।।", নরহরি চক্রবর্তী, *নরোত্তমবিলাস*, শ্রীচৈতন্যডোবা: শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.২০

[৮৪] যদুনন্দন দাস, *কর্ণানন্দ*, মুর্শিদাবাদ: রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, প্রথম প্রকাশ, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৬

মল্লরাজা। বৃন্দাবনে এই ঘটনায় বীর হাম্বীরের যথেষ্ট খ্যাতিবৃদ্ধি হয়েছিল। তাঁর পাঠানো দ্রব্যগুলি জীব গোস্বামী সযত্নে উপযুক্ত জায়গায় বণ্টন করে দেন।[৮৫] স্বাভাবিকভাবেই কিছুদিন পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীর প্রশংসাসূচক চিঠি রাজার কাছে এসে পৌঁছায়।[৮৬] শ্রীনিবাস আচার্য অবশ্য পাকাপাকিভাবে বিষ্ণুপুরে থাকতে শুরু করেননি। যাজিগ্রামের বসতবাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু, সদ্য বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য কিছুদিনের জন্য বিষ্ণুপুর ছেড়ে গেলেও অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়তেন। প্রথমবার যখন রাজগুরু শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুর ছেড়ে যাজিগ্রামে যাওয়া মনস্থ করেন তখন বীর হাম্বীর আকুল হয়ে পড়েছিলেন। বীর হাম্বীরের ভক্তিপ্রাণতায় এই পর্বে শ্রীনিবাস আচার্যের সমৃদ্ধিলাভের স্পষ্ট বিবরণ আছে *ভক্তিরত্নাকর*-এ।[৮৭]

কিছুদিন যাজিগ্রামে থেকে শ্রীনিবাস আচার্য আবার বনবিষ্ণুপুরে এলে রাজা যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। এই পর্বেই ভক্তিশাস্ত্রে রাজার অধিকার দেখে শ্রীনিবাস রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। কলিতে নামসংকীর্তনই কর্তব্য; অত এব রাজাকে হরিনাম জপ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলেন। রাজার বৈষ্ণব শাস্ত্র ও বিধি শিক্ষার ভার দিলেন শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের উপর। বীর হাম্বীরের স্ত্রী সুলক্ষণাও পুত্রসহ দীক্ষা নিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে। বীর হাম্বীরের শ্রীনিবাসের প্রতি ভক্তি আশপাশের ভূম রাজ্যের রাজাদেরও মনোযোগ কেড়েছিল। শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ শ্রীনিবাসের শিষ্য হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল রামভক্তিতে।

---

[৮৫] নরহরি চক্রবর্তী, *ভক্তিরত্নাকর*, মুর্শিদাবাদ: রামদেব মিশ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪২৬ চৈতন্যাব্দ, পৃ.৫০২

[৮৬] তদেব, পৃ.৫৬৫

[৮৭] তদেব, পৃ.৫১৮

শ্রীনিবাস আচার্যের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত এক দক্ষিণ ভারতীয় গুরু রামমন্ত্রে হরিনারায়ণের দীক্ষা দেন।[৮৮]

শ্রীনিবাস আচার্য যাজিগ্রামে থাকাকালীন বীর হাম্বীর গুরুদর্শন করতে এসেছিলেন। *ভক্তিরত্নাকর* জানাচ্ছে আচার্যদর্শনে উপহারসামগ্রীর অভাব ছিল না। যাজিগ্রামে গুরুর সান্নিধ্যে থাকতে পেরে রাজার বিষ্ণুপুরে যাবার মন নেই। এই সময়ে খবর আসে নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গোপীনাথ-রাধার যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। শ্রীনিবাস আচার্য এবং কিছু শিষ্যকেও সেখানে যেতে হবে। এই উপলক্ষে শ্রীনিবাস শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজকে রাজা সহস্র মুদ্রা দান করেছিলেন।[৮৯] রাণী সুলক্ষণাও বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি দান করেন আচার্য পত্নীকে।[৯০] আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বিতীয় বিবাহ। এই বিবাহে রাজা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।[৯১] রাজপরিবারের সান্নিধ্যে বিপুল বিলাসে থেকে শ্রীনিবাস আচার্য ধর্মপথ থেকে সরে গেছেন—এমন আশঙ্কাও বৃন্দাবনের কোন কোন গোস্বামীর ছিল।[৯২]

মল্লভূমের রাজাদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। সমসাময়িক ভূম রাজ্যগুলির মধ্যে মল্লরাজারাই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। বীর হাম্বীরের পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম এই সমৃদ্ধি ধরে রাখতে পেরেছিল। মুঘলদের বাংলা দখলের পর্বে বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে প্রতিহত করতে বীর হাম্বীরের সহায়তার প্রতিদান মুঘলরা উপযুক্তভাবেই দিয়েছিলেন। মানসিংহ বীর হাম্বীরকে ১২টি জমিদারি ও ২৯টি কেল্লা প্রদান করেন।[৯৩] আকরিক সম্পদের প্রাচুর্য মল্লভূমে

---

[৮৮] তদেব, পৃ.৫৮০-৫৮৩

[৮৯] তদেব, পৃ.১০০৫

[৯০] তদেব, পৃ.১০০৯

[৯১] তদেব, পৃ.১০১৪

[৯২] প্রভাতকুমার সাহা, 'বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজপরিবার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম', ঐতিহাসিক: প্রবন্ধ সংকলন ৬, ১৯৭৮, পৃ.১৮

[৯৩] মাণিকলাল সিংহ, *পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি*, পৃ.১৬২-১৬৩

ছিলই। উপরন্তু, মল্লভূম হয়ে উঠেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। তন্তুবায়, রাজমিস্ত্রি, তাম্বূলী, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক, শঙ্খবণিক ইত্যাদি শিল্পী, কারিগর ও বণিকগোষ্ঠী মল্লভূমে বসতি গড়ে তুলেছিল। জাতিগুলির থাক লক্ষ করলে দেখা যায় বেশিরভাগ জাতিই বাইরে থেকে এখানে এসেছে। বিশেষ করে প্রসিদ্ধি ছিল বিষ্ণুপুরের রেশম, শঙ্খ ও লাক্ষা শিল্পের। অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি উদ্বৃত্ত দ্রব্য পৌঁছে যেত মল্লভূমের সীমানার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে; অনেক রাজদরবারে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিষ্ণুপুরের বণিকের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যযাত্রার কথা পাওয়া যায়।[৯৪] এই অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিকে মল্লরাজারা বৈষ্ণবধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজে লাগিয়েছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম আর মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিষ্ণুপুরের রাজারা প্রচুর দেবোত্তর আর ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেছিলেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দেওয়া হয়েছিল। গোপাল সিংহ আর চৈতন্য সিংহের সময়ে রটে গিয়েছিল যে ব্রাহ্মণের রাজপ্রদত্ত নিষ্কর জমি নেই, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণই নন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রচুর টোল আর চতুষ্পাঠী। প্রতিটি টোলের জন্য ভূমিদান করা হয়েছিল। শেষদিকে মল্লরাজারা ভূমিদান করতে করতে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন।[৯৫] অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি নথি থেকে জানা যাচ্ছে ৭৩১৪টি গ্রাম ছিল নিষ্কর।[৯৬] এমনকি, উনিশ শতকেও দেখা যাচ্ছে, বিষ্ণুপুরের ৪২.২% জমি নিষ্কর জমি হিসাবে মূলত ব্রাহ্মণরাই ভোগ করছেন।[৯৭]

অবশ্য মল্লরাজারা বৈষ্ণবভক্তিতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলেন—এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই। বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁদের যথেষ্টই বজায় ছিল; থাকাটাই স্বাভাবিক।

---

[৯৪] প্রভাতকুমার সাহা, *বৈষ্ণব-কথা: বিষ্ণুপুর*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, পৃ.১২৭-১২৯

[৯৫] চিত্তরজন দাশগুপ্ত, 'মল্লরাজ্য বিষ্ণুপুর', প্রত্ন পরিক্রমা: মল্লভূম, ৩য় সংখ্যা, ২০০৮, পৃ.১২৪

[৯৬] প্রভাতকুমার সাহা, 'বিষ্ণুপুরের মধ্যযুগের মন্দির: কিছু কথা, প্রত্ন পরিক্রমা: মল্লভূম, ৪র্থ সংখ্যা, ২০০৯, পৃ.১১৩

[৯৭] Ratnalekha Ray, *Change in Bengal Agrarian Society c.1760-1800*, Delhi: Manohar, 1st Published, 1979, p.111

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। ওন্দা থানার মাজদিহা গ্রামের কনকলতা মন্দির সম্পর্কে একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রস্তুত করেছিলেন শর্মিলা সাহা ও রজত সান্যাল। কনকলতা মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল **১৬৬৩** খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ সিংহের জমানায়। জনৈক বীরভদ্রের পুত্রবধূ দেবকী মন্দিরের জন্য জমিটি দান করেছিলেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালেখে মল্লাব্দের উল্লেখ আছে। মল্ল আধিপত্যকে স্বীকার করে ব্যক্তিগত দানে মল্লভূমে মন্দির প্রতিষ্ঠার গুটিকয়েক উদাহরণের মধ্যে এটি একটি। বিষ্ণুপুর থেকে মন্দিরটি যথেষ্ট দূরে অবস্থিত। ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ জনপদের কাছে মন্দিরটি গড়ে উঠেছিল। মল্ল কর্তৃত্বকে স্বীকার করা বিত্তশালী বৈষ্ণব ভক্তের মাধ্যমে এহেন অঞ্চলে বৈষ্ণব মন্দির পত্তনের বিশেষ তাৎপর্য ছিল। দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী এই অঞ্চলে আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের আগ্রহ ছিল মল্ল রাজশক্তির। প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ বসতি তৈরি হলে রাজস্ব আদায়ের অনেক সুবিধা হবে। দ্বারকেশ্বর নদীর কারণে এই অঞ্চলের বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধের একটা স্বাভাবিক সুবিধা ছিল। উপরন্তু, খারাপ পরিস্থিতিতে বহিঃশত্রুকে ঠেকাতে স্থানীয় মানুষের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যও পাওয়া সম্ভব। নানাবিধ কৌশলগত কারণে এই অঞ্চলে মন্দির স্থাপন মল্ল রাজশক্তির অভিপ্রেত ছিল। জয়পুর বনাঞ্চলের কাছে নির্মিত জোড়ামন্দির বা তালড্যাংরার রামকৃষ্ণ মন্দির, যাদবনগরের যাদব-রাই মন্দিরকেও আমরা এই দৃষ্টিতে দেখতে পারি।[৯৮] মন্দির স্থাপন মল্লরাজাদের কাছে কেবল বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের উপায় হয়ে ছিল না; অর্থনৈতিক দিক থেকেও মল্লরাজাদের কাছে বৈষ্ণবধর্মের কার্যকারিতা ছিল। ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও কি বৈষ্ণবধর্মের কার্যকারিতা ছিল না? সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

[৯৮] Ratnabali Chatterjee, *Urbanity and Economy: The Pre Modern Dynamics in Eastern India*, Calcutta: Suchi, 1st Edition, 2014, pp.172-175

বিষ্ণুপুরের রাজাদের আরাধ্য দেবতা মদনমোহন। মদনমোহন সংক্রান্ত দুটি পুথি পাওয়া যায়—মদনমোহনের আদ্যকথা ও মদনমোহন বন্দনা। দেখা যাক, এই দুটি রচনায় বৈষ্ণবতা ও ক্ষত্রিয়ত্ব কীভাবে জুড়ে গেছে? মল্লরাজাদের পারিবারিক বিবরণী ইত্যাদিতে রাজপুত উৎস সংক্রান্ত কিংবদন্তিটি আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। উত্তর ভারতের রাজপুত-ক্ষত্রিয় পরিবারের রাজা আর রাণী তীর্থে যাচ্ছিলেন। পথে সন্তানের জন্ম হল। পিতা চলে গেলেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে। মায়েরও খোঁজ পাওয়া গেল না। এই বিবরণটি 'মদনমোহনের আদ্যকথা' পুথিতেও আছে। যোগ হয়েছে কেবল একটি বিষয়। সদ্যোজাত পিতৃ-মাতৃহীন ক্ষত্রিয় সন্তানটিকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং মদনমোহন—'কে তাহারে মারে যাকে রাখে ভগবান'![৯৯] লক্ষণীয়, বৈষ্ণব পুথিতেও তাহলে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিটি জোরের সঙ্গেই সমর্থিত হচ্ছে। আর ক্ষত্রিয়ত্বের দাবির সঙ্গেই জুড়ে নেওয়া হচ্ছে বৈষ্ণব দেবতা মদনমোহনকে। আবার, ক্ষত্রিয়ত্বের কেন্দ্রে রয়েছে রাজশক্তি; রাজা আর রাজত্বকে ঘিরেই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি আবর্তিত হচ্ছে। 'মদনমোহন বন্দনা' পুথিতে দেখা যাচ্ছে, বহিঃশত্রুর আক্রমণে যখন শিখরভূম সহ অন্যান্য ভূম রাজ্যের রাজারা পিছু হটছেন তখনও মদনমোহনের কৃপায় মল্লরাজ অটল। বহিঃশত্রুর সামনে মাথা না নোয়ানোর এই 'বীরদর্পী' (?) ক্ষত্রিয়ত্বে সহায় বৈষ্ণব দেবতা মদনমোহন।

সংগতভাবে মনে করতে পারি, বৈষ্ণবসমাজের প্রতি প্রবল পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার একটি সম্পর্ক আছে। বৈষ্ণবতার সূত্র ধরে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদ মল্লভূমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও ছিল। মল্লরাজারা ছিলেন বাগদি। রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল সামরিক শক্তিই যথেষ্ট ছিল না; প্রয়োজন ছিল ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার, উচ্চবর্ণের পরিচিতির। মল্ল রাজশক্তিকে আরেকটি রাজনৈতিক অসুবিধার মুখোমুখি

[৯৯] দীপঙ্কর দাস(সম্পা.), *গবেষক হেমেন্দ্রনাথ পালিত এবং তাঁর সংগৃহীত পুঁথি*, কলকাতা: দিবারাত্রির কাব্য, প্রথম প্রকাশ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৩১

হতে হচ্ছিল মাল, ভূমিজ, ডোম, বাগদিদের থেকে। স্থানীয় রাজনীতি এঁরা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন। সর্দার বা ঘাটোয়াল হিসাবে নিযুক্ত এইসমস্ত জনজাতির লোকেদের ক্ষমতা স্বশাসিত শাসক বা গোষ্ঠীপতির মতোই ছিল। স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ায় স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য রাজারা এঁদের প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করতেন। কিন্তু, প্রশাসনিক পদের দৌলতেই এঁদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যেত। অনেকক্ষেত্রেই রাজার নিরঙ্কুশ আধিপত্যে এঁরা বাধা তৈরি করেছেন। পাশাপাশি, মল্লরাজাদের বাগদি উৎস বিষয়ক জনরবের কারণেও অন্ত্যজ মাল, বাগদি, ভূমিজ গোষ্ঠীপতিদের থেকে একপ্রকার 'চ্যালেঞ্জ' এর আশঙ্কা ছিল। এই অবস্থায় এই জনগোষ্ঠীর উপর শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠা এবং কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য মল্লরাজাদের প্রয়োজন ছিল উচ্চবর্ণের মর্যাদা।[১০০] মল্লরাজারা দেখেছিলেন, ডোম, বাগদি, ভূমিজ, মালরা ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আত্তীকরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বৃত্তে ঢুকতে চাইছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মৌল বিশ্বাসগুলিকে স্বীকার করে নিচ্ছে ক্রমশ। এই অবস্থায়, মল্লরাজারা নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে প্রতিস্পর্ধী এই গোষ্ঠীগুলির উপর অনেকখানি সামাজিক ও নৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারবেন। প্রতিস্পর্ধী গোষ্ঠীগুলির পক্ষে আর মল্লরাজাদের নিজেদের সমমর্যাদাভুক্ত বলে মনে করার সুযোগ পাবে না। ক্ষত্রিয়ত্ব তাঁদের একটা উচ্চ সামাজিক আসন দেবে। সেই কাজে সহায়ক হতে পারে বৈষ্ণবধর্ম। ঠিক এই জায়গাতেই আমরা আরেকটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইব। মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে মল্লরাজাদের মিত্রতা ছিল। মুঘলদের সংস্পর্শে এসে মল্লরাজাদের সমৃদ্ধিও বেড়েছিল অনেখানি। তৎসত্ত্বেও, সামাজিক মর্যাদার খোঁজে মল্লরাজারা বৃহত্তর রাজশক্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করলেন না কেন? ঊর্দ্ধতন শাসকের ধর্ম গ্রহণও তো হতে পারত উচ্চ সামাজিক মর্যাদা

[১০০] আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ, *ইতিহাস অনুসন্ধান(১০ খণ্ড)*, কলিকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১১৯৫, পৃ.২৭০-২৭১

লাভের পথ। এখানেই, মল্লরাজারা তাঁদের অধীনস্থ ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক ধারণার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রতিস্পর্ধী মাল, ভূমিজ, বাগদি গোষ্ঠীর সর্দার, ঘাটোয়াল, মণ্ডলরা প্রবেশ করতে চাইছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের বৃত্তে। তাঁদের কাছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকৃত একটি উচ্চ সামাজিক পরিচয়ই হতে পারত মল্লরাজাদের সামাজিক ও নৈতিক কর্তৃত্বলাভের পথ। বরং, এই প্রতিস্পর্ধী গোষ্ঠীগুলির কাছে একজন 'বিধর্মী' শাসকের উপস্থিতি তাঁদের বিরোধিতা আরও বাড়িয়ে দিতে পারত। উপরন্তু, মল্লভূম ছিল 'হিন্দু' প্রধান। বাইরে থেকেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থরা এসে বসতি তৈরি করেছিলেন মল্লভূমে। 'বিধর্মী' শাসক হিসাবে এই জনগোষ্ঠীর উষ্মা উদ্রেক করার কোন অভিপ্রায় মল্লরাজবংশের ছিল না। ফলত, বৈষ্ণবতার সূত্র ধরে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল অনিবার্য।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি দান-ধ্যানে মল্লরাজাদের কার্পণ্য ছিল না। বৈষ্ণব সমাজের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের অন্যান্য শক্তিশালী ধর্মমতকে উপেক্ষা করছিলেন মল্লরাজারা? এই কারণে কি সাম্রাজ্যের ক্ষতি হচ্ছিল? বিশেষ করে ধর্মপূজক গোষ্ঠীর থেকে কি মল্লরাজারা দূরে সরে যাচ্ছিলেন? এমন একটা সম্ভাবনার কথা হিতেশরঞ্জন সান্যাল শুনিয়েছেন।[১০১] ধর্মপূজক গোষ্ঠী মল্লভূমে বরাবরই সক্রিয়; তাঁদের কটাক্ষ ছিল মল্লরাজাদের অতিরিক্ত বৈষ্ণবতার প্রতি।[১০২] কিন্তু, মল্লরাজাদের তরফে ধর্মপূজায় পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। *ধর্মমঙ্গল* রচয়িতা প্রভুরাম ও দ্বিজ রামচন্দ্র মল্লরাজা গোপাল সিংহের কাছ থেকে ভূমিদান পেয়েছিলেন। বৈতালের বাঁকুড়া রায় ধর্ম মন্দিরটিও সম্ভবত কোন এক মল্লরাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি।[১০৩] *ধর্মমঙ্গল*-এর আরেক

---

[১০১] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ.২০৬

[১০২] রূপরামের *ধর্মমঙ্গল*-এ আছে—"রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী/ পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী।/ চারা মানে হাথিকে ঘোড়াকে মানা ঘাস,/ দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস।" একাদশীতে রাজার সঙ্গে যেন পোষ্য জন্তুরাও উপবাস করত। দ্র. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি(১ম খণ্ড)*, কলিকাতা: পুস্তক প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫০, পৃ.৭৯

[১০৩] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ.২০৬

কবি সীতারাম দাসও মল্লরাজাকে প্রণতি জানিয়েছেন।[১০৪] ফলে, মল্লরাজাদের সঙ্গে ধর্মপূজক গোষ্ঠীর সম্পর্ক একেবারে চুলোয় যায়নি। তবে এটাও ঠিক যে, মল্লরাজাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতার স্রোতটি ছিল বৈষ্ণবধর্ম অভিমুখী। বৈষ্ণবধর্ম মল্লরাজবংশকে দিচ্ছিল মার্গ সংস্কৃতির ছোঁয়া। ক্ষত্রিয়ত্ব ও আভিজাত্য নির্মাণের প্রক্রিয়ায় তাকে উপেক্ষা করার কোন জো ছিল না। সেই প্রক্রিয়াটিকে পরবর্তী অংশে আমরা বিশদে লক্ষ করব।

৪.৪ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও মল্ল রাজবংশ: ক্ষত্রিয় মর্যাদার দাবি ও সাংস্কৃতিক নির্মিতি

বিখ্যাত রাজদরবারগুলির পরিচিতি কেবল সাম্রাজ্যবিস্তারের দৌলতে নয়, রুচিসম্মত, অভিজাত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্যও। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে বিখ্যাত রাজশক্তিগুলির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনার সচেতন প্রয়াস ছিল। মুঘল রাজদরবারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মুঘল সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজপুত দরবারগুলিতেও সেই চেষ্টা ছিল। আমাদের আলোচ্য কালপর্বে মুঘল ও রাজপুতরাই ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক শক্তি। একইসঙ্গে অভিজাত রাজরুচির পরাকাষ্ঠা। মুঘল-রাজপুত সংস্কৃতির চরিত্রগুলি আত্তীকরণ করে মুঘল শাসন থেকে দূরে থাকা প্রান্তবর্তী রাজসভাগুলিও 'জাতে' উঠতে চেয়েছিল। বিশেষত যেসমস্ত প্রান্তবর্তী রাজসভার সঙ্গে মুঘল-রাজপুত শক্তির সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ ছিল, সেখানে এই প্রবণতা বেশি করে দেখা যায়। মল্লভূমের রাজারা নিজেদের রাজপুত-ক্ষত্রিয় বলে বলে দাবি করতেন। মুঘল ও রাজপুত শক্তির সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। অভিজাত সংস্কৃতির চর্চার আগ্রহ তাঁদের মধ্যেও প্রবলভাবে দেখা যায়। উত্তর

[১০৪] বন্দনা অংশে সীতারাম দাস লিখেছেন-'বিষ্ণুপুরের শিব বন্দো আর মল্লেশ্বর'। এই মল্লেশ্বর সম্ভবত কবির সমসাময়িক মল্লরাজা তৃতীয় দুর্জন সিংহ। কবি দেবতার সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে মল্লরাজাকে বন্দনা করেছেন। দ্র. পল্লবী হালদার, 'সীতারাম দাস বিরচিত ধর্মমঙ্গল: সবিমর্শ আলোচনা', ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অপ্রকাশিত এম.ফিল গবেষণা সন্দর্ভ, ২০২০, পৃ.৩২, ৭০

ভারতের মার্গ সংস্কৃতির ছোঁয়ায় তাঁরা কৌম, আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে টপকে সর্বভারতীয় মার্গ সংস্কৃতির অংশীদার হতে চেয়েছিলেন।[১০৫] বৈষ্ণব ধর্মও মল্লরাজাদের এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লক্ষণীয়, রাজপুত কেবল একটি বংশগত পরিচয় নয়; একটি সাংস্কৃতিক পরিচয়ও বটে। সেই সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ধরতে না পারলে বংশগত পরিচয় নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায়। রাজপুত ঘরানার সাংস্কৃতিক চরিত্র নির্মাণ একারণেই জরুরি। সঙ্গে অনিবার্যভাবেই আসে মুঘল সংস্কৃতি। বৈষ্ণবধর্মও। মুঘল, রাজপুত আর বৈষ্ণবধর্মের ত্র্যহস্পর্শ এবং মল্ল সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগাযোগ বুঝতে গেলে বৃন্দাবনের দিকে চোখ ফেরাতে হবে।

ষড়গোস্বামীর অন্যতম রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। চৈতন্যদেবের সূত্রেই বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তত্ত্বচর্চার প্রধানতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বৃন্দাবন চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের অন্যতম তীর্থক্ষেত্রও। গোবিন্দদেব মন্দিরকে বৃন্দাবনের প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দদেব মন্দির সহ বৃন্দাবনের অন্যান্য কিছু বৈষ্ণব মন্দির সম্রাট আকবরের থেকে রাজকীয় দান পায়। কছওয়া বংশীয় অম্বরের রাজা ভার মল্লের কন্যার সঙ্গে আকবরের বিয়ে হয়েছিল। ভার মল্লের অনুরোধে এবং আকবরের নির্দেশে তোডরমল মদনমোহন ও গোবিন্দ মন্দিরের সেবক গোপালদাসকে ১০০ বিঘার জায়গির দান করেন। গোবিন্দদেব এবং সংলগ্ন মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে তিনটি গোষ্ঠীর যোগাযোগ দেখা যাচ্ছে—চৈতন্য সম্প্রদায়, মুঘল রাজশক্তি ও কছওয়া রাজপুত। কছওয়া বংশীয় রাজপুতদের সঙ্গে মুঘল রাজশক্তির বরাবরই খুব ভালো সম্পর্ক। মানসিংহ আকবরের সমকালে মুঘল দরবারে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। কছওয়া রাজপুতদের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়েরই সুসম্পর্ক ছিল; কিন্তু কালক্রমে তাঁরা চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত

[১০৫] Kumkum Chatterjee, 'Cultural Flows and Cosmopolitanism in Mughal India: The Bishnupur Kingdom', Indian Economic and Social History Review, Vol.46, No.2, 2009, pp.148-149

হয়ে পড়েন।[১০৬] ব্রজধামের বৈষ্ণব মন্দিরের সঙ্গে কছওয়া বংশীয়দের দৃঢ় যোগাযোগ ছিল। মানসিংহ গোবিন্দদেব মন্দিরকে আরও বড়ো চেহারা দেন। বৃন্দাবনে কছওয়া রাজপুতদের দানশীলতার প্রসিদ্ধি যথেষ্ট।[১০৭] লক্ষণীয়, মানসিংহের সঙ্গে বীর হাম্বীরের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীনিবাস যেসময়ে বৃন্দাবনে ছিলেন, সেসময়েই জায়গির দান, রাজপুত পৃষ্ঠপোষকতা ঘটছে। শ্রীনিবাস আচার্যের সূত্রে বৃন্দাবনের চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রতি রাজপুত দানশীলতার বিবরণ জানা বীর হাম্বীরের পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। রাজপুত সংস্কৃতির সঙ্গে দানশীলতা, মন্দির স্থাপনের সম্পর্ক বীর হাম্বীর নিশ্চয় বুঝেছিলেন। মনে রাখতে হবে, বীর হাম্বীর কিন্তু প্রথম থেকেই বৃন্দাবনে দান-ধ্যান করে গেছেন।

এপ্রসঙ্গে খেয়াল রাখা দরকার সামাজিক সচলতাগত পরিবর্তনের তিনটি মাত্রা আমরা বুঝতে চেয়েছি—পরিবর্তনের কারণ, পরিবর্তনের অভিব্যক্তি, পরিবর্তনের তীব্রতা। সুবর্ণবণিক বা সদগোপের মতো একটি গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার চেষ্টার সঙ্গে মল্ল রাজপরিবারের সামাজিক সচলতার প্রচেষ্টার ফারাক থাকবেই। কেবল ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না; রাজোচিত অভিজাত সংস্কৃতিও তৈরি করতে হবে প্রধান এবং পার্শ্ববর্তী রাজশক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য। রাজবংশের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে সেই চেষ্টা চালাতে হবে। কেবল মন্দির স্থাপন করলে হবে না; সামগ্রিকভাবে মার্গ সংস্কৃতির একটি মানদণ্ড হয়ে উঠতে হবে। বিষ্ণুপুরের রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবির সঙ্গে সাংস্কৃতিক নির্মিতির এই প্রক্রিয়াটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাংস্কৃতিক নির্মিতিটিকে বুঝতে গেলে বিষ্ণুপুরের মন্দির স্থাপত্য, ধ্রুপদ গানের ঘরানা, পুথিচিত্র-পাটাচিত্রের জগৎ, দশাবতার তাস ইত্যাদির দিকে তাকাতে হবে।

---

[১০৬] Monika Hortsmann, *In Favour of Govinddevji*, New Delhi: Manohar, 1st Published, 1999, pp.1-2

[১০৭] তদেব, পৃ.৭

চিত্রকলা শৈলীর সঙ্গে মন্দির টেরাকোটার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। মন্দির স্থাপত্যের আলোচনার আগে চিত্রকলা সম্পর্কে আলোচনা জরুরি। মানসিংহের সূত্রেই সম্ভবত মুঘল-রাজপুত সংস্কৃতি এবং রাজস্থানের দিকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে বাঙালির নজর পড়ে। রাজস্থানি চিত্রকলা এবং রাজপুত-মুঘল চিত্ররীতির প্রভাব বাংলার চিত্রকলায় লক্ষ করা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিষ্ণুপুর শাখায় সংগৃহীত পাটাচিত্র, পুথিচিত্রের দিকে তাকালেই বিষয়টা বোঝা যাবে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকার একটি সংখ্যায় বাঁকুড়ার কিছু ছবি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। রাখালদাস আলোচিত প্রথম চিত্রে ঘনপাতায় ভরা গাছ-গাছালির উপরে মেঘময় আকাশ, নিচে পূজারত রাজা এবং রাজার পিছনে দুই হাতে দুই পদ্ম নিয়ে বসে থাকা নারীর গায়ে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের ওড়না—রাজপুত-মুঘল চিত্রের প্রভাবের নমুনা। তৃতীয় ছবিটিতে মুঘল-রাজপুত প্রভাব আরও বেশি। মেঘপূর্ণ আকাশের নিচে সুদৃশ্য দো'তলা বাড়ি। বাড়ির চূড়াগুলি মিনারের মতো। বাড়ির তৈজসপত্রেও মুঘল সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। বাড়িটিতে মুঘল-ফারসি রীতির মিনিয়েচারের ধরনে লতাফুল আর জ্যামিতিক নক্সার বিন্যাস লক্ষণীয়। ছবিটি সম্ভবত একটি রাগিণীচিত্র।[১০৮] রাগিণীচিত্র বা রাগমালার ছবি বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাবে। মৃন্ময়ীদেবীর মন্দিরের স্তম্ভে টোড়ী রাগের একটি মূর্তি আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিষ্ণুপুর শাখায় সংগৃহীত অন্তত ৪০টি পাটাচিত্র রাগমালার অনুরূপ।[১০৯] পাটাচিত্রে নায়ক-নায়িকার পোশাক দেখলেও রাজপুত প্রভাব আঁচ করা যায়। রাজপুত চিত্রকলার মতোই নারী বেশ কিছু পাটাচিত্রে ঘাঘরা এবং চোলি পরিহিত; বুকের কিছু

[১০৮] চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, *বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা*, পৃ.৪৩-৪৫

[১০৯] মাণিকলাল সিংহ, পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃ.১৯৩

অংশ নিরাবরণ। মাথায় স্বচ্ছ ওড়না। পাটাচিত্রে রাধা-কৃষ্ণের বেশবিন্যাসে এই ধরনটি আছে।[১১০]

মুঘল-রাজপুত চিত্রকলার ছাপ মল্লভূমের মন্দির স্থাপত্যেও আছে। মুঘল চিত্ররীতির বৈশিষ্ট্য—পোর্ট্রেট। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের একটি টেরাকোটা প্যানেলে রাজা, আমির-ওমরাহদের মুখে পোর্ট্রেট ধাঁচের বিভিন্ন ভাব লক্ষ করা যায়। মুঘল চিত্ররীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'অ্যাকশন চিত্র'। আকবরের সময় থেকেই মুঘল চিত্রকলায় এই ধরনটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষ্ণুপুরের মন্দিরের টেরাকোটা প্যানেলগুলিতে যুদ্ধ আর শিকারের দৃশ্যের রূপায়ণে চরিত্রগুলির দেহভঙ্গিমায় গতিশীলতা স্পষ্ট। এই ধাঁচটিকে তাত্ত্বিকরা মুঘল চিত্রশৈলীর অনুসরণ বলেই মনে করেন।[১১১] বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটায় গুজরাতি ছবির ছাপও আছে। গুজরাতি চিত্রকলা প্রাক-মুঘল যুগের বিশিষ্ট চিত্রকলা তো বটেই; রাজপুত চিত্রকলাতেও গুজরাতি উপাদানের প্রতিগ্রহণ বিপুল। নারীদেহে এক্ষেত্রে ঘাঘরার পরিবর্তে বুটিদার বা নক্সা করা শাড়ি দেখা যাবে। শাড়িটি বিশেষ কায়দায় কোমরে বাঁধা। রাজপুত ঘরানার মতো বুকের অংশটি অনাবৃত নয়।[১১২] মুঘল চিত্রকলা ও টেরাকোটা সম্বন্ধে আরও দুটি জিনিস লক্ষ করা দরকার। প্রথমত, টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধের দৃশ্যে, সৈন্যসামন্তদের পোশাকে জাহাঙ্গিরি টুপির ব্যবহার লক্ষণীয়। দ্বিতীয়ত, বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটাগুলি মুঘল চিত্রকলার সর্বোচ্চ বিকাশের যুগেই তৈরি হচ্ছিল। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নকশা, অলংকরণে মুঘল শিল্পকলার ছাপ স্পষ্ট। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সময়ে স্থাপত্যশিল্পে মুঘল আধিপত্যের কাল। বিষ্ণুপুরের মন্দিরেও বিভিন্ন অলংকরণ মার্বেল-জাফরিগুলিকে মনে করিয়ে

---

[১১০] চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, *বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা*, পৃ.৪৭

[১১১] তদেব, পৃ.৫৮-৫৯

[১১২] তদেব, পৃ.৬১

দেয়।[১১৩] মুঘল-ফারসি সংস্কৃতির ছাপ যে কেবল বিষ্ণুপুরের মন্দিরেই দেখা যাচ্ছিল তা নয়। আরেক ভূম রাজ্য ময়ূরভঞ্জের হরিপুরের কেশবরায় মন্দিরে আমির-ওমরাহদের বেশভূষা দেখলেই তা বোঝা যাবে।[১১৪] বিভিন্ন ভূম রাজ্যের মধ্যে একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল।

মুঘল বা রাজপুত সংস্কৃতির সূত্র ধরে মার্গসংস্কৃতির যে চর্চা চলছিল তার একটা ছাপ দেখা যাবে বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদের চর্চা থেকেও। একটি অগ্রন্থিত রচনায় কুমকুম চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—সঙ্গীতের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্য ভারতের একটি বড়ো অংশে স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং সঙ্গীতই হয়ে উঠেছিল আভিজাত্য জাহির করার উপায়। অভিজাত সংস্কৃতির ধাঁচে মল্লরাজারাও ধ্রুপদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছিলেন। বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনে ধ্রুপদের একটি ধারা তৈরি হয়েছিল। সেটিও বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে মল্লভূমে এসে পৌঁছায়। ধ্রুপদের সঙ্গে বৈষ্ণব ভক্তির সংযোগের দরুণ এই ঘরানা পৌঁছে যায় রাজস্থানের বিভিন্ন দরবারে; মিলতে থাকে রাজপুত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। মিলে যায় বৈষ্ণব ও দরবারি সংস্কৃতি। আকবর থেকে শুরু শাহজাহানও ধ্রুপদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশের নানা অঞ্চলের নৃপতিদের কাছেই অভিজাত সংস্কৃতির অংশরূপে ধ্রুপদের কদর বাড়ছিল। বৈষ্ণবীয় ভক্তি আর দরবারি সংস্কৃতিপুষ্ট ধ্রুপদের ধারা বঙ্গদেশে এল বৃন্দাবনী বৈষ্ণবদের সঙ্গে।[১১৫] অনেকে লক্ষ করেছিলেন বিষ্ণূপুরের কীর্তনগানে বৃন্দাবনের কালোয়াতি গানের প্রভাব বেশি। বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক হরিদাসস্বামী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে বৃন্দাবনের বঙ্কুবিহারী মন্দিরে থাকতেন। অনেক বাঙালি বৈষ্ণবই বৃন্দাবনে তাঁর কাছে ধ্রুপদের তালিম নেন। নরোত্তম ঠাকুর এঁদের

---

[১১৩] তদেব, পৃ.৫৪, ৬৮-৬৯

[১১৪] তদেব, পৃ.৮৪

[১১৫] https://www.parabass.com/PB65/LEKHA/pKumKum65.shtml, দেখা হয়েছে ৩০.১১.২০২০ তারিখে।

অন্যতম।[১১৬] বৃন্দাবনী ধারা থেকে ধ্রুপদ এলেও বাংলার সংস্কৃতির অংশগ্রহণে ধ্রুপদের প্রতিগ্রহণও ঘটছিল। বাংলার বাউল বা কীর্তনগানে কথার গুরুত্ব থাকে। সেই ধারা মেনে বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদের ঘরানাতেও এল কথার গুরুত্ব। পশ্চিমি হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশে রাখলে এই পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে।[১১৭] দিল্লির মুঘল সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বাহাদুর খাঁ'র হাত ধরে বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদের সূত্রপাত কি না তা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। তবে দেখা যাচ্ছে, মল্লরাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের বন্দনাসূচক গানে বাহাদুর খাঁ'র উল্লেখ আছে।[১১৮] দেবব্রত সিংহ ঠাকুর বলেছেন—বিষ্ণুপুরে একটি মহল্লার নাম বাহাদুরগঞ্জ। যেখানে বিষ্ণুপুরের সমস্ত পাড়ার নাম হিন্দু দেবতার নামে; সেখানে একটি মহল্লার মুসলমানি নাম বাহাদুর খাঁ'র বিষ্ণুপুরে আগমনের ঐতিহাসিকতাকেই প্রমাণ করছে।[১১৯] এছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিষ্ণুপুর শাখায় সংরক্ষিত গানের পুথিগুলির মধ্যে মুঘল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গির; আমির-ওমরাহ তোডরমল, বৈরাম খাঁর প্রশস্তি রয়েছে।[১২০]

মুঘল-রাজপুত সংস্কৃতির পাশাপাশি বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির ছাপও ধ্রুপদ গানে স্পষ্ট। বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম শিল্পী সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় দেখা যায়—তাঁদের বাড়িতে পুরুষানুক্রমে টোল চলত। *ভাগবত* পাঠ, সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের শিক্ষা, ধ্রুপদ গানের প্রশিক্ষণ চলত একইসঙ্গে। তাঁর পিতা-পিতামহ একইসঙ্গে অদ্বিতীয় *ভাগবত* পাঠক এবং ধ্রুপদ শিল্পী ছিলেন।[১২১] ধ্রুপদ শিল্পীদের প্রতি মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অতুলনীয়। শোনা

---

[১১৬] চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, *ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা*, বিষ্ণুপুর: সুষমা দাশগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ.১৮৪

[১১৭] জগন্নাথ দাশগুপ্ত, 'বাংলার শাস্ত্রীয় সংগীতে লৌকিক উপাদান'প্রত্ন পরিক্রমা; মল্লভূম, ৮ নং সংখ্যা, ২০১৪, পৃ.১৫০

[১১৮] চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, *ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা*, পৃ.২০৪

[১১৯] শৈলেন দাস, নমিতা মণ্ডল(সম্পা.), *বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ.১৭৪

[১২০] মাণিকলাল সিংহ, পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃ.১৮৭

[১২১] চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, *ভারতের শিল্প- পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা*, পৃ.১৯৫

যায়, দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনের বিনিময়ে বাহাদুর শাহকে দিল্লি থেকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন।[১২২] রাজানুকূল্য প্রাপ্ত ধ্রুপদ শিল্পীরাও মল্লরাজাদের যথোচিত প্রশস্তি করেছেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার একটি বন্দিশে দেখা যাচ্ছে, রঘুনাথ সিংহের প্রশস্তি—

তুঁহিদাতা বীর সবকো কর বেপীর

বিক্রমসে দুরজন সব দূর যাও এ।

তুএ সম রাজ জগমেঁ নহী দুজো,

ইস্ লিয়ে বাহাদুর নিশ দিন গুন গাও এ।।[১২৩]

রামশংকর ভট্টাচার্য মহারাজ চৈতন্য সিংহের সভাগায়ক ছিলেন।[১২৪] তাঁর বিপুল ভূসম্পত্তি ছিল। আরেক ধ্রুপদ গায়ক অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লরাজাদের ক্ষয়িষ্ণু দশাতেও প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে তিনিই ছিলেন এই অঞ্চলের একমাত্র করদাতা।[১২৫] যদুভট্টও মল্লরাজাদের শেষ দশায় যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা পান। অন্যান্য ভূমরাজ্যগুলিও অভিজাত সংস্কৃতি নির্মাণের চেষ্টায় ধ্রুপদকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছিল। যদুভট্ট কিছুকাল পঞ্চকোট রাজদরবারে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি রঙ্গনাথ উপাধি পান।[১২৬]

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের মধ্যেও বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি ও মুঘল সংস্কৃতির যুগপৎ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণবীয় দশাবতারের ধারণাকে কেন্দ্র করে দশাবতার তাসের উৎপত্তি। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এ বর্ণিত দশাবতারের ক্রমটিকে দশাবতার তাসে ব্যবহার

---

[১২২] রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর*, কলিকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩২

[১২৩] গৌতম চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান(১১ খণ্ড)*, কলিকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ.২৪২

[১২৪] মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, *সুরের সাধনায় বিষ্ণুপুর*, কলকাতা: পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ.২০

[১২৫] জগন্নাথ দাশগুপ্ত, ধ্রুপদ শিল্পী, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৩.০৭.২০২০

[১২৬] সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *সুরের পথে একটি জীবন*, বিষ্ণুপুর: অঞ্জলি দেবী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ.৩

করা হয়ে থাকে। কেবল বুদ্ধের জায়গায় আছেন জগন্নাথ। দিন ও রাতে দশাবতার তাসের খেলার পদ্ধতি আলাদা। সকালে খেলা হলে স্টার্টার জগন্নাথ, দুপুরে রাম, সন্ধেয় নৃসিংহ, রাতে মৎস্য। দশাবতার তাস খেলার বিভিন্ন নিয়মের একটিতে অবতারদের মধ্যে শ্রেণিভেদ আছে। অভিজাত অবতার হচ্ছেন রাম, পরশুরাম, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কি। 'অন্ত্যজ' অবতার—মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন।[১২৭] এটি কি মল্লরাজাদের টোটেম নির্ভর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার চিহ্ন? মুঘল সংস্কৃতির ছাপ আছে দশাবতার তাসের অবতারদের বেশভূষায়। কল্কি অবতার মুসলমান রাজপুরুষের বেশে শোভিত; পরনে পায়জামা।[১২৮] লক্ষণীয়, কল্কি অবতারের মুখে গোঁফ নেই, দাড়ি আছে।

অভিজাত রাজপরিবারগুলির মতোই মল্লরাজারা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মল্লরাজা বীর হাম্বীরের নামে দুটি বৈষ্ণব পদ পাওয়া গেছে। মল্ল রাজমহিষীরা বৈষ্ণব পুথির নকল করতেন। মল্লরাজা গোপাল সিংহ *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল* নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর নামেও কিছু পদ পাওয়া গেছে। চৈতন্য সিংহের দ্বিতীয় পুত্র নিমাই সিংহ কুচিয়াকোল রাজ এস্টেট তৈরি করেছিলেন। সংস্কৃতে পণ্ডিত, সঙ্গীতানুরাগী নিমাই সিংহ *রাগমালা* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। বইটি যদিও এখন আর পাওয়া যায় না। পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাতেও মল্লরাজাদের সুখ্যাতি ছিল। *অনর্ঘ্য রাঘব* রচয়িতা মুরারি মিশ্রের বংশধর কাশীনাথ বাচস্পতি রঘুনন্দনের টীকা রচনা করেছিলেন। এই স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন মহারাজ গোপাল সিংহের সভাসদ।[১২৯] মল্ল রাজসভায় স্মার্ত পণ্ডিতের উপস্থিতি মল্লরাজাদের ক্ষত্রিয়ত্ব ও সাংস্কৃতিক নির্মিতির প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

---

[১২৭] শর্মিষ্ঠা দত্ত(সম্পা.), *দশাবতার তাস,* কলকাতা: প্রতিক্ষণ, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ.৩৩

[১২৮] মাণিকলাল সিংহ, পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃ.২০৮

[১২৯] অনুকূলচন্দ্র সেন, *বাঁকুড়া পরিক্রমা,* কলিকাতা: বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লি., প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৪৮

রাজপুত গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। শ্রীনিবাস আচার্যের সূত্রে বৃন্দাবনী বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে এসে রাজপুত রাজাদের মতোই মল্লরাজারাও বিষ্ণুপুরকে 'বৃন্দাবন' হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিষ্ণুপুর 'গুপ্ত বৃন্দাবন' হিসাবে পরিচিত।[১৩০] মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুরে রত্ন মন্দির নির্মাণের ঢল নামে। বিষ্ণুপুর মল্ল রাজপরিবারের প্রধান বৈষ্ণব দেবতা মদনমোহন। মদনমোহন বৃন্দাবনেরও অন্যতম প্রধান দেবতা। ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখেও নানা বৈষ্ণবীয় কল্পনা তৈরি হয়। মনে করা হতে থাকে, এই অঞ্চলে দামোদর নদ আর কংসাবতী নদীর মিলন আসলে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের প্রতীক। বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন বাঁধ (যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ), কুণ্ড (শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড), সংলগ্ন গ্রামের নামকরণ করা বৈষ্ণবীয় ও বৃন্দাবনী অনুষঙ্গ বজায় রেখে। এমনকি, রাজারা বৃন্দাবন থেকে গাছের চারা এনেও বসিয়েছিলেন। বৃন্দাবনের আদলে বিষ্ণুপুরকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বেশ সফল হয়েছিল। মদনমোহনের মহিমা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বেনারস, এমনকি বৃন্দাবন থেকেও ভক্ত আসতে থাকে মদনমোহন দর্শনে।[১৩১]

ক্ষত্রিয়ত্ব এবং রাজপুত মহিমা প্রতিষ্ঠায় মল্লরাজাদের পক্ষে মার্গ সংস্কৃতির অনুশীলন জরুরি ছিল। মল্লরাজাদের সঙ্গে মুঘল-রাজপুত সামরিক শক্তির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলই। মার্গ সংস্কৃতিকে মল্লভূমে আরও প্রতিষ্ঠা করে গেল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমেই দরবারি সংস্কৃতির সঙ্গেও মল্লবংশের নিবিড় যোগ তৈরি হয়ে গেল। সেই চর্চা চলল কয়েক শতাব্দী ধরে। ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের সঙ্গে অনিবার্যত যুক্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির

---

[১৩০] 'গুপ্ত বৃন্দাবন প্রায় বিষ্ণুপুর গ্রাম।/মদনমোহন পুন মিলে অভিরাম।।' দ্র. প্রসন্নকুমার গোস্বামী(সংকলিত), *শ্রীঅভিরামলীলামৃত*, পৃ.১৪৮

[১৩১] Pika Ghosh, *Temple to Love : Architecture and Devotion in Seventeenth-Century Bengal*, Indiana: Indiana University Press, 1st Published, 2005, pp.190-194

চর্চাও চলল দীর্ঘ সময় জুড়ে। ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠা আর সাংস্কৃতিক নির্মিতি তো একদিনের কাজ নয়। রাজপুত বংশের উত্তরসূরী বলে প্রমাণ করতে মল্লরাজপরিবারের লোকেরা তাই উনিশ শতকেও বাংলা আর হিন্দুস্থানির মিশেলে কথা বলতেন![১৩২]

আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতে প্রশ্ন তুলেছিলাম, অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতাও যুক্ত হলে কি সর্বাতিশায়ী আধিপত্য তৈরি হয়? এই প্রশ্নের উত্তর অন্তত প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে—না। স্মার্ত পৌরাণিক বিধিব্যবস্থায় ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা অত্যন্ত জরুরি। নাহলে জনমানসে রাজারও বৈধতা জোটে না। মল্লরাজাদের তাই ধর্মকৃত্যগত মর্যাদালাভে তৎপর হতে হয়েছে। মল্লরাজাদের সামাজিক-রাজনৈতিক-নৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রকল্পে দুটি দিক ছিল—এক, অভিজাত রাজরুচি নির্মাণের মাধ্যমে বাকি রাজশক্তিগুলির কাছে নিজেদের মাহাত্ম্য জানান দেওয়া; দুই, ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা লাভের মাধ্যমে শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠা। দুটি দিক আসলে পরস্পর সম্পর্কিত। ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠা না করলে অভিজাত রাজপরিবারগুলির কাছেও সম্মানজনক অবস্থান মেলে না। আর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ধর্মগোষ্ঠীর আনুকূল্য। সেই আনুকূল্য লাভে মল্লরাজারা পৃষ্ঠপোষকতায় কোন কার্পণ্য করেননি। এসবই, প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ধর্মের অসীম গুরুত্বের নির্দেশক। সামাজিক বা জাতিগত মর্যাদার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক আমরা আরেকটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী অধ্যায়ে।

[১৩২] Kumkum Chatterjee, 'Cultural Flows and Cosmopolitanism in Mughal India: The Bishnupur Kingdom', p.160

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: সদ্‌গোপ

৫.১	মেদিনীপুরের জনবিন্যাস এবং শ্যামানন্দ-রসিকানন্দের ধর্মপ্রচার
৫.২	সদ্‌গোপদের বৈষ্ণবতার ইতিহাস
৫.৩	গোপ, সদ্‌গোপ ও সদ্‌গোপদের নবশাখ মর্যাদাপ্রাপ্তি
৫.৪	ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা ও সদ্‌গোপ সমাজ

অধ্যায়: ৫

বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: সদ্‌গোপ

রবার্ট এরিক ফ্রাইকেনবার্গ ও তাঁর কিছু সহকর্মী বিশ শতকের সাতের দশকে ভাবনাচিন্তা করছিলেন ভারতবর্ষে জমির অধিকার ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক নিয়ে। সেই প্রকল্পের সূত্রেই প্রকাশিত হল *Land Control and Social Structure in Indian History* (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯ খ্রি.)। এই বইয়েরই একটি প্রবন্ধে জমি সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় ধারণার তফাত খুঁজতে বসে ওয়াল্টার সি. নিয়েল উড়িষ্যার বিসিপাড়া নামে এক গ্রামের কথা বলেছেন। ব্রিটিশরা যখন ক্ষমতায় আসে তখন এই অঞ্চলে বিত্তশালী, রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী ও ভূম্যধিকারী ছিল একটি যোদ্ধৃগোষ্ঠী। বিসিপাড়া জয় করার সূত্রে বিপুল ধনসম্পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এই গোষ্ঠীর হাতে আসে। গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রতিপত্তিও বাড়ে। ব্রিটিশ শাসনপর্বে আবার নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুবাদে এই গোষ্ঠীর বাইরেও অনেক গোষ্ঠীর হাতে ভালো পরিমাণ টাকা এসেছিল। যেমন—মদ্য প্রস্তুতকারক গোষ্ঠী। পয়সাকড়ি ও জমিজমা হলেও তাতে রাজনৈতিক শক্তি অধিগত হয়নি। ব্রিটিশ শাসনের প্রায় এক শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও যোদ্ধৃগোষ্ঠীর বাইরের এই গোষ্ঠীগুলি যথার্থ ধর্মকৃত্যগত বা সাধনাধিকারগত মর্যাদার অভাবে রাজনৈতিকভাবে যোদ্ধৃগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেনি।[১] এই প্রসঙ্গটি এই অধ্যায়ের শুরুতে মনে রাখা যেতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা মূলত অবিভক্ত মেদিনীপুরের সদ্‌গোপ সম্প্রদায়কে নিয়ে আলোচনা করব। সদ্‌গোপরা পেশা বদলে কৃষিজীবী হয়েছেন।

[১] Robert Eric Frykenberg(ed.), *Land Control and Social Structure in Indian History*, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1st Published, 1969, p.10

অবিভক্ত মেদিনীপুরে ব্রিটিশ পর্বেও সদ্‌গোপদের একাধিক জমিদারি ছিল। পয়সাকড়ি এবং জমিজমা থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য ধর্মকৃত্যগত মর্যাদাও জরুরি হয়ে পড়ে। গোপ পরিচয় ঝেড়ে ফেলে, পেশা বদলে সদ্‌গোপ হয়ে ওঠা গোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ধর্মীয় স্বীকৃতি। একই ঘটনা ঘটেছিল মেদিনীপুরের শক্তিশালী ভূম্যধিকারী গোষ্ঠী মাহিষ্যদের ক্ষেত্রেও। মাহিষ্যরাও পয়সা-জমির সুবাদে পূর্বতন কৈবর্ত পরিচয় ঝেড়ে ফেলে সম্মানজনক পরিচয় খুঁজে নিতে চাইছিল। তাদেরও প্রয়োজন ছিল ধর্মসম্প্রদায়ের স্বীকৃতির। মেদিনীপুরের সদ্‌গোপ ও মাহিষ্যদের ঝোঁক ছিল বৈষ্ণবধর্মের প্রতি। বৈষ্ণবধর্মের সূত্র ধরে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা ও সামাজিক সচলতা নিশ্চিত করতে চাইছিল। অবিভক্ত মেদিনীপুরের অনেকগুলি জমিদারি ছিল মাহিষ্যদের হাতে। এই ধর্মীয় স্বীকৃতি তাদের অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল। কৃষিজীবী, ভূ-সম্পত্তির অধিকারী সদ্‌গোপদের সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়াটি এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য। পয়সাকড়ি আর জমিজমার সঙ্গে ধর্মীয় স্বীকৃতির সুবাদে রাজনৈতিক আধিপত্য কীভাবে পাকাপোক্ত হয়—সদ্‌গোপদের প্রসঙ্গে তা আলোচনার সুযোগ থাকবে।

সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের সামাজিক সচলতার আলোচনা চারটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম উপ-অধ্যায়ে অবিভক্ত মেদিনীপুরের জনবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্যামানন্দ নিজেও জাতিতে সদ্‌গোপ। দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ে আলোচ্য মেদিনীপুরের সদ্‌গোপদের বৈষ্ণবতার ইতিহাস। তৃতীয় উপ-অধ্যায়ে আমাদের অভিনিবেশ থাকবে গোপ থেকে সদ্‌গোপ হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এবং সদ্‌গোপদের নবশাখ মর্যাদাপ্রাপ্তির ইতিহাসে। শেষ অংশে ইংরেজ শাসনপর্বে সদ্‌গোপদের বৈশ্যত্ব প্রতিষ্ঠার দাবিটি আমরা পর্যালোচনা করব। বঙ্গদেশীয় পুরাণ, ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সাহিত্য, বিভিন্ন প্রশাসনিক নথিপত্র এই পর্বের

আলোচনায় আমাদের প্রধান অবলম্বন। এই সূত্র ধরে এবার প্রথম উপ-অধ্যায়ের আলোচনায় আসা যাক।

৫.১ মেদিনীপুরের জনবিন্যাস এবং শ্যামানন্দ-রসিকানন্দের ধর্মপ্রচার:

আয়তনের দিক থেকে অবিভক্ত মেদিনীপুর বিরাট। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুরের আয়তন আরও বড়ো ছিল।[২] বিভিন্ন সময়ে মেদিনীপুরের সীমারেখার পরিবর্তনও হয়েছে। স্বাধীনতার পরে অবিভক্ত মেদিনীপুরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল যথাক্রমে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা। পূর্বদিকে হুগলি নদী ও রূপনারায়ণ হুগলি জেলার থেকে মেদিনীপুরকে আলাদা করেছে। অবিভক্ত মেদিনীপুরের দক্ষিণ সীমায় ছিল বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমদিকে উড়িষ্যার বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ জেলা এবং অবিভক্ত বিহারের সিংভূম ও ধানবাদ জেলা।[৩] অবিভক্ত মেদিনীপুর ভেঙে পরবর্তীকালে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর নামে দুটি আলাদা জেলা হয়েছে। আরও পরে, পশ্চিম মেদিনীপুর ভেঙে সাম্প্রতিককালে জন্ম হয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার। আমরা যে অঞ্চলগুলি নিয়ে কথা বলব সেগুলি মূলত বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত। মেদিনীপুর সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় মেদিনীপুরের সঙ্গে বিহার (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) বা উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। আমাদের আলোচনায় সেকথাও আসবে।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মেদিনীপুর রাজনৈতিকভাবে উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে উড়িষ্যার রাজা অনন্ত চোড়গঙ্গদেব বঙ্গদেশের একটা বড়ো অংশ অধিকার

---

[২] বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায়(সম্পা.), *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন(১ম খণ্ড)*, কলকাতা: সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ.৩

[৩] Rabindranath Mandal, ‘Vaishnavism and Vaishnavite Culture in Midnapore’, Unpublished Ph.D. Thesis submitted at Vidyasagar University, 2001, p.5

করেন। তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল বর্তমান হুগলি জেলার ত্রিবেণী পর্যন্ত। মেদিনীপুরের গড়বেতায় ওড়িয়াশাহী নামে একটি গ্রাম আছে। বোঝা যায়, বহুকাল আগে থেকেই মেদিনীপুরে ওড়িয়া বসতি তৈরি হচ্ছিল। মধ্যযুগে মেদিনীপুরের একটা বড়ো অংশ ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত ছিল। জঙ্গল অধ্যুষিত এই অঞ্চলের মধ্যে পড়বে—গোপীবল্লভপুর, নয়াবসান, জামবনি, রামগড়, লালগড়, শিলদা, নারায়ণগড় ইত্যাদি; অর্থাৎ আধুনিক ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের অনেকটা অংশ। উড়িষ্যার হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে অনেক ওড়িয়া বর্ণহিন্দু পরিবার মেদিনীপুরে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কারণে বসতি তৈরি করেন। এই সূত্রেই মেদিনীপুরে থাকতে শুরু করেছিলেন উড়িষ্যার যুদ্ধব্যবসায়ী খাণ্ডাইত এবং লেখকগোষ্ঠী করণরা। আবার, জগন্নাথধামের তীর্থযাত্রীরা এই অঞ্চলের উপর দিয়েই যেতেন। কখনও কখনও স্থায়ী বসতিও তৈরি করতেন এই অঞ্চলে।[৪] এই বর্ণহিন্দু গোষ্ঠীর পাশাপাশিই মেদিনীপুরের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ আদিবাসী গোষ্ঠী। এই জনবিন্যাসগত পর্যালোচনার সূত্রে মেদিনীপুরে শ্যামানন্দ-রসিকানন্দের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের তাৎপর্য বোঝা সম্ভব। সামাজিক সচলতা লাভে উদগ্রীব গোষ্ঠীগুলির কাছে এই ধর্মসম্প্রদায়ের গুরুত্বও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ও'ম্যালির বিশ শতকের গোড়ার দিকের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মেদিনীপুরে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি কৈবর্তরা (৮,৮৩,৪৯১ জন)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ যথাক্রমে সাঁওতাল (১,৪৮,২৫১ জন) ও বাগদিরা (১,৪২,২১২ জন)। চতুর্থ স্থানে সদ্গোপ গোষ্ঠী; জনসংখ্যা ১,৩০,৮৫১। পঞ্চম স্থানে ব্রাহ্মণ (১,১৪,১১০ জন)।[৫] অর্থাৎ, অবিভক্ত মেদিনীপুরের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ 'হিন্দু' জাতিনির্ভর-সমাজ বহির্ভূত; একটা অংশ অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক অবস্থান

---

[৪] Bishnupada Das, *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South Western Bengal Since Introduction of Neo-Vaisnavism*, Calcutta: Firma K L M Pvt. Ltd., 1st Published, 1996, pp.13-19

[৫] L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazeetters Midnapore*, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1st Published, 1911, p.57

থেকে উঠে এসে ব্রাহ্মণ্য জাতিকাঠামোয় 'উঁচু'মর্যাদা লাভের চেষ্টা করেছে—সদ্‌গোপ ও কৈবর্ত ইত্যাদি। উনিশ-বিশ শতকের আদমসুমারির ক্ষেত্রে কৈবর্তরা 'মাহিষ্য' নামে নিজেদের চিহ্নিত করে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করেছে; আর সদ্‌গোপদের দাবি বৈশ্যত্ব। সামাজিক সচলতার এই দাবি যে উনিশ শতকের এমন নয়। বরং, ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেও ব্রাহ্মণ্যকরণের প্রক্রিয়ায় এই গোষ্ঠীগুলি নিজেদের জাতে তুলতে চেয়েছে। তখন অবশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের দাবি ছিল না। আদিবাসী অধ্যুষিত, প্রান্তিক জাতিতে পূর্ণ এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম খ্রিস্টীয় ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কীভাবে জায়গা করে নিচ্ছিল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার দাবির সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের সম্পর্কটিও খতিয়ে দেখা উচিত।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবস্থানের সুবাদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আনাগোনা ছিল এখানে। ফা-হিয়েন বা হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। জৈনধর্মেরও প্রতিপত্তি ছিল এই অঞ্চলে। জৈন কল্পসূত্র থেকে জানা যায় নির্গ্রন্থের চারটি শাখার মধ্যে ভদ্রবাহু প্রবর্তিত একটি শাখার নাম 'তাম্রলিপ্তিক'; অর্থাৎ তাম্রলিপ্তের জৈনসংঘ। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের সূত্র ধরে আর্যসংস্কৃতির ছোঁয়া আসে এই অঞ্চলে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অস্তিত্ব ও মন্দিরের কথাও জানা যায় চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণী থেকে।[৬] এসবের সূত্র ধরেই এই অঞ্চলে জাতপাতনির্ভর সমাজ তৈরি হতে শুরু করে। বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজকর্মের কারণে বাইরে থেকে এই অঞ্চলে এসে বসতি গড়েছিলেন ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত ও অন্যান্য বৃত্তির লোকজন। সেই সূত্রেও বৃত্তিনির্ভর জাতপাতের ধারণা এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে। আধুনিক পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা, আধুনিক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রান্তিকজন সম্বলিত অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার

[৬] প্রণব রায়, *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ*, কলকাতা: প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প্রথম প্রকাশ, পৃ.২৪-২৭

প্রয়াস চলছিল। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্যামানন্দ-রসিকানন্দ প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমেও সেই ব্রাহ্মণ্যকরণের চেষ্টার ছাপ লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলের উপর দিয়ে চৈতন্যদেবও নীলাচলে গিয়েছিলেন। নারায়ণগড় অঞ্চলে এই পুরনো পথটি এখনো আছে।[৭]

বৃন্দাবন যাবার পথে চৈতন্যদেব আবার এই অঞ্চলে এসেছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর সূত্রে জানা যাচ্ছে এই অঞ্চল ধরে যাবার সময় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। 'ভিল্লপ্রায় পরম পাষণ্ড লোক' চৈতন্যের কৃপায় 'নিস্তার' পেল।[৮] চৈতন্যদেবের এক শতাব্দী পরে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব কতটা ছিল—তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্যামানন্দ-রসিকানন্দকে এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। চৈতন্যদেব-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত আচার্যের পরের প্রজন্মে শ্যামানন্দ ছিলেন অত্যন্ত বড়ো মাপের প্রচারক। শ্যামানন্দ সম্ভবত ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মারা যান ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর জন্মের পরেই পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যার দণ্ডেশ্বর ছেড়ে মেদিনীপুরের ধারেন্দায় বসবাস শুরু করেন। ধারেন্দা বর্তমান খড়্গপুর রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত। শ্যামানন্দ, নরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের কাছে ধর্মশিক্ষা করেছিলেন। বয়সে সম্ভবত শ্যামানন্দ বাকি দু'জনের থেকে কিছুটা ছোটো। শ্যামানন্দ জাতিতে সদ্‌গোপ; বৃন্দাবনে যাবার আগেই তিনি কালনায় নিত্যানন্দ পরম্পরার শিষ্য হৃদয়চৈতন্যের (মতান্তরে হৃদয়ানন্দ) কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।[৯] বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামীর যথেষ্ট সাহচর্য পান।

---

[৭] তদেব, পৃ.১৩

[৮] শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮, পৃ.৪১৫

[৯] Ramakanta Chakrabarty, *Viasnavism in Bengal 1486-1900*, Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1st Published, 1985, p.245

তাঁর কাছ থেকেই রাগানুগা ও রাগাত্মিকা সাধনার মূল কথা শিখে নেন শ্যামানন্দ।[১০] বৈষ্ণবগ্রন্থ অনুযায়ী দীর্ঘদিন বৃন্দাবনে বাস করার পর স্বয়ং রাধা-কৃষ্ণ শ্যামানন্দকে উৎকলে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের নির্দেশ দেন। এমনকি, তাঁরা জীব গোস্বামীকেও আজ্ঞা দেন এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য। শ্যামানন্দের কাজ ছিল 'উৎকলের দুষ্টলোকে প্রবোধন' দেওয়া।[১১] 'দুষ্টলোক' বৈষ্ণবধর্মের ভাষায় অবৈষ্ণব লোক। এরপরে তিনি উৎকলে (সেসময়ে মেদিনীপুরও যার অন্তর্ভুক্ত) চলে আসেন। শ্যামানন্দ পরম্পরার গ্রন্থে তাঁর উৎকলে আসার আরও একটি কারণ বর্ণিত হয়েছে। *শ্রী শ্রী বিন্দুপ্রকাশ*—এ বলা হল, তীর্থযাত্রীরা উৎকলে যাবার পথে পুলিন্দ, শবর গোষ্ঠীর রাজাদের অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে থাকে। রাজারা অনেক সময় ভক্তদের প্রাণও কেড়ে নেন। এই অত্যাচার নিবারণ করতেই ঈশ্বর শ্যামানন্দকে উৎকলে ভক্তিপ্রচারের নির্দেশ দেন।[১২] শ্যামানন্দ পরবর্তীকালে বহু কৌমগোষ্ঠীভুক্ত রাজাদের বাস্তবিকই বৈষ্ণবধর্মের বৃত্তে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচারের পরেও এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। ভূমিপুত্র শ্যামানন্দ সেই কাজে খুবই সফল হয়েছিলেন। এই অঞ্চলে ধর্মপ্রচারকালে শ্যামানন্দের আলাপ হয়েছিল রয়ণীর রাজা অচ্যুতের পুত্র রসিকানন্দের সঙ্গে। রসিকানন্দের জন্ম ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে। ৬২ বছর বয়সে ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে রসিকানন্দ মারা যান। জাতিতে করণ রসিকানন্দ ছিলেন এই অঞ্চলে শ্যামানন্দের ধর্মপ্রচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। রসিকানন্দের হাতেই শ্যামানন্দ গোপীবল্লভপুর মঠের দায়িত্ব দিয়ে

---

[১০] শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা.), *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ*, শ্রীচৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ.২-৪

[১১] তদেব, পৃ.৩৮-৩৯

[১২] শ্রী শ্রী গৌরকিশোরানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুপাদ(সম্পা.), *শ্রীশ্রীবিন্দুপ্রকাশ*, মথুরা: শ্রী শ্রী রাধাশ্যামসুন্দর মন্দির, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৮, পৃ.৯৬

যান। তারপর থেকেই রসিকানন্দের বংশের লোকরা গোপীবল্লভপুর মঠের মহান্ত হিসাবে বংশপরম্পরায় দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে কৌমগোষ্ঠীচালিত ভূমরাজ্যের প্রসঙ্গে আমরা ধলভূমের কথা বলেছিলাম। শ্যামানন্দের এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মপ্রচার শুরু হয় ধলভূম রাজ্য থেকে। ধলভূমের তৎকালীন রাজা নবীন কিশোর ধল ছিলেন রঙ্কিণীদেবীর উপাসক। তীর্থবাসী বৈষ্ণবদের আশ্রয় দেন ধলভূমের রাজা; তারপরে রাত্রে সেই পরম বৈষ্ণবদের রক্তপান করে তৃপ্ত হন দেবী রঙ্কিণী। বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে ধলভূমের রাজার এই বৈরিতার সম্পর্কটি খেয়াল করার মতো। শ্যামানন্দকেও রাজা একইভাবে ছেড়ে দেন দেবী রঙ্কিণীর কাছে। দেবী রঙ্কিণী অবশ্য শ্যামানন্দকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। 'প্রভু' হিসাবে শ্যামানন্দকে স্বীকার করে নেন দেবী। এই ঘটনায় বিচলিত রাজাও কৌলিক ধর্ম ছেড়ে আশ্রয় নেন শ্যামানন্দের কাছে। পরিবারসহ রাজা দীক্ষা নিলেন বৈষ্ণবধর্মে; শ্যামানন্দ নির্দেশ দিলেন কৃষ্ণনামে আশ্রয় নেবার। রাজাকে বললেন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সেবা করতে। কৌম জনগোষ্ঠীর রাজাকে শ্যামানন্দ দীক্ষাদানের সূত্রে টেনে আনলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের বৃত্তে। রাজা মোহর এবং গ্রামদানের মাধ্যমে শুরু করলেন বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা।[১৩] এই সময়ে বিভিন্ন কৌমগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত রাজবংশ আদিবাসী দেবনির্ভরতা ছেড়ে বৈষ্ণব ধর্মের বৃত্তে আসছিলেন। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির রাজারাও দীক্ষিত হলেন বৈষ্ণবধর্মে। তাঁদের কুলদেবতা রাধাগোবিন্দ।[১৪] পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভূমরাজ্যের মতো ধলভূমের রাজন্যবর্গের মধ্যেও রাজপপুত-ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার যে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল, তাঁর সঙ্গে এই দান-ধ্যানের অবশ্যই সম্পর্ক আছে। রাজন্যবর্গকে কাছে টেনে নেওয়ার মাধ্যমে এই অঞ্চলে প্রতিপত্তি বাড়াতে শ্যামানন্দেরও সুবিধা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুই ভূমরাজ্য মল্লভূম

---

[১৩] তদেব, পৃ.৪০-৪৪

[১৪] দিলীপ কুমার গোস্বামী, *পঞ্চকোট ও মানভূমের সভ্যতা*, পুরুলিয়া: বজ্রভূমি প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৯, পৃ.৫২

ও ধলভূমের রাজাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন বৃন্দাবন ফেরত দুই বৈষ্ণব আচার্য—শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ। খেয়াল রাখা যেতে পারে, যেসময়ে শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ পূর্বভারতের দুই ভূমরাজ্যের রাজাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, সেসময়ে মুঘল রাজশক্তিও এই অঞ্চলে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল। এই ভূমরাজ্যগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক রফায় না এসে মুঘল রাজশক্তির পক্ষে এই দুর্গম ও প্রান্তিক অঞ্চলে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা কার্যত অসম্ভব ছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে মুঘল রাজশক্তির ঘনিষ্ঠতার কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে লক্ষ করেছি। সেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে পূর্বভারতের এই ভূমরাজ্যগুলির শক্তি ও প্রতিপত্তির কথা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অজানা থাকার কথা নয়। কেবল ধলভূম নয়, আরেক ভূম রাজ্য ভঞ্জভূম বা ময়ূরভঞ্জের রাজাও শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত। রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ ও তাঁর ভাইদের রসিকানন্দ দীক্ষা দিলেন। লক্ষণীয়, কৌমগোষ্ঠী পরিচালিত ভূমরাজ্যগুলির মধ্যে সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশজাত ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের প্রমাণ করার যে তাগিদ ছিল, তা ভঞ্জভূমের রাজার মধ্যেও দেখা যাবে। সেই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে শ্যামানন্দ-রসিকানন্দ পরম্পরার গ্রন্থ *রসিকমঙ্গল*-এ।[১৫] ময়ূরভঞ্জের রাজা এক হাজার বিঘারও বেশি জমি গোপীবল্লভপুর পাটে দান করেছিলেন। ব্রাহ্মণবাত্তি, ঘুতিয়া ইত্যাদি গ্রাম ময়ূরভঞ্জের রাজারই দান।[১৬] আরেক ভূমরাজ্য শিখরভূমিতে তিনবছর অনাবৃষ্টি চলার পরে শিখরভূমির রাজার অনুরোধে সেই অঞ্চলে গিয়ে 'দৈবী' প্রভাবে বৃষ্টি নামান রসিকানন্দ।[১৭] ভূমরাজ্যগুলির সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে, বঙ্গদেশে প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বৃন্দাবনী

---

[১৫] শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা.), *রসিকমঙ্গল(পূর্ব বিভাগ-দক্ষিণ বিভাগ)*, শ্রীচৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.৯৪

[১৬] Bishnupada Das, *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South Western Bengal Since Introduction of Neo-Vaisnavism*, p.86

[১৭] শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা.), *রসিকমঙ্গল(পশ্চিম বিভাগ-উত্তর বিভাগ)*, শ্রীচৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.৯৪-৯৫

মতের প্রসারের ক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলির গুরুত্ব তাঁরা অনুধাবন করে থাকতে পারেন। সেদিক থেকে দেখলে ভূমরাজ্যের রাজাদের দীক্ষাদানের ঘটনাটি খুব আপতিক নাও হতে পারে।[১৮]

ধলভূমের রাজা রঙ্কিণীর উপাসনা ছেড়ে শ্যামানন্দের মাধ্যমে পরম বৈষ্ণব হয়ে উঠলেন। রঙ্কিণীকে বৈষ্ণবসমাজ অবশ্য একেবারে ত্যাগ করলেন না। স্থানীয় অঞ্চলে রঙ্কিণীর মাহাত্ম্য স্বীকার করেই যেন তাঁরা রঙ্কিণীকে জায়গা দিলেন গোপীবল্লভপুরে শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের প্রধান মঠের কাছেই। বৈষ্ণববৃত্তে এসে অবশ্য রঙ্কিণীর চরিত্র অনেকখানি বদলে গেল। রঙ্কিণীর থানে বিভিন্ন জায়গাতে; এমনকি ঘাটশিলাতেও আগে বিঁধা পরব হত। এই অনুষ্ঠান প্রাচীন বলিপ্রথার চিহ্ন। কিন্তু, গোপীবল্লভপুরের রঙ্কিণী থানে বিঁধা পরব হয় না, পশুবলিও হয় না। রঙ্কিণী মন্দিরে পুজো করেন গোপীবল্লভপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূজারী।[১৯] সেকারণে শ্যামানন্দ পরম্পরার গ্রন্থে রসিকানন্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

দুর্জ্জন ভীম শ্রীকর উদ্দণ্ডং,

রঙ্কিনী দেবী বিদূরিত পশু ভাবম।[২০]

স্থানীয় কৌম সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেবীকে বৈষ্ণবধর্মের বৃত্তে নিয়ে এসে এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মকে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ অনেকবেশি সংহত করেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে, বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দিরের কথা। মল্লরাজাদের কুলদেবী মৃন্ময়ী মন্দিরেও বলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বৈষ্ণবপ্রভাবে।

---

[১৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বভারতের প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে মুঘল রাজশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রকল্পে বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট সাহায্য ছিল—এমন একটা অনুমান করেছেন অধ্যাপক কুমকুম চট্টোপাধ্যায়। এবিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা বিশেষ হয়নি। দ্র. Kumkum Chatterjee, 'Cultural Flows and Cosmopolitanism in Mughal India: The Bishnupur Kingdom, Indian Economic Social History Review, Vol.46, No.2, p.157

[১৯] মধুপ দে, *গোপীবল্লভপুর*, মেদিনীপুর: বিপ্লবী সব্যসাচী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০১৬, পৃ.৪৬-৪৭

[২০] শ্রী শ্রী গৌরকিশোরানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুপাদ(সম্পা.), *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ শ্রী শ্রী রসিকানন্দ পদামৃত*, গোপীবল্লভপুর: শ্রী শ্রী শ্যামানন্দ গাদী, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৪

কেবল রঙ্কিণী নন, আরও অনেক আদিবাসী দেবতা মেদিনীপুর অঞ্চলে শ্যামানন্দ-রসিকানন্দের প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবায়িত হয়ে পড়েন। মেদিনীপুরের গড়বেতা, শালবনি, ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেক কৌম দেবদেবীর পূজা প্রচলিত। ও'ম্যালির পরিসংখ্যানেও আমরা দেখেছি মেদিনীপুরে সাঁওতালরা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী। সাঁওতালদের মধ্যে বড়াম ও সিনি দেবীর পূজা বহুল প্রচলিত। বড়াম পুজোয় সাধারণভাবে ছাগল, মোরগ, মোষ ও শুয়োর বলি দেওয়া হয়ে থাকে।[২১] বড়াম গোপীবল্লভপুরেরও সবচেয়ে প্রাচীন দেবতা। অথচ, শ্যামানন্দের প্রভাবে গোপীবল্লভপুরে বড়ামের থানে ১লা মাঘ বাৎসরিক পূজা হয়; কিন্তু বলি হয় না! এই অঞ্চলে নয়াবসান গ্রামের পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদের তীরে সাতভউনি নামে কৌমগোষ্ঠীর এক দেবী ছিলেন। এই থানের পুরোহিত আগে ছিলেন দণ্ডছত্র মাঝি সম্প্রদায়ের লোক। এখন এই দেবীর পৌরোহিত্য করেন উপবীতধারী ব্রাহ্মণ। পাশের ধরমপুর গ্রামে নরখাদক সাতভউনি বৈষ্ণব প্রভাবে তুলসী দাসীতে পরিণত হয়েছেন। কৌম জনগোষ্ঠীর দেবতাদের থেকে প্রাথমিকভাবে বৈষ্ণবধর্মকে প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল; সেই বিরোধের ছাপ আছে পূর্বোক্ত রঙ্কিণী আখ্যানে। এই সূত্র ধরেই সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও এখন দেখা যায় বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ। গোপীবল্লভপুরের সাঁওতালরা চৈত্রমাসে পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদান করেন সুবর্ণরেখা নদের ধারে। সেখানে অনুষ্ঠান সেরে তাঁরা হাজির হন গোপীবল্লভপুরের বৈষ্ণব মঠে। মৃতদেহ কাঁধে তোলার সময় আজও তাঁরা হরিধ্বনি দেন। গোপীবল্লভপুরের ভূমিজ, মাঝি, মাল, বাগদিরা কণ্ঠী ও তিলক ধারণ করেন। এইসব গোষ্ঠীর তরফে গোপীবল্লভপুরের বৈষ্ণব মহান্তদের ভেট দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত আছে। কৌম জনগোষ্ঠীর দেবতাদের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যসমাজের দেবতা-শিব ইত্যাদির সঙ্গেও লড়তে হয়েছিল বৈষ্ণবধর্মকে। গোপীবল্লভপুরে

[২১] বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায়(সম্পা.), *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন(২য় খণ্ড)*, কলকাতা: সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ.৩৬৩-৩৬৪

শিবের আধিপত্যই ছিল বেশি। তবে, বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে শিবকে গোপীবল্লভপুর ছেড়ে সরে যেতে হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামে।[২২] 'অন্ত্যজ', 'নিচু' জাতির উদ্ধারকর্তা হিসাবে শ্যামানন্দের প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে রসিকানন্দ রচিত *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-শতকম্*-এর ২০ নং শ্লোকেও।[২৩] এই অংশটি জনজাতি অধ্যুষিত মেদিনীপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলে শ্যামানন্দের প্রভাবের কথা খেয়াল করিয়ে দেয়।

শ্যামানন্দ-রসিকানন্দের প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বেড়েছিল স্থানীয় মুসলমান প্রশাসকদের আনুগত্য লাভের মাধ্যমে। বৃন্দাবন থেকে ফিরে নিজদেশে ধর্মপ্রচারের সময় শের খাঁ নামে এক পাঠান রাজপ্রতিনিধি শ্যামানন্দকে সংকীর্তনে বাধা দেন; তীব্র রাগে তিনি শ্যামানন্দের খোল-করতাল ভেঙে ফেলেন। *প্রেমবিলাস*-এর বয়ান অনুযায়ী ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন শ্যামানন্দ। সেই হুঙ্কারে ভীত-সন্ত্রস্ত যবনের রক্তবমি হল; দাড়ি-গোঁফ পুড়ে গেল। পরদিন শ্যামানন্দ আরও বড়ো করে সংকীর্তনের উদ্যোগ করলেন। সেই উদ্যোগ দেখে শের খাঁ প্রণিপাত জানালেন শ্যামানন্দের কাছে এসে; জানালেন রাতে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাঁকে শ্যামানন্দের কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে শরণ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪] বলরামপুরের এক যবনও রসিকানন্দের কোপে ঘোড়া, হাতি, সম্পত্তি হারিয়ে, প্রাণ নিয়ে টানাটানির পর শেষে তাঁর শরণ নিলেন। রসিকানন্দের কৃপায় তাঁর সব সম্পত্তি আবার ফিরে এল।[২৫] *রসিকমঙ্গল* অনুসারে এই সময়ে নাকি প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর শিষ্য হচ্ছিল। এই বর্ণনায় অবশ্যই অতিশয়োক্তি আছে। তবে এই শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দুটি—এক, 'নানা অন্ত্যজ

[২২] মধুপ দে, *গোপীবল্লভপুর*, পৃ.৩৮-৫৩

[২৩] রসিকানন্দ মুরারি, *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-শতকম্*, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর: শ্রীশ্রীগোপাল্লোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামি, প্রথম প্রকাশ, শ্রিগৌরাব্দ ৫০০, পৃ.১৯

[২৪] নিত্যানন্দ দাস, *প্রেমবিলাস*, কলকাতা: যশোদালাল তালুকদার, প্রথম প্রকাশ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৭০

[২৫] শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা.), *রসিকমঙ্গল(পূর্ব বিভাগ-দক্ষিণ বিভাগ)*, পৃ.৮৬-৮৭

জাতি সব হৈলা উদ্ধার'। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের এই গ্রহণযোগ্যতা ঐতিহাসিকভাবেও স্বীকৃত। রসিকানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁরা সাধু সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিল। দ্বিতীয় ব্যাপারটি এপ্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যা দেশের মুঘল সুবাদার আহম্মদ বেগ 'বড় দুষ্ট'। তাঁর উপদ্রবে এই অঞ্চলের রাজা, ভুঁইঞ্যারা অতিষ্ঠ। এমতাবস্থায়, একবার রসিকানন্দ ভঞ্জভূমের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জের প্রাসাদে যান। তাঁকে দেখে রাজা সহ কায়স্থ, করণরা উৎফুল্ল হয়ে প্রণিপাত জানাল। এই অঞ্চলে হিন্দু ও স্থানীয় মুসলমানরা রসিকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এসব দেখে সুবাদার আহম্মদ বেগ খুবই কুপিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে যবনদের শিষ্য করার প্রচেষ্টা দেখে আহম্মদ বেগের রাগ আরও বাড়ল। কিন্তু শেষ অবধি রসিকানন্দের কৃপায় সুবাদার আহম্মদ বেগও বৈষ্ণবমতে বিশ্বাসী হলেন।[২৬] মুঘল রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা শ্যামানন্দ-রসিকানন্দকে ধর্মপ্রচারে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। শের খাঁ বৈষ্ণব হওয়ার পর তাঁর আর্থিক সমর্থনে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ বড়কোলা, আলমগঞ্জ, নৈহাটি, নৃসিংহপুর, গোপীবল্লভপুর, শ্যামসুন্দরপুর ইত্যাদি স্থানে বড়ো মাপের বৈষ্ণব উৎসব ও জমায়েত করেন। আলমগঞ্জের উৎসবে সমর্থন এসেছিল' হরবোলা' নামে পরিচিত স্থানীয় এক মুসলমান শাসকের থেকেও।[২৭] মুঘল রাজশক্তির স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৃন্দাবন ফেরত শ্যামানন্দের ঘনিষ্ঠতা দেখে পূর্বভারতের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে মুঘল আধিপত্য বিস্তারে বৈষ্ণবমতের সাহায্যের সম্ভাবনাটি আরেকটু দানা বাঁধে। মুঘল প্রশাসনের সঙ্গে গোপীবল্লভপুরের মহান্তদের সম্পর্কটি লক্ষ করার মতো। ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব সুজাউদ্দিনের ফরমান অনুসারে বাংলা ও উড়িষ্যার চৌধুরী ও কানুনগোদের রাজস্বের একটি অংশ গোপীবল্লভপুর পাটে দান করার নির্দেশ দেন। ১৭৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে মহান্তদের

---

[২৬] শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা.), *রসিকমঙ্গল(পশ্চিম বিভাগ-উত্তর বিভাগ)*, পৃ.১৯-২৮

[২৭] রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, কলকাতা: আনন্দ, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ.১০৪

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিতর্ক হলে একটি ফরমান জারি করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ।[২৮] মুঘল সম্রাটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মেদিনীপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলে শ্যামানন্দ-রসিকানন্দ পরম্পরার আধিপত্যবৃদ্ধির একটা বড়ো প্রমাণ।

অন্ত্যজ জাতিগুলির সঙ্গে শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত। আবার, ব্রাহ্মণ্যসমাজে প্রান্তিক যে সমস্ত গোষ্ঠী স্থানীয় অঞ্চলে জমিজমা লাভ করে, বিপুল আর্থিক প্রতিপত্তির সুবাদে সামাজিক সচলতা লাভে উদগ্রীব ছিল, তাদেরও শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। বিশেষ করে এই ভূম্যধিকারী গোষ্ঠী বা স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে মুঘল রাজশক্তির যোগাযোগের দরুণ স্থানীয় মুঘল প্রশাসকদের সঙ্গে শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে তাদের জানার কথা। এটিও তাদের শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা দুটি ভূম্যধিকারী গোষ্ঠীর কথা বলতে পারি—কৈবর্ত বা মাহিষ্য এবং সদ্‌গোপ। মেদিনীপুরে মাহিষ্যরা অত্যন্ত ধনশালী; মূলত জমিই তাঁদের আর্থিক সম্পত্তির উৎস। ১৮৭২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মেদিনীপুরে কৈবর্তদের সংখ্যা ২৭%। বিশ শতকের শুরুর দিকের জনগণনা অনুসারেও মাহিষ্যরা মেদিনীপুরের সর্বাধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট গোষ্ঠী। মেদিনীপুরের অনেকগুলি বড়ো জমিদারিই ছিল কৈবর্ত বা মাহিষ্যদের অধীনে। গদাধর ভট্টের বংশাবলি থেকে মেদিনীপুর ও হিজলী অঞ্চলে কৈবর্তদের প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি জমিদারির কথা জানা যায়। ব্রিটিশ শাসনের আদিপর্বেও তমলুক, সুজামুঠা , ময়নাচুরার তিনটি বড়ো জমিদারির মালিক ছিল কৈবর্তরা। বিশেষত ময়নার কৈবর্ত জমিদারি মুঘল আমলেও প্রায় স্বশাসিত ছিল।[২৯] এই কৈবর্তদের ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

[২৮] Bishnupada Das, *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South Western Bengal Since Introduction of Neo-Vaisnavism*, p.90

[২৯] Ratnalekha Ray, *Change in Bengal Agrarian Society C.1760-1800*, New Delhi: Manohar, 1st Published, 1979, pp.139-143

কৈবর্তরা জমিজমা আর পয়সার সুবাদে এই পর্বে যখন মাহিষ্য পরিচিতি তৈরি করতে চাইছিল, তখন তাদের প্রয়োজন হয়েছিল বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয়। আর্থিক প্রতিপত্তির সুবাদে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য লাভে ও উচ্চ জাতিগত মর্যাদা অর্জনে মাহিষ্যদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। ধর্মাচরণের দিক থেকে এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিলেন বৈষ্ণব। ও'ম্যালি লিখেছেন ব্রাহ্মণদের তুলনায় বৈষ্ণবদের প্রতিই কৈবর্ত বা মাহিষ্যদের শ্রদ্ধাভক্তি বেশি।[৩০] সামাজিক সচলতা লাভে বৈষ্ণবদের সহযোগিতাকে এই শ্রদ্ধাভক্তির উৎস বলে মনে করা যেতে পারে।

সদ্গোপদের বৈষ্ণবতার ইতিহাস আমরা পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করব। এখানে কেবল এটুকু বলা যেতে পারে, মেদিনীপুরে অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের এই প্রবল প্রসারের প্রধানতম চরিত্র শ্যামানন্দ নিজেই সদ্গোপ। শ্যামানন্দ নিজেও বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। অত এব, শ্যামানন্দের পূর্ব প্রজন্ম থেকেই সদ্গোপদের একটা অংশের মধ্যে বৈষ্ণবতার প্রতি ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের তরফে শ্যামানন্দের স্বীকৃতি এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে শ্যামানন্দের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি এই অঞ্চলের সদ্গোপদের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আরও আগ্রহী করে তোলে। পেশা বদলের মাধ্যমে গোপ থেকে সদ্গোপ পরিচিতি লাভে তৎপর গোষ্ঠীটিও মেদিনীপুর অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে নাড়াজোল, মেদিনীপুর, কর্ণগড়, নারায়ণগড় ইত্যাদি জমিদারির মালিক ছিল। খেয়াল রাখতে হবে, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি অনুযায়ী বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে মেদিনীপুরেই সদ্গোপদের সংখ্যা সর্বাধিক।[৩১] এম. এন. শ্রীনিবাসের গবেষণা থেকে ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি, সামাজিক সচলতার কোন সাধারণ নিয়ম বা সূত্র না থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং আর্থিক প্রতিপত্তি কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার ধ্বন্যাত্মক অনুঘটক হতে পারে। এই দুইয়ের পাশাপাশি প্রয়োজন

---

[৩০] L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazeetters Midnapore*, p.58

[৩১] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Benga(Vol.2)*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1st published, 1892, p.214

ধর্মসম্প্রদায়ের তরফে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার বৈধতা। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও আর্থিক প্রতিপত্তির সুবাদে মেদিনীপুরের উল্লেখযোগ্য সদ্‌গোপ বংশগুলির মধ্যেও বৈষ্ণবতার প্রতি আগ্রহ দেখা গেছে। সদ্‌গোপদের সামাজিক সচলতার সঙ্গে বৈষ্ণবতার প্রতি ঝোঁকটি পরবর্তী অংশে আমাদের আলোচ্য। উনিশ শতকের শেষ দশকে মেদিনীপুরে এক লক্ষ 'শ্যামানন্দী' বৈষ্ণব ছিল।[৩২] মেদিনীপুরের মত জনবৈচিত্র সম্বলিত অঞ্চলে এই বিপুল সমর্থন লাভের নেপথ্যে ছিল স্থানীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধর্মাচরণ সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা ঠিকভাবে বুঝতে পারা এবং সেই অনুযায়ী কার্যকলাপ চালানো। নাহলে একইসঙ্গে কেওনঝরের আদিবাসী থেকে শুরু করে মেদিনীপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আর্থিক ও জাতিমর্যাদাযুক্ত গোষ্ঠীগুলিকে একই প্রতিষ্ঠানের ছাতায় আনা সম্ভব ছিল না। স্থানীয় চাহিদার এই মনোযোগী অনুধাবন শ্যামানন্দকে চৈতন্যদেব পরবর্তী সময়ের এত বড়ো মাপের একজন প্রচারক করে তুলেছিল। পরবর্তী অংশে আমরা এই প্রচারকের প্রতিভার আরেকটু পরিচয় পাব।

৫.২. সদ্‌গোপদের বৈষ্ণবতার ইতিহাস

রাঢ়বঙ্গে বর্ধমান অঞ্চলে সদ্‌গোপ বংশের রাজত্ব ছিল। গোপভূমের অন্তর্গত প্রাচীন অমরাগড় নামক স্থানে এক সদ্‌গোপ রাজা মহেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী অমরাবতীর নামে অমরাগড় দুর্গের পত্তন করেন। পরবর্তীকালে মেদিনীপুরে একাধিক সদ্‌গোপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এইসমস্ত রাজবংশের মধ্যে প্রচলিত আখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এই বংশের আদিপুরুষদের জন্ম হয়েছিল গোপভূমের বিভিন্ন অংশে। মেদিনীপুরের নারায়ণগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্ব পাল অমরাবতীর কাছে দিগনগর গ্রামে জন্মেছিলেন। মেদিনীপুরের আরেক সদ্‌গোপ জমিদার বংশ কর্ণগড় রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন বর্ধমানের নীলপুর গ্রামের বাসিন্দা। এই সদ্‌গোপ

[৩২] রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, পৃ.১০৫

পরিবারগুলি এই অঞ্চল থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। অমরাগড় ছাড়া ভাল্কীর গড় নামে আরেক বিখ্যাত সদ্‌গোপ জমিদার বংশ ছিল। ভাল্কীর গড়ের রাজ্যসীমা একসময় বিস্তৃত ছিল কাটোয়া থেকে পঞ্চকোট পর্যন্ত। কিংবদন্তি শোনা যায়, ভাল্কীর গড় রাজবংশ ভাল্লুক পালন করতেন। ভাল্লুক মরলে অশৌচের প্রথাও প্রচলিত ছিল। সম্ভবত, এই কিংবদন্তীর মধ্যে গোপ গোষ্ঠীর পূর্বতন বৃত্তি পশুপালনের ইঙ্গিত আছে। পশুপালন এবং কৃষিকাজ সম্ভবত সদ্‌গোপদের মধ্যেও একটা সময় একইসঙ্গে চলছিল। ভাল্কীর গড় রাজবংশের রাজা গোপালের পৌত্র বা প্রপৌত্র মহেন্দ্রই বিখ্যাত অমরার গড়ের রাজা। রাজা মহেন্দ্র অমরার গড়ে প্রতিষ্ঠা করেন দশভূজা সিংহবাহিনী মূর্তি; দেবীর নাম শিবাখ্যা। এই দেবীই অমরার গড়ের কুলদেবী।[৩৩] বীরভূমের দুবরাজপুর থানার সিহুড় (সিউর) গ্রামের কোঙর বংশের কুলদেবী দশভুজা শ্রী শ্রী রামেশ্বরী দেবী।[৩৪] গোপ বা সদ্‌গোপদের মধ্যে শক্তিদেবীর উপাসনা যে প্রচলিত ছিল তাঁর প্রমাণ আছে *ধর্মমঙ্গল*-এর আখ্যানে। *ধর্মমঙ্গল*-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র গোপ বংশীয় ইছাই ঘোষ ছিলেন দেবী শ্যামারূপার উপাসক। শক্তি উপাসনার পাশাপাশি শৈব উপাসনার ধারাও যথেষ্ট প্রবল ছিল গোপ ও সদ্‌গোপদের মধ্যে। একটি কিংবদন্তিতে দেখা যায়, গোপ বংশীয় এক পশুপালক বনের মাঝে গোরু চরাতে যেতেন। গোরুটি একদিন দুধ দিচ্ছে না দেখে গোয়ালার সন্দেহ হয়। পরদিন বনের মাঝে গোরুটিকে অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি দেখেন একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর গোরুটি দুগ্ধবর্ষণ করছে। এই দৃশ্যে গোয়ালা আশ্চর্য হয়ে পড়েন। রাতে তিনি স্বপ্নাদেশ পান অনাদি লিঙ্গ শিবের কাছ থেকে। শিব তাঁকে নির্দেশ দেন প্রস্তরখণ্ডটিকে উদ্ধার করে যথাবিধি শিবের উপাসনা শুরু করার। এই শিবলিঙ্গ দর্শন করার জন্য বনের মাঝে প্রচুর লোকের আগমন হতে থাকে; গড়ে ওঠে একটি

---

[৩৩] বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি(১ম খণ্ড)*, কলকাতা: পুস্তক প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫০, পৃ.২০৪-২০৭

[৩৪] ত্রৈলোক্যনাথ পাল, 'গোপভূমের আটজন সদ্গোপ রাজা', সদ্গোপ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৫, পৃ.১৮৪

শিবমন্দিরও। এই কিংবদন্তি বনজঙ্গল পরিষ্কার করে গোপদের নতুন বসতি তৈরির ইঙ্গিতও দেয়। গোপদের সঙ্গে পরবর্তীকালে সদ্‌গোপরা সম্পর্ক অস্বীকার করলেও দেখা যাবে অমরাগড়ের রাজবংশের অন্যতম প্রধান উপাস্য দেবতা দুগ্ধেশ্বর শিব।[৩৫] কাঁকসার সদ্‌গোপ রাজবংশের কুলদেবতা কঙ্কেশ্বর শিব। জীবতকুণ্ড নামে এক পুকুরের ধারে কঙ্কেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।[৩৬] শৈব উপাসনার সঙ্গে সদ্‌গোপদের সম্পর্কের প্রমাণ আছে মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিবায়ন* রচনায়। কর্ণগড় রাজপরিবারের উপাস্য দেব-দেবী মহামায়া ও দণ্ডেশ্বর শিব। নারায়ণগড় রাজপরিবারের অন্যতম উপাস্য দেবী ব্রহ্মাণী। শিব-শক্তি উপাসনার ধারাটিকে সদ্‌গোপরা ছেড়ে না দিলেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে সদ্‌গোপদের সখ্য তৈরি হতে থাকে। খেয়াল করব, অমরার গড়ের নানা দেবদেবীর মধ্যে একটি পঞ্চরত্ন নারায়ণ মন্দিরও ছিল।[৩৭] এমনকি, যে কর্ণগড় রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় *শিবায়ন* রচিত হয়েছিল, সেই *শিবায়ন*-এর মধ্যেও বৈষ্ণবভক্তির ছাপ লক্ষণীয়। রামেশ্বরের *শিবায়ন* কাব্যে বন্দনা অংশে চৈতন্য বন্দনা পাওয়া যাবে। চৈতন্যদেব পরবর্তী বঙ্গদেশের শিবভক্তির কাব্যের পক্ষেও চৈতন্যদেবকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। চৈতন্যদেব কলিযুগে নামসংকীর্তনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছিলেন। সেই সূত্রটিকে মনে রেখেই যেন রামেশ্বরের রচনাতেও পাওয়া যাচ্ছে বিষ্ণুনামের মাহাত্ম্য—"বিষ্ণুনাম নিতে কেহ কর্য নাই হেলা।।"[৩৮] শৈব-শাক্ত ধারার পাশাপাশি সদ্‌গোপ রাজপরিবারগুলিতে বৈষ্ণব উপাসনার ছাপ যে পড়ছিল তার আরও অনেক প্রমাণ আছে। বর্ধমানের আউসগ্রাম থানার ওড়গ্রামের ওড়ম্বর

---

[৩৫] Hitesranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal*, Calcutta: Papyrus, 1st Published, 1981, pp.84-87

[৩৬] বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি(১ম খণ্ড)*, পৃ.২০৮

[৩৭] তদেব, পৃ.২০৭

[৩৮] যোগিলাল হালদার(সম্পা.), *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন*, কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, [], ২০১২, পৃ.১২৯

রায় বংশের কুলদেবী শ্রী শ্রী ত্রৈলোক্যতারিণী এবং কুলদেবতা শ্রী শ্রী শ্যামরায়জীউ ঠাকুর। আবার, সদ্‌গোপ জাতির প্রতিহার রায় বংশের কুলদেবতা বৈষ্ণব—শ্রী শ্রী কেলেসোনা।[৩৯]

মেদিনীপুর সহ বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সদ্‌গোপদের উপস্থিতি ছিল। সদ্‌গোপ কুলপঞ্জিকার বক্তব্য অনুযায়ী পশ্চিমকুল কুলীন সদ্‌গোপদের আদিপুরুষ পশ্চিমদেশ থেকে এসেছিলেন। পূর্বকুল কুলীনদের মধ্যে প্রচলিত আখ্যান অনুযায়ী তাঁরা কৌলীন্য পেয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের চোল রাজবংশের থেকে। পূর্বকুল কুলীন ও মৌলিক সদ্‌গোপদের সকলেই বৈষ্ণব। পশ্চিমকুলীন সদ্‌গোপদের কেউ কেউ বৈষ্ণব, কেউ শৈব। বিশেষত, কৃষিজীবী মৌলিক সদ্‌গোপদের মধ্যে ভক্ত বৈষ্ণবোচিত আচরণ যথেষ্ট দেখা যায়। তাঁরা মাংস, পেঁয়াজ খান না; হরিনাম সংকীর্তন করে থাকেন।[৪০] সদ্‌গোপদের মধ্যে শৈব ও শাক্ত ধর্মের ধারাটিকে স্বীকার করেও হিতেশরঞ্জন সান্যাল জানিয়েছেন—সদ্‌গোপদের অধিকাংশই বৈষ্ণব।[৪১] রিজলিও তাঁর রচনায় জানিয়েছেন, হরি ও সত্যনারায়ণ সদ্‌গোপ সমাজের অত্যন্ত প্রিয় দেবতা। সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে লক্ষ্মীর কদরও আছে সদগোপদের মধ্যে।[৪২]

ষোড়শ- সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই সদ্‌গোপদের মধ্যে বৈষ্ণবতার প্রাবল্য বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। চৈতন্যদেব পরবর্তী বঙ্গদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মপ্রচারক শ্যামানন্দ ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। বৃন্দাবনে ষড়গোস্বামীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত শ্যামানন্দ মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার কিছু অংশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বেশ সাফল্য লাভ করেছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে শ্যামানন্দের গুরুত্বপ্রাপ্তি সদ্‌গোপদের একটা বড়ো অংশকে স্বাভাবিকভাবেই বৈষ্ণবতার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এমনকি, শ্যামানন্দের পরবর্তীকালে সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে আরও এক বৈষ্ণবগুরু

---

[৩৯] ত্রৈলোক্যনাথ পাল, 'গোপভূমের আটজন সদ্গোপ রাজা', পৃ.১৮৬-১৮৭

[৪০] শরৎচন্দ্র ঘোষ, *সদ্গোপ-তত্ত্ব(১ম খণ্ড)*, কলকাতা: সুধীর চন্দ্র ঘোষ, ১ম সংস্করণ, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.৩২-৩৩

[৪১] Hitesranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal*, p.93

[৪২] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Benga(Vol2)*, p.213

উঠে আসেন। তিনি রামশরণ পাল, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষ্ণবতার যোগ থাকলেও চরিত্রে এই ধর্মমত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের থেকে অনেকটাই আলাদা। সদ্‌গোপ জাতির এক ঐতিহাসিকের মতে সদ্‌গোপরা এককালে বৌদ্ধ ছিলেন। সদ্‌গোপদের কুলজিগ্রন্থের সূচনায় 'শূন্যমূর্তি সদ্ধর্ম্ম নিরঞ্জন'-এর স্তব থাকে। পরে সদ্‌গোপদের মধ্যে শৈব ও শাক্ত ধারার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সদ্‌গোপদের মধ্যে সেসময়ে বৈষ্ণব খুবই কম ছিলেন। পরে চৈতন্যদেবের উত্থানের সঙ্গে এবং সদ্‌গোপ জাতির মধ্যে থেকে শ্যামানন্দ ও ঘোষপাড়ার ঘোষ বংশের বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক হিসাবে খ্যাতির সুবাদে সদ্‌গোপদের একটা বড়ো অংশ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন।[৪৩] শ্যামানন্দের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরে শৈবধর্মের গুরুত্বহ্রাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি, গোপীবল্লভপুরে শিবের আধিপত্য থাকলেও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে শিবকে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে পাশের গ্রামে। গোপীবল্লভপুরের বৈষ্ণব মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত কাশীনাথ শিব রাধা-গোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণ করে থাকেন। শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সুবাদে স্থানীয় শৈব সংস্কৃতি হয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে আপোস করেছে; অথবা শৈবরা সরাসরি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছে।[৪৪] এই অঞ্চলে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমতকে সরিয়ে বৈষ্ণবধর্মকে জায়গা দিতে শ্যামানন্দ-রসিকানন্দ বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। যেসব অঞ্চলে শাক্তদের আধিপত্য ছিল, সেখানেই তাঁরা বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছেন। হিংস্র, রক্তপায়ী রঙ্কিণী দেবী তাঁদের প্রচেষ্টায় হয়ে উঠেছেন অহিংস।[৪৫] শ্যামানন্দ- রসিকানন্দের আধ্যাত্মিক প্রতিভা ও সাংগঠনিক দক্ষতায় শৈব-শাক্ত ধর্মের উপর বৈষ্ণবধর্মের যে আধিপত্য তৈরি হয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল সদ্‌গোপদের উপরেও। সদ্‌গোপদের মধ্যে স্থানীয় স্তরে প্রচলিত ও শক্তিশালী ধর্মমতের আশ্রয় গ্রহণের

---

[৪৩] রঙ্গলাল ঘোষ, 'সদ্গোপ জাতির ইতিহাসের কিঞ্চিৎ' সদ্গোপ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৫, পৃ.২২৫-২২৬

[৪৪] মধুপ দে, *ঝাড়গ্রাম : ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, কলকাতা: মনফকিরা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০২০, পৃ.১৫০

[৪৫] বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায়(সম্পা.), *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন(২য় খণ্ড)*, পৃ.৩৯২

প্রবণতা আছে। একদিক থেকে বিচার করলে, এটা খুবই স্বাভাবিক প্রবণতা। একটি গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, সদ্‌গোপদের মধ্যে সাধারণত শিব-শক্তির উপাসনা প্রচলিত থাকলেও মল্লভূমের বেশ কিছু সদ্‌গোপ পরিবারে মল্লভূমের বৈষ্ণব মল্লরাজাদের প্রভাবে বিষ্ণু উপাসনার ধারা প্রচলিত। এমনকি, কিছু কিছু পরিবারের কুলদেবতা হিসাবে শালগ্রাম শিলার উপস্থিতি খেয়াল করা যায়।[৪৬]

মেদিনীপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলে সদ্‌গোপদের ভূম্যধিকারী হিসাবে বিশেষ ক্ষমতা ছিল। শ্যামানন্দ নিজে জাতিতে সদ্‌গোপ। শ্যামানন্দের প্রধান সহযোগী রসিকানন্দ এই অঞ্চলের আরেক ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী করণদের প্রতিনিধি। স্থানীয় স্তরে ক্ষমতাশালী দুই গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের হাতে পরিচালিত বৈষ্ণবধর্ম এই অঞ্চলে দ্রুত প্রসারিত হয়। শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের কারণে স্থানীয় সদ্‌গোপ ও করণদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। এপ্রসঙ্গে, আরেকটি বিতর্কের কথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। শ্যামানন্দ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব শিখে মেদিনীপুর, উৎকল ইত্যাদি অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নেন। ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপালভট্ট রচিত স্মৃতিগ্রন্থ *হরিভক্তিবিলাস*-এ প্রতিলোম দীক্ষাকে সমর্থন জানানো হয়নি। শ্যামানন্দ এই ধারার সঙ্গে পরিচিত হলেও এই মতকে সমর্থন জানাননি। নিজে সদ্‌গোপ হয়েও শ্যামানন্দ উচ্চবর্ণের লোকজনকে, এমনকি ব্রাহ্মণদেরও দীক্ষা দিতেন। প্রতিলোম দীক্ষা দিতেন শ্যামানন্দের সমসাময়িক কায়স্থ নরোত্তম দত্তও। খেতুরী মহোৎসবে এই বিষয়ে বিতর্ক তৈরি হলে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম দত্ত—দুজনেই সাধনবলে দ্বিজত্বপ্রাপ্ত। সুতরাং, ব্রাহ্মণ সহ অন্যান্য উচবর্ণকে দীক্ষাদানের

[৪৬] মাণিকলাল সিংহ, *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি(২য় খণ্ড)*, বিষ্ণুপুর: প্রণবকুমার সিংহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ.৬৩

অধিকার তাঁদের আছে। বৈষ্ণবগ্রন্থ *প্রেমবিলাস*-এর উক্তিতে দেখা যায় শ্যামানন্দ নিজে উপবীত ধারণ করতেন—

গোয়ালা আছিল তিঁহো হইলা ব্রাহ্মণ।

ভজনের এত গুণ জানে সর্ব্বজন।।

অথবা,

শ্যামানন্দের রূপ দেখে পরম উজ্জ্বল।

জ্যোতির্ম্ময় পৈতা অঙ্গে করে ঝলমল ।।[৪৭]

বৈষ্ণবসমাজের একটা বড়ো অংশের তরফে শ্যামানন্দের 'দ্বিজত্ব'-এর স্বীকৃতি নিজগোষ্ঠীর কাছে শ্যামানন্দের গুরুত্ব নির্দ্বিধায় বাড়িয়ে তুলেছিল। শ্যামানন্দের স্বীকৃতি ব্যক্তিগত হয়েও গোষ্ঠীর মর্যাদাবৃদ্ধির চিহ্ন। পরবর্তীকালেও দেখছি, উপবীত ধারণ বিতর্ক প্রসঙ্গে শ্যামানন্দ সম্প্রদায় যথেষ্ট সরব থেকেছে। শ্যামানন্দী বৈষ্ণব মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি তাঁর *গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস বৈষ্ণব বিবৃতি*-তে গোপীবল্লভপুর মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামীর চিঠি উদ্ধৃত করে জানান—" বৈষ্ণব ইচ্ছা করিলে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ স্বরূপে উপবীত ধারণ করিতে পারেন। সেজন্য নিত্যতাও নাই, নিষেধও নাই।"[৪৮] এই মন্তব্য পরোক্ষে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সমতুল্যতা জ্ঞাপক। সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতির কাছে এই ধরনের মন্তব্যের আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। শ্যামানন্দকে কেন্দ্র করে দ্বিজত্বের এই দাবি উনিশ-বিশ শতকের সদ্‌গোপ সমাজের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশ শতকে জনগণনার সময়ে জাতিগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শরৎচন্দ্র ঘোষ *সদ্গোপ- তত্ত্ব* বইতে শ্যামানন্দের যজ্ঞোপবীত ধারণের সূত্রে সদ্‌গোপ

---

[৪৭] নিত্যানন্দ দাস, *প্রেমবিলাস*, পৃ.১৭১

[৪৮] মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস বৈষ্ণব বিবৃতি*, হুগলী: সুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৫৩

জাতির দ্বিজত্বের দাবি করেছেন।[৪৯] একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির দরুণ প্রাপ্ত স্বীকৃতিকে তাঁর স্বজাতি আত্মসাৎ করতে চাইছে। উনিশ- বিশ শতকের সদ্‌গোপ সমাজে শ্যামানন্দের গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া যাবে ১৩৩৫-৩৬ বঙ্গাব্দের 'সদ্গোপ পত্রিকা'য় একই লেখকের শ্যামানন্দ বিষয়ক প্রবন্ধেও। এপ্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'প্রবাসী' পত্রিকার ৩৯ বর্ষ, ২য় খণ্ড, মাঘ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন সেন শ্যামানন্দ করণবংশীয় বলে দাবি করেন। এই প্রবন্ধের পাল্টা জবাব দেন সদ্‌গোপ সমাজের তরফে ক্ষিতিনাথ সুর 'প্রবাসী' পত্রিকারই ৩৯ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যায়। তিনি সোচ্চারে শ্যামানন্দকে সদ্‌গোপ সমাজের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন।[৫০] এই ক্ষিতিনাথ সুর ছিলেন 'সদ্গোপ পত্রিকা'রও নিয়মিত লেখক। এইসমস্ত কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে সদ্‌গোপ সমাজে শ্যামানন্দের গুরুত্বের চিহ্ন।

শ্যামানন্দের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের অজস্র সদ্‌গোপ পরিবার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। *রসিকমঙ্গল* রচয়িতা গোপীজনবল্লভ দাস ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। তাঁর পিতা রসময় দাস পরিবার সহ শ্যামানন্দের শিষ্য হয়েছিলেন। গোপীজনবল্লভ দাস নিজে ছিলেন রসিকানন্দের শিষ্য।[৫১] শ্যামানন্দের স্বজাতির লোকজন এই নব্য বৈষ্ণবমতের প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে গোপীবল্লভপুরে মঠ প্রতিষ্ঠার পরে তাঁরা মন্দিরের মহান্তদের পূজার্চনার সহযোগী হয়ে ওঠেন এবং 'অধিকারী' উপাধি ধারণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা বহু ভূসম্পত্তির মালিক হন।[৫২] গোপীবল্লভপুর পাটের সঙ্গে যুক্ত 'অধিকারী' উপাধিপ্রাপ্ত সদ্‌গোপ

---

[৪৯] শরৎচন্দ্র ঘোষ, *সদ্গোপ-তত্ত্ব(১ম খণ্ড)*, পৃ.৪৪

[৫০] ক্ষিতিনাথ সুর, 'শ্যামানন্দের জাতি ও নিবাস', 'প্রবাসী', ৩৯ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৬, পৃ.৭৭৫-৭৭৬

[৫১] যোগেশচন্দ্র বসু, *মেদিনীপুরের ইতিহাস*, কলকাতা: সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.৪৬১

[৫২] Bishnupada Das, *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South Western Bengal Since Introduction of Neo-Vaisnavism*, p.68

পরিবারগুলি স্বজাতির অন্যান্য লোকদের তুলনায় মর্যাদায় কিছুটা উঁচু। উচ্চবর্ণসুলভ একাধিক সংস্কার পালন এবং আচার-অনুষ্ঠানে তাঁদের অধিকার আছে। গোপীবল্লভপুরের গোস্বামীদের সংস্পর্শে এসে তাঁরা আর নিজেরা হালচাষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বরং, ব্রাহ্মণ ও করণ ভূম্যধিকারীদের মতো কেবল কৃষিকার্যের তদারকি করতেন।[৫৩] কায়স্থ বা করণদের মতো মেদিনীপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলের সদ্‌গোপরাও নিজে হাতে জমি চষার কাজকে জাতিমর্যাদার পক্ষে হানিকর বলে মনে করেছিলেন।[৫৪] সদ্‌গোপ গোষ্ঠীভুক্ত চাষী ও ভূম্যধিকারী পরিবারগুলি গোপীবল্লভপুর পাটের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার ধারা বজায় রেখেছিলেন। প্রচুর দেবোত্তর জমি তাঁরা মঠকে দান করেন। সদ্‌গোপদের পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে আরেক শক্তিশালী গোষ্ঠী মাহিষ্যদেরও একাধিক প্রজন্ম ধরে গোপীবল্লভপুর পাটের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা বজায় থেকেছে। তমলুক, কোন্টাইয়ের বহু মাহিষ্য ভূম্যধিকারী পরিবার গোপীবল্লভপুর পাটের ভক্তগোষ্ঠীর অন্তর্গত।[৫৫]

সদ্‌গোপদের বৈষ্ণবতার ইতিহাসে মেদিনীপুরের সদ্‌গোপ রাজবংশগুলির কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। নারায়ণগড়, নাড়াজোল, কর্ণগড় ইত্যাদি রাজপরিবার জাতিতে সদ্‌গোপ। নাড়াজোল রাজপরিবারের তরফে একাধিক বৈষ্ণবমন্দির তৈরি করা হয়েছিল। বহু ভূসম্পত্তি সহ এই মন্দিরগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজপরিবারের তরফে তুলে দেওয়া হয়েছিল গোপীবল্লভপুরের মঠের মহান্তদের হাতে।[৫৬] নাড়াজোল রাজপরিবারের অধীনে একসময় প্রায় ১৪,০০০ বিঘা জমি ছিল; বার্ষিক রাজস্ব ছিল ১৩,০০০ টাকারও বেশি।[৫৭] এই

---

[৫৩] তদেব, পৃ.১৭৮

[৫৪] P.K.Bhowmick, *Socio-Cultural Profile of Frontier Bengal*, Calcutta: Punthi Pustak, 1st Edition, 1976, p.33

[৫৫] Bishnupada Das, *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South Western Bengal Since Introduction of Neo-Vaisnavism*, p.108

[৫৬] তদেব, পৃ.৬৪

[৫৭] কমল চৌধুরী(সম্পা.), *মেদিনীপুরের ইতিহাস(দ্বিতীয় পর্ব)*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৯, পৃ.১২৩

বিপুল সম্পত্তির বেশ কিছুটা খরচ করা হয়েছিল বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায়। নাড়াজোল রাজপরিবারের কুলদেবতা সীতারাম জীউ। এই রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ রাজবাড়িতে রাম-সীতার মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। এখানে রাম-সীতার বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহে ঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন গোপীবল্লভপুর মন্দিরের দেবতা শ্রী শ্রী মদনমোহন জীউ।[৫৮] অর্থাৎ, এই সদ্‌গোপ রাজপরিবার শ্যামানন্দ প্রতিষ্ঠিত গোপীবল্লভপুরের মঠের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গেছে। নাড়াজোল রাজপরিবারের তৈরি স্থাপত্যগুলি দেখলেও বোঝা যায়, সদ্‌গোপ পরিবারগুলির মধ্যে শিব-শক্তির উপাসনার পাশাপাশি কীভাবে বৈষ্ণবতার প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। নাড়াজোল রাজবাড়ির ভিতরে একটি মৃত্যুঞ্জয় শিবের আটচালা মন্দির বা একটি বড়ো দুর্গাদালান থাকলেও পাশাপাশি দেখা যাবে একাধিক বৈষ্ণব স্থাপত্য। বিশেষত, রাজপরিবারের তৈরি করা পঁচিশরত্ন রাসমঞ্চটি উল্লেখযোগ্য। রাসমঞ্চটি সম্ভবত উনিশ শতকে নির্মিত। এছাড়া, দুর্গামন্দিরের পাশেই আছে গোবিন্দজীউ ও রঘুনাথজীউর মন্দির।[৫৯] আরেক সদ্‌গোপ পরিবার—নারায়ণগড় রাজবংশের জমিজমা ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬৫,৫০৬ বিঘার অধিক। বিশ শতকের গোড়ায় নারায়ণগড় জমিদারির বার্ষিক রাজস্ব ধার্য হয় ৭০,০০০ টাকা।[৬০] শিব-শক্তির উপাসনার পাশাপাশি বৈষ্ণব উপাসনার ধারা প্রচলিত ছিল নারায়ণগড় রাজবাড়িতেও। রাজা নারায়ণবল্লভ পাল কুলদেবতা ভুবনমোহন জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজবাড়ির অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি ব্রজনাগর, রাধারমণ ইত্যাদি বৈষ্ণব বিগ্রহ। শোনা যায়, পুরী যাবার পথে চৈতন্যদেব নারায়ণগড় রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে সংকীর্তন করেছিলেন।[৬১] উনিশ শতকে এই বৈষ্ণব-সদ্‌গোপ রাজপরিবারগুলির প্রতিনিধিরাই সদ্‌গোপ

---

[৫৮] তদেব, পৃ.১৩১

[৫৯] তারাপদ সাঁতরা, *পুরাকীর্তি সমীক্ষা: মেদিনীপুর,* কলকাতা: [], প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃ.১০৫

[৬০] প্রণব রায়(সম্পা.), *মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন(৪র্থ খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ.২৪

[৬১] প্রণব রায়, *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ,* পৃ.১৬০-১৬১

জাতির নেতা হয়ে ওঠেন এবং জাতিমর্যাদাবৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যকলাপে যুক্ত থাকেন। সদ্‌গোপদের সামাজিক সচলতা লাভের ইতিহাসে এই রাজপরিবারগুলির প্রতিপত্তির কথা খেয়াল রাখতেই হয়। পরবর্তী অংশে সদ্‌গোপদের সামজিক সচলতা প্রাপ্তির ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বিষয়টি আমরা আরও বিশদে আলোচনা করব। তবে, এই উপ-অধ্যায়ের সূত্রে আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম যে সামাজিক সচলতার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুমোদন সদ্‌গোপরা জোগাড় করে নিতে চাইছিল স্থানীয় স্তরে শক্তিশালী আরেক সদ্‌গোপ শ্যামানন্দ প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে। মেদিনীপুরে বৈষ্ণবধর্মের দাপট, সাংগঠনিক শক্তি উচ্চাকাঙ্ক্ষী সদ্‌গোপদের ধীরে ধীরে টেনে আনছিল বৈষ্ণবধর্মের বৃত্তে। শ্যামানন্দ প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের পরিসরে নিজেদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করতে আর্থিক সমৃদ্ধিকে তাঁরা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

৫.৩. গোপ, সদ্‌গোপ ও সদ্‌গোপদের নবশাখ মর্যাদাপ্রাপ্তি

হিতেশরঞ্জন সান্যালের প্রামাণ্য গবেষণা *Social Mobility in Bengal*-এ দেখা যাচ্ছে গোপদের একটা অংশ পূর্বতন পেশা—পশুপালনের বদলে কৃষিকাজে যুক্ত হয়ে পড়ছিলেন। তাতে আর্থিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাও বাড়ছিল। এই অংশটি পূর্বতন গোষ্ঠী পরিচিতিকে অস্বীকার করে সদ্‌গোপ নামে নিজেদের পরিচয় দিতে চাইছিলেন। গোষ্ঠীনামের আগে ‘সৎ’ বিশেষণটি যুক্ত করে তাঁরা গোপদের তুলনায় নিজেদের উন্নত সামাজিক মর্যাদা চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ‘সৎ’ শব্দটি পূর্বতন গোষ্ঠীনামের আগে যোগ করে উন্নততর অবস্থান বোঝানোর চেষ্টা আমরা আগেও লক্ষ করেছি। যেমন-সৎ + চাষী = সচ্চাষী। ভূম্যধিকারী সদ্‌গোপরাও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ তৎপর ছিলেন। বঙ্গদেশের জাতিকাঠামোয় গোপদের অবস্থান বেশ নিচুতে; উঁচু ঘরের ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য তাঁরা পান

না। সদ্‌গোপরা অবশ্য ধর্মকৃত্যগত মর্যাদায় গোপদের থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে। তাঁরা সম্মানজনক নবশাখ পর্যায়ভুক্ত। বঙ্গদেশের বর্ণজাতিকাঠামোয় সর্বোচ্চ স্থানে আছেন ব্রাহ্মণ। তারপরেই বৈদ্য ও কায়স্থ। এই তিন জাতিকে নিয়েই বাংলার উচ্চজাতি গঠিত। এই উচ্চজাতির পরেই নবশাখদের অবস্থান। নবশাখের মধ্যে প্রথমে বারুই, মোদক, কর্মকার, নাপিত ইত্যাদি ৯টি গোষ্ঠী থাকলেও বর্তমানে নবশাখ গোষ্ঠীভুক্ত জাতির সংখ্যা প্রায় ১৪। সদ্‌গোপরা কীভাবে সৎশূদ্র বা নবশাখ মর্যাদ পেলেন—সেই ইতিহাসটিই এখন আমাদের আলোচ্য।

গোপদের অবস্থান পর্যালোচনা করতে হলে আমাদের অবশ্য অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে শুরু করতে হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গোপদের উল্লেখযোগ্য পূর্বসূত্র আভীর বা আহীর জাতি। আভীর বা আহীররা ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা নন; সম্ভবত মধ্য এশিয়া থেকে তাঁরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের গোষ্ঠীগত বৃত্তি পশুপালন। এই দিক থেকে গোপদের সঙ্গে আভীরদের প্রাথমিক সাদৃশ্য খেয়াল করা যায়। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে দেখলে মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতে আভীরদের বারংবার 'ম্লেচ্ছ' বলা হয়েছে। *মৎস্যপুরাণ*-এ শক, পুলিন্দ, অন্ধ্র প্রভৃতি জাতির সঙ্গে আভীরদেরও চিহ্নিত করা হয়েছে 'ম্লেচ্ছ' নামে। যদিও পুরাণমাত্রেই আভীরদের 'ম্লেচ্ছ' তকমা দেয়নি। *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*-এর কথা প্রসঙ্গত খেয়াল রাখতে পারি।[৬২] খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পতঞ্জলির *মহাভাষ্য*-এ অবশ্য আভীরদের শূদ্রের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছিল—'শূদ্রাভীরাম'।[৬৩] এই গোষ্ঠী ভারতে বসবাস শুরু করার পরে যাযাবরবৃত্তি ছেড়ে দেয়। বিভিন্ন পেশায় তাঁদের ঝোঁক দেখা গেলেও গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ

[৬২] Dev Kumar Jhanjh, 'Changing Social Contours of the Abhiras in Early India', Proceedings of the Indian History Congress, Vol.76, 2015, p.102

[৬৩] Debala Mitra, 'The Abhiras and Their Contributions to the Indian Culture', Proceedings of the Indian History Congress, Vol.14, 1951, p.92

মানুষ যুক্ত ছিলেন পূর্বতন পেশা পশুপালনে।[৬৪] আভীরদের পরাক্রম ছিল; যুদ্ধবৃত্তিতেও তাঁরা দক্ষ ছিলেন। *মহাভারত*-এর অশ্বমেধ পর্বের বিবরণ পড়লে দেখা যায়, আভীররা ক্ষত্রিয় হলেও ক্ষত্রিয়োচিত ধর্মপালনের অভাবে শূদ্রত্ব বা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। অবশ্য মহাভারত-এর সংশ্লিষ্ট শ্লোকটি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায়, আভীরদের ক্ষত্রিয়ত্ব নিছকই বৃত্তিগত; জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নয়। তবে, পতঞ্জলির রচনায় আভীরদের 'শূদ্র' বলে গণ্য করার মধ্যে সম্ভবত প্রথম তাঁদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণকাঠামোয় নিয়ে আসার চেষ্টা হল। প্রশ্ন হচ্ছে, শক, পুলিন্দ, বাহ্লীক ইত্যাদি শক্তির তুলনায় আভীরদের কেন আগে বর্ণকাঠামোয় নিয়ে আসার চেষ্টা হল? এর উত্তর আছে সম্ভবত অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির তুলনায় আভীরদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রাধান্যে। এই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা গিয়েছিল যুদ্ধবৃত্তির সাহায্যে। বাল্মীকি *রামায়ণ*-এ এবং ব্যাসদেবের *মহাভারত*-এর ভীষ্মপর্বে আভীরদের দস্যুবৃত্তির উল্লেখ আছে। আভীরদের দুর্দমনীয় শক্তির প্রমাণ আছে ৯ম শতাব্দীর ঘাটিয়ালা অনুশাসনেও—'আভীরজনদারুণঃ'।

কালক্রমে আভীররা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। রাজনৈতিক শক্তিরও কিছুটা হ্রাস হয়। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত স্থানীয় রাজাদের মধ্যে আভীরদের উল্লেখ আছে। মনে রাখতে হবে, আভীরদের ক্ষত্রিয়ত্ব ছিল বৃত্তিগত; জন্মগত নয়। ফলে, রাজনৈতিক শক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ক্ষত্রিয় মর্যাদাতেও টান পড়ে। ফলত, স্মৃতিশাস্ত্র ঘাঁটলে দেখা যাবে *মনুসংহিতা*-য় আভীররা অনুলোম বর্ণসংকর—ব্রাহ্মণ পিতা ও অম্বষ্ঠ মাতার সন্তান। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*-র একটি ভাষ্যে আভীরদের মহাশূদ্র বলা হয়েছে। অনেক পরবর্তী স্মৃতিকার হেমচন্দ্র মনুনির্দিষ্ট বর্ণভিত্তিক বৃত্তির কথা মাথায় রেখে কৃষিকাজ ও পশুপালনে রত আভীরদের বৈশ্য বলেছেন। আভীরদের একটা অংশ যে কৃষিকার্যে যুক্ত ছিল

[৬৪] তদেব, পৃ.৯৩

তার প্রমাণ আছে চতুর্থ শতাব্দীর নৃপতি তৃতীয় রুদ্রসেনের গোন্দাল পুরালেখে।[৬৫] ফলত, আভীরদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে একপ্রকার টানাপোড়েন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে দেখা যাবে। আসলে হেমচন্দ্র বৃত্তিগত কারণে আভীরদের বৈশ্য বললেও সামাজিক ব্যবহারে আভীররা বৈশ্যোচিত মর্যাদা পেতেন না। আরও পরবর্তী যুগের স্মৃতিশাস্ত্রে—যেমন ত্রয়োদশ শতাব্দীর *স্মৃতিচন্দ্রিকা*-য় আভীরদের বর্ণাশ্রম বহির্ভূত গোষ্ঠী বলা হয়েছে।[৬৬] দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রচিত *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এও আভীররা অপেক্ষাকৃত নিচু মধ্যম সংকর পর্যায়ভুক্ত। এইসমস্ত উল্লেখ থেকে আভীরদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে একপ্রকার সংকোচ ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে লক্ষ করা যায়। সার্বিক বিচারে ভারতবর্ষীয় বর্ণজাতিকাঠামোয় আভীরদের স্থান খুব উঁচুতে বলা চলে না। তবে, যেসমস্ত জায়গায় আভীররা রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিলেন, সেখানে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ভালোই ছিল। একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রের আভীররা ব্রাহ্মণ হিসাবে স্বীকৃত![৬৭] এই ব্যতিক্রমগুলি বাদ দিলে বেশিরভাগ প্রদেশে এবং বেশিরভাগ কালপর্বেই আভীরদের খুব উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী বলা চলে না। সামরিক পরাক্রম তাঁদের চিরস্থায়ী মর্যাদা দিতে পারেনি।

এখন আভীরদের সঙ্গে গোপের সম্পর্ক বিচার করা প্রয়োজন। গোপদের সঙ্গে আভীরদের পেশাগত সাদৃশ্যের কথা আমরা আগেই বলেছি। হোয়সল, কলচুরি, চালুক্য বংশের পুরালেখে আভীর অর্থে ‘গুয়ালা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ‘গুয়ালা’রাই গোপ বা গোপালক গোষ্ঠী। মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতে আভীর, গোপ, ঘোষ, গোপাল শব্দগুলি সমার্থে ব্যবহৃত হয়ে

---

[৬৫] Dev Kumar Jhanjh, ‘Changing Social Contours of the Abhiras in Early India’, pp.102-106

[৬৬] Bhagwansingh Suryavanshi, *The Abhiras : Their History and Culture*, Baroda: Maharaja Sayajirao University of Baroda, 1st Edition, 1962, pp.23-24

[৬৭] Debala Mitra, ‘The Abhiras and Their Contributions to the Indian Culture’, p.99

থাকে। *ব্রহ্মপুরাণ*-এও আভীর আর গোপাল সমার্থক।[৬৮] এমনকি, বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেও আভীর আর গোপ সমার্থক। রিজলির রচনায় আভীর গোপজাতি বা গোয়ালার প্রতিশব্দ।[৬৯]

আভীর আর গোপদের এক বলে ধরে নিলে কার্যত ভারতবর্ষ জুড়ে আভীর বা গোপদের বিস্তার দেখা যায়। বঙ্গদেশেও আভীর বা গোপদের অস্তিত্ব যথেষ্ট। গোপদের দেখা যাবে বঙ্গদেশ সংলগ্ন বিহার ও উড়িষ্যাতেও। আভীর আর গোপ-গোয়ালা মূলত এক হলেও শব্দব্যবহারের দিক থেকে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে আভীর এবং বঙ্গদেশে গোয়ালা বা গোপ শব্দের প্রচলন বেশি। এই জাতি নিজেদের ভগবান কৃষ্ণের স্বজাতীয় বলে মনে করে। এই কিংবদন্তির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন থাকতে পারে। তবে, লোকবিশ্বাসে এবং গোয়ালাসমাজে এই দাবি খুবই মজবুত। আনুমানিকভাবে ১৭০০-১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত বঙ্গদেশের কবি দ্বিজ কবিচন্দ্রের *কপিলামঙ্গল*-এ বলা হয়েছে—

গোধন সেবার ধর্ম কে কহিতে পারি।

আপনে সফল করি মানিলা শ্রীহরি।।

গোপকূলে জনমিয়া গোধন সেবিলা।

গোবিন্দ আপনে যার সঙ্গে করি লীলা।।[৭০]

গোপজাতির সঙ্গে মথুরার নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও আছে *কপিলামঙ্গল*-এ। স্বর্গের কপিলা গাই মর্ত্যে জন্মে ছিল মথুরা নগরে হরিহর গোয়ালার ঘরে।[৭১]

---

[৬৮] Bhagwansingh Suryavanshi, *The Abhiras : Their History and Culture*, pp.21-22

[৬৯] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Bengal (Vol.1)*, Calcutta: Firma Mukhopadhyay, [], [], p.1

[৭০] অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.), *কপিলামঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র*, কলকাতা: ভারবি, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ.৬৫-৬৬

[৭১] তদেব, পৃ.৪৯

কালক্রমে বিভিন্ন পশুপালক গোষ্ঠী গোপ, গোয়ালা বা আভীর জাতির নামের তলায় আশ্রয় নিয়েছে—এমনটা মনে করার সংগত কারণ আছে। এইকারণে গোয়ালা বা গোপজাতির মধ্যে একাধিক উপবিভাগ দেখা যায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দেশী, নন্দবংশী, যদুবংশী, সুরবংশী, আহীর ইত্যাদি সাতপ্রকার উপবিভাগ চোখে পড়ে। বিহারের গোপ জাতির মধ্যে উপবিভাগগুলি আবার অন্যরকম। নওমূলিয়া, সাতমূলিয়া, দহিয়াড়া বা গোরিয়া, কনৌজিয়া ইত্যাদি উপবিভাগ দেখা যাবে বিহারে।[৭২] বঙ্গদেশে রাঢ়ী, বাগড়ী, বারেন্দ্র, পল্লব বা বল্লব, গৌড় বা ঘোষগোয়ালা, মধুগোয়ালা, করঞ্জী, কাঙ্গাল, আহীর, ভোগা ইত্যাদি ভাগ আছে। বারেন্দ্র শ্রেণির গোয়ালদের মধ্যেও আবার কিছু উপস্তর আছে—পল্লাল, লাহেড়ি, মূল গাবাং প্রভৃতি। ভোগা শ্রেণির গোয়ালাদের দুই থাক—সাদা গোয়ালা ও লাল গোয়ালা। লাল ও সাদা গোয়ালাদের বাস মূলত ঢাকায়। বঙ্গদেশের পাশাপাশি উড়িষ্যাতেও গোপ জাতির দেখা পাওয়া যাবে। দুমালা, যদুপুরিয়া, মথুরা বা মথুরাবংশী, মগধা ইত্যাদি উড়িষ্যার গোপজাতির উপবিভাগ। ছোটনাগপুরেও কিষনৌৎ, গোরো, চৌয়ানিয়া ইত্যাদি থাক লক্ষ করা যায়।[৭৩]

বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানরত গোপদের সামাজিক মর্যাদা ও ধর্মবিশ্বাসে পার্থক্য আছে। বঙ্গদেশের গোয়ালারা ধর্মে মূলত বৈষ্ণব। কৃষ্ণের স্বজাতীয় বলে মনে করার দরুণই সম্ভবত কৃষ্ণের জন্মতিথি বা জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালন করে থাকে। গোয়ালাদের ধর্মানুষ্ঠানে যেসমস্ত ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করে থাকেন, তাঁরা বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণসমাজে নিম্নশ্রেণির হিসাবেই পরিচিত। বিহারে অবশ্য গোয়ালাদের মধ্যে বৈষ্ণবের তুলনায় শৈব-শাক্তের সংখ্যা বেশি। যেসমস্ত ব্রাহ্মণরা বিহারে গোয়ালাদের পৌরোহিত্য করেন, তাঁদের সামাজিক মর্যাদাও বঙ্গদেশের গোয়ালা বংশের পৌরোহিত্যকারী ব্রাহ্মণদের তুলনায় বেশি। অন্য গোষ্ঠীর

---

[৭২] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Bengal (Vol.1)*, pp.282-284

[৭৩] নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ(পঞ্চম খণ্ড)*, কলকাতা: নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম প্রকাশ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, পৃ.৫২০

পৌরোহিত্য করার সুযোগও তাঁরা পেয়ে থাকেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে উড়িষ্যার গোয়ালাদের মর্যাদা সর্বাধিক। উড়িষ্যার গোয়ালারা বঙ্গদেশ ও বিহারের গোয়ালাদের কিছুটা নিচু চোখে দেখেন।[৭৪] বঙ্গদেশের গোয়ালারা অন্যান্য অনেক অঞ্চলের গোয়ালার মতোই দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ের পেশায় নিযুক্ত। বংশপরম্পরায় এই পেশা সযত্নে ধরে রাখার তাগিদও লক্ষ করা যাচ্ছিল গোয়ালাদের মধ্যে। মোটের উপর প্রাক-চৈতন্যযুগের রচনা হিসাবে স্বীকৃত[৭৫] *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়াখ্যানে গোপ জাতির কথা বারেবারে এসেছে। এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, পথে কৃষ্ণের অত্যাচারে রাধা দুধ-দই বিক্রি করতে যেতে না চাওয়ায় অন্যান্য গোপবধূরা কুলগত বৃত্তি অনুসরণের জন্য রাধাকে চাপ দিচ্ছে।[৭৬] প্রাক্-চৈতন্যযুগের আরেক রচনা বিজয় গুপ্তের *মনসামঙ্গল*-এও ধন্বন্তরী বধ পালায় দেখছি গোয়ালিনীর পেশা দুধ-দই বিক্রি।[৭৭] প্রাক্-চৈতন্যযুগের রচনায় এসব উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীকালে গোয়ালা বা গোপদের মধ্যে কুলগত বৃত্তি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা লক্ষ করা যাচ্ছিল কি? সেই প্রসঙ্গে নজর দিলে আমাদের গোপ থেকে সদ্গোপ হওয়ার ইতিহাসটি বুঝতে সুবিধা হবে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকের রচনা কবিকঙ্কণ মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল* দেখলে অবশ্য দেখা যাবে— গোপদের মধ্যে দুটি আলাদা পেশা তৈরি হচ্ছিল। *চণ্ডীমঙ্গল*-এর গুজরাট নগরপত্তন অংশে গোপবসতি প্রসঙ্গে আহীরি গোপ বা হালিক অথবা হলিক গোপ এবং পল্লগোপ বা পেল্যগোপের উল্লেখ আছে। দেখা যাচ্ছে, আহীরি গোপ বা হালিক গোপরা মূলত কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। খেতে চাষ করে গুড়, তিল, মুগ, গম, সরষে, কার্পাসে তাঁদের ঘর ভরে উঠেছে। অন্যদিকে,

---

[৭৪] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Bengal (Vol.1)*, pp.289-290

[৭৫] বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ(সম্পা.), *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.(৯)

[৭৬] তদেব, পৃ.৬৭

[৭৭] অচিন্ত্য বিশ্বাস(সম্পা.), *বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল*, কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, পৃ.১৫৯

পল্লগোপরা গোচারণের সঙ্গেই যুক্ত। বন পরিষ্কার করে তাঁরা গোচারণভূমি তৈরি করেন।[৭৮] আভীরদের প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, মূলত গোচারণের সঙ্গে যুক্ত হলেও আভীরদের বিভিন্ন পেশার প্রতি ঝোঁক ছিল। তৃতীয় রুদ্রসেনের গোন্দাল পুরালেখে দেখেছি, আভীরদের একটি অংশ কৃষিকার্যেও যুক্ত হচ্ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-এও আহীরি গোপদের মধ্যে চাষবাসের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। খেয়াল করা দরকার, *কৃষিপরাশর* বইতে বলা হয়েছে যাবতীয় জীবিকার মধ্যে কৃষিকাজই শ্রেষ্ঠ। সোনা-রূপো, হীরে, জহরত অভাব ঘোচাতে পারে না। প্রাণধারণের জন্য অন্ন প্রয়োজন। *কৃষিপরাশর* বইতে চাষবাসে সুফল লাভের জন্য 'বাহন পালন' এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৃষককে ভালো গোপালক বা গোহিতকারী হতে হবে; খেয়াল রাখতে হবে গবাদি পশুর।[৭৯] লক্ষণীয়, গোপরা বৃত্তিগতভাবে গোপালক; 'বাহন পালন' সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। এখন তাঁরা যদি জমিজমা লাভ করে চাষবাস শুরু করেন—তাহলে কৃষিকর্মের মতো সম্মানজনক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামাজিক মর্যাদালাভের সুযোগ তৈরি হয়। কারণ, কৃষিকর্মের অন্যতম প্রধান উপকরণ গোসম্পদ এবং গোসম্পদের প্রতিপালন বিষয়ক জ্ঞান—দুইই তাঁদের আছে। ফলত, গোসম্পদের অধিকারী গোপরা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে যেমন গোচারণভূমি তৈরি করেছেন, তেমনই আবাদি জমি তৈরি করে ফসলও ফলিয়েছেন। কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত গোপরা রাঢ়ের রুক্ষ জমি স্থানীয় আদিবাসীদের সাহায্যে পরিষ্কার করে কৃষির বিস্তার ঘটিয়েছেন। শুধু কৃষি নয়, বাণিজ্যের সঙ্গেও গোপদের এই অংশটি যুক্ত হয়ে সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছিল। আমাদের মনে পড়ে যাবে, মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-এ 'হালিক গোপ' এর পাঠান্তর হিসাবে 'বণিক গোপ' পাঠটিও পাওয়া যাচ্ছে।[৮০] বৃত্তিবদলের কারণে

---

[৭৮] পঞ্চানন মণ্ডল(সম্পা.), *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, কলকাতা: ভারবি, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.১৫৮

[৭৯] অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.), *কপিলামঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র*, পৃ.২৫

[৮০] দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়(সম্পা.), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল* , কলকাতা: প্রকাশন বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০, পৃ.২০২

সাধারণ গোপের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া কৃষি-বাণিজ্যজীবী গোপদের ‘সৎশূদ্র’ এবং নবশাখ পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে চূড়ামণিদাসের *গৌরাঙ্গবিজয়*-এও। ‘রাজসেবা’য় যুক্ত, ‘বাণিজ্য সদা তৎপর’, ‘দেব-বিপ্র-সেবাপর’ গোপদের প্রশংসা করেছেন গ্রন্থকার।[৮১] সাধারণভাবে গোপালক গোপরা যেখানে সৎ ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য পান না; সেখানে কৃষি-বাণিজ্যজীবী গোপরা সৎশূদ্র ও নবশাখ মর্যাদাপ্রাপ্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরামের *ধর্মমঙ্গল*-এও ‘গণ্য গোপ’ আর ‘পল্লব গোপ’ কে আলাদা করে দেখা হয়েছে। কৃষি-বাণিজ্যজীবী গোপরাই ‘গণ্য গোপ’ হিসাবে স্বীকৃত। পল্লব গোপদের বর্ণনা এসেছে ধর্মকর্মরহিত জাতিগুলির প্রসঙ্গে। সুবর্ণবণিক, স্বর্ণকার, ছুতোর, জালু, কলু ইত্যাদির সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে গোপালক পল্লব গোপদের নাম।[৮২] ফলত, প্রাক্-চৈতন্যযুগের রচনা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ গোপদের মধ্যে গোপালন ও দধি-দুগ্ধ বিক্রির পেশার উল্লেখ পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে গোপ জাতির মধ্যে স্পষ্টতই পেশাবৈচিত্র দেখা যাচ্ছে এবং পেশাবদলের সূত্রে সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নও ঘটছে। সদ্গোপ শব্দটি যদিও আমাদের আলোচ্য রচনাগুলিতে প্রাথমিকভাবে দেখা যায়নি। ‘হালিক গোপ’, ‘বণিক গোপ’, ‘গণ্য গোপ’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে গোপদের এক নতুন শাখাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সদ্গোপ শব্দটির প্রথম উল্লেখ দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত নরহরি চক্রবর্তীর *ভক্তিরত্নাকর*-এ।[৮৩]

রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সদ্গোপদের জমিদারি তৈরি হয়। গোপালনের বদলে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ভূমির সঙ্গে সদ্গোপদের যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তাঁর সূত্র ধরেই

[৮১] Sukumar Sen(ed.), *Gauranga Vijaya*, Kolkata: The Asiatic Society, Reprint, 2002, p.31

[৮২] পীযূষকান্তি মহাপাত্র, *ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল*, কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ৫৮

[৮৩] Hitesranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal*, p.85, এবিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন অতুল সুর। তাঁর মতে সদ্গোপ শব্দটির প্রথম উল্লেখ আছে খ্রি. পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত ময়ূরভট্টের *শ্রীধর্মপুরাণ*-এ। দ্রষ্টব্য- অতুল সুর, *সদ্গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, কলকাতা: সাহিত্যলোক, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃ.১

সদ্‌গোপদের একটা অংশ ভূম্যধিকারী হয়ে ওঠেন। গোপভূম অঞ্চলে প্রথম সদ্‌গোপ জমিদারি তৈরি হয়েছিল। সদ্‌গোপদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় অমরাগড় রাজবংশের প্রাথমিকভাবে বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অমরাগড়ের রাজারা প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালিয়েছেন। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে অমরাগড়ের শেষ রাজা বর্ধমান রাজবংশের চিত্রসেন রায়ের কাছে যুদ্ধে হেরে জমিদারি খুইয়ে বসেন। মেদিনীপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চলের সদ্‌গোপ জমিদার বংশগুলি গোপভূমের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের কথা বলে।[৮৪] মেদিনীপুরে নাড়াজোল, কর্ণগড়, নারায়ণগড়ে একাধিক সদ্‌গোপ জমিদারি মধ্যযুগে তৈরি হয়েছিল। নারায়ণগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্ব পাল উৎকলরাজের অধীনে ১২৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই রাজবংশের পত্তন করেন। বংশবিবরণ পাঠ করে এই বংশের ২৬ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। উড়িষ্যা লাগোয়া নারায়ণগড়ের উপর দিয়েই তখন পুরী যেতে হত। চৈতন্যদেব এই অঞ্চলের উপর দিয়েই পুরী গিয়েছিলেন এবং রাজবাড়ির মন্দির প্রাঙ্গণে নামসংকীর্তন করেছিলেন। এই ঘটনা বংশের মানমর্যাদা নিশ্চিতভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল। আরেকটি রাজনৈতিক ঘটনার কথাও এই সূত্রে বলা যেতে পারে। শাহজাহান তাঁর পিতা জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় জাহাঙ্গিরের সেনাদল তাঁকে খুঁজতে থাকে। শাহজাহান তখন মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নারায়ণগড় অঞ্চল দিয়ে উড়িষ্যা যাবার পথটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেই জঙ্গল একরাতের মধ্যে পরিষ্কার করে শাহজাহানের জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন নারায়ণগড়ের তৎকালীন রাজা শ্যামবল্লভ। সম্রাট হবার পরে একথা খেয়াল রেখে শাহজাহান নারায়ণগড়ের রাজাকে মাড়-ঈ-সুলতান বা পথের রাজা উপাধি দেন।[৮৫] সামাজিক সচলতার ইতিহাসে ঘটনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। নারায়ণগড় রাজবাড়িতেও ধীরে ধীরে বৈষ্ণব উপাসনার ঝোঁক দেখা যায়।

[৮৪] তদেব, পৃ.৯০

[৮৫] তরুণদেব ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ দর্শন মেদিনীপুর*, কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯, পৃ.১৮৭-১৮৮

পরবর্তী বংশধররা শ্রী শ্রী ব্রজনাগর জীউ ঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এইসমস্ত দেবতার সেবার জন্য নারায়ণগড়ের রাজারা উৎকল থেকে ব্রাহ্মণদের এনে প্রচুর ভূমিদান করে এখানে বসতি তৈরি করিয়েছেন।[৮৬] সামাজিক সচলতার ইতিহাসে এই পৃষ্ঠপোষকতাগুলি খেয়াল রাখা জরুরি। নাড়াজোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা উদয়নারায়ণ ঘোষ আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। নবাবের কাছ থেকে উদয়নারায়ণের উত্তরপুরুষ কার্তিকরাম 'রায়' উপাধি ও আরেক উত্তরপুরুষ বলবন্ত 'খাঁন' উপাধি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নাড়াজোল রাজপরিবার এই 'খাঁ' উপাধি নামের শেষে ব্যবহার করে থাকেন।[৮৭] নাড়াজোল রাজপরিবারও ধর্মকর্মে অনেক অর্থব্যয় করেছিলেন। ১২৫৫ বঙ্গাব্দে নাড়াজোল রাজপরিবারের প্রতিনিধি মোহনলাল খাঁ রাম-সীতার একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন। রাম-সীতার বিবাহ উপলক্ষে বারাণসী ও দক্ষিণভারত থেকে প্রচুর পণ্ডিত এসেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে খরচ হয়েছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ইতিপূর্বে ১২৩৫ বঙ্গাব্দে তিনি একটি মঠ তৈরি করে গঙ্গারাম দাসকে তাঁর মহান্ত হিসাবে নিযুক্ত করেন। সেসময়েও বারাণসী ইত্যাদি অঞ্চল থেকে বহু মহান্তের আগমন হয়। এই কাজেও রাজার প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। দান ও ধর্মকর্মের জন্য নাড়াজোল রাজপরিবারের প্রসিদ্ধি ছিল। নাড়াজোলে মহেন্দ্রলাল খাঁর অন্নসত্রে বহু লোক নিয়মিত অন্নগ্রহণ করতেন।[৮৮] রাজবংশের শেষকালে রাজা অযোধ্যারাম অত্যন্ত সঙ্গীন দশাতেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অর্থপ্রদানে কার্পণ্য করেননি।[৮৯] ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি এই বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা সদ্গোপদের সামাজিক সচলতার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

---

[৮৬] জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, 'নারায়ণগড় রাজবংশ', প্রজাপতি পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ.১০২

[৮৭] তরুণদেব ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ দর্শন মেদিনীপুর*, পৃ.১৯৮

[৮৮] জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, *বংশপরিচয়(১ম খণ্ড)*, কলিকাতা: জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, প্রথম প্রকাশ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩৪৩

[৮৯] তদেব, পৃ.৩৫৪

সদ্‌গোপদের সামাজিক প্রতিপত্তি আরও বেড়েছিল মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মধ্যযুগের বঙ্গদেশে মন্দির নির্মাণের একটি সামাজিক তাৎপর্য ছিল। মন্দির নির্মাণ প্রতিষ্ঠাতার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চিহ্ন তো বটেই; একইসঙ্গে সামাজিক প্রভাববিস্তারের মাধ্যম। এইকারণে নবশাখ, অজলচল ও অন্ত্যজ জাতিগুলির মধ্যে মন্দির নির্মাণের তাগিদ দেখা যায়। বর্ণজাতিকাঠামোয় ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের থেকে পিছিয়ে থাকা জাতিগুলি মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে তাদের সামাজিক প্রাধান্যের পরিচয় দিতে চাইতেন। বণিক, ভূম্যধিকারী হয়ে বিপুল অর্থের অধিকারী হলে এই গোষ্ঠীগুলি মন্দির নির্মাণে উদ্যোগী হত।[৯০] স্বাভাবিকভাবে বণিক ও ভূম্যধিকারী সদ্‌গোপরাও বঙ্গদেশের এই প্রবণতা মেনে মন্দির তৈরিতে সচেষ্ট ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নবশাখ পর্যায়ভুক্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মন্দির নির্মাণের হার পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলির থেকে অনেকখানি বেড়ে যায়। নবশাখভুক্ত জাতিগুলি সাধারণত ব্যবসা, কারিগরিবৃত্তি ও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়পর্বে মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে তাঁরা সামজিক সম্মান অনেকখানি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেন।[৯১] সদ্‌গোপদের মন্দির নির্মাণকে এই প্রবণতার নিরিখেই দেখতে হবে। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সদ্‌গোপরা ৭৯টি মন্দির তৈরি করেন। একই সময়পর্বে গোপদের তৈরি করা মন্দিরের সংখ্যা মাত্র ১৫।[৯২] এই পরিসংখ্যান দুই গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদার পার্থক্যকে নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে দেয়। সদ্‌গোপদের মধ্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণবতার প্রাবল্যকে মাথায় রাখলে অনুমান করা যেতে পারে, এই মন্দিরগুলির অধিকাংশই বৈষ্ণব মন্দির।

---

[৯০] Hitesranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal*, pp.67-68

[৯১] Hitesranjan Sanyal, 'Temple Building Activities in Bengal : A Social Study (From C.1450 to C.1900 A.D.), unpublished Ph.D. thesis sub,itted at the University of Calcutta, [], p.400

[৯২] তদেব, পৃ.৪৮১

এখানে একটি প্রশ্ন তৈরি উঠতে পারে—গোপদের একটি অংশ যখন ভূম্যধিকারী এবং ব্যবসায়ী হিসাবে আর্থিক প্রতিপত্তি লাভ করেন, তখন সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির টানে ইসলাম ধর্মগ্রহণের পথটি ছেড়ে কেন তাঁরা বঙ্গদেশের জাতিকাঠামোয় উচ্চমর্যাদা লাভে তৎপর হন এবং ধর্মান্তরণের বদলে সদ্‌গোপ হিসাবে পরিচিত হতে আগ্রহী হয়ে উঠেন? মেদিনীপুরের সদ্‌গোপদের প্রসঙ্গে এই প্রশ্নের দুটি উত্তর ভাবা যেতে পারে। এক, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের মাধ্যমে মেদিনীপুরের বৈষ্ণবধর্ম তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায়। এই প্রতিষ্ঠার একটি অংশ স্থানীয় মুসলমান প্রশাসকদের স্বীকৃতি। প্রথম উপ-অধ্যায়ে বিষয়টি আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি। বৈষ্ণব চরিতগ্রন্থগুলির সাহায্যে বোঝা যাচ্ছে একাধিক মুসলমান প্রশাসক প্রাথমিকভাবে শ্যামানন্দকে ধর্মপ্রচারে বাধা দিলেও পরে শ্যামানন্দের ‘সাধনমাহাত্ম্য’-এ নতিস্বীকার করেন। *রসিকমঙ্গল*-এ দেখা গেছে, দলে দলে যবনরা শ্যামানন্দ-রসিকানন্দের শিষ্য হয়েছেন। বিভিন্ন বৈষ্ণব উৎসবে মুসলমান রাজশক্তির তরফে বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা এসেছিল। গোপীবল্লভপুরের মহান্তদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য মুঘল দরবারের ফরমানের উল্লেখও আমরা প্রথম উপ-অধ্যায়ে করেছি। ফলত দেখা যাচ্ছে, মেদিনীপুরের প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্মও শ্যামানন্দের কাছে কিছুটা নতিস্বীকার করেছে। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবই সেখানে সর্বাধিক। মেদিনীপুরের সদ্‌গোপরাও সেকারণে বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে সামাজিক সচলতার পথ খুঁজেছে, সরাসরি ধর্মান্তরণের রাস্তায় হাঁটেনি। উপযুক্ত কারণ না থাকলে ধর্ম মানুষ সহজে ছাড়তে চায় না, বিশেষ করে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে তো বটেই। এক্ষেত্রে বৈষ্ণবধর্মের সদর্প উপস্থিতির কারণে সদ্‌গোপরাও ধর্মান্তরণকে পথ হিসাবে বেছে নেয়নি। দুই, সদ্‌গোপদের ইসলামে আশ্রয় না নেওয়ার একটি পেশাগত কারণও আছে। খেয়াল রাখতে হবে, মেদিনীপুরের সদ্‌গোপদের একটা বড়ো অংশ ভূম্যধিকারী। মেদিনীপুরের একাধিক সদ্‌গোপ জমিদার

বংশের কথা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। মুঘল আমলের জমিদারি প্রথার একটি বৈশিষ্ট্য খেয়াল করলে সদ্‌গোপদের ধর্মান্তরণের পথ বেছে না নেবার আরেকটি কারণ পাওয়া যেতে পারে। জমিদারি বা পরগণার ক্ষেত্রে জাতভিত্তিক বিন্যাস বা সংগঠনের একটি গুরুত্ব ছিল। অনেকক্ষেত্রেই জমিদার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজার জাত একই হত। এরকম অজস্র উদাহরণ বঙ্গদেশে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের রাজশাহীতে জমিদাররা মূলত ব্রাহ্মণ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাও ব্রাহ্মণ। বাকরগঞ্জে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাই কায়স্থ; জমিদাররাও কায়স্থ সম্প্রদায়ের। কায়স্থদের পরে সেখানে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে এখানেও জমিদারির সমানুপাতিক সম্পর্ক। আসলে পরগণা বা জমিদারি যেহেতু অনেকগুলি গ্রামের সমষ্টি, তাই মোটামুটিভাবে একটি জমিদারিতে জনবিন্যাস মোটের উপর একই প্রকৃতির হয়ে থাকে। আদতে একই জাতের লোকজন হয়তো প্রাথমিকভাবে একটি অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিল, তারপর সেইসব অঞ্চল নিয়েই পরবর্তীকালে জমিদারি পত্তন হয়েছে। সেকারণে, প্রজার ও জমিদারের জাতিগত পরিচয় মূলত এক। এই জনবিন্যাসগত সূত্রটি মেদিনীপুরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জনসংখ্যার নিরিখে মেদিনীপুরে সদ্‌গোপরা (সাঁওতাল ও বাগদিদের বাদ দিলে) দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী। জমিদারির দিক থেকেও মেদিনীপুরে সদ্‌গোপরা দ্বিতীয় স্থানে।[৯৩] জমিদারির সঙ্গে জাতিগত বিন্যাসের এই সম্পর্কও সদ্‌গোপদের ধর্মান্তরিত না হওয়ার একটা বড়ো কারণ। বরং, সদ্‌গোপ জমিদার-বংশগুলির সূত্রে মেদিনীপুরের এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সদ্‌গোপ সম্প্রদায় যথেষ্ট জাতিগত মর্যাদা দাবি করেছে। জাতের একটি অংশের আধিপত্য বাকি অংশের মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠেছে।

[৯৩] Shirin Akhtar, 'The Role of Zamindars in Bengal(1707-1772)', Unpublished Ph.D. Thesis submitted at the University of London, 1973, pp.44-47

প্রশ্ন হচ্ছে, এই সামাজিক সচলতার ইতিহাসকে সদ্‌গোপরা পরবর্তীকালে কীভাবে দেখেছে? সদ্‌গোপ সমাজের প্রতিনিধিদের লেখালেখি দেখলে বোঝা যায়, সদ্‌গোপরা গোপদের সঙ্গে পূর্বতন সম্বন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গটি আমাদের পরবর্তী উপ-অধ্যায়ের আলোচনাতেও আসবে। আপাতত সংক্ষেপে বিষয়টির আলোচনা করা যেতে পারে। সদ্‌গোপ সমাজের প্রতিনিধি শরৎচন্দ্র ঘোষ একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—সদ্‌গোপদের সঙ্গে গোপদের কোন সম্পর্ক নেই। দধি-দুগ্ধ বিক্রয় কোনকালে সদ্‌গোপদের পেশা ছিল না। দুধে জল মিশিয়ে ব্যবসা শঠতাপূর্ণ—সদ্‌গোপরা তা করতেই পারে না। গো-চিকিৎসা, গোপালন ইত্যাদিও কস্মিনকালে সদ্‌গোপের বৃত্তি নয়। তবে, সদ্‌গোপ শব্দের মধ্যে 'গোপ' শব্দ থাকায়, বঙ্গদেশের পতিত গোয়ালারা মনে করছেন গোপ থেকেই সদ্‌গোপদের উৎপত্তি।[৯৪] তবে, গোপের সঙ্গে সদ্‌গোপদের সম্পর্কের প্রশ্নটি নিয়ে এতখানি বিচলিত হওয়ায় সদ্‌গোপদের আশঙ্কা কিছুটা টের পাওয়া যাচ্ছে। সদ্‌গোপ সমাজের আরেক প্রতিনিধি অতুল সুর লিখেছেন—গোয়ালাদের সঙ্গে সদ্‌গোপদের অবয়বগত ও বৃত্তিগত পার্থক্য আছে। সদ্‌গোপদের অবয়ব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের সঙ্গে অনেকবেশি পরিমাণে মেলে; গোয়ালাদের সঙ্গে নয়। দ্বিতীয়ত, সদ্‌গোপরা মূলত কৃষিজীবী আর গোয়ালারা দুগ্ধবিক্রেতা। আরও বলছেন, সদ্‌গোপ জাতি আগে গোপ নামে পরিচিত ছিল। 'গোপ' শব্দের আভিধানিক অর্থ ভূম্যধিকারী, ভূপ বা রাজা। অনুমান করা যেতে পারে, মধ্যযুগের কোন সময়ে আভীর জাতির কিছু লোক নিজেদের 'গোপ' বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। সদ্‌গোপরাও তখন গোপ হিসাবেই পরিচিত ছিল। আভীরদের এহেন আচরণে সদ্‌গোপরা বিচলিত হয়ে পড়ে গোয়ালাদের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য স্পষ্ট করে বোঝানোর

[৯৪] শরৎচন্দ্র ঘোষ, 'সদ্গোপ-শব্দের উৎপত্তি', সদ্গোপ পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ,১৩৩৬, পৃ.২১৩

জন্য ‘সদ্‌গোপ’ বলে পরিচয় দিতে শুরু করে।[৯৫] অতুল সুরের এই বয়ান লক্ষ করলে স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। এক, গোপ বা সদ্‌গোপরা যদি বিপুল রাজনৈতিক প্রভাবসম্পন্নই হয়ে থাকে, তাহলে গোয়ালাদের ‘গোপ’ নামধারণের মাধ্যমে জাতিমর্যাদায় উত্তরণের প্রক্রিয়াকে প্রতিহত না করে খামোখা নিজেদের গোষ্ঠীনাম বদলাতে যাবে কেন? ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন সময়ে রাজন্য বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চাপে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিপত্তিশালী জাতির সামাজিক সচলতার চেষ্টা বিঘ্নিত হয়েছে। সদ্‌গোপরা সেই পথে না চলে গোপদের বিনা বাধায় নিজেদের পূর্বতন গোষ্ঠীনাম ব্যবহার করতে দিল এবং নিজেরা গোষ্ঠীনাম বদলে নিল—এই বয়ান কতদূর বিশ্বাসযোগ্য? দুই, সামান্য গোয়ালারাই বা কোন স্পর্ধায় প্রতিপত্তিশালী রাজার সমান জাতিমর্যাদা দাবি করে? রাজার তরফে শাস্তি নেমে আসার ভয়ও কি তাঁদের নেই? অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর অতুল সুরের লেখায় নেই। আসলে, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক বিবরণ* বইতে অতুল সুর সামাজিক সচলতার অস্তিত্ব ও ইতিহাস স্বীকার করলেও নিজ গোষ্ঠীর সচলতার ইতিহাস স্বীকার করছেন না। কারণ, সচলতার ইতিহাস আদতে অতীত অগৌরবেরও ইতিহাস। কে হায়, অতীত খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!

বরং, উনিশ-বিশ শতকে সদ্‌গোপরা জাতির গৌরবময় ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন বারেবারে। ‘পতিত’ গোপদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার না করে সেই ইতিহাস লেখা যায় না। গৌরবময় ইতিহাস রচনার এই প্রকল্প উনিশ-বিশ শতকের আদমসুমারির জন্যও প্রয়োজন ছিল। ঔপনিবেশিক পর্বে সদ্‌গোপ সমাজের সেই প্রচেষ্টার পর্যালোচনা আমরা পরবর্তী অংশে করব।

[৯৫] অতুল সুর, *সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ.৩-৫

৫.৪ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা ও সদ্‌গোপ সমাজ

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ, জলাচরণীয় গোষ্ঠীগুলি নিয়ে জাতিব্যবস্থার উপরিস্তর এবং অজলচল ও অন্ত্যজ গোষ্ঠীগুলি নিয়ে জাতিব্যবস্থার নিম্নস্তর—এই কাঠামো ঔপনিবেশিক শাসনপর্বেও মোটের উপর অক্ষুণ্ণ ছিল। জাতিব্যবস্থার উপরিস্তরভুক্ত গোষ্ঠীগুলিই ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বিদেশি বণিকশক্তির সূত্রে তৈরি হওয়া নতুন কাজ-কর্মের সম্ভাবনাগুলিই অনেকক্ষেত্রে এইসব গোষ্ঠীর হস্তগত হয়।[৯৬] *বিশ্বকোষ*-এ নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—সদ্‌গোপদের মূল জীবিকা চাষবাস; সদ্‌গোপদের অনেকে ভূম্যধিকারী। পাশ্চাত্য শিক্ষার দরুণ এই গোষ্ঠীর অনেকে রাজকার্যে যুক্ত হয়ে প্রচুর সম্মানলাভ করেছেন।[৯৭] সদ্‌গোপসহ জাতিব্যবস্থার উপরিস্তরভুক্ত গোষ্ঠীগুলি বুঝতে পারে, নতুন যুগে প্রভাব ধরে রাখতে গেলে নতুন আমলের মর্যাদার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই, আদমসুমারিতে গোষ্ঠীর জাতিগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার তাগিদ এঁদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে সদ্‌গোপদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এই উপ-অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশ্লেষণে আমরা দেখিয়েছি যে, সদ্‌গোপরা সম্মানজনক 'নবশাখ' পর্যায়ভুক্ত। চূড়ামণিদাসের *গৌরাঙ্গবিজয়*-এ কৃষি ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত গোপদের 'সৎশূদ্র' বলা হয়েছে। সৎশূদ্র তথা নবশাখ পর্যায়ভুক্ত সদ্‌গোপরা উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য পেয়ে থাকেন। তাঁদের হাতের জল-মিষ্টি গ্রহণ উচ্চবর্ণের পক্ষে দোষের নয়।

---

[৯৬] Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal*, New Delhi: Sage Publications, 1st Published, 2004, p.48

[৯৭] নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ(২১ খণ্ড)*, দিল্লী: বি.আর.পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮, পৃ.১২৬

এহেন সদ্‌গোপদেরও দেখছি, উনিশ-বিশ শতকে 'নবশাখ' মর্যাদায় সন্তুষ্ট না থাকতে। দ্বিজত্ব, বিশেষ করে বৈশ্যত্ব প্রতিষ্ঠাই ঔপনিবেশিক পর্বে তাঁদের মূল দাবি। **১৮৯২** খ্রিস্টাব্দে রিজলির *The Tribes and Castes of Bengal*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে সদ্‌গোপদের স্পষ্টতই নবশাখ বলা হয়েছিল।[৯৮] সদ্‌গোপ সমাজের প্রতিনিধিরা অবশ্য নবশাখ তকমায় খুশি হতে পারেননি। **১৯০৫** খ্রিস্টাব্দে শরচ্চন্দ্র ঘোষের *সদ্গোপ জাতি ও সমাজ-তত্ত্ব* বইতে সদ্‌গোপদের বৈশ্যত্ব খুব জোরের সঙ্গে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। শরচ্চন্দ্র ঘোষ বলেন—সৎ শব্দের পরে গোপ শব্দ আছে। এই গোপ শব্দ বৈশ্যত্বসূচক। অনেকে মূর্খতাদোষে সদ্‌গোপকে চাষা বলে থাকেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কৃষিকার্যও বৈশ্যের বৃত্তি।[৯৯] একই বইতে ছাপা হয় সদ্‌গোপদের বৈশ্যত্বের পক্ষে বঙ্গদেশ ও বারাণসীর পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র। সেখানে পণ্ডিতদের বয়ানে দেখা যাচ্ছে, গোপ শব্দ বৈশ্যবাচক। বৈশ্যদের মতোই সদ্‌গোপরাও কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষণে নিযুক্ত। এমনকি, *মহাভারত*-এর বিরাটপর্বের একটি শ্লোক তুলে এনে দেখানো হয়েছে যে, গোপবেশ ও গোপবৃত্তি অনুসরণকারী সহদেব নিজেকে বৈশ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ, বৈশ্য ও গোপ ভিন্ন নন।[১০০] সদ্‌গোপ সমাজ এইভাবে বৈশ্যত্বের পক্ষে সওয়াল চালিয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্রে অবশ্য একটু অসুবিধা তৈরি হয়। গোরক্ষণকারীরাও যদি বৈশ্য তকমা পায়, তাহলে বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে কার্যত গোপ ও সদ্‌গোপ একই মর্যাদা পাবে। একটু পরেই আমরা আলোচনা করব, ঠিক এই যুক্তিতেই গোপরা পরবর্তীকালে নিজেদের বৈশ্যত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছে।[১০১] অথচ, গোপদের থেকে নিজেদের পৃথক প্রমাণ করার তাগিদই সদ্‌গোপদের মধ্যে সর্বাধিক। **১৯১১** খ্রিস্টাব্দে ও'ম্যালির নেতৃত্বে আদমসুমারির আগে তাই সদ্‌গোপ সমাজের প্রতিনিধি

---

[৯৮] H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Benga(Vol2)*, p.213

[৯৯] শরচ্চন্দ্র ঘোষ, *সদ্গোপ জাতি ও সমাজ-তত্ত্ব*, কলিকাতা: ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রথম প্রকাশ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৬০

[১০০] তদেব, পৃ.৮২-৮৪

[১০১] পরবর্তীকালে সদ্‌গোপরা এপ্রসঙ্গে টিপ্পনী জুড়েছেন— গোপরা দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য 'গোপালন' করে আর সদ্‌গোপরা 'গোরক্ষণ' করে কৃষিকর্মের সহায়ক উপাদান হিসাবে। দ্র. অতুল সুর, *সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ.৩-৪

মোক্ষদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী চিঠি দিয়ে জানান—একটি জাতিকে চেনা যায় তার অনুসৃত ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে। শাস্ত্রে বৈশ্যের যে যে বৃত্তি উল্লিখিত, সদ্গোপদের মধ্যে তার প্রতিটিই লক্ষ করা যাবে। অনেক গোষ্ঠী বৈশ্যের এক-আধটি বৃত্তি অনুসরণ করে; কিন্তু সদ্গোপদের মধ্যে বৈশ্যোচিত গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে দেখা যায়। অত এব, সদ্গোপদের বৈশ্য হিসাবেই গণ্য করা উচিত। ও'ম্যালি প্রত্যুত্তরে জানান—আগামী আদমসুমারিতে ক্রমোচ্চ বিন্যাস অনুযায়ী জাতিগুলির বর্ণনা করা হবে না।[১০২] এই দাবিসম্বলিত চিঠি কেবল সদ্গোপদের বৈশ্যত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই নয়, ঠারেঠোরে অন্যদের বৈশ্যত্বের দাবির প্রতি কটাক্ষও বটে। এই ব্যাপারটি আরেকটু স্পষ্ট হবে ঈষৎ পরবর্তীকালে রচিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমারের *সদ্গোপজাতির ইতিহাস (১ম খণ্ড)* বলা হয়েছে—আধুনিক কালে বঙ্গদেশে যেসমস্ত গোষ্ঠী শূদ্র হিসাবে পরিচিত, তাদের মধ্যে একমাত্র সদ্গোপরাই বৈশ্যত্বের দাবি রাখেন। কিন্তু, ইদানীং সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, বারুইদেরও বৈশ্যত্বের দাবি করতে দেখা যাচ্ছে।[১০৩] সামাজিক সচলতা লাভে উদগ্রীব গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক প্রতিযোগিতাটিও খেয়াল করা মতো।

বিশ শতকের একটা দীর্ঘসময় জুড়ে সদ্গোপ পরিচালিত পত্রপত্রিকা ও সদ্গোপ সমাজের প্রতিনিধিদের লিখিত বইপত্রে বৈশ্যত্বের দাবির প্রবল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 'সদ্গোপ পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ, ৮ম সংখ্যায় রঙ্গলাল ঘোষ লিখেছিলেন—সদ্গোপরা এককালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেও এবং বৈশ্যবৃত্তি মেনে চললেও বল্লালী ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় 'বৈশ্য' বলে পরিচিতি পান নি।[১০৪] অথচ, এমন মতও আছে যে, সদগোপদের যে নবশাখ শ্রেণির মধ্যে গণ্য করা হচ্ছে, সেই নবশাখ শ্রেণিটিই আদতে বল্লাল সেনের আমলে

[১০২] মোক্ষদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী, *সদগোপ কুলীন সংহিতা,* কাশীধাম: গ্রন্থকার, প্রথম প্রকাশ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ.১২-১৪

[১০৩] জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার,*সদ্গোপজাতির ইতিহাস(১ম খণ্ড),* কলিকাতা: প্রজাপতি প্রেস, প্রথম প্রকাশ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩০

[১০৪] রঙ্গলাল ঘোষ, 'সদ্গোপ জাতির ইতিহাসের কিঞ্চিৎ', পৃ.২২৫

তৈরি।[১০৫] যদি তাই হয়, তাহলে যে বল্লাল সেনের তৈরি করা সম্মানজনক একটি শ্রেণিতে এককালে সদ্গোপরা উন্নীত হয়েছিলেন; নতুন কালের নিয়মে সেই বল্লাল সেন আর বল্লালী বামুনদেরই কটাক্ষ করছেন! পাশাপাশি এটাও খেয়াল করা উচিত, বল্লাল সেনের উপর সদগোপদের ক্ষোভ সুবর্ণবণিকদের তুলনায় অনেকটাই কম। ক্ষোভের এই তারতম্যের কারণ বঙ্গদেশের জাতিকাঠামোয় দুই জাতির অবস্থানগত পার্থক্যের মধ্যেই রয়েছে। আবার অন্যদিকে সদ্গোপরা যে গোপদের থেকে উন্নত শ্রেণিতে অবস্থান করছেন, তাও সদর্পে উচ্চারিত হয়েছে বারবার। গোপদের ব্রাহ্মণ অন্যান্য সৎ ব্রাহ্মণদের চোখে জাতিচ্যুত। সদ্গোপের ব্রাহ্মণ অবশ্য অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র। এই দিক থেকে, গোপ আর সদ্গোপের ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার পার্থক্য বারেবারে খেয়াল করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হল, গোপরা বঙ্গদেশে, দাক্ষিণাত্যে, উত্তর ভারতে পতিত।[১০৬] সদ্গোপদের এহেন পাতিত্যের অভিযোগ সহ্য করতে হয়নি! বরং, সদ্গোপরা যে উঁচু জাতের তা প্রমাণ করা জন্য সদ্গোপদের দীক্ষাগুরু ধর্মানন্দ মহাভারতীর একটি চিঠি প্রকাশ করা হয়। তাতে ধর্মানন্দ মহাভারতী বলেছেন—সদ্গোপরা বৈশ্য। শাস্ত্রও এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।[১০৭] সদ্গোপরা উনিশ-বিশ শতকে মূলত বৈশ্যত্বের দাবিই তুলেছিলেন। তবে, একটি গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার দাবি কি সবসময় একসুরে বাঁধা থাকে? গোষ্ঠীর মধ্যেও থাকে চাহিদার তারতম্য। সদ্গোপ সমাজের মধ্যেও তৈরি হচ্ছিল জাতিগত পরিচিতি নির্মাণ সম্পর্কে তর্ক। বৈশ্যত্ব নাকি ক্ষত্রিয়ত্ব-কোনটি সদ্গোপদের যথার্থ পরিচিতি, তা নিয়ে তর্ক হচ্ছিল 'সদ্গোপ পত্রিকা'য়। এক সদ্গোপ লেখক লিখেছেন—ভালকো, কাঁকসা ও শিউরের সদ্গোপ বংশীয় রাজকুমাররা রাজপুতের মতো আচরণ করেন

[১০৫] রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বল্লালসেন, সুবর্ণবণিক ও নবশাখ', কৌশিকী নবপর্যায়, ৩য় বর্ষ, ১২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৮৩

[১০৬] শরৎচন্দ্র ঘোষ, 'সদ্গোপ-শব্দের উৎপত্তি', পৃ.২১৩

[১০৭] শরচ্চন্দ্র ঘোষ, *সদ্গোপ জাতি ও সমাজ-তত্ত্ব*, পৃ.৮৫

এবং নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। যাঁরা, রাজপুত-ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত; তাঁদের কি আদৌ বৈশ্যত্বে সন্তুষ্ট থাকা উচিত?[১০৮] বোঝা যাচ্ছে, ভূম্যধিকারী এবং রাজ্যবিস্তারকারী সদগোপদের ঐতিহ্যের সূত্রেই এই দাবি উঠে এসেছিল। খেয়াল করলে দেখা যাবে, সদ্‌গোপদের সৃষ্টিকথায় ক্ষত্রিয়ত্বের অনুষঙ্গ প্রবলভাবেই আছে। স্বর্গের গাভী কামধেনু ছিলেন বশিষ্ঠের আশ্রয়ে। বিশ্বামিত্রের কামধেনুকে খুব পছন্দ হয় এবং এর অধিকার পেতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়েন। নারাজ বশিষ্ঠকে দেখে বিশ্বামিত্র যুদ্ধের হুঙ্কার দেন। সেসময়, কাতর বশিষ্ঠকে দেখে কামধেনু নিজেই নিজের রোম থেকে এক যোদ্ধৃবৃন্দ তৈরি করেন। কামধেনুর রোম থেকে নির্গত এই যোদ্ধৃবৃন্দই রাঢ়ীয় সদ্‌গোপদের আদিপুরুষ।[১০৯] তবে, ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি সদ্‌গোপ সমাজে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। বৈশ্যত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার পক্ষেই সদ্‌গোপ সমাজের মূল অংশ লড়ে গেছে। কারণ, সদ্‌গোপ সমাজের মূল অংশই কৃষি-বাণিজ্যজীবী, ভূম্যধিকারী। সদ্‌গোপ জমিদারবংশগুলির দাপট ধীরে ধীরে কমছে বিশ শতকে। সামরিক শক্তি প্রদর্শনের অতীত গৌরবের স্মৃতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। বৈশ্যত্বের দাবিটিই ঔপনিবেশিক পর্বে অনেকবেশি সমীচীন। অনেক পরবর্তীকালের সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাসলেখকও সদগোপদের বৈশ্যত্বের দাবির পক্ষে। প্রমাণস্বরূপ বলা হচ্ছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ করেছিলেন। এই ধরনের যজ্ঞে তিন দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি এই দুই যজ্ঞে ক্ষত্রিয় হিসাবে বরণ করা হয়েছিল বর্ধমানের রাজা ত্রিলোকচাঁদ বাহাদুরের জ্ঞাতিপুত্র বীরেন্দ্র সিংহ বর্মন বাহাদুরকে। বৈশ্য হিসাবে বরমাল্য পেয়েছিলেন সদ্‌গোপ সমাজের প্রতিনিধি নরোত্তম পাল। সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাসলেখক দাবি করছেন যে সেযুগের বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ

[১০৮] নবীনচন্দ্র ঘোষ, 'জাতিবিচারে সদ্গোপ বৈশ্য না ক্ষত্রিয়', সদ্গোপ পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৬, পৃ.৫৬-৫৭
[১০৯] মাণিকলাল সিংহ, *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি(২য় খণ্ড)*, পৃ.৩৪-৩৫

তর্কপঞ্চাননের উপস্থিতিতে যখন এই ঘটনা ঘটেছিল, তখন সদ্‌গোপদের বৈশ্যত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকার কথা নয়।[১১০]

এই বৈশ্যত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল উপনয়নের অধিকার। সদ্‌গোপ সমাজের লেখকরা বারংবার এই উপনয়নের অধিকারের সূত্রে বৈশ্যত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার লিখেছেন—নবশাখ জাতির উপনয়ন সংস্কার থাকে না। কিন্তু সদ্‌গোপদের মধ্যে বর্ধমান জেলায় রাজা গোপীনাথ নিয়োগীর পরিবারে, বীরভূমের শিউরের সদ্‌গোপ রাজবংশে, মেদিনীপুরের কর্ণগড় ও নারায়ণগড় রাজপরিবারে উপনয়ন প্রচলিত।[১১১] আরও বলেছেন, কর্ণগড় রাজপরিবারে দেবতাকে অন্নভোগ দেওয়া হয়। শূদ্রস্থাপিত দেবালয়ে দেবতার অন্নভোগ থাকার কথা না। অত এব, সদ্‌গোপরা দ্বিজ বা বৈশ্য বলেই ধরতে হবে।[১১২] আসলে, বৈশ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উপনয়নের অধিকার উনিশ-বিশ শতকের বাংলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সুবর্ণবণিক বা সদ্‌গোপদের মতো সামাজিক সচলতা লাভে উদগ্রীব গোষ্ঠীগুলির উপবীত ধারণের তৎপরতা লক্ষণীয়। জনমানসে এবং আদমসুমারিতে বৈশ্যত্বের দাবির প্রতিষ্ঠার জন্য উপনয়নের অধিকার যে গুরুত্বপূর্ণ—সেকথা খোলাখুলি স্বীকার করেছেন সুবর্ণবণিক সমাজের প্রতিনিধি শিবচন্দ্র শীল।[১১৩]

উপনয়নের অধিকার কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যাবে বিশ শতকে গোপদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলেও। বিশ শতকের শিক্ষিত গোপরাও আদমসুমারিতে বৈশ্য হিসাবে নাম লেখাতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। সদ্‌গোপদের থেকে তাঁরা এই লড়াইতে

[১১০] অতুল সুর, *সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ.৮

[১১১] জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার,*সদ্গোপজাতির ইতিহাস(১ম খণ্ড)*, পৃ.৩০

[১১২] তদেব, পৃ.৭৯

[১১৩] শিবচন্দ্র শীল, *সুবর্ণ বণিকের উপনয়নের প্রয়োজন ও অশৌচ সম্বন্ধে বিচার*, চুঁচুড়া: সানরাইজ প্রেস, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.৪

একেবারেই পিছিয়ে থাকতে চাননি। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়ে তাঁরা লিখিয়ে এনেছিলেন গোরক্ষণ বৈশ্যবৃত্তি এবং গোরক্ষণকারী গোপরাও বৈশ্যপর্যায়ভুক্ত।[১১৪] বঙ্গীয় গোপ সমাজও বৈশ্যত্বের অধিকার বুঝে নিতে সক্রিয় ছিল। অখিল ভারত যাদব মহাসভার একাধিক সম্মেলনে বঙ্গদেশের গোপদের যোগদানের খবর পাওয়া যায়। 'গোপমিত্র' পত্রিকার বিবরণে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে গোপ বা আহীররা যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে চাইলে ব্রাহ্মণ ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অত্যাচার নেমে আসছে। ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে মিথ্যা অভিযোগে। এইসব অত্যাচার সামলেও অখিল ভারত যাদব মহাসভার একটি বার্ষিক সম্মেলনে তিন দিনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোককে উপবীত ধারণ করতে দেখা গেছে।[১১৫] এই অংশটি মাথায় রাখলে, অতুল সুরের গোপ ও সদ্‌গোপ সংক্রান্ত বক্তব্যটি আবার প্রশ্নের মুখে পড়ে। অতুল সুর বলেছিলেন, গোয়ালাদের একটা অংশ গোপ নাম ধারণ করলে, প্রকৃত গোপরা 'সদ্‌গোপ' নাম নিয়ে পৃথক হবার চেষ্টা করেছিল। যেখানে, যজ্ঞোপবীত ধারণের 'অপরাধে' ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে গোয়ালাদের উপর প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আক্রমণ নেমে আসছিল, সেখানে বঙ্গদেশের প্রকৃত 'গোপ'রা গোয়ালাদের নাম বদলে জাতিগত মর্যাদা বাড়ানোর এহেন দুঃসাহস চুপ করে মেনে নিলেন—একথার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। গোপদের একটা অংশ আবার নিজেদের সদ্‌গোপ পরিচয় দিয়ে ঘুরপথে বৈশ্য হিসাবে স্বীকৃতি চাইছিল। বিশেষ করে যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায় একশ্রেণির গোপের এহেন চেষ্টা দেখে সদ্‌গোপরা যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন।[১১৬] 'পতিত' গোষ্ঠীগুলির কাছে আদমসুমারি নতুনভাবে মর্যাদা আদায়ের

---

[১১৪] বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা, *গোপতত্ত্বকৌমুদী*, নবদ্বীপ: নবদ্বীপ বল্লব সমিতি, প্রথম প্রকাশ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, পৃ.৮

[১১৫] [], 'অখিল ভারত যাদব মহাসভার বিবরণ', 'গোপমিত্র', ৩য় বর্ষ, ৭ম ভাগ, চৈত্র ১৩৩১, পৃ.১৫৭,১৬৩

[১১৬] জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার,*সদ্গোপজাতির ইতিহাস(১ম খণ্ড)*, পৃ.৬৫, শরৎচন্দ্র ঘোষ, 'সদ্গোপ-শব্দের উৎপত্তি', পৃ.২১৩

রাস্তা খুলে দিয়েছিল। বিভিন্ন জাতিই সেই রাস্তায় হেঁটে মর্যাদা আদায়ের প্রচেষ্টার শরিক ছিল। সেই চেষ্টা অবশ্য অনেকসময়ই খুব একটা সফল হত না।

সামাজিক সচলতা আদায়ের প্রক্রিয়ায় অবশ্য সদ্‌গোপ সমাজের অভ্যন্তরেই বেশ কিছু তর্ক, মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল। সেই দিকে নজর দিলে সামাজিক সচলতার চালচিত্র আরেকটু পরিষ্কার হবে। এপ্রসঙ্গে আমরা তিনটি তর্কের দিকে নজর দেব। এক, সদ্‌গোপ সমাজের মধ্যে কুলীন ও মৌলিক শ্রেণিবিভাগ ছিল। সদ্‌গোপরা যেমন নিজেদের বৈশ্য হিসাবে পরিচয় দিয়ে জাতের মর্যাদা সামগ্রিকভাবে বাড়াতে চাইছিলেন; তেমনই মৌলিক সদ্‌গোপরাও নিজেদের কুলীন পর্যায়ে উন্নীত করে সদ্‌গোপ সমাজের ভিতরে মর্যাদা বাড়ানোর প্রয়াসী ছিলেন। বিশ্বাস উপাধিধারী মৌলিক সদ্‌গোপরা কুলীন বিশ্বাসের গোত্র 'কাশ্যপ' গ্রহণ করছিলেন। এটাই ছিল নিজেদের কুলীন সদ্‌গোপ সমাজে মিশিয়ে দেওয়ার কৌশল; গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সামাজিক সচলতার প্রয়াস। কুলীন সদ্‌গোপ শরচ্চন্দ্র বিশ্বাসের কলমে এই প্রচেষ্টা ধিক্কৃত হয়েছে।[১১৭] সামাজিক সচলতার এই বহুস্তরিক অভিব্যক্তিটি আকর্ষণীয়। স্তর-উপস্তরে বিভক্ত ভারতীয় বর্ণজাতিকাঠামোর নিরিখে অভিব্যক্তিটি অনিবার্যও বটে।

আরেকটি তর্ক সদ্‌গোপ সমাজের ভিতরেই তৈরি হয় কুলীন সদ্‌গোপদের কৌলীন্যের ইতিহাস নিয়ে। আশুতোষ নিয়োগী নামে এক সদ্‌গোপ দাবি করেছিলেন বল্লাল সেনের থেকেই কুলীন সদ্‌গোপরা কৌলীন্য পেয়েছেন। সদ্‌গোপ সমাজের মৌলিক এবং কুলীনদের একটা বড়ো অংশ অবশ্য এই বক্তব্য মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা বলছিলেন, সদ্‌গোপদের কৌলীন্য দক্ষিণভারতের কর্ণাটকরাজ প্রদত্ত।[১১৮] আসলে বল্লালী কুল কন্যাগত হওয়ায় মেয়ের কুলে দোষ থাকলে কুলক্ষয় হবেই। এখন, কুলীন আর মৌলিকে বিয়ে যেহেতু আটকানো যাবে

---

[১১৭] শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস, *সদ্গোপ জাতি তৃতীয় ভাগ-সমাজসংস্কার*, চন্দননগর: গ্রন্থকার, প্রথম প্রকাশ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.৬-৭

[১১৮] শরচ্চন্দ্র ঘোষ, *সদ্গোপ জাতি ও সমাজ-তত্ত্ব*, পৃ.৫৭

না, তাই কুলীন সদ্‌গোপের সঙ্গে মৌলিক সদ্‌গোপের বিয়ে হলে কুলীনের কুলক্ষয় হবে। আবার, কোন কুলীন যদি মৌলিককে কন্যা না দিয়ে মৌলিকভাবাপন্নর (অর্থাৎ যেসমস্ত কুলীনের আগেই কুল গিয়েছিল মৌলিক পরিবারে কন্যা দিয়ে) সঙ্গে সম্বন্ধ করে, তাহলেও কুলীনের কুলক্ষয় হবে।[১১৯] ফলে, আশুতোষ নিয়োগীর বক্তব্য কৌলীন্য সম্পর্কে অতিশয় চিন্তিত সদ্‌গোপ সমাজ মেনে নিতে পারেনি। আরেকটা অনুমানও করা যেতে পারে। যেহেতু বঙ্গদেশে মোটের উপর ব্রাহ্মণ-শূদ্রে বিভাজিত দ্বিবর্ণ সমাজের ধারণা স্বীকৃত, তাই বঙ্গ-বহির্ভূত উৎসকে স্বীকার করলে বৈশ্যত্বের দাবিকে আরেকটু জোরালো করে তোলা যায় কি?

তৃতীয় আরেকটি তর্কের কথা বলে এই প্রসঙ্গটি শেষ করব। নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ-সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে পূর্ণচন্দ্র কুমার বলেছিলেন—হিন্দু ধর্মের প্রসারনীতির প্রভাবে নিম্নশ্রেণির জাতিগুলি চাষবাস করতে শুরু করে। কালক্রমে এই জাতিগুলিই দাস, রায়, গুপ্ত, শূর ইত্যাদি উপাধির জোরে বৈশ্য, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ হয়ে ওঠে।[১২০] এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়েছিল সম্মিলনীর তরফে। স্পষ্টত জানিয়ে দেওয়া হয়, সম্মিলনী পূর্ণচন্দ্র কুমারের বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েও এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারছে না।[১২১] আসলে, এই বক্তব্যকে মেনে নিলে সদ্‌গোপদের অতীত নিম্নশ্রেণিগত অবস্থানকে স্বীকার করা নেওয়া হয়। সামাজিক সচলতা লাভে উদগ্রীব একটি গোষ্ঠীর তরফে স্বাভাবিকভাবেই এই মন্তব্যের প্রতিবাদ এসেছে।

সদ্‌গোপদের সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া লক্ষ করলে কয়েকটি দিকে নজর পড়ে। সামাজিক সচলতাকে পরিবর্তনের কারণ, পরিবর্তনের অভিব্যক্তি ও পরিবর্তনের তীব্রতার

---

[১১৯] তদেব, পৃ.৫৫

[১২০] পূর্ণচন্দ্র কুমার, 'অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', সদ্গোপ পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪২, পৃ.১৫১

[১২১] [], 'আমাদের কথা', সদ্গোপ পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪২, পৃ.১৬৩

নিরিখে আমরা বুঝতে চেয়েছি। গোপালক গোপদের একটি অংশ মধ্যযুগের বঙ্গদেশে পেশা বদলে কৃষি-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ভূম্যধিকারী হিসাবে অধিকতর সামাজিক মর্যাদা দাবি করেছিল। সেই সামাজিক মর্যাদার দাবি মূলত ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা সংক্রান্ত। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের সূত্র ধরে সদ্‌গোপরা ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার স্বীকৃতি পায়। 'নবশাখ' হিসাবে স্বীকৃতি মেলে; গোপালক গোয়ালারা সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিরিখে 'পতিত'। নবার্জিত আর্থিক প্রতিপত্তি সদ্‌গোপদের ধর্মীয় স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক পর্বে 'নবশাখ' তকমায় সদ্‌গোপরা অবশ্য খুশি থাকতে পারেননি। বৈশ্যত্বের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। সামাজিক সচলতার অভিব্যক্তির এই পরিবর্তনটি চোখে পড়ার মতো। পাল্লা দিয়ে দাবি বাড়তে থাকে উপনয়নের অধিকারের। উপনয়ন এবং সেই সূত্রে দ্বিজত্ব বা বৈশ্যত্বের দাবিটি মূলত ঔপনিবেশিক পর্বের। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে যেখানে সদ্‌গোপরা যেখানে 'নবশাখ' হিসাবে বঙ্গদেশের অভ্যন্তরীণ বর্ণজাতিকাঠামোয় পরিচিত হতে চাইছিল, সেখানে ঔপনিবেশিক পর্বে সদ্‌গোপদের লক্ষ্য সর্বভারতীয় বর্ণকাঠামোর নিরিখে বৈশ্যত্ব প্রাপ্তি। সর্বভারতীয় বর্ণকাঠামোর মানদণ্ডে পরিচিত হবার তাগিদটি সদ্‌গোপদের ক্ষেত্রে প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে লক্ষ করা যায়নি। অবশ্য, বৈশ্য হিসাবে পরিচিত হবার এবং গোপ উৎসকে খারিজ করার যে চেষ্টা সদ্‌গোপদের মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছিল, তার সাফল্য নিয়ে সংশয় আছে। বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ও'ম্যালি সদ্‌গোপদের এই দাবিকে সমর্থন করেননি। ও'ম্যালি স্পষ্ট লিখেছেন সদ্‌গোপরা নবশাখ।[১২২] ফলে, নবশাখ হিসাবে স্বীকৃতিটুকু ঔপনিবেশিক পর্বে ধরে রাখতে পারলেও আদমসুমারির খাতায় বৈশ্য হিসাবে নিজেদের নথিভুক্ত করানো সম্ভব হয় না। ঔপনিবেশিক আদমসুমারির কাল শেষ হয়ে গেলেও নিজ সমাজের কাছে বৈশ্যত্বের দাবিটুকু ধরে রাখতেই হয়। সদ্‌গোপ সমাজের প্রতিনিধিরা স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে দাঁড়িয়েও তাই প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক

[১২২] মাণিকলাল সিংহ, *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি(২য় খণ্ড)*, পৃ.৩৫

অতুল সুরকে অনুরোধ করেছিলেন স্বজাতির ইতিহাস রচনার জন্য। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে রচিত *সদগোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য* নামের এই বইয়ের মুখ্য প্রতিপাদ্য সদ্‌গোপদের বৈশ্যত্ব। এই বই আসলে সদ্‌গোপ জাতির পরিচিতি নির্মাণের একটি জায়মান প্রবণতার নির্দেশক। কাঙ্ক্ষিত অবস্থানের স্বীকৃতিলাভের তাগিদ এভাবেই জায়মান থেকে সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ায় বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত:

ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন ‘প্রান্তিক’ জাতির সামাজিক সচলতা আমাদের আলোচ্য ছিল। মূলত সাহিত্যিক সূত্র, পুরালেখ, বিভিন্ন অনুশাসনাত্মক গ্রন্থ, ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ইতিবৃত্ত, প্রশাসনিক নথিপত্র, স্মার্ত পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে আমরা দেখলাম—

১। সামাজিক সচলতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রতিপত্তির সঙ্গে ধর্মকৃত্যগত বা সাধনাধিকারগত মর্যাদার সামঞ্জস্য তৈরি করার চেষ্টা হয়ে থাকে। বিশেষত, প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রতিপত্তিও ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার অভাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে জমি পায় না। সুবর্ণবণিক, বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশ বা সদ্‌গোপ ইত্যাদি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিষয়টি আমরা লক্ষ করেছি। ব্রাহ্মণ্য সমাজ বা বিশেষ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীর উচ্চতর ধর্মকৃত্যগত মর্যাদালাভ বা বর্ণজাতিকাঠামোয় উঁচু স্থানলাভ চিরকালই ‘স্থাণু’ ভারতবর্ষের কল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক সচলতার সঙ্গে একইভাবে ক্রিয়াশীল ছিল অধোমুখী সামাজিক সচলতাও।

২। সামাজিক সচলতার ঘটনাগুলি অনেকাংশেই অঞ্চলকেন্দ্রিক। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে, অঞ্চলের কোন একটি শক্তিশালী বা বিশিষ্ট ধর্মমতের অনুমোদন লাভের মাধ্যমে সামাজিক সচলতার দাবিগুলি প্রতিষ্ঠা পায়। প্রতিটি সামাজিক সচলতার ঘটনাই আলাদা আলাদা প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়াকে পড়তে ‘কেস স্টাডি’ এবং আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ জরুরি। বর্তমান গবেষণাতেও আমরা সেই কারণে সপ্তগ্রাম, মল্লভূম এবং অবিভক্ত মেদিনীপুরের ইতিহাসে বিশেষ জোর দিয়েছি।

৩। সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়াটি আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক হলেও সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতটিকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। সামাজিক সচলতা লাভে উদগ্রীব গোষ্ঠীগুলি সর্বভারতীয় বর্ণজাতিকাঠামো বা সর্বভারতীয় কাঠামোর ঈষৎ পরিবর্তিত আঞ্চলিক রূপে নিজেদের 'উন্নত' অবস্থান জাহির করতে চায়। যেধরনের ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা তাঁদের সামাজিক সচলতা লাভের স্মারক, সেগুলি অনেকসময়ই সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। বর্ণজাতিকাঠামোর ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে একারণেই আমরা বর্ণজাতিকাঠামোর সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক রূপের ফারাক, সামাজিক সচলতার পথ ও প্রবণতার হদিস পেতে চেয়েছি। অনেকসময়ই, বিভিন্ন প্রদেশের সমধর্মী গোষ্ঠীর অবস্থান ও আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করলে একটি প্রবণতা টের পাওয়া যায়। বর্তমান গবেষণায় আমরা সুবর্ণবণিক প্রসঙ্গে ভিন্ন প্রদেশের সুবর্ণবণিক, স্বর্ণকারদের অবস্থান, মল্ল রাজবংশ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠী-উদ্ভূত রাজবংশের আকাঙ্ক্ষা, সদ্‌গোপ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে গোপ বা গোয়ালাদের মর্যাদার তুলনামূলক আলোচনা করেছি। এই সূত্রে আঞ্চলিক (regional) আর সর্বভারতীয় (pan-indian) প্রেক্ষিতের নিয়মিত যোগাযোগ থেকেছে আমাদের গবেষণায়।

৪। সামাজিক সচলতাজাত পরিবর্তনকে বোঝার জন্য আমরা মূলত তিনটি অভিমুখ দেখতে চেয়েছি—পরিবর্তনের কারণ, পরিবর্তনের অভিব্যক্তি, পরিবর্তনের তীব্রতা। সুবর্ণবণিকরা বলে থাকেন বল্লাল সেনের চক্রান্তে তাঁদের বৈশ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁরা নিজেদের জল-অনাচরণীয় শূদ্র বলে মেনে নিতে নারাজ। নিত্যানন্দ পরম্পরায় তাঁরা জলাচরণীয় বলে স্বীকৃত হলেন। তবে, উনিশ শতকে তাঁদের দাবি বৈশ্যত্ব। সদ্‌গোপরা আবার জল-অনাচরণীয় গোপ বা গোয়ালাদের থেকে নিজেদের আলাদা করে নবশাখ মর্যাদা পেয়েছেন। উনিশ শতকে তাঁদেরও দাবি বৈশ্যত্ব। মল্লরাজবংশ আদতে বাগদি এবং ব্রাহ্মণ্য বর্ণজাতিকাঠামোর অন্তর্গত নয়। সেখান থেকে তাঁরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণজাতিকাঠামোয় ঢুকে প্রথম থেকেই সৎশূদ্র বা নবশাখ ইত্যাদি দাবির

বদলে সরাসরি বর্ণের নিরিখে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিকে তুলে আনলেন। প্রত্যেক গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান আর দাবি পৃথক। এই পার্থক্যকে নজরে রেখেই আমরা এই প্রক্রিয়াগুলিকে পড়তে চেয়েছি। পরিবর্তনের ত্রিবিধ অভিমুখের নিরিখে সুবর্ণবণিক, মল্ল রাজবংশ, সদ্‌গোপের সামাজিক সচলতাকে পড়তে চাওয়ায়, বিশেষত পরিবর্তনের অভিব্যক্তি ও তীব্রতা বুঝতে, উনিশ শতক আর বিশ শতকের গোড়ার দিকের কিছু প্রসঙ্গও আমাদের আলোচনায় এসেছে। বিশেষ করে সুবর্ণবণিক ও সদ্‌গোপ সমাজের প্রতিনিধিদের গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাভিত্তিক কর্মকাণ্ডে আমরা নজর দিয়েছি। সামাজিক সচলতা গোষ্ঠী পরিচিতি নির্মাণের অংশ আর গোষ্ঠী পরিচিতি নির্মাণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময়ের দেওয়াল তোলা ভাগের মাধ্যমে সেই চলমান প্রক্রিয়াকে পড়া যায় না।

৫। বঙ্গদেশে আমাদের আলোচ্য গোষ্ঠীগুলি খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামে ধর্মান্তরণের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির পথ খোঁজেনি। তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রাখার জন্যই ব্রাহ্মণ্য বর্ণজাতিকাঠামোর মধ্যে উচ্চ ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা প্রয়োজন ছিল। নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ-রসিকানন্দের শাখা সেই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাধনাধিকারগত মর্যাদার সংগতি তৈরি করতে পারে। স্মার্ত ধর্মের তুলনায় বৈষ্ণবধর্মের এই দর্শনগত নমনীয়তা সুবর্ণবণিক ও সদ্‌গোপদের দাবি মেটাতে পেরেছিল। মল্লরাজবংশের কাছে নমনীয়তার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে অভিজাত সংস্কৃতির যোগ। কৌম জনগোষ্ঠীর রাজারা অভিজাত ধর্মকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন অভিজাত বা দরবারি সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠা পেতে। একই ধর্মের গোষ্ঠীভিত্তিক আকর্ষণের ভিন্ন ভিন্ন কারণও লক্ষণীয়। এটি নিশ্চিতভাবেই একটি ধর্মের বহুমুখী অভিব্যক্তি।

আমাদের আলোচ্য জাতিগুলি ছাড়াও তিলি, মাহিষ্য ইত্যাদি অনেকগুলি জাতিই বৈষ্ণবধর্মের হাত ধরে আলোচ্য কালপর্বে সামাজিক সচলতা লাভ করে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার এবং সাংগঠনিক বিন্যাস ছাড়া এতগুলি জাতির সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারত না। লক্ষণীয়, আমাদের আলোচ্য কালপর্বে (অর্থাৎ খ্রি. ষোড়শ-খ্রি. অষ্টাদশ শতাব্দী) বঙ্গদেশ রাজনৈতিকভাবে মুসলমান শাসকদের অধীনে। এইসময়, বঙ্গদেশে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটে। ধর্মান্তরণ তার একটা বড়ো কারণ। ঐতিহাসিক রিচার্ড ইটন বঙ্গদেশে গণ ধর্মান্তরণের চারটি তত্ত্বের কথা বলেছিলেন—ক) তরবারি তত্ত্ব বা বলপূর্বক ধর্মান্তরণের তত্ত্ব, খ) পৃষ্ঠপোষকতার তত্ত্ব, গ) বহিরাগত ঐসলামিক অভিবাসন তত্ত্ব, ঘ) সামাজিক মুক্তির তত্ত্ব। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা প্রাথমিকভাবে ইসলামের বলপূর্বক ধর্মান্তরণ প্রায়াসের তত্ত্বে সায় দিলেও ইটন এটিকেই ইসলামের প্রসারের একমাত্র কারণ বলে মনে করেননি। ইটন বরং দেখিয়েছেন, হিন্দু রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত অভিজাত গোষ্ঠীগুলি স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরণের মাধ্যমে মুসলিম রাজদরবারে কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ খুঁজতে থাকে। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধালাভ স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মগ্রহণের একটা বড়ো কারণ। তৃতীয় আরেকটি কারণের কথাও ইটন জানিয়েছেন। সুফি সন্ত, পীর, ফকিরদের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যসমাজের নিম্নবর্গের একটা বড়ো অংশ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা বলবেন, বর্ণজাতিকাঠামোয় বিভক্ত ব্রাহ্মণ্যসমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের যে অসীম বৈষম্যের শিকার হতে হত; তার থেকে মুক্তির চেষ্টাতেই সামাজিক সাম্যের ধর্ম ইসলামে তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন। ইটনের বিচারে এই তত্ত্বগুলির প্রত্যেকটিই কিছুদূর পর্যন্ত সত্য; কিন্তু প্রত্যেকটি তত্ত্বেরই সীমাবদ্ধতা আছে এবং কোন একটি তত্ত্ব দিয়েই সামগ্রিকভাবে এই ধর্মান্তরণের ইতিহাসকে পড়া সম্ভব নয়।[১]

[১] Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760*, California: University of California Press, 1st Paperback Printing, 1996, pp.113-119

তত্ত্বগুলির আংশিক সীমাবদ্ধতা মেনে নিলেও বঙ্গদেশে ইসলামের দ্রুত বিস্তার নিয়ে ঐতিহাসিকভাবে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও বঙ্গদেশে ইসলামকে প্রতিহত করার মতো একটি শক্তি গড়ে ওঠে। জগদীশনারায়ণ সরকার মনে করেন—বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় এবং অসমে শংকরদেবের ধর্মপ্রচার ইসলামের দ্রুত বিস্তারকে কিছুটা হলেও প্রতিহত করতে পেরেছিল। তাতে এই গণ ধর্মান্তরণে কিছুটা ভাঁটা পড়ে।[২] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—বঙ্গদেশে অন্ত্যজ সম্প্রদায়, নাথধর্মাবলম্বী, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মসাধনার সঙ্গে যুক্ত মানুষরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের এই প্রবল আকর্ষণকে কিছুটা প্রতিহত করে বঙ্গদেশে আবির্ভূত একটি নতুন ধর্মান্দোলন—বৈষ্ণবধর্ম।[৩] ঠিক কীভাবে বৈষ্ণবধর্ম এই ধর্মান্তরণকে কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করতে পারছে এবং ‘নিচু’ জাতের কাছে একপ্রকার সামাজিক মুক্তির আশ্বাস দিতে পারছে? সেই দিকে এবার নজর দেওয়া যাক।

চৈতন্যদেবের সময়কালে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত বা নাথপন্থ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই গুহ্য সাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। সম্প্রদায়ভেদে বামাচারী তান্ত্রিক যৌন-যৌগিক প্রক্রিয়া বা শুদ্ধ যৌগিক প্রক্রিয়ায় এই ধর্মাচরণ চলত। তন্ত্র এই গুহ্য সম্প্রদায়গুলির দর্শনভাবনার মৌলিক ভিত্তি। উপরোক্ত প্রতিটি ধর্মদর্শনের মধ্যেই তন্ত্রের ছাপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৌদ্ধ তান্ত্রিক পরম্পরা, নাথপন্থ ইত্যাদির মধ্যে ‘নিম্ন’বর্ণের অংশগ্রহণের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এই গুহ্য সম্প্রদায়ে বর্ণাশ্রমের ভেদ, জাতিবিচার ইত্যাদি ছিল না। বর্ণজাতিকাঠামোয় নিম্নস্তরভুক্ত জাতিগুলির কাছে দৈনন্দিন বৈষম্যের থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সাধনাধিকার লাভের সম্ভাবনা ছিল এই গুহ্য সম্প্রদায়গুলিতে। বৌদ্ধ *চর্যাগীতি*-র

---

[২] জগদীশনারায়ণ সরকার, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক(মধ্যযুগ)*, কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪১৪, পৃ.১৬-১৭

[৩] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*, কলিকাতা: ভারত সাহিত্যভবন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৫, পৃ.১১৬

সূত্রে গুহ্য সাধনায় কয়েকজন উচ্চবর্ণের মানুষের অংশগ্রহণের খবরও মেলে। তবে সাধারণভাবে, ‘শিষ্ট’ সমাজের গুহ্য সাধনার প্রতি মনোভাব খুব প্রীতিকর নয়। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* পড়লে তা নিশ্চিতভাবেই বোঝা যায়।[৪] ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের আলোচনার সূত্রে আমরা বুঝতে পারছিলাম বৌদ্ধ তান্ত্রিক পরম্পরা বা নাথপন্থের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই মন্তব্যের সাহিত্যিক প্রমাণও আছে। শেখ ফয়জুল্লা, শুকর মহম্মদ নাথ সাহিত্যের খুব উল্লেখযোগ্য কবি। গুহ্য সাধনার সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যাবে ফকিরি সাধনার ধারাতেও। ইসলামের প্রতি ঝুঁকে থাকা এই গুহ্য সাধন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পরবর্তীকালে আগ্রহ দেখা যায় বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব কেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্মের প্রতি। এই আগ্রহের কারণ কী? অদ্বৈত আচার্যের মতো বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তিবাদী প্রচারক অনুজপ্রতিম অথচ ঈশ্বরবৎ চৈতন্যদেবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদ্বিজচণ্ডালের মধ্যে ভক্তিধর্ম প্রসার করার। আদ্বিজচণ্ডালে ভক্তিধর্ম প্রসারিত করার অর্থ একেবারেই জাতপাতের কাঠামো উপড়ে ফেলা নয়। বস্তুত, স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণবধর্মের যে সম্পর্ক তাতে বর্ণজাতিকাঠামোর মূলগত বিরোধিতা বা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা সম্ভব ছিল না। তবে, চৈতন্যদেব এবং পরবর্তী প্রচারকরা অবশ্যই সমাজের ‘নিম্নস্তর’ পর্যন্ত ভক্তিধর্ম এবং সাধনাধিকার প্রশস্ত করতে পেরেছিলেন। সেযুগের নিরিখে এর তাৎপর্য নেহাত কম নয়। এই সূত্র ধরেই চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে সংকীর্তন ইত্যাদি কয়েকটি আচার অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়; যেখানে বর্ণজাতি নির্বিশেষে সকলের সমবেত হওয়ার সুযোগ থাকে। শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের বদলে কীর্তনের মাধ্যমে, অতীন্দ্রিয় ভাবোন্মত্ততার মাধ্যমে গুহ্য সাধনার মতোই জাতি, কুল পরিচয়কে কিছুদূর উপেক্ষা করেও সাধনপথে অগ্রসর হবার সুযোগ ‘নিম্ন’ জাতিগুলির কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ পরিকরদের মধ্যেও কেউ

---

[৪] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস*, কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ.১২০-১২৮

কেউ গুহ্যসাধনায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের মূল ঝোঁক জ্ঞান ও ভক্তির প্রতিই ছিল। কিন্তু, *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর সাক্ষ্য বলছে, অদ্বৈত আচার্য আগমশাস্ত্রেও কুশল ছিলেন। নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত বা তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। তাঁর সঙ্গে সবসময় ত্রিপুরেশ্বরী যন্ত্র থাকত। খড়দহে নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাটে আজও ত্রিপুরেশ্বরী যন্ত্রের নিত্য পূজা হয়। এইসমস্ত কারণে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলনে গুহ্য সাধক সম্প্রদায়ের আনাগোনা ছিল। চৈতন্যদেবের সাধনপদ্ধতির আচারবিহীন অথচ গভীর উপলব্ধির পথ গুহ্য সাধকদের বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত নয়। যেসমস্ত গুহ্য সাধকরা নিজেদের সমাজে ব্রাত্য বলে মনে করছিলেন; চৈতন্যদেবের সুবাদে তাঁরা প্রকাশ্যে সসম্মানে দাঁড়াতে পারলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র প্রায় ১৩০০ নেড়া অর্থাৎ বৌদ্ধ সহজসাধককে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিলেন। গুহ্য সাধনপন্থীরা এইভাবে ধীরে ধীরে বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করলেন।[৫] বৌদ্ধ, নাথ ইত্যাদি গুহ্য সাধনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষদের ইসলামে ধর্মান্তরিত হবার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল, বঙ্গদেশের চৈতন্য আন্দোলন ধর্মদর্শনগত বিশিষ্টতার কারণেই সেই প্রবণতায় বাঁধ দেয়।

এ তো গেল গুহ্য সাধনপন্থীদের কথা। 'নিম্ন' জাতির মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণের আরও একটা কারণ ছিল। বিমানবিহারী মজুমদারের গবেষণার কথা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। তাতে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যদেবের সমসময়ে মূলত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য 'উচ্চ'জাতির মধ্যেই শিষ্য ও ভক্ত সীমিত ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এই প্রবণতা অনেকখানি বদলে যায়। নিত্যানন্দ এবং অন্যান্য প্রচারকদের দৌলতে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম রূপ গোস্বামী জাতিবর্ণ নির্বিশেষে অতিরিক্ত ধর্মান্তরণের বিরোধী ছিলেন।[৬] কার্যক্ষেত্রে অবশ্য সেই নিষেধাজ্ঞা বিশেষ

---

[৫] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস*, পৃ.১২৮-১৩১

[৬] Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal 1486-1900*, Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1st Published, 1985, p.323

গুরুত্ব পায়নি। বঙ্গদেশের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে 'নিচু' জাতের ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। 'নিচু' জাতের ধর্মানুষ্ঠানে সৎ পুরোহিত এতদিন জাত খোয়ানোর ভয়ে পৌরোহিত্য করতে চাইতেন না। বৈষ্ণবধর্মের সুবাদে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল; 'নিচু' জাতগুলিও ধর্মানুষ্ঠানে পুরোহিত পেল। নিত্যানন্দ নিজে সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্তের হাতে প্রস্তুত অন্নগ্রহণ করলেন। সে নিয়ে সেই সময়ে বাদ-বিতণ্ডা কম হয়নি। সবমিলিয়ে, ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার অনেকটাই চলে যায়।[৭] এই জাতিগুলিই বিভিন্ন বৈষ্ণব পরম্পরায় বা বৈষ্ণব সমাজে আগের তুলনায় অনেক বেশি মর্যাদা পেতে থাকে। অন্তত বৈষ্ণব পরম্পরার মধ্যে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদালাভের সম্ভাবনা 'নিচু' জাতের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের আকর্ষণের একটা বড়ো কারণ। মনে রাখা দরকার, গুহ্য সাধনপন্থী এবং 'নিচু' জাত—উভয় পক্ষই ব্রাহ্মণ্যসমাজে যথেষ্ট অবহেলিত হচ্ছিল। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ইসলাম ধর্মগ্রহণের প্রবণতাও আমরা দেখেছি। ঐতিহাসিক অসীম রায় খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন, গোষ্ঠীগত ধর্মান্তরণ সমাজের নিম্নশ্রেণির মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। নিজেদের আচার-ব্যবহার ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছাঁচে ঢেলে সামাজিক মর্যাদালাভের সংকীর্ণ ও দুরূহ পথের তুলনায় অবস্থার উন্নতির জন্য ধর্মান্তরণের আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি।[৮] কাজেই, এই গোষ্ঠীগুলির মাত্রতিরিক্ত ধর্মান্তরণে ব্রাহ্মণ্যসমাজের যে সংকট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মান্দোলন সেই সম্ভাবনাকে অনেকটাই রোধ করে।

ঐতিহাসিকভাবে মেনে নিতে দ্বিধা নেই যে, পাঠান আমলের তুলনায় মুঘল আমলে ধর্মান্তরণের স্রোত অনেকটা কমে এসেছিল।[৯] চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্মের প্রারম্ভিক পর্ব বাদ

[৭] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*, পৃ.১১৯

[৮] অসীম রায়, *ইসলাম ও বাঙালি মুসলমান সমাজ*, কলকাতা: রেডিয়্যান্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, পৃ.৩৫-৩৬

[৯] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*, পৃ.১২১

দিলে মূল বিস্তার ঘটেছে মুঘলযুগেই। সেদিক থেকে ধর্মান্তরণের মূল পর্বটির মুখোমুখি চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণবরা সেভাবে হননি। বরং, ভারতজুড়ে ভক্তি আন্দোলনের সূত্রে সমন্বয়বাদী ধর্মচিন্তার প্রকাশ ব্যাপকভাবে ঘটে মুঘলযুগেই। আকবরের সময়কাল থেকে ধর্মান্তরণের ঝোঁক ক্রমশ কমতে থাকে। ধর্মীয় সমানাধিকারের প্রতি আকবরের ঝোঁক পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মুঘল সম্রাট শাহজাহান বা ঔরঙ্গজেবও পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি।[১০] বাংলার মুসলমান শাসকরাও ধর্মান্তরণের কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দেখাননি।[১১] এই পরিস্থিতিতে চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণব আন্দোলনের দর্শন এবং প্রচারকৌশল 'নিম্ন'বর্ণের মানুষদের ইসলামে ধর্মান্তরণের স্রোতকে বাধা দেওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে চৈতন্যদেব জানিয়েছিলেন—'কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার।'[১২] এই উক্তি জাতিনির্বিশেষে সাধনাধিকার প্রসারের ছাড়পত্র। এই সুবাদে 'নিম্ন' জাতির কাছে বৈষ্ণবধর্মের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের অনেকেই শাক্তধর্মের উপাসক ছিলেন; যদিও বৈষ্ণবধর্মকে তাঁরা সম্পূর্ণত ছেড়ে দেননি। বিশেষত, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থরা বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, 'নিম্ন'জাতির মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক। ব্রিটিশ প্রশাসক বুকাননের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গোঁসাই গোবিন্দের প্রভাব মূলত ছিল 'নিচু' জাতের মধ্যে।[১৩] এর পাশাপাশি বৈষ্ণবধর্ম বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে যায়।[১৪] ভক্তিমার্গে 'নিচু' জাতের অধিকারও স্বীকার করে বৈষ্ণবধর্ম। 'নিচু' জাতের ভক্ত সাধনমাহাত্ম্যে 'উঁচু' জাতের ভক্তকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন। বিদুর সহ

---

[১০] Leon Sinder, *Caste Instability in Moghul India*, Korea: International Culture Research Center, [], [], p.167

[১১] Rafiuddin Ahmed(ed.), *Understanding the Bengal Muslims*, New Delhi: Oxford University Press, 1st Published, 2001, p.31

[১২] শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮, পৃ.৭১১

[১৩] বাসন্তী চৌধুরী, *বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য*, কলিকাতা: বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, [], ১৯৬৮, পৃ.২৯-৩০

[১৪] Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal 1486-1900*, p.327

একাধিক 'নিচু' জাতের ভক্তের ঈশ্বরকৃপা লাভই তার প্রমাণ।[১৫] পাশাপাশি বৈষ্ণবধর্ম একধরনের নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদ তৈরি করে। মেদিনীপুরে শ্যামানন্দী বৈষ্ণবরা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে উপবীত ধারণ করতে শুরু করেন। একধরনের বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ সাম্যের দাবি তৈরি হয় এর মাধ্যমে।[১৬] সবমিলিয়ে, চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্ম 'নিচু' জাতের ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার চেষ্টা করে।

এর পাশাপাশি বেশ কিছু 'নিচু' জাতের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণের অর্থনৈতিক কারণও ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বাদে অধিকাংশ 'নিচু' জাত বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলেও বৈষ্ণবসাহিত্যে এই জাতগুলির বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের কোন অর্থনৈতিক কারণ পাওয়া যায় না।[১৭] এপ্রসঙ্গে বর্তমান গবেষণায় আমরা দেখিয়েছি, সুবর্ণবণিক, মল্লরাজবংশ ও সদ্‌গোপদের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সরাসরি অর্থনৈতিক কারণ জড়িত। বৈষ্ণবসাহিত্যে অর্থনৈতিক কারণের সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও অন্যান্য তথ্যসূত্র থেকে বিষয়টি আন্দাজ করা সম্ভব। সুবর্ণবণিকরা ছিলেন বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যস্বত্বভোগী। সপ্তগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্যপ্রক্রিয়ায় পর্তুগিজ বণিকদের সঙ্গে সুবর্ণবণিকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ধর্মান্তরণেও পর্তগিজদের খ্যাতি সুবিদিত। সুবর্ণবণিকরা কিন্তু পর্তুগিজদের সংস্পর্শে এসে জাতিগত বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে খ্রিস্টধর্মকে পথ হিসাবে বেছে নেননি। তাঁরা জানতেন, দেশীয় পণ্য উৎপাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে গেলে এবং বাড়াতে গেলে ভিন্নধর্মের আশ্রয় নয়; বরং ব্রাহ্মণ্য বর্ণজাতিকাঠামোয় উন্নতিই হচ্ছে একমাত্র পথ। সুতরাং, জাতিকাঠামোয় উন্নতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কারবারকে মসৃণ রাখা তাঁদের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের

---

[১৫] শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ.৩৩০

[১৬] Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal 1486-1900*, p.322

[১৭] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*, পৃ.১১৮

অবশ্যই একটি কারণ। সদ্‌গোপরা অনেকেই ভূম্যধিকারী, জমিদার। সদ্‌গোপ জমিদারির প্রজারাও মূলত একই জাতের লোক। জমিদার শ্রেণি হিসাবে প্রজাদের উপর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য যে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার প্রয়োজন, তা দিতে পারে বৈষ্ণবধর্ম। একই কথা খাটে মাহিষ্যদের ক্ষেত্রেও। মেদিনীপুরের তমলুক, ময়না, সুজামুঠার জমিদাররা গোপীবল্লভপুরের শ্যামানন্দ-রসিকানন্দ পরম্পরার মঠে বিপুল দানধ্যান করেন। এই দানধ্যানের সঙ্গে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না—এমনটা মনে করা বাতুলতা। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠছিল বাগদি, ডোম ইত্যাদি গোষ্ঠীর আধিপত্য। এই গোষ্ঠীগুলি ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের আওতায় আসছিল; আবার একইসঙ্গে 'চ্যালেঞ্জ' করছিল মল্লরাজাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে। মল্লরাজারা বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে 'ক্ষত্রিয়' পরিচিতি লাভের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীগুলির উপর ধর্মকৃত্যগত এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কর্তৃত্ব জোরদার করেন। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলিতে বিষয়টি আমরা বিশদে আলোচনা করেছি। সামাজিক সচলতালাভে উদগ্রীব গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব প্রচারকদের কর্মকাণ্ড সংগতিপূর্ণ হওয়ায় বৈষ্ণবধর্মের প্রসার দ্রুত হয়।

বৈষ্ণবধর্ম সীমিত পরিসরে হলেও যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারল তার সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের সাংগঠনিক দিকের সরাসরি যোগাযোগ আছে। বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্ম ও সামাজিক সচলতার আলোচনায় সেই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। বৈষ্ণবধর্মের সাংগঠনিক বিন্যাস সম্পর্কে গবেষণা করেছেন জোসেফ টি. ও'কোনেল। তাঁর মনে হয়েছিল চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংগঠন বিকেন্দ্রীভূত এবং বিচিত্র।[১৮] চার্চ বা শ্রী সম্প্রদায়, রামানন্দী সম্প্রদায়, বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মতো কেন্দ্রীয়

[১৮] Joseph T. O'Connell, *Organizational and Institutonal Aspects of Indian Religious Movements*, New Delhi: Manohar, 1st Published, 1999, p.215

সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা করেননি।[১৯] বঙ্গদেশের বৈষ্ণবরা নানা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত। এই শাখা এবং উপশাখা একটি অধ্যাত্ম পরম্পরার অঞ্চলভিত্তিক বিকাশ ও সম্পর্কের প্রমাণ। শাখাভিত্তিক বিকাশ আবার একই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকসময় একাধিক মূল্যবোধের অস্তিত্বের কথা বলে। জেমস ওয়াইজ লিখেছিলেন, বিভিন্ন গোস্বামী পরম্পরার জন্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল নির্দিষ্টভাবে সংরক্ষিত।[২০] জেমস ওয়াইজের কথাটি সম্ভবত ভুল নয়।[২১] একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, একটি বৈষ্ণব মঠের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে 'অনৈতিক'ভাবে প্রতিস্পর্ধী আরেকটি শাখা ঢুকে পড়ায় বিষয়টি মোকদ্দমার চেহারা নেয় এবং রাজদরবার পর্যন্ত গড়ায়।[২২] এই ঘটনার সূত্রে একেকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একেকটি শাখা বা পরম্পরার প্রভাব টের পাওয়া যায়। কীভাবে এই প্রভাব তৈরি হত? প্রত্যেক গোস্বামীর অধীনে একজন করে অধিকারী থাকতেন। ভক্তমণ্ডলীকে দীক্ষা দেওয়া এবং দক্ষিণা আদায় করার গুরুভার থাকত অধিকারীর উপর। অধিকারীর সাহায্যের জন্য থাকতেন ফৌজদার। ফৌজদারের অধীনে থাকতেন ছড়িদার।[২৩] সাধারণভাবে এই হচ্ছে বিভিন্ন বৈষ্ণব পরম্পরার সাধারণ সাংগঠনিক বিন্যাস। বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে, সংগঠন মজবুত করার জন্য নিত্যানন্দ টাকাপয়সার হিসাব রাখতে একজন 'ভাণ্ডারি'ও নিয়োগ করেছিলেন।[২৪] গোপীবল্লভপুরের শ্যামানন্দ-রসিকানন্দ পরম্পরার মঠে দেখা যাচ্ছে, অধিকারীরা বেতনভুক

---

[১৯] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাংলার ভক্তি আন্দোলনে পরিবর্তনের ধারা*, নতুন দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯, পৃ.৫২

[২০] Joseph T. O'Connell, *Organizational and Institutonal Aspects of Indian Religious Movements*, p.221-222

[২১] এই কথাটি সমর্থন করেছেন রমাকান্ত চক্রবর্তীও। দ্র. Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal 1486-1900*, p.320

[২২] Bishnupada Das, *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South Western Bengal Since Introduction of Neo-Vaisnavism*, Calcutta: Firma K L M Private Limited, 1st Published, 1996, p.61

[২৩] Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal 1486-1900*, p.320

[২৪] তুহিন মুখোপাধ্যায়, *লোকায়ত শ্রীচৈতন্য*, কলকাতা: গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪, পৃ.৩৭৩

কর্মচারী। এই পদটি বংশানুক্রমিক নয়। মহান্ত গোস্বামীদের কাছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর টাকা দিয়ে পদের পুনর্নবীকরণ করাতে হত। কখনও কখনও অধিকারীরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে মহান্তদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেরা স্বাধীনভাবে সংগঠন চালাত। পাট্টাদার নামে আরেকটি শ্রেণির কথাও পাওয়া যাচ্ছে। এই পদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য নিলাম হত। সর্বোচ্চ অর্থপ্রদানকারী পদটি পেতেন। গোপীবল্লভপুর মঠের পুরনো নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, শিষ্যমহলের আয়তনের উপর নির্ভর করে পাট্টা লাভের জন্য আবেদনকারীদের ২ টাকা থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত মহান্ত গোস্বামীদের দিতে হত।[২৫] শিষ্যবৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের যোগ থাকায় এবং শিষ্যবৃদ্ধির জন্য মজবুত সংগঠন হাতে থাকায় দ্রুত বিভিন্ন শাখায় শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একবিংশ শতাব্দীর একদম শুরুতে প্রকাশিত একটি বইতে এক ক্ষেত্রসমীক্ষক গোপীবল্লভপুর মঠ সম্পর্কে লিখেছেন—স্থানীয় অঞ্চলে সাধারণ মানুষ মহান্ত গোস্বামীদের একান্ত অনুগত। প্রায় প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে মহান্তদের কুলগুরুর মতো সম্পর্ক। তাঁরা প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত এবং প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখেন। এই কারণে, আজও ভক্তসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। স্থানীয় অঞ্চলে মহান্তদের প্রভাবও যথেষ্ট।[২৬] নিত্যানন্দ পরম্পরার শ্রীপাট খড়দহেও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন গোস্বামীর শিষ্যের সংখ্যা ২৫০০ এর অধিক।[২৭] এই বিপুল সংখ্যক ভক্তমণ্ডলীর সুবাদে প্রতিটি শাখাভিত্তিক যে সমাজ তৈরি হয়, তাতে বৈষ্ণব গুরুরা তাঁদের অনুগত কোন সম্প্রদায়ের সামাজিক সচলতার দাবিকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন। বঙ্গদেশে শ্রীপাটভিত্তিক সংস্কৃতি বৈষ্ণবধর্মের প্রসার এবং দৃঢ়তা নিশ্চিত করে। এপ্রসঙ্গে নিত্যানন্দ পরম্পরার দ্বাদশ গোপাল এবং উপ-গোপালের কথা বলা যেতে পারে। নিত্যানন্দের বিশিষ্ট

[২৫] Bishnupada Das, *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South Western Bengal Since Introduction of Neo-Vaisnavism*, p.59-60

[২৬] ষষ্ঠিচরণ ভট্টাচার্য, *বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি*, কলকাতা: পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পৃ.২৮৫

[২৭] তদেব, পৃ.৩১০

শিষ্যদের ব্রজের কৃষ্ণসখাদের সঙ্গে তুলনা করে গোপাল আখ্যা দেওয়া হয়। অভিরাম দাস, কমলাকর পিপলাই, উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট গোপাল ছিলেন। পরবর্তীকালে গোপালদের আদর্শে 'উপ-গোপাল' এর কল্পনা করা হয়। সংগঠন বিস্তারের সঙ্গে গোপাল বা উপ-গোপালদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। গোপালদের মাধ্যমেই বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সংগঠন তৈরির সূত্রপাত।[২৮] মনে রাখতে হবে, নিত্যানন্দ পরম্পরা পূর্ববঙ্গেও প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গেও গোপালদের কেউ কেউ যুক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দের বংশধরদের কেউ কেউ ত্রিপুরার আগরতলায় বসবাস শুরু করলে সেখানেও বৈষ্ণবতার প্রসার ঘটে।[২৯] প্রত্যেক গোপাল এবং উপগোপালের কর্মকাণ্ড ছিল নির্দিষ্ট এলাকাকেন্দ্রিক। এদিক থেকে সংগঠন বিকেন্দ্রীভূত। আবার, প্রত্যেক গোপাল এবং উপ-গোপাল নিত্যানন্দ পরম্পরার অংশ হওয়ায় পরম্পরাগত সাধারণ যোগসূত্রও ছিল।[৩০] এইভাবে যে বৃহৎ সমাজ তৈরি হয় তা সামাজিক সচলতার দাবির বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য অতীব প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে গুরু ভক্তের সামগ্রিক জীবনচর্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। অনেক বৈষ্ণব গুরুরা জেল চালাতেন; বিচারের মাধ্যমে শিষ্যদের উপযুক্ত দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। রাজশাহী জেলার বিবরণে দেখা যাচ্ছে, ভক্তরা গুরুদের এই ব্যবস্থা স্বীকার করে নিতেন।[৩১] এই প্রেক্ষাপট মাথায় রাখলে বুঝতে পারব, কীভাবে বৈষ্ণব সংগঠন এবং গুরুদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার দাবি বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীতে মান্যতা পেত।

---

[২৮] Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal 1486-1900*, p.159

[২৯] বাসন্তী চৌধুরী, *বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য*, পৃ.১৫

[৩০] বিভিন্ন বৈষ্ণব পরম্পরার মধ্যে সাধারণ যোগসূত্র তৈরির চেষ্টাও ছিল। প্রসঙ্গত, খেতুরি মহোৎসবের কথা বলতে পারি। বৃন্দাবনের গোস্বামী সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একপ্রকার মতসাম্য তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। এই সূত্রেও বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা ঐক্য তৈরি হয়েছিল।

[৩১] দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ(দ্বিতীয় খণ্ড)*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৬, পৃ.৭৭০

ফলত, আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নতুন সমাজ তৈরি হচ্ছিল—বৈষ্ণব সমাজ। চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্ম স্মৃতিনির্ভর ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনি; বরং তাকেই একটু গড়েপিটে নিয়েছে নিজের মতো করে। বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্ম উত্তর ভারতের কবীর, নানকদের ভক্তিধর্মের তুলনায় অনেকবেশি ব্রাহ্মণ্যবাদ ঘেঁষা বলে মনে করেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।[৩২] কিন্তু, বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সমাজ আর রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতির সমাজ পুরোপুরি এক নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা সাধনাধিকারের প্রসার ঘটাতে পেরেছিলেন। পৌরোহিত্য প্রাপ্তির অধিকার এবং গুরুকরণের অধিকারের মাধ্যমে সেই প্রসার সুনিশ্চিত হল। কীভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বর্ণজাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য পুরোহিত এবং গুরুর ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে? বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষার মাধ্যমে।[৩৩] ফলে, এই সাধনাধিকার কেবল বৈষ্ণবের এবং তা বৈষ্ণব সমাজেই সীমাবদ্ধ। বিপিনচন্দ্র পালও মনে করেছেন, বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্মের লক্ষ্য ছিল নিজস্ব সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক বিধান তৈরির মাধ্যমে একটি নতুন এবং সংস্কৃত সম্প্রদায় গড়ে তোলা।[৩৪] উপযুক্ত সংগঠন আর নির্দিষ্ট ধর্মদর্শনের সূত্রে যে নতুন সমাজ বা বৈষ্ণব সমাজ গড়ে উঠল, তা আদতে হয়ে দাঁড়াল বঙ্গদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর উচ্চাশা ও সামাজিক সচলতাপ্রাপ্তির ভিত্তিভূমি।

বর্তমান গবেষণায় আমরা যে গোষ্ঠীগুলির সামাজিক সচলতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, সেগুলি মূলত রাঢ়বঙ্গকেন্দ্রিক। রাঢ়ের বাইরেও আলোচ্য কালপর্বে সামাজিক সচলতার নিদর্শন ছিল কি? প্রসঙ্গত, আমরা তিলিদের কথা বলতে পারি। তেলিরা মুখ্যত ছিলেন তৈল উৎপাদক। কিন্তু, সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দী থেকেই তেলিদের মধ্যে তিনটি গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছিল। একটি

---

[৩২] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*, পৃ.১২২

[৩৩] অর্জুনদেব সেনশর্মা, *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ*, কলকাতা: ভারবি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, পৃ.১৫৬

[৩৪] Bipinchandra Pal, *Bengal Vaishnavism*, Calcutta: Yugayatri Prakashak LTD., 2nd Edition, 1962, p.93

গোষ্ঠী যুক্ত ছিল পূর্বতন কৌলিক বৃত্তির সঙ্গে। আরেকটি দল, তৈল উৎপাদন ছেড়ে দিয়ে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করেন। তৃতীয় অংশ তৈল উৎপাদন ছেড়ে দেন, কিন্তু তৈল ব্যবসায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। শেষ দুটি গোষ্ঠী তৈল উৎপাদক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের উন্নততর মর্যাদা দাবি করে। ইউরোপীয় বাণিজ্যশক্তির অভিঘাতে ক্রমশ নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা খুলে যায়। তিলিরা সেগুলি কাজে লাগান। তাঁরা যোগ দেন লবণ ও বস্ত্রের ব্যবসায়। এই আর্থিক সমৃদ্ধিকে পুঁজি করে তাঁরা ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার দাবিদার হয়ে ওঠেন। এই তিলিদের রাঢ়বঙ্গে তো দেখা যায়ই; উপরন্তু এঁদের একটি বড়ো অংশ ছিল পূর্ববঙ্গের রাজশাহী, রংপুর, যশোর, খুলনা, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চলে।[৩৫] রাঢ়বঙ্গের বাইরে পূর্ববঙ্গেও সামাজিক সচলতার ঢেউয়ের আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যশোর-খুলনা অঞ্চলে বালকদাস নামে এক 'নিচু' জাতের বৈষ্ণব গুরুর নেতৃত্বে একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। বালকদাস নকুল ব্রহ্মচারীর (ব্রাহ্মণ) শিষ্য। নকুল ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দ পরম্পরায় দীক্ষিত; সেই অর্থে বালকদাসও নিত্যানন্দ পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত। নিত্যানন্দ গোষ্ঠী পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মনোযোগী ছিলেন। নকুল ব্রহ্মচারী এবং বালকদাসের পরম্পরা সেই প্রচেষ্টারই উত্তরাধিকার। বালকদাস নিজে চাষিকৈবর্ত পরিবারের মানুষ। চাষিকৈবর্তরাই পরবর্তীকালের আদমসুমারিতে মাহিষ্য বলে নিজেদের পরিচয় দিতে চাইবে। বালকদাসের প্রধান অনুগামীরা ছিলেন 'নিচু' জাতের ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক কাজকর্মে ক্ষুরধার নদীস্রোত পেরোতে গিয়ে বা রোগ-ব্যাধি, ঝড়ঝাপটার থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা বালকদাসের উপাস্য গোপালের আরাধনা করতেন। বাণিজ্যশক্তির সম্প্রসারণের সুবাদে এই 'নিচু' জাতের বণিকদের অর্থনৈতিক কারবারও জোরদার হয়েছিল। তাঁরা চাইছিলেন অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা। বালকদাসের মধ্যে তাঁরা পেয়েছিলেন প্রায় নিজেদের সমমর্যাদার;

[৩৫] Hitesranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal*, Calcutta: Papyrus, 1st Published, 1981, pp.98-104

অথচ সাধনমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ্য সমাজের থেকে সমীহ আদায় করা এক ব্যক্তিকে। বালকদাসের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁরা নিজেদের জাতিগত মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টা করলেন।[৩৬] বোঝা যাচ্ছে, নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্ভাবনাগুলি বঙ্গদেশের যে যে প্রান্তে সম্প্রসারিত হচ্ছিল, সেখানেই সামাজিক সচলতার দাবির জন্ম হয়েছে। এই নিদর্শনগুলি কার্যত ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে বর্ণজাতিকাঠামোয় নানারকম চলাচল, পরিবর্তনের সাক্ষ্য। আরেকটু বড়ো করে ভাবলে, একটি আঞ্চলিক প্রবণতার প্রমাণ। উপ-আঞ্চলিক প্রবণতাগুলো জুড়ে নিতে থাকলে এইভাবে বর্ণজাতিকাঠামো সংক্রান্ত আঞ্চলিক প্রবণতায় পৌঁছানো যায়। আসলে রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি *বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর মতোই বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপস্থিতি স্বীকার করেনি। বঙ্গদেশে দুটিই বর্ণ— ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।[৩৭] এইভাবে শূদ্রবর্ণের মধ্যে নানারকম থাক তৈরি হয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্ভাবনার অভিঘাতে এই থাকগুলির মধ্যে দীর্ঘকাল জুড়ে প্রতিযোগিতা এবং বর্ণজাতিকাঠামোয় অবস্থানগত বদল লক্ষ করা যায়। এই প্রবণতা চলতে থাকে ঔপনিবেশিক পর্বেও।[৩৮] সামাজিক সচলতার প্রাক্-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক প্রবণতার মধ্যে অবশ্য একটি পদ্ধতিগত পার্থক্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিজস্ব গড়নে সামাজিক সচলতার চূড়ান্ত ছাড়পত্র ছিল স্মার্ত পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র বা কোন একটি ধর্ম সম্প্রদায়ে উপযুক্ত সাধনাধিকার লাভ। ঔপনিবেশিক শক্তি তখন বঙ্গদেশে প্রবেশ করে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সূত্রপাত ঘটালেও আলাদা শাসনব্যবস্থা তৈরি করেনি। ঔপনিবেশিক পর্বে যখন পৃথক শাসনব্যবস্থার সূত্র ধরে আদমসুমারি এল, তখন সামাজিক সচলতা লাভে উন্মুখ

[৩৬] Tanika Sarkar, 'Holy Infancy: Love and power in a 'low caste' sect in Bengal', South Asian History and Culture, Vol.2, No.3, July 2011, pp.340-342

[৩৭] বাণী চক্রবর্তী, *সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন*, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ.২৬৫

[৩৮] Tanika Sarkar, 'Holy Infancy: Love and power in a 'low caste' sect in Bengal', p.341

গোষ্ঠীগুলি বুঝতে পারল আদমসুমারিতে উপযুক্ত স্থান পেলেই সামাজিক সচলতার দাবি বৈধতা পাবে। শুরু হল তার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা। স্মার্ত পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র তখনও প্রয়োজন হল। তবে সেটাই চূড়ান্ত স্বীকৃতি নয়; বরং, ব্রিটিশ আধিকারিকের কাছে নিজের দাবিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার সহায়ক উপাদান বা নথি। আদমসুমারি হয়ে গেল চূড়ান্ত স্বীকৃতি।

আবার ফিরে আসা যাক চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্মে। প্রশ্ন হচ্ছে, চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্ম কীভাবে এই সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারছে? এপ্রসঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা দরকার। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, সামাজিক সচলতা যেহেতু আদতে বর্ণজাতিকাঠামোর আদ্যন্ত বিরোধিতা নয়; বরং কিছু রদবদল মাত্র বা প্রকারান্তরে বর্ণজাতিকাঠামোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির উপায়, তাই চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সামাজিক সচলতার যোগ খুব স্বাভাবিক। চৈতন্যদেব নিজে সরাসরি বর্ণজাতিকাঠামোর বিরোধিতা করেননি। চৈতন্যদেব পরবর্তী সময়ে স্মার্ত বিধানের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের যোগাযোগ আরও দৃঢ় হয়েছে। লক্ষণীয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সগুণ ভক্তিধারার অংশ। সগুণ ভক্তিবাদীরা বর্ণজাতিকাঠামোর সরাসরি বিরোধী নন। বড়োজোর সাধনাধিকার প্রসারে তাঁদের আগ্রহ। এইদিক থেকে দেখলে, ভক্তিধর্মের জাতপাত সংক্রান্ত স্বাভাবিক নমনীয়তা এবং একইসঙ্গে ভক্তিধর্মের সঙ্গে স্মার্তবিধানের সংযোগ—দুইকেই রক্ষা করতে হলে ভক্তিবাদী, বিশেষত সগুণ ভক্তিবাদী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে কার্যত বর্ণজাতিপ্রথার বিলোপন প্রচেষ্টা নয়, বরং বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতার রাস্তাই খোলা থাকে। নির্গুণ ভক্তিবাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করলে এবিষয়ে স্পষ্ট একটি পার্থক্য ধরা পড়বে। উত্তর ভারতের নির্গুণ ভক্তিধারার দুই কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব কবীর ও নানক। দু'জনের বিচারধারতেই বর্ণজাতিকাঠামোর বিরোধিতা স্পষ্ট। কবীরের একটি রচনায় দেখা যাচ্ছে, তিনি ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের পৃথক জাতিগত সত্তাকেই অস্বীকার করেছেন—"কী করে বোঝা যাবে যে

তুমি ব্রাহ্মণ আর আমি শূদ্র? / আমার ধমনীতে রক্ত বইছে, তোমার ধমনীতে কি দুধ আছে?" বর্ণজাতিকাঠামোর প্রতি এমন সরাসরি কটাক্ষ কবীরের অনেক রচনাতেই আছে।[৩৯] বোঝা যাচ্ছে, কবীরের দর্শনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি মন্তব্যের দর্শনগত ফারাক আছে। একজন ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদকেই অস্বীকার করেছেন; আরেকজন সামাজিক জীবনে এই ভেদকে স্বীকার করে ধর্মজীবনে ভক্তির নিরিখে চণ্ডালের দ্বিজকেও ছাড়িয়ে সম্ভাবনাকে স্বীকার করছেন মাত্র। নানকের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, তিনি বর্ণজাতিকাঠামোর সংশোধনের পক্ষপাতী নন; বরং বর্ণজাতিব্যবস্থার উচ্ছেদের পক্ষে।[৪০] পরবর্তীকালে কবীরপন্থ বা শিখধর্মেও জাতপাতের প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল। তবে, সেটি পরবর্তী বিবর্তন; সম্প্রদায় প্রণেতাদের মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কবীর বা নানক মূলগতভাবে বর্ণজাতিকাঠামোর বিরোধী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক সচলতার প্রতি তাঁদের কোন ঝোঁক ছিল না। বরং, সগুণ ভক্তিধারা সংশ্লিষ্ট মহারাষ্ট্রের বারকরী সম্প্রদায়ে সামাজিক সচলতার উদাহরণ আছে। মহারাষ্ট্রে বারকরীদের সূত্রে জাতের মধ্যে একাধিক উপবিভাগ তৈরি হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে মহারাষ্ট্রে দর্জি ও বস্ত্ররঞ্জনকারীরা একই জাতিভুক্ত ছিলেন। বারকরী সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখ নামদেব নিজে ছিলেন দর্জি। নামদেবের আবির্ভাবের পরে নামদেবপন্থী দর্জিরা বস্ত্ররঞ্জনকারীদের থেকে নিজেদের আলাদা ও উন্নত গোষ্ঠী বলে দাবি করে এবং তাঁদের পূর্বতন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহ, সামাজিক আদানপ্রদান ইত্যাদি বন্ধ করে। লক্ষণীয়, অনেকটা চৈতন্যপন্থীদের মতোই বারকরীরা সামাজিক জীবনে জাতপাতকে অস্বীকার করেননি; কেবল ধর্মজীবনে সমানাধিকারের পক্ষপাতী।[৪১] জোসেফ টি. ও'কোনেল আরেকটু

[৩৯] S.P.Sen (ed.), *Social Contents of Indian Religious Reform Movements*, Calcutta: Institute of Historical Studies, 1st Published, 1978, pp.80-81

[৪০] তদেব, পৃ.১০৮

[৪১] তদেব, পৃ.১১৬২-১৬৩, ১৬৫

এগিয়ে বলেছেন, চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণ্য শক্তির সঙ্গে বিরোধে যেতে বারকরীদের তুলনায়ও কম আগ্রহী।[৪২] সগুণ ভক্তিমার্গে সামাজিক সচলতার নিদর্শন আছে রামানুজের শ্রী সম্প্রদায়েও। তিরুপতিতে রামানুজ সম্প্রদায়ের মন্দিরে ষোলটি শূদ্র পরিবার সাধারণ শূদ্রদের থেকে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদায় অনেকটাই উঁচু। সাত্তাদ শ্রীবৈষ্ণব নামে পরিচিত এই গোষ্ঠী মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠানে প্রায় ব্রাহ্মণদের সমতুল।[৪৩]

চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্ম সগুণ ভক্তিধারা সংশ্লিষ্ট ধর্মদর্শনের কারণে যদি সামাজিক সচলতার দাবিকে পুষ্ট করে থাকে; তাহলে সেই ধর্মদর্শনগত বিশিষ্টতার প্রায়োগিক রূপের মাধ্যমে বঙ্গদেশের বর্ণজাতিব্যবস্থার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও নির্মাণ করেছে। প্রসঙ্গত, দুটি উদাহরণ সামনে আনা যেতে পারে। এক, মহারাষ্ট্রে বারকরী সম্প্রদায়ে চোখামেল নামে ‘অস্পৃশ্য’ মাহার জাতির এক ভক্ত ছিলেন। ভক্তিমাহাত্ম্য এবং সাহিত্যিক রচনাতে চোখামেলের যতই খ্যাতি থাক না কেন, পনঢরপুরে বিঠোবার মন্দিরে ঢোকার অপরাধে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তাঁকে প্রহার করেন। ভক্তি সাধক হিসাবে খ্যাতি পেলেও চোখামেলের দরুণ মহারাষ্ট্রে ‘অস্পৃশ্য’দের প্রতি সামাজিক আচরণ বদলায়নি।[৪৪] এই মাহার সম্প্রদায়েরই মানুষ বি.আর.আম্বেদকরকেও বাল্যকালে একইরকম বাধার শিকার হতে হয়েছিল। উত্তর ভারতেও নির্গুণ ভক্ত রুইদাস বা রবিদাস এমন একজন ‘অস্পৃশ্য’ সন্ত। দুই,কেরলে ‘নিচু’ জাতের লোকজনের সঙ্গে কেবল স্পর্শ হলেই যে ‘উঁচু’ জাতের লোক দূষিত হতেন তা নয়; বরং, ‘নিচু’ জাতের লোকের মুখ দেখাই ছিল দূষণের যথেষ্ট কারণ।[৪৫] ছোঁয়াছুঁয়ি বা অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে এরকম ধারণা বঙ্গদেশে

---

[৪২] Joseph T. O’Connell, *Caitanya Vaisnavism in Bengal*, New York: Routledge, 1st Published, 2019, p.58

[৪৩] David N. Lorenzen, *Religious Movements in South Asia 600-1800*, New Delhi: Oxford university Press, Oxford India Paperbacks, 2005, p.95

[৪৪] S.P.Sen (ed.), *Social Contents of Indian Religious Reform Movements*, pp.164-165

[৪৫] Neha Chatterji, ‘Sacred Calling, Worldly Bargain: Caste, Self-Cultivation and Mobilizattion in Late Colonial Bengal’, Unpublished Ph.D. thesis submitted at Jawaharlal Nehru University, 2017, p.1

সেই অর্থে ছিল না। আসলে *চৈতন্যচরিতামৃত* দেখলে বোঝা যাবে, চৈতন্যদেব অন্নবিচার করলেও স্পর্শবিচার করতেন না। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসপর্বেও সম্ভবত 'লোকশিক্ষা'র দরুণ অব্রাহ্মণের হাতের অন্ন গ্রহণ করেননি। বৈষ্ণব সমাজে পঙ্‌ক্তিভোজনের ক্ষেত্রেও জাতপাতের বিচার ছিল। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ মধ্যলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে গুণ্ডিচা মন্দির পরিষ্কার করার পরে ভক্তবৃন্দ একসঙ্গে খেতে বসেছেন। চৈতন্যপার্ষদ যবন হরিদাস সেই পঙ্‌ক্তিভোজনে অংশ নেননি। তিনি অপেক্ষা করছেন দূরে। চৈতন্যদেবের আহ্বানে হরিদাস প্রত্যুত্তর দেন—"ভক্ত সঙ্গে করুন প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার,/ এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহোঁ মুঞি ছার"।[৪৬] যে হরিদাস নিজের 'নিচ কুল' জনিত কুণ্ঠার কারণে পঙ্‌ক্তিভোজনে অংশ নিয়ে বৈষ্ণব ভক্তদের অস্বস্তির কারণ হননি, সেই হরিদাসকেই কিন্তু চৈতন্যদেব আলিঙ্গন করেছেন। এমনকি, চৈতন্যদেব নিজমুখে হরিদাসকে স্পর্শের কারণ জানালেন—"তোমা স্পর্শে পবিত্র হইতে,/ তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।"[৪৭] অথচ, হরিদাস প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের স্পর্শবিচার না থাকলেও, জগন্নাথ মন্দিরের সেবকদের যে সম্ভবত স্পর্শবিচার থাকতে পারে, তার ইঙ্গিত আছে *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ।[৪৮] যবনস্পর্শ দোষে 'দূষিত' সনাতন গোস্বামীর ক্ষেত্রেও চৈতন্যদেবের কোন স্পর্শবিচার ছিল না। বিমানবিহারী মজুমদারের প্রবন্ধের সূত্রে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিয়েছি, বৈষ্ণব সমাজে বিবাহবিষয়ে স্মার্ত নিয়মের যথেষ্ট অনুসরণ চলত। সুতরাং, অন্নগ্রহণ, বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক আদানপ্রদানে স্মার্ত নিয়মের অনুসরণ বা জাতবিচার থাকলেও; চৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণবীয় প্রচারকদের জীবনাচরণে স্পর্শবিচার না থাকায় 'অস্পৃশ্যতা'র ধারণা কেরল, মহারাষ্ট্র বা উত্তর ভারতের মতো বঙ্গদেশে ততটা প্রবল নয়। বিশেষ করে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের অপ্রতিহত দাপট এই প্রবণতাকে আরও জোরদার

---

[৪৬] শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ.৩৫২

[৪৭] তদেব, পৃ.৩৪৩

[৪৮] তদেব, পৃ.৩৪২

করে। এপ্রসঙ্গে দুটি দৃষ্টন্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। এক, মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-এ গুজরাট নগর পত্তন অংশে চণ্ডালের উল্লেখ আছে। মুকুন্দ জানিয়েছেন চণ্ডালরা লবণ, পানিফল ইত্যাদি বিক্রি করে।[৪৯] দুই, রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রে চণ্ডালের অন্নগ্রহণ বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ থাকলেও সরাসরি চণ্ডালকে 'অস্পৃশ্য' বলা হয়নি।[৫০] চৈতন্য অনুসারী বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব বাদ দিলেও সহজিয়া বৈষ্ণবদের মাধ্যমেও 'অস্পৃশ্যতা' বঙ্গসমাজে শিথিল হয়ে যায়। সহজিয়া বৈষ্ণবরা বর্ণজাতিব্যবস্থাকে স্বীকার করেননি; অস্পৃশ্যতাকে স্বীকার করার তো প্রশ্নই নেই। চৈতন্যদেব পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশে বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবদের প্রচেষ্টার দরুণ 'অস্পৃশ্যতা'র বিচ্ছিন্ন কিছু উদাহরণ থাকলেও[৫১] তা সেইভাবে একটি সামগ্রিক প্রবণতায় পরিণত হয়নি। এই সূত্রে বর্ণজাতিব্যবস্থায় বঙ্গদেশের একটি আঞ্চলিক বিশিষ্টতাও নজরে পড়ে।

আমাদের আলোচনা শেষ করব একটি প্রসঙ্গ তুলে। সামাজিক সচলতা নিশ্চয়ই ব্রিটিশ প্রশাসক কল্পিত 'স্থাণু', 'পরিবর্তনহীন' ভারতের ধারণার বিরোধী। 'পরিবর্তন' অবশ্যই ছিল। কিন্তু পরিবর্তন মানেই কি প্রগতি? অনেকক্ষেত্রেই সামাজিক সচলতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শক্তি প্রদর্শন, ক্ষমতার আস্ফালন। সমাজের দুর্বল অংশকে পরাভূত করে শক্তিশালী অংশের দাপট প্রতিষ্ঠা। কায়স্থদের নিয়ে গবেষণা করেছিলেন চিত্ররেখা গুপ্ত। কায়স্থদের

---

[৪৯] সুকুমার সেন(সম্পা.), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল*, নয়া দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৮১

[৫০] Swarupa Gupta, *Notions of Nationhood in Bengal: Perspectives on Samaj C.1867-1905*, Leiden: Brill, 1st Published, 2009, p.197

[৫১] এপ্রসঙ্গে দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এক, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বামুনের মেয়ে* উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা রাসমণি ও তাঁর নাতনি পথে যেতে যেতে এক দুলে বালিকার মুখোমুখি হয়। দুলে পরিবারের বালিকাকে বামুনপাড়ায় দেখে রাসমণি রুষ্ট হলেন এবং নাতনির সঙ্গে দুলে বালিকার স্পর্শদোষের আশঙ্কায় আঁতকে উঠে বললেন—'অ্যাঁ, এই অবেলায় মেয়েটাকে ছুঁয়ে দিয়ে তুই নাওয়ালি?' 'অস্পৃশ্যতা'র ইঙ্গিত এইভাবে *বামুনের মেয়ে* উপন্যাসে স্পষ্ট। দ্র. সুকুমার সেন(সম্পা.), *সুলভ শরৎ সমগ্র(১ম খণ্ড)*, কলকাতা: আনন্দ, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ.৯৭৯ । দুই, উত্তর কলকাতার কিছু বনেদি সুবর্ণবণিক পরিবার জ্ঞাতসারে চেষ্টা করে ব্রাহ্মণের খাবার পাতে যেন নিজেদের ছায়া না পড়ে। 'নিচু' জাতের ছায়ায় তাহলে ব্রাহ্মণের অন্ন দূষিত হবে। দ্র. Asok Mitra, *Caste and Class in Indian Society*, Kolkata: The Asiatic Society, Reprint, 2016, p.21

সামাজিক সচলতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় অন্যতম নিপীড়নকারী গোষ্ঠী হয়ে ওঠা এবং বিপুল অর্থ হস্তগত করা।[৫২] বঙ্গদেশও কি এর ব্যতিক্রম? অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের দুটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল*-এ হরিহোড়ের বৃত্তান্তে দেখছি, হরিহোড়ের পরিবার মৌলিক কায়স্থ। ঘুঁটে বেচে তাঁদের সংসার চলে। কুলীন কায়স্থের কাছে তাঁরা কদর পান না; বৈবাহিক সম্পর্ক তো দূরের কথা!—

মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।

মাগিলে মিলয়ে আঁটে নাহি মিলে থোড়।।

বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।

বসিতে না পান ভালো কায়স্থের কাছে।।[৫৩]

সেই হরিহোড়ই দেবী অন্নদার কৃপায় প্রচুর ধনলাভ করে প্রথমেই জাতিকৌলীন্য লাভে তৎপর হন। ঘটককে প্রভূত ধনরত্ন দিয়ে হাত করেন, অর্থবলে তুষ্ট করেন কুলীন কায়স্থদেরও। তারপরেই ঘোষ-বসু-মিত্র প্রমুখ কুলীন কায়স্থ ঘরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ দূর করে ‘বাহাত্তরে’ গালি দূর করলেন—

কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।

নানামত ধন দিয়া সকলে তুষিল।।

ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।

বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা হৈল দূর।।

---

[৫২] Chitrarekha Gupta, *The Kayasthas*, Calcutta: K P Bagchi & Company, 1st Published, 1996, p.5

[৫৩] সুনীলকুমার ওঝা (সম্পা.), *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*, কলকাতা: সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ.৯৭

ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা।

বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা।।[৫৪]

ভারতচন্দ্র সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়াটিকে নিপুণ ভঙ্গিতে চিহ্নিত করেছেন। সেই প্রক্রিয়া মোটেও কলুষমুক্ত নয়। আরেকটি চমৎকার উদাহরণ আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত সাধক রামপ্রসাদের গানে। 'মা গো তারা ও শঙ্করি' গানে আছে—'প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।/ ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী।।[৫৫] এই গানের ইতিহাস লুকিয়ে আছে বাংলার নবাবি আমলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবছর বাংলা সুবাহ থেকে দিল্লিতে গড়ে ১,২৫,০০,০০০ টাকা রাজস্ব পাঠানো হত। এইসময় চাষের পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু ক্রেতার হাতে টাকার জোগান বাড়েনি। বাংলার কৃষকদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বিনিময়ে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধির সুযোগ ছিল না। অথচ এই বিপুল পরিমাণ টাকা দিল্লি দরবারে পাঠানোর জন্য নবাব বা ইজারাদের চাপে জমিদাররা প্রজাদের উপর মারাত্মক শোষণ চালাতেন। রাজস্ব অনাদায়ে সেই জমিদারি নিলামে উঠত। জমিদারি কিনে নিতেন অন্য কোন উঠতি বড়োলোক। তিনিও প্রজা শোষণের এই প্রক্রিয়ায় শামিল হতেন।[৫৬] এমন সময় প্রচণ্ড বন্যায় নদীয়া রাজের প্রবল ক্ষতি হলে রাজস্ব আদায় দুষ্কর হয়ে উঠল। নদীয়া রাজ সরকারের কাছে রাজস্ব মুকুবের আবেদন করলেন। সেই আবেদনে কাজ হল না; জমিদারি নিলামে উঠল। উঠতি বড়োলোক রানাঘাটের কৃষ্ণ পান্তি, জাতিতে তাম্বুলি অর্থাৎ নবশাখ পর্যায়ভুক্ত, সেই জমিদারি নিলামে কিনে নিলেন।[৫৭] তাম্বুলি কৃষ্ণ পান্তি জমিদার হয়ে নিশ্চয়

[৫৪] তদেব, পৃ.১০০

[৫৫] অমরেন্দ্রনাথ রায়(সম্পা.), *শাক্ত পদাবলী [চয়ন]*, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়য়, নবম সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ.১১৩

[৫৬] দীপান্বিতা ঘোষ, 'সাহিত্য দর্পণে নবাবী আমল', বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, একাদশ সংখ্যা, ২০০১, পৃ.৮-৯

[৫৭] কুমুদনাথ মল্লিক, *নদীয়া-কাহিনী*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ.৩৮

ধনে-মানে মহিমান্বিত হলেন। কিন্তু, বোঝাই যাচ্ছে, জমিদারি বজায় রাখতে, নিজের গৌরব জাহির করতে গিয়ে কৃষ্ণ পান্তিকেও একই শোষণ প্রক্রিয়ায় শামিল হতে হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াতেই জমিদার হয়ে নিজেদের জাতিগৌরব বাড়িয়ে নিয়েছিলেন দীঘাপাতিয়ার তিলি জমিদার বংশ, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ি।[৫৮] প্রত্যেকেই এই জমিদারি ব্যবস্থার অংশীদার। প্রত্যেকের সামাজিক সচলতাই এই সামাজিক নিপীড়নের সঙ্গে যুক্ত। বিশ শতকেও কি এমন ঘটত না? **১৯৯১** সালের ৪ ঠা নভেম্বর 'আজকাল' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার তেলাঙ্গল গ্রামের একটি জাতিগত নিপীড়নের কথা বেরোয়। এই গ্রামের সদ্‌গোপরা প্রত্যেকে বিত্তশালী; গড়ে ২৫-৩০ বিঘা চাষযোগ্য জমির অধিকারী। গ্রামের চারশো তফসিলি জাতির মানুষ সদ্‌গোপদের অত্যাচারে কোণঠাসা। এমনকি, বারোয়ারি পূজামণ্ডপের দুর্গামূর্তি সদ্‌গোপরা সরিয়ে নিজেদের জিম্মায় রাখেন।[৫৯] কর্তৃত্বশালী জাত হিসাবে সদ্‌গোপদের উত্থান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। এখন কর্তৃত্বশালী, সচলতাপ্রাপ্ত জাত হিসাবে তাঁদের নিপীড়নের নমুনাও দেখলাম। সামাজিক সচলতার ইতিহাসে এই দিকটিও ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

---

[৫৮] দীপান্বিতা ঘোষ, 'সাহিত্য দর্পণে নবাবী আমল', পৃ.১১-১২

[৫৯] অঞ্জন ঘোষ ও প্রদীপ বসু(সম্পা.), *জাতপাতের কথা: ভারতীয় সমাজ ও জাতপাতের সমস্যা,* কলকাতা: অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ, ২০২০, পৃ.৩৮-৩৯

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

অভিধান, কোষগ্রন্থ ইত্যাদি

নগেন্দ্রনাথ বসু. *বিশ্বকোষ(২১ খণ্ড).* দিল্লী: বি.আর.পাবলিশিং. পুনর্মুদ্রণ. ১৯৮৮

নগেন্দ্রনাথ বসু. *বিশ্বকোষ(২২ ভাগ).* কলিকাতা: বিশ্বকোষ প্রেস. প্রথম সংস্করণ. ১৩১৭ বঙ্গাব্দ

নগেন্দ্রনাথ বসু. *বিশ্বকোষ(পঞ্চম খণ্ড).* কলকাতা: নগেন্দ্রনাথ বসু. প্রথম প্রকাশ. ১৩০১ বঙ্গাব্দ

হরিদাস দাস. *শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. প্রথম প্রকাশ. ১৪২২ বঙ্গাব্দ

James Hastings(ed.). *Encyclopedia of Religion and Ethics (Vol.III)*. Edinburgh: T. & T. Clark. Reprint. 1974

আকর (বাংলা)— (খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

Sukumar Sen(ed.). *Gauranga Vijaya*. Kolkata: The Asiatic Society. Reprint. 2002

অচিন্ত্য বিশ্বাস(সম্পা.). *বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল.* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স. প্রথম প্রকাশ. ২০০৯

অচিন্ত্য বিশ্বাস(সম্পা.). *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল.* কলকাতা: রত্নাবলী. প্রথম প্রকাশ. ২০০২

অমরেন্দ্রনাথ রায়(সম্পা.). *শাক্ত পদাবলী [চয়ন].* কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়য়. নবম সংস্করণ. ১৯৬০

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.). *কপিলামঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র.* কলকাতা: ভারবি. পুনর্মুদ্রণ. ২০১৮

কিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা). *সপ্তগ্রামের শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ.* চৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট. []. ১৪১৩ বঙ্গাব্দ

কিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা.). *রসিকমঙ্গল(পশ্চিম বিভাগ-উত্তর বিভাগ).* শ্রীচৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট. প্রথম সংস্করণ. ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

কিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা.). *রসিকমঙ্গল(পূর্ব বিভাগ-দক্ষিণ বিভাগ).* শ্রীচৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট. প্রথম সংস্করণ. ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

কিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা.). *শ্রীশ্রী গৌরভক্তামৃত লহরী.(শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর শাখা).* হালিশহর: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট. দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

কিশোরী দাস বাবাজী(সম্পা.). *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ.* শ্রীচৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট. তৃতীয় সংস্করণ. ১৪২০ বঙ্গাব্দ

কিশোরীদাস বাবাজী(সম্পা.). *শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ বংশবিস্তার.* হালিশহর: বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্সটিটিউট. দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র. *শ্রীকৃষ্ণবিজয়.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. []. ২০১১

তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত. *সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ.* কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. পুনর্মুদ্রণ. ২০১১

দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়(সম্পা.). *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল* . কলকাতা: প্রকাশন বিভাগ. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়. প্রথম প্রকাশ. ১৯৯০

নরহরি চক্রবর্তী. *নরোত্তমবিলাস.* শ্রীচৈতন্যডোবা: শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী. দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

নরহরি চক্রবর্তী. *ভক্তিরত্নাকর.* মুর্শিদাবাদ: রামদেব মিশ্র. দ্বিতীয় সংস্করণ. ৪২৬ চৈতন্যাব্দ
নিত্যানন্দ দাস. *প্রেমবিলাস.* কলকাতা: যশোদালাল তালুকদার. প্রথম প্রকাশ. ১৩২০ বঙ্গাব্দ
পঞ্চানন মণ্ডল(সম্পা.). *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল.* কলকাতা: ভারবি. প্রথম সংস্করণ. ২০১৭
পীযূষকান্তি মহাপাত্র. *ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. পুনর্মুদ্রণ. ২০১২
প্রসন্নকুমার গোস্বামী(সংকলিত). *শ্রীঅভিরামলীলামৃত.* কলিকাতা: জি. সি. বসু এণ্ড কোং. প্রথম প্রকাশ. ১৩০১ বঙ্গাব্দ
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ(সম্পা.). *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ. পুনর্মুদ্রণ. ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
মনোহর দাস. *অনুরাগবল্লী.* কলিকাতা: তড়িৎকান্তি বিশ্বাস. দ্বিতীয় সংস্করণ. দ্বিতীয় সংস্করণ. ৪২৪ শ্রীগৌরাব্দ
যদুনন্দন দাস. *কর্ণানন্দ.* মুর্শিদাবাদ: রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন. প্রথম প্রকাশ. ১২৯৮ বঙ্গাব্দ
যোগিলাল হালদার(সম্পা.). *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. []. ২০১২
রাজবল্লভ গোস্বামী. *শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস.* মথুরা: শ্রী কৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা সংস্থান. প্রথম প্রকাশ. ৪০৯ চৈতন্যাব্দ
শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.). *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত.* কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি. পুনর্মুদ্রণ. ২০০৮
শ্রী শ্রী গৌরকিশোরানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুপাদ(সম্পা.). *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ শ্রী শ্রী রসিকানন্দ পদামৃত.* গোপীবল্লভপুর: শ্রী শ্রী শ্যামানন্দ গাদী. শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর. দ্বিতীয় প্রকাশ. ১৪২০ বঙ্গাব্দ
সুকুমার সেন(সম্পা.). *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল.* নয়া দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি. প্রথম প্রকাশ. ১৩৬২ বঙ্গাব্দ
সুকুমার সেন(সম্পা.). *চৈতন্যভাগবত.* নয়া দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. পঞ্চম মুদ্রণ. ২০১৫
সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য(সম্পা.). *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত.* কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. প্রথম প্রকাশ. ১৯৬৫
সুনীলকুমার ওঝা (সম্পা.). *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল.* কলকাতা: সাহিত্যলোক. প্রথম প্রকাশ. ২০০২
হরিদাস দাস(সম্পা.). *শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা.* [ ]. [ ]

আকর (বাংলা)— (উনিশ শতক থেকে একুশ শতক)

অতুল সুর. *সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য.* কলকাতা: সাহিত্যলোক. প্রথম মুদ্রণ. ১৯৮০
অন্নদাশঙ্কর রায়. *জীবনযৌবন.* কলকাতা: আনন্দ. চতুর্থ মুদ্রণ. ২০১৭
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ. *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী(৩য় খণ্ড).* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. প্রথম প্রকাশ. ১৯৯০
অরুণ নাগ(সম্পা.). *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. দ্বিতীয় মুদ্রণ
কন্দর্পমোহন বিদ্যারত্ন. *সুবর্ণবণিকের কুলজী.* হুগলি: শ্রী অক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য. প্রথম প্রকাশ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ
কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল. *আমি কেন চাঁড়াল লিখি.* কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া. দ্বিতীয় প্রকাশ. ২০২১
কান্তি বিশ্বাস. *আমার জীবন: কিছু কথা.* কলকাতা: একুশ শতক. দ্বিতীয় মুদ্রণ. ২০১৬
কুঞ্জলাল ভূতি. *সুবর্ণবণিক(২য় খণ্ড).* কলকাতা: কুঞ্জলাল ভূতি. প্রথম প্রকাশ. ১৩১০ বঙ্গাব্দ
কুঞ্জলাল ভূতি. *সুবর্ণবণিক.* কলকাতা: কুঞ্জলাল ভূতি. প্রথম প্রকাশ. ১৩০৯ বঙ্গাব্দ
জওহরলাল নেহরু. *ভারত সন্ধানে.* কলকাতা: আনন্দ. ষষ্ঠ মুদ্রণ. ২০০৪
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী. *পুরাতনী.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. চতুর্থ মুদ্রণ. ২০১৭
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার.*সদ্গোপজাতির ইতিহাস(১ম খণ্ড).* কলিকাতা: প্রজাপতি প্রেস. প্রথম প্রকাশ. ১৩১২ বঙ্গাব্দ
দীননাথ ধর. *ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত.* কলিকাতা: রাধিকাপ্রসাদ দত্ত. প্রথম প্রকাশ. ১৩১১ বঙ্গাব্দ

দেবেশ রায়(সম্পা.). *দলিত.* নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. চতুর্থ মুদ্রণ. ২০১৫

নরেন্দ্রনাথ লাহা. *সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি(২য় খণ্ড).* কলিকাতা: কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস. প্রথম প্রকাশ

নিমাইচাঁদ শীল. *সুবর্ণবণিক.* চুঁচুড়া: []. প্রথম প্রকাশ. ১৮৮৫

প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত. *বিষ্ণুপুরের রান্দেল রাজবংশ ও বিষ্ণুপুরের ইতিহাস.* বাঁকুড়া: অলক কুমার চৌধুরী. প্রথম প্রকাশ. ২০১৭

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. *বঙ্কিম রচনাবলী(২য় খণ্ড).* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. দ্বিতীয় মুদ্রণ. ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

বলাইচাঁদ দত্ত দেবভূতি. *সুবর্ণ-বণিক তত্ত্ব.* কলিকাতা: প্রতিভা প্রেস. প্রথম প্রকাশ. ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

বিপিন চন্দ্র পাল. *সত্তর বৎসর-আত্মজীবনী.* কলিকাতা: যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড. প্রথম প্রকাশ. ১৯৬২

বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা. *গোপতত্ত্বকৌমুদী.* নবদ্বীপ: নবদ্বীপ বল্লব সমিতি. প্রথম প্রকাশ. ১৩২১ বঙ্গাব্দ

বৈষ্ণবচরণ মল্লিক. *সুবর্ণবণিক বৈশ্য.* হুগলি: গোপালচন্দ্র পাল. প্রথম প্রকাশ. ১৩০২ বঙ্গাব্দ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস(সম্পা.). *নববাবুবিলাস. নব বিবি বিলাস. কলিকাতা কমলালয়.* কলিকাতা: সুবর্ণরেখা. নব সংস্করণ. ১৯৭৯

ভূদেব মুখোপাধ্যায়. *প্রবন্ধ সমগ্র.* কলকাতা: চর্চাপদ. প্রথম প্রকাশ. ২০১০

মনোরঞ্জন ব্যাপারী. *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন.* কলকাতা: দে পাবলিকেশন্স. []

মনোহরমৌলি বিশ্বাস. *আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি.* কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া. প্রথম প্রকাশ. ২০১৩

মহেন্দ্রনাথ দত্ত. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা.* কলকাতা: মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি. ২য় সংস্করণ.১৩৮২ বঙ্গাব্দ

মোক্ষদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী. *সদগোপ কুলীন সংহিতা.* কাশীধাম: গ্রন্থকার. প্রথম প্রকাশ. ১৩২২ বঙ্গাব্দ

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়. *স্মৃতিতে সেকাল.* কলকাতা: চর্চাপদ. দ্বিতীয় চর্চাপদ সংস্করণ. ২০১৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *কালান্তর.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. পরিবর্ধিত সংস্করণ. ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *গোরা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. পুনর্মুদ্রণ. ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *চতুরঙ্গ.* কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ. পুনর্মুদ্রণ. ১৩৯০ বঙ্গাব্দ

রাজনারায়ণ বসু. *আত্মচরিত.* কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেস. প্রথম প্রকাশ. ১৯০৯

রাজনারায়ণ বসু. *বিবিধ প্রবন্ধ(প্রথম খণ্ড).* কলিকাতা: ওরিয়েন্ট্যাল পব্লিশিং এষ্ট্যাব্লিশ্মেন্ট. প্রথম প্রকাশ. ১২৮৯ বঙ্গাব্দ

রাসবিহারী মল্লিক. *বৈশ্য ইতিহাস(প্রথম ভাগ).* কলকাতা: আর মল্লিক. প্রথম প্রকাশ. ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

লালমোহন বিদ্যানিধি. *সম্বন্ধনির্ণয়.* []. তৃতীয় সংস্করণ. ১৩১৫ বঙ্গাব্দ

শরচ্চন্দ্র ঘোষ. *সদ্গোপ জাতি ও সমাজ-তত্ত্ব.* কলিকাতা: ইণ্ডিয়ান প্রেস. প্রথম প্রকাশ. ১৩১২ বঙ্গাব্দ

শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস. *সদ্গোপ জাতি তৃতীয় ভাগ-সমাজসংস্কার.* চন্দননগর: গ্রন্থকার. প্রথম প্রকাশ. ১৩২৮ বঙ্গাব্দ

শিবচন্দ্র শীল. *সুবর্ণ বণিকের উপনয়নের প্রয়োজন ও অশৌচ সম্বন্ধে বিচার.* চুঁচুড়া: সানরাইজ প্রেস. প্রথম প্রকাশ. ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

শিবনাথ শাস্ত্রী. *আত্মচরিত.* কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ. পুনর্মুদ্রণ. ২০০০

শিবনাথ শাস্ত্রী. *জাতিভেদ.* কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ. সংস্করণ. ১৪০৬ বঙ্গাব্দ

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়. *সুরের পথে একটি জীবন.* বিষ্ণুপুর: অঞ্জলি দেবী. প্রথম প্রকাশ. ১৯৭৪

সুকুমার সেন(সম্পা.). *সুলভ শরৎ সমগ্র(১ম খণ্ড).* কলকাতা: আনন্দ. প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ. ১৯৮৯

আকর (হিন্দি)

গঙ্গাসাগর রায়. *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ.* দিল্লী; চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান. পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ. ২০১৫

আকর (সংস্কৃত. পালির বঙ্গানুবাদ)

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী(সম্পা.). *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ.* কলকাতা: রবীন্দ্রনাথ সান্যাল. প্রথম প্রকাশ. ১৩৬৭

দীননাথ ধর(অনুবাদিত). *শ্রীমদানন্দ ভট্ট-বিরচিত সংস্কৃত বল্লাল-চরিতের বঙ্গানুবাদ.* কলকাতা: আর দত্ত. প্রথম প্রকাশ. ১৯০৪

পঞ্চানন তর্করত্ন(অনুবাদিত ও সম্পাদিত). *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ.* কলকাতা: নবভারত. নব সংস্করণ. ১৩৯১

পঞ্চানন তর্করত্ন(সম্পা.). *বৃহদ্ধর্মপুরাণ.* কলকাতা: নবভারত. দ্বিতীয় নবভারত সংস্করণ. ১৪২০

ভরতচন্দ্র শিরোমণি(অনূদিত). *মনুসংহিতা.* কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির. চতুর্থ সংস্করণ. ১৩৩৬

ভিক্ষু শীলভদ্র(অনূদিত). *দীঘনিকায়.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী. ২০০৬

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়(অনূদিত). *মনুসংহিতা.* কলকাতা: সদেশ. প্রথম প্রকাশ. ১৪১২ বঙ্গাব্দ

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.). *কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম(প্রথম খণ্ড).* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ষষ্ঠ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ. ২০১৪

রসিকানন্দ মুরারি. *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-শতকম.* শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর: শ্রীশ্রীগোপাল্লোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামি. প্রথম প্রকাশ. শ্রীগৌরাব্দ ৫০০

শ্যামাচরণ শর্ম্মা(সম্পা.). *শ্রীশ্রী হরিভক্তিবিলাস.* কলিকাতা: কলেজ রো. চতুর্থ মুদ্রণ. ২০০৬

শ্রী বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ(অনূদিত). *ব্রাহ্মণসর্বস্ব(প্রথম খণ্ড).* কলকাতা: শ্রীগুরু প্রকাশন. প্রথম প্রকাশ. ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

শ্রী শ্রী গৌরকিশোরানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুপাদ(সম্পা.). *শ্রীশ্রীবিন্দুপ্রকাশ.* মথুরা: শ্রী শ্রী রাধাশ্যামসুন্দর মন্দির. তৃতীয় সংস্করণ. ২০১৮

আকর (সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ)

Daniel H.H.Ingalls. *An Anthology of Sanskrit Court Poetry: Vidyakara's Subhasitaratnakosa*. Harvard oriental Series Vol.44. Massachusetts: Harvard University Press. 1st Published. 1965

F. Max Muller(ed.). *The Sacred Books of the East*(Vol.29). Oxford: Clarendon Press. 1st Published. 1886

Patrick Olivelle (tr.). *Dharmasutras: The Law Codes of Ancient India*. New York: Oxford University Press.1st Published. 1999

Sukumar Sen(ed.). *Sekasubhodaya*. Kolkata: The Asiatic Society. Reprint. 2002

আকর (ইংরেজি এবং বিদেশি ভাষার গ্রন্থ থেকে অনুবাদিত)

বি.টি.রণদিভে. *জাত বর্ণ শ্রেণী এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক.* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি. নবম মুদ্রণ. ২০১২

শানজিদ অর্ণব(অনূদিত). *হিস্টরি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল.* ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ. প্রথম প্রকাশ. ২০১৮

Armando Cortesao(tr.). *The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Francisco Rodrigues*. London: The Haklyut Society. []. 1944

আকর গ্রন্থ (ইংরেজি)

[]. *Golwalkar and Caste*. New Delhi: Sampradayikta Virodhi Committee. 1st Published. 1970

B.R.Ambedkar. *Annihilation of Caste*. New Delhi: Navayana. The Annotated Critical Edition. []

B.R.Ambedkar. *The Untouchables: Who Were They and Why They Became Untouchables?*. Delhi: Siddharth Books. Reprint. 2008

B.R.Ambedkar. *Who were the Shudras? How they Came to be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society*. Bombay: Thackers. Reprint. 1970

Bal Gangadhar Tilak. *Sri Bhagavagita-Rahasya orKarma-Yoga-Sastra(Vol.1)*. Poona: Tilak Brothers. 1st Edition. 1935

Bhanwar Meghwanshi. *I Could Not Be Hindu: The Story of a Dalit in the RSS*. New Delhi: Navayana. 1st Published. 2020

Jotirao Govindrao Phule. *Slavery*. Tr. by P.G.Patil. []. []. 1st Edition. 2020

M.K.Gandhi. *Hind Swaraj o Indian Home* Rule. Madras: G.A.Natesan & Co.. []. []

M.K.Gandhi. *The Removal of Untouchability*. Ahmedabad: Navajivan Publishing Home. Reprint. 1959

Mahadev Desai. *The Gospel of Selfless Action or The Gita According to Gandhi*. Ahmedabad: Navajivan Publishing House. 1st Edition. 1946

Mahatma Gandhi. *Young India1927-28*. Madras: S Ganesan. 1st Published. 1935

Pandita Ramabai Saraswati. *The High-Caste Hindu Woman*. New York: Fleming H.Revell Company. New Edition. 1901

Sri Aurobindo. *Essays on The Gita(Second Series)*. Calcutta: Arya Publishing House. 2nd Edition. 1942

Swami Vivekananda. *The Complete Works of Swami Vivekananda(Vol.3)*. Calcutta: Advaita Ashram. 13th Reprint. 1958

V.D.Savarkar. *Hindutva*. Bombay: Veer Savarkar Prakashan. 5th Edition. 1969

Vasant Moon(ed.). *Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches(Vol.9)*. New Delhi: Dr. Ambedkar Foundation. Reprint. 2014

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

অঞ্জন ঘোষ ও প্রদীপ বসু(সম্পা.). *জাতপাতের কথা: ভারতীয় সমাজ ও জাতপাতের সমস্যা.* কলকাতা: অনুষ্টুপ. প্রথম প্রকাশ. ২০২০

অতুল সুর. *হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য.* কলকাতা: সাহিত্যলোক. দ্বিতীয় মুদ্রণ. ১৯৮৪

অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.). *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি.* কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী. দ্বিতীয় মুদ্রণ. ২০১২

অনিরুদ্ধ রায়. *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর.* কলকাতা: আনন্দ. পঞ্চম মুদ্রণ. ২০১৬

অনুকূলচন্দ্র সেন. *বাঁকুড়া পরিক্রমা.* কলিকাতা: বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লি.. প্রথম প্রকাশ. ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়. *জাতিভেদপ্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ.* কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি. প্রথম প্রকাশ. ১৯৮১

অরুণ চৌধুরী (সম্পা.). *গৌরীহর মিত্র সঙ্কলিত বীরভূমের ইতিহাস.* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা. লি.. প্রথম অখণ্ড সংস্করণ. ২০০০

অর্জুনদেব সেনশর্মা. *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ.* কলকাতা: ভারবি. প্রথম প্রকাশ. ২০১৫

অশীন দাশগুপ্ত. *প্রবন্ধসমগ্র.* কলকাতা: আনন্দ. পঞ্চম মুদ্রণ. ২০১৬

অসীম রায়. *ইসলাম ও বাঙালি মুসলমান সমাজ.* কলকাতা: রেডিয়্যান্স. প্রথম প্রকাশ. ২০১৫

আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ. *ইতিহাস অনুসন্ধান(১০ খণ্ড).* কলিকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড. প্রথম প্রকাশ. ১১৯৫

ইরফান হাবিব. বিজয় কুমার ঠাকুর. *বৈদিক সভ্যতা.* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী. তৃতীয় মুদ্রণ. ২০০৭

ইরফান হাবিব. বিবেকানন্দ ঝা. *মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ.* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি. চতুর্থ মুদ্রণ. ২০১৬

ইরফান হাবিব. *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে.* কলকাতা; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি. ষষ্ঠ মুদ্রণ. ২০১৫

উমা বন্দ্যোপাধ্যায়. *বাংলা চরিত সাহিত্যে নিত্যানন্দ.* সোদপুর: এষা মুখার্জি. প্রথম প্রকাশ. ১৪১০ বঙ্গাব্দ

এ.এল.ব্যাশাম. *অতীতের উজ্জ্বল ভারত.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স. পুনর্মুদ্রণ. ২০১১

কমল চৌধুরী(সম্পা.). *পুরুলিয়ার ইতিহাস.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. প্রথম প্রকাশ. ২০১৮

কমল চৌধুরী(সম্পা.). *মেদিনীপুরের ইতিহাস(দ্বিতীয় পর্ব).* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. পুনর্মুদ্রণ. ২০১৯

কুমুদনাথ মল্লিক. *নদীয়া-কাহিনী.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি. তৃতীয় সংস্করণ. ১৯৮৬

গৌতম চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.). *ইতিহাস অনুসন্ধান(১১ খণ্ড).* কলিকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড. প্রথম প্রকাশ. ১৯৯৬

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত. *বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা.* বিষ্ণুপুর: টেরাকোটা. প্রথম টেরাকোটা সংস্করণ. পৃ. ভূমিকা

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত. *ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা.* বিষ্ণুপুর: সুষমা দাশগুপ্ত. প্রথম প্রকাশ

জগদীশনারায়ণ সরকার. *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক(মধ্যযুগ).* কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ. তৃতীয় মুদ্রণ. ১৪১৪

জীমূতবাহন রায়. শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি. প্রথম প্রকাশ. ১৯৮৪

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার. *বংশপরিচয়(১ম খণ্ড).* কলিকাতা: জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার. প্রথম প্রকাশ. ১৩২৮ বঙ্গাব্দ

তপোব্রত ঘোষ(সম্পা.). *জগদীশ ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত গদ্য.* কলকাতা: ভারবি. প্রথম প্রকাশ. ২০১২

তরুণদেব ভট্টাচার্য. *পশ্চিমবঙ্গ দর্শন মেদিনীপুর.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা. লি.. প্রথম প্রকাশ. ১৯৭৯

তরুণদেব ভট্টাচার্য. বাঁকুড়া. কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা.লি.. প্রথ ম প্রকাশ. ১৯৮২

তারাপদ সাঁতরা. *পুরাকীর্তি সমীক্ষা: মেদিনীপুর.* কলকাতা: []. প্রথম প্রকাশ. ১৯৮৭. পৃ.১০৫

তুহিন মুখোপাধ্যায়. *চৈতন্য আন্দোলন. ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈষ্ণবীয় বিবাহবিচিত্রা.* কলকাতা: পত্রলেখা. প্রথম প্রকাশ. ২০১৮

তুহিন মুখোপাধ্যায়. *লোকায়ত শ্রীচৈতন্য.* কলকাতা: গাঙচিল. প্রথম প্রকাশ. ২০১৪

দিলীপ কুমার গোস্বামী. *পঞ্চকোট ও মানভূমের সভ্যতা.* পুরুলিয়া: বজ্রভূমি প্রকাশনী. দ্বিতীয় সংস্করণ. ২০১৯

দিলীপকুমার গোস্বামী(সম্পা.). *রাজপুরোহিত রাখাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত পঞ্চকোট ইতিহাস.* পুরুলিয়া: বজ্রভূমি প্রকাশনী. নবম প্রকাশ. ২০১৯

দীনেশচন্দ্র সরকার. *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত.* কলকাতা: সাহিত্যলোক.পুনর্মুদ্রণ. ২০১৫

দীনেশচন্দ্র সরকার. সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ(১ম খণ্ড). কলকাতা: সাহিত্যলোক. সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ.১৪২৩ বঙ্গাব্দ

দীনেশচন্দ্র সরকার. সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ(২য় খণ্ড). কলকাতা: সাহিত্যলোক. প্রথম মুদ্রণ.১৩৮৯ বঙ্গাব্দ

দীনেশচন্দ্র সেন. *বৃহৎ বঙ্গ(দ্বিতীয় খণ্ড).* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. তৃতীয় মুদ্রণ. ২০০৬

দীপঙ্কর দাস(সম্পা.). *গবেষক হেমেন্দ্রনাথ পালিত এবং তাঁর সংগৃহীত পুঁথি.* কলকাতা: দিবারাত্রির কাব্য. প্রথম প্রকাশ. ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

দুর্গাচন্দ্র সান্যাল. *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস.* কলকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস. প্রথম প্রকাশ. ১৪১০ বঙ্গাব্দ

দেবরাজ চানানা. *প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা* . কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী. দ্বিতীয় সংস্করণ. ২০১৮

নগেন্দ্রনাথ বসু. *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ.* কলকাতা: দে;জ পাবলিশিং. দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ. ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

নগেন্দ্রনাথ বসু. *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস(বৈশ্য-কাণ্ড).* প্রথম ভাগ. কলকাতা: বিশ্বকোষ প্রেস. দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৩২০ বঙ্গাব্দ

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য. *ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা. লি.. প্রথম প্রকাশ. ১৯৮৭

নির্মলকুমার বসু. *হিন্দু সমাজের গড়ন.* কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ. পুনর্মুদ্রণ. ১৪১৫বঙ্গাব্দ

নীহাররঞ্জন রায়. *বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ.* কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়. প্রথম প্রকাশ. ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

নীহাররঞ্জন রায়. *বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব্ব).* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. সপ্তম সংস্করণ. ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

নেপাল মজুমদার. *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ(৩য় খণ্ড).* কলকাতা: পুস্তক বিপণি. প্রথম প্রকাশ. ১৯৯৭

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ (সম্পা.). *ইতিহাস অনুসন্ধান-৩২.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ. প্রথম প্রকাশ. ২০১৮

পান্নালাল দাশগুপ্ত. *গান্ধী-গবেষণা.* কলকাতা:নবপত্র প্রকাশন. প্রথম প্রকাশ. ১৯৬০

প্রণব রায়(সম্পা.). *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন(৪র্থ খণ্ড).* কলকাতা: সাহিত্যলোক. প্রথম প্রকাশ. ২০১০

প্রণব রায়. *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ.* কলকাতা: প্রত্নতত্ত্ব অধিকার. তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ. প্রথম প্রকাশ

প্রদীপ কর(সম্পা.). বাঁকুড়া জেলার লোকপার্বণ. বিষ্ণুপুর: টেরাকোটা. প্রথম প্রকাশ. ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রভাতকুমার সাহা. *বৈষ্ণব-কথা: বিষ্ণুপুর.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি. প্রথম প্রকাশ. ২০১৬

ফকিরনারায়ণ কর্মকার. *বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. দ্বিতীয় দে'জ পরিবর্ধিত সংস্করণ. ২০১৮

বাণী চক্রবর্তী. *সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন.* কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৯৭০

বাসন্তী চৌধুরী. *বাংলার বৈষ্ণব সমাজ. সংগীত ও সাহিত্য.* কলিকাতা: বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড. []. ১৯৬৮

বিনয় ঘোষ. *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি(১ম খণ্ড).* কলিকাতা: পুস্তক প্রকাশক. প্রথম প্রকাশ. ১৯৫০

বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায়(সম্পা.). *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন(১ম খণ্ড).* কলকাতা: সাহিত্যলোক. প্রথম প্রকাশ

বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায়(সম্পা.). *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন(২য় খণ্ড).* কলকাতা: সাহিত্যলোক. প্রথম প্রকাশ. ১৯৯৮

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.). *কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস(১ম খণ্ড).* কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ. কলকাতা. ১২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে জয়ন্তী গ্রন্থ. ১৯৪৮

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়. *গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি(দ্বিতীয় ভাগ).* কলকাতা: গ্রন্থমিত্র. প্রথম প্রকাশ. ২০০৫

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়. *গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম ভাগ.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স. প্রথম প্রকাশ. ২০০৩

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত. *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব.* কলিকাতা: ভারত সাহিত্যভবন. প্রথম প্রকাশ. ১৯৪৫

মণীন্দ্রনাথ সান্যাল. *সুরের সাধনায় বিষ্ণুপুর.* কলকাতা: পত্রলেখা. প্রথম প্রকাশ. ২০১৩

মধুপ দে. *গোপীবল্লভপুর.* মেদিনীপুর: বিপ্লবী সব্যসাচী প্রকাশনী. প্রথম প্রকাশ. মার্চ ২০১৬

মধুপ দে. *ঝাড়গ্রাম : ইতিহাস ও সংস্কৃতি.* কলকাতা: মনফকিরা. তৃতীয় সংস্করণ. ২০২০

মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি. *গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস বৈষ্ণব বিবৃতি.* হুগলী: সুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ. দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

মানব চক্রবর্তী. শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়(সম্পা.). *বিদগ্ধ রাজশেখর: রসিক পরশুরাম.* কলকাতা: জলার্ক. প্রথম প্রকাশ. ২০০৭

যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ. *নিত্যানন্দ-চরিত.* কলকাতা: পাতাবাহার/খোয়াবনামা. পাতাবাহার/খোয়াবনামা সংস্করণ. ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

যোগেশচন্দ্র বসু. *মেদিনীপুরের ইতিহাস.* কলকাতা: সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং. পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ. ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রণবীর চক্রবর্তী. *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. দ্বিতীয় সংস্করণ. পঞ্চম মুদ্রণ. ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

রণবীর চক্রবর্তী. ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড). কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান. প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান মুদ্রণ. ২০০৯

রমাকান্ত চক্রবর্তী. *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম.* কলকাতা: আনন্দ. তৃতীয় মুদ্রণ. ২০০৯

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়. *দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর.* কলিকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির. প্রথম প্রকাশ. ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

রামশরণ শর্মা. *প্রাচীন ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ গঠন.* কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান. প্রথম প্রকাশ. ১৯৯৮

রামশরণ শর্মা. *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস.* কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান. পুনর্মুদ্রণ. ২০১৬

রামশরণ শর্মা. *ভারতের প্রাচীন অতীত.* কলকাতা; ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান. প্রথম প্রকাশ. ২০১১

রোমিলা থাপার. *সময়: ইতিহাসের রূপক প্রাচীন ভারত.* কলকাতা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস. প্রথম বাংলা সংস্করণ. ২০১৮

শর্মিষ্ঠা দত্ত(সম্পা.). *দশাবতার তাস.* কলকাতা: প্রতিক্ষণ. পুনর্মুদ্রণ. ২০১৫

শার্ল মারি এমিল সেনার. *প্রাচীন ভারতে বর্ণ শ্রেণী ও জাত.* কলকাতা: ছোঁয়া. প্রথম প্রকাশ. ২০১৬

শৈলেন দাস. নমিতা মণ্ডল(সম্পা.). *বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি.* বাঁকুড়া: বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি

ষষ্ঠিচরণ ভট্টাচার্য. *বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি.* কলকাতা: পুনশ্চ. প্রথম প্রকাশ. ২০০১

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়. *দলিতের পুরাণকথা.* কলকাতা: অনুষ্টুপ. পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ. ২০১৭

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়. *দক্ষিণ পশ্চিম রাঢ় পরিক্রমা(প্রথম খণ্ড).* বিষ্ণুপুর: টেরাকোটা. প্রথম সংস্করণ. ২০১৬

সুকুমার সেন. *বঙ্গভূমিকা.* কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. প্রথম আকাদেমি সংস্করণ

সুকুমার সেন. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(২য় খণ্ড).* কলকাতা: আনন্দ. দশম মুদ্রণ. ১৪১৮

সুভাষ রায়. *পুরুলিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি.* সিউড়ি: রাঢ়. প্রথম প্রকাশ. ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

সুভাষ রায়. *মন্দিরনগরী তেলকূপি: সেকাল একাল.* বিষ্ণুপুর: টেরাকোটা. প্রথম প্রকাশ. ২০২১

সুশীল চৌধুরী. *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য.* কলকাতা: আনন্দ. প্রথম সংস্করণ. ২০১৭

হিতেশরঞ্জন সান্যাল. *নির্বাচিত প্রবন্ধ.* কলকাতা: সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যাণ্ড ট্রেনিং. ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া. প্রথম সংস্করণ. ২০০4

হিতেশরঞ্জন সান্যাল. *বাংলার ভক্তি আন্দোলনে পরিবর্তনের ধারা.* নতুন দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস. প্রথম প্রকাশ. ২০১৯

হিতেশরঞ্জন সান্যাল. *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস.* কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী. প্রথম প্রকাশ. ১৯৮৯

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

A.C.Banerjea. *Studies in the Brahmanas*. Delhi: Motilal Banarsidass Pvt. Ltd.. 1st Published. 1963

Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti(ed.). *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives (up to c.1200 CE)*. Vol.1. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh. 1st Published. 2018

Abhaya Pada Mallik. *History of Bishnupur-Raj*. Calcutta: Abhaya Pada Mallick. 1st Edition. 1921

Amitabha Bhattacharyya. *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar. 1st Published. 1977

Amiya Kumar Banerjee. *West Bengal District Gazetteers Bankura*. Calcutta: []. 1st Published. 1968

Amiya Kumar Banerji. *West Bengal District Gazetteers Hooghly*. Calcutta: Government of West Bengal. 1st Published. 1972

Aniruddha Ray. 'The Rise and Fall of Satgaon: An Overseas Port of Medieval Bengal'. *The Indian Trade at the Asian Frontier*. ed. S. Jeyaseela Stephen. New Delhi: Gyan Publishing House. 1st Edition. New Delhi. 2008

Anjali Chatterjee. *Bengal in the Reign of Aurangzib 1658-1707*. Calcutta: Progressive Publishers. 1st Edition. 1967

Ashok Kumar Shrivastava. *Hindu Society in the Sixteenth Century*. New Delhi: Milind Publications Pvt. Ltd. . 1st Published. 1981

Asok Mitra. *Caste and Class in Indian Society*. Kolkata: The Asiatic Society. Reprint. 2016

Atindranath Bose. *Social and Rural Economy of Northern India(Cir.600 B.C- 200 A.D)*. Vol.1. Calcutta: University of Calcutta. 1st Published. 1942

B.D. Chattopadhyay. *A Sourcebook of Indian Civilization*. Kolkata: Orient Longman. Reprinted. 2002

B.D. Chattopadhyay. *The Concept of Bharatavarsha and Other Essays*. New Delhi; Permanent Black. 1st paperback Printing. 2019

B.D. Chattopadhyaya(ed.). *A Soial History of Early India.* in *History of Science. Philospohy and Culture in Indian Civilization(vol.II. part 5)*. General Editor: D.P. Chattopadhyaya. Delhi: Pearson Longman. 1st Published. 2009

B.D.Chattopadhyay. & Others(eds.). *Inscriptions and Agrarian Issues in Indian History*. Kolkata: The Asiatic Society. 1st Published. 2017

B.N.Mukherjee & others. *Sri Dinesacandrika: Studies in Indology*. Delhi: Sundeep. 1st Published. 1983

B.N.S.Yadava. *Society and Culture in Northern India in the Twelfth Century*. Allahabad: Raka Prakashan. 2nd Edition. 2016

Barrie M. Morrison. *Political Centres and Cultural Regions in Early Bengal*. Arizona: The University of Arizona Press. 1970

Bhagwansingh Suryavanshi. *The Abhiras:Their History and Culture*. Baroda: Maharaja Sayajirao University of Baroda. 1st Edition. 1962

Bhairabi Prasad Sahu. *The Changing Gaze Regions and the Constructions of Early India*. New Delhi; Oxford University Press. 1st Published. 2013

Bipinchandra Pal. *Bengal Vaishnavism*. Calcutta: Yugayatri Prakashak LTD.. 2nd Edition. 1962

Birendra Kumar Bhattacharya & others(eds.). *West Bengal District Gazetteers Puruliya*. Calcutta: []. 1st Edition. 1985

Bishnupada Das. *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South Western Bengal Since Introduction of Neo-Vaisnavism*. Calcutta: Firma K L M Pvt. Ltd.. 1st Published. 1996

Brajadulal Chattopadhyaya. *Aspects of Rural Settlements and Rural Society in Early Medieval India*. New Delhi: Primus Books. Reprinted. 2017

Brajadulal Chattopadhyaya. *Studying Early India*. New Delhi: Permanent Black. Third Impression. 2016

Brajadulal Chattopadhyaya. *The Making of Early Medieval India*. Delhi: Oxford University Press. 1st Published. 1994

Brian K Smith. *Classifying the Universe*. New York: Oxford University Press.1st Published. 1994

Brian K Smith. *Reflections on Resemblance. Ritual. and Religion*. New York: Oxford University Press. 1st Published. 1989

Chitrarekha Gupta. *The Kayasthas*. Calcutta: K P Bagchi & Company. 1st Published. 1996

Christophe Jaffrelot. *India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India*. London: Hurst & Company. 1st Published. 2003

Christophe Jaffrelot. *The Sangh Parivar: A Reader*. New Delhi: Oxford University Press. Oxford India

D.N.Jha. *Economy and Society in Early India: issues and Paradigms*. New Delhi; Munshiram Manoharlal. 1st Published. 1993

David N. Lorenzen. *Religious Movements in South Asia 600-1800*. New Delhi: Oxford university Press. Oxford India Paperbacks. 2005

Debala Mitra. *Telkupi*. New Delhi: Archaeological Survey of India.1st Published. 1969

Debiprasad Chattopadhyay(ed.). *History and Society Essays in Honour of Professor Niharranjan Ray*. Calcutta.: K P Bagchi & Company. 1st Published. 1978

Dev Nathan(ed.). *From Tribe to Caste*. Shimla: IIAS. 1st Published. 1977

E.A.Gait. *Census of India(Vol. VI)*. Calcutta: Bengal Secretariat Press. 1st Edition.1902

E.T.Dalton. *Descriptive Ethnology of Bengal*. Calcutta : Office of the Superintendent of Government Printing. 1st Published. 1872

Edward W Hopkins. *The Mutual Relations of the Four Castes*. New Delhi: Asian Educational Services. 1st AES Reprint. 1985

G.P. Singh. *Kiratas in Ancient India*. New Delhi: Gian Publishing House. 1st Published. 1990

G.S. Ghurye.*Two Brahmanical Institutions Gotra and Charana*. Bombay: Popular Prakashan. 1st Edition. 1972

G.S.Ghurye. *Caste. Class and Occupation*. Bombay: Popular Book Depot. []. 1956

Gen'ichi Yamazaki. *The Structure of Ancient Indian Society*. Tokyo: The Tokyo Bunko. 1st Published. 2005

Govind Prasad Upadhyay. *Brahmanas in Ancient India*. Delhi: Munshiram Manoharlal. 1st Edition. 1979

H .H. Risley. *The Tribes and Castes of Bengal(Vol.II)*. Calcutta: Bengal Secretariat Press. 1st Edition. 1892

H.Coupland. *Bengal District Gazetteers Manbhum*. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot. 1st Published. 1911

H.H.Risley. *The Tribes and Castes of Bengal (Vol.1)*. Calcutta: Firma Mukhopadhyay. []. []

H.H.Risley. *The Tribes and Castes of Bengal(Vol.1)*. Calcutta: Bengal Secretariat Press. 1st Published. 1892

Haran Chandra Chakladar. *The Aryan Occupation of Eastern India*. Calcutta: Indian Studies; Past & Present. Reprint. 1962

Haripada Chakraborty. *Socio-Economic Life of India in the Vedic Period*. Calcutta:Sanskrit Pustak Bhandar. 1st Published. 1986

Harishchandra Satyarthi. 'Some Aspects of Economic Condition of the Brahmanas (C.185 B.C-A.D. 319)'. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.30(1968)

Hitesranjan Sanyal. *Social Mobility in Bengal*. Calcutta: Papyrus. 1st Published. 1981

Ishita Banerjee-Dube. *Caste in History*. New Delhi: Oxford University Press. Second Impression. 2008

J. Talboys Wheeler.*Ancient and Hindu India*. Calcutta: Punthi Pustak. 2nd Reprint. 1961

J.C.K.Peterson. *Bengal District Gazetteers Burdwan*. Calcutta: Government of West Bengal. West Bengal Govt. Reprint. 1997

J.D.Beglar. *Report of A Tour Through the Bengal Provinces*. Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing. 1st Edition. 1878

J.H. Hutton.*Caste in India*. Bombay: Oxford University Press. Sixth Impression. 1981

J.R. Gharpure. *Teachings of Dharmasastra*. Lucknow: The Lucknow University. 1st Published. 1956

Jadunath Sarkar(ed.). *The History of Bengal Volume II Muslim Period*. Delhi: B. R. Publishing Corporation. Reprint. 2003

Jagdish Chandra Jain. *Life in Ancient India as Depicted in the Jain Canons*. Bombay; New Book Company. 1st Published. 1947

Jaimal Rai. *The Rural- Urban Economy and Social Changes in Ancient India*. Varanasi: Bharatiya Vidya Prakashan. 1st Edition. 1974

James Silverberg(ed.). *Social Mobility in the Caste System in India: An Interdisciplinary Symposium*. The Hague: Mouton. 1st Published. 1968

Jogendranath Bhattacharya. *Hindu Castes & Sects*. New Delhi: Kalpaz Publications. Indian Reprint. 2017

Jogiraj Basu. *India of the Age of the Brahmanas*. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar. 1st Published. 1969

John Winter Jones(tr.). *The Travels of Ludovico Di Varthema*. London: The Haklyut Society. []. 1863

Joseph T. O'Connell. *Caitanya Vaisnavism in Bengal*. New York: Routledge. 1st Published. 2019

Joseph T. O'Connell. *Organizational and Institutional Aspects of Indian Religious Movements*. New Delhi: Manohar. 1st Published. 1999

K.A. Nilakanta Sastri. *Cultural Contacts Between Aryans and Dravidians*. Bombay: Manaktalas. 1st Published. 1967

K.L.Sharma(ed.). *Social Inequality in India*. New Delhi: Rawat Publications. Reprint. 2012

K.M. Panikkar. *Hindu Society at Crossroads*. New Delhi: Asia Publishing House. 2nd Edition. 1956

K.M.Panikkar. *Hindu Society at Crossroads*. Bombay: Asia Publishing House. 3rd Edition. 1961

Kosambi. D.D. . *The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline*. New Delhi; Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2nd Reprint. 2002

Kumkum Roy. *The Emergence of Monarchy in North India Eighth-Fourth Centuries B.C.* Delhi: Oxford University Press. 1st Published. 1994

Kumkum Roy. *The Power of Gender & the Gender of Power*. New Delhi: Oxford University Press. 1st Published. 2010

Kunal Chakrabarti& Kanad Sinha(ed.). *State. Power & Legitimacy: The Gupta Kingdom*. New Delhi: Primus Books. 1st Published. 2019

Kunal Chakrabarti. *Religious Process The Puranas and the Making of a Regional Tradition*. New Delhi:Oxford University Press. Oxford India Paperbacks.2018

L.S.S. O'Malley. *Bengal District Gazeetters Midnapore*. Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot. 1st Published. 1911

L.S.S. O'Malley. *India's Social Heritage*. Oxford: Clarendon Press. 1st Published. 1934

L.S.S. O''Malley. *Bengal District Gazetteers Bankura*. Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot. 1st Published. 1908

Lallanji Gopal.*The Economic Life of Northern India(c. A.D. 700-1200)*. Varanasi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 1st Edition. 1965

Leon Sinder. *Caste Instability in Moghul India*. Korea: International Culture Research Center. []. []

Lorenzen. David N. *Religious Movements in South Asia 600-1800*. New Delhi: Oxford University Press. Oxford india Paperbacks. 2005

Louis Dumont. *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications*.New Delhi: Oxford University Press. 1st Indian Edition. 1988

M.N.Srinivas. 'The Dominant Caste in Rampura'. American Anthropologist. New Series. Vol.61. No.1. 1959

Mansel Longworth Dames(tr.). *The Book of Duarte Barbosa*. Vol.II. London: The Haklyut Society

Martin E.Marty & R.Scott Appleby(eds.). *Fundamentalism and the State: remaking Polities. Economies and Militance*. Chicago: The University of Chicago Press. 1st Published. 1993

Meera Kosambi. *Pandita Ramabai: Life and Landmark Writings*. New York: Routledge. 1st Published. 2016

MM. Haraprasad Sastri(ed.). *Ramacaritam of Sandhyakaranandin*. Kolkata: The Asioatic Society. Reprinted. 2012

Mohinder Singh. *The Depressed Classes*. Bombay: Hind Kitabs Ltd. . 1st Published. 1947

Moirangthem Kirti Singh. 'Religious Developments in Manipur in the Eighteenth and Nineteenth Centuries'. unpublished Ph.D. thesis submitted at Gauhati University. 1971
Monika Hortsmann. *In Favour of Govinddevji*. New Delhi: Manohar. 1st Published. 1999
N. Gerald Barrier. *The Census in British India: New Perspectives*. New Delhi. 1st Published. 1981
N.K. Dutt. *Origin and Growth of Caste in India*. Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd.. First Combined Reprint Edition. 1986
Narendra Wagle. *Society at the Time of Buddha*. Bombay: Popular Prakashan. 2nd Edition. 1995
Nicholas B. Dirks. *Castes of Mind*. Delhi: Permanent Black. 1st Indian Edition. 2001
Nripendra Kumar Duta. *Origin and Growth of Caste in India*. Calcutta: Firma K L M Pvt. Ltd.. First Combined Reprint Edition. 1986
Om Prakash. *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal 1630-1720*. Delhi: Manohar. Indian Edition. 2012
Osmund Boperachchi & Suchandra Ghosh(eds.). *Early Indian History and Beyond*. New Delhi: Primus Books. 1st Published. 2019
P.K.Bhowmick. *Socio-Cultural Profile of Frontier Bengal*. Calcutta: Punthi Pustak. 1st Edition. 1976
P.V.Kane. *History of Dharmasastra*(Vol.2. Part-I). Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute.1977
Pandharinath H. Prabhu. *Hindu Social Organization*. Bombay: Popular Prakashan. Sixth Reprint. 1979
Pika Ghosh. *Temple to Love : Architecture and Devotion in Seventeenth-Century Bengal*. Indiana: Indiana University Press. 1st Published. 2005
Pitrim A. Sorokin. *Social and Cultural Mobility*. Illinois: Free Press. 1st Published. 1959
Pius Malekandathil. *The Mughals. The Portuguese and the Indian Ocean*. Delhi: Primus Books. Reprint. 2014
Prabhati Mukherjee. *Beyond the Four Varnas*. Shimla: Indian Institute of Advanced Study. 1st Published. 1988
Pramode Lal Paul. *The Early History of Bengal'*. Calcutta: Satis Chandra Seal. 1st Published. 1940
Puspa Niyogi. *Brahmanic Settlements in Different Subdivisions of Ancient Bengal*. Calcutta: Indian Studies: Past & Present. 1st Published. 1967
R.C. Dutt. 'The Aboriginal Element in the Population of Bengal'. Calcutta Review. 1882
R.C. Hazra. *Puranic Records on Hindu Rites and Customs*. Delhi: Motilal Banrsidass Publishers Pvt. Ltd. 2nd Edition. 1975
R.C. Majumdar(ed.). *The History of Bengal (Vol.1)*. Dacca: The University of Dacca. 1st Edition. 1943
R.K.Tripathi. *Social and Religious Aspects in Bengal Inscriptions*. Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd.. 1st Published. 1987
Rafiuddin Ahmed(ed.). *Understanding the Bengal Muslims*. New Delhi: Oxford University Press. 1st Published. 2001
Rajendra Nath Sharma. *Culture and Civilization as Revealed in the Srautasutras*. Delhi: Nag Publishers. 1st Published. 1977
Rajendranath Sharma. *Brahmins Through The Ages*. Delhi: Ajanta Publications. 1st Published. 1977
Raka Ray & Mary Fainsod Katzenstein. *Social Movements in India: Poverty. Power and Politics*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 1st Published. 2005

Ram Gopal. *India of Vedic Kalpasutras*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd. 1st Published. 1983

Ram Sharan Sharma. *Sudras in Ancient India*. New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.. 2nd Reprint. 2014

Ramakanta Chakrabarty. *Vaisnavism in Bengal 1486-1900*. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar. 1st Published. 1985

Ramaprasad Chanda. *The Indo-Aryan Races: A Study of the Origin of Indo-Aryan People and Institutions*. Calcutta: Indian Studies: Past & Present. Reprint. 1969

Ranavir Chakravarti. *Trade and Traders in Early Indian Society*. New Delhi: Manohar. 1st Paperback Edition. 2007

Ratnabali Chatterjee(ed.). *Urbanity and Economy: The Pre Modern Dynamics in Eastern India*. Calcutta: Suchi. 1st Edition. 2014

Ratnalekha Ray. *Change in Bengal Agrarian Society C.1760-1800*. New Delhi: Manohar. 1st Published. 1979

Raychaudhuri Tarak Ch. & Bikash Raychaudhuri. *The Brahmans of Bengal*. Calcutta: Anthropological Survey of India. 1st Published. 1981

Reena Bhaduri. *Social Formation in Medieval Bengal*. Kolkata: Bibhasa. 1st published. 2001

Richard G. Fox (ed.). *Realm and Region in Traditional India*. New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd. . 1st Published. 1977

Richard M. Eaton. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760*. California: University of California Press. 1st Paperback Printing. 1996

Robert Eric Frykenberg(ed.). *Land Control and Social Structure in Indian History*. Wisconsin: The University of Wisconsin Press. 1st Published. 1969

Romila Thapar. *Ancient Indian Social History: Some Interpretations*. New Delhi: Orient Longman. 1st Published. 1978

Romila Thapar. *From Lineage to State*. New Delhi: Oxford University Press. Oxford India Paperbacks. 1990

Romila Thapar. *Indian Culture as Heritage*. New Delhi: Aleph. 1st Published. 2018

Ronald B. Inden. *Marriage and Rank in Bengali Culture*. California: The University of California Press 1st Published. 1976

Rosalind O'Hanlon. *Caste. Conflict. and Ideology: Mahatma Jotirao Phule and Low Caste Protest in Nineteenth-Century Western India*. Cambridge: Cambridge University Press. 1st Paperback Edition. 2002

S.C.Bhattacharya(ed.). *Vaishnavism in Eastern India*. Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd.. 1st Published. 1995

S.K.Biswas. *Nine Decades of Marxism in the Land of Brahminism*. Kerala: Other Books. 1st Published. 2008

S.N.Mukherjee. *Calcutta: Essays in Urban History*. Calcutta: Subarnarekha. 1st Published. 1993

S.P.Sen (ed.). *Social Contents of Indian Religious Reform Movements*. Calcutta: Institute of Historical Studies. 1st Published. 1978

Sabyasachi Bhattacharya(ed.).*The Mahatma and The Poet*. New Delhi: National Book Trust. 1st Edition. 1997

Sachindra Kumar Maity. *Economic Life of Northern India in the Gupta Period(Cir. 300-550*). Calcutta: The World Press Pvt. Ltd. 1st Published. 1957

Sekhar Bandyopadhyay. *Caste. Culture and Hegemony*. New Delhi: Sage Publications. 1st Published. 2004

Sekhar Bandyopadhyay. *Caste. Politics and the Raj*. Calcutta: K P Bagchi & Company.1st Published. 1990

Sibesh Chandra Bhattacharya. *Some Aspects of Indian Society*. Calcutta: Firma K L M Pvt Ltd. 1st Edition. 1978

Suchandra Ghosh & others. (eds.). *Revisiting Early India: Essays in Honour of D.C.Sircar*. Kolkata: R.N.Bhattacharya. 1st Published. 2013

Sudhakar Chattopadhyaya. *Social Life in Ancient India*. Calcutta: Academic Publishers. 1st Edition. 1965

Sukla Das. *Socio-Economic Life in Northern India*. New Delhi: Abhinav Publications. 1st Edition. 1980

Sumit Sarkar. *Beyond Nationalist Frames*. New Delhi: Permanent Black. 1st edition. 2002

Sumit Sarkar. *Writing Social History*. New Delhi: Oxford University Press. Oxford India Paperbacks. 1998

Surabhi Sheth. *Religion and Society in the Brahma Purana*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd. 1st Edition. 1979

Surajit Sinha(ed.). *Tribal Polities and State Systems in Pre-Colonial Eastern and North Eastern India*. Calcutta: K P Bagchi & Company. 1st Published. 1987

Sushil Chaudhury. *Companies. Commerce and Merchants*. Delhi: Manohar. 1st Published. 2015

Suvira Jaiswal. *Caste: Origin. Function and Dimensions of Change*. Delhi: Manohar. Reprint. 2000

Suvira Jaiswal. *The Making of Brahmanic Hegemony*. New Delhi; Tulika Books. 1st Published. 2016

Swarupa Gupta. *Notions of Nationhood in Bengal: Perspectives on Samaj C.1867-1905*. Leiden: Brill. 1st Published. 2009

Swati Dutta. *Migrant Brahmanas in Northern India*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.. 1st Edition. 1989

Syed Ejaj Husain & Syed Ejaj Hussain. 'Rise and Decline of Bandar Satgaon: Based on Numismatic Evidence. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.58. 1997

Syed Ejaz Hussain. *The Bengal Sultanate: Politics. Economy and Coins(AD 1205-1576)*. New Delhi: Manohar. 1st Published. 2003

Tapan Raychaudhuri. *Bengal Under Akbar and Jahangir*. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.. 1966

U.N Ghoshal. *The Agrarian System in Ancient India*. Calcutta: The University of Calcutta. 1st Published. 1930

U.N.Ghoshal. *A History of Hindu Public Life*(Part-I). Calcutta: Ramesh Ghoshal.[ ]. []

Uma Chakravarti. *The Social Dimension of Early Buddhism*. New Delhi: Munshiram Manoharlal. Reprint. 1996

Urmila Bhagowalia. *Vaisnavism and Society in Northern India 700-1200*. New Delhi: Intellectual Book Corner. 1st Published. 1980

V.M.Apte. *Social and Religious Life in the Grihya Sutras*. Bombay: The Popular Book Depot. Reset Ediotion. 1954

V.N.Jha. *Candala: Untouchability and Caste in Early India*. Delhi: primus Books. 1st Published. 2018

W.W.Hunter. *Annals of Rural Bengal(Vol.1)*. London: Smith. Elder & Co.. 1st Published. 1868

Walter K. Andersen & Shridhar D. Damle. *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*. New Delhi: Vistaar Publications. 1st Published. 1987

William Foster(ed.). *Early Travels in India 1583-1619*. London: Oxford University Press. 1st Edition. 1921

সহায়ক গ্রন্থ (হিন্দি)

বাসুদেব শরণ অগ্রবাল. *পাণিনিকালীন ভারতবর্ষ.* বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন. পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ. ২০১৪

পত্র-পত্রিকা (বাংলা)

[]. 'অখিল ভারত যাদব মহাসভার বিবরণ'. 'গোপমিত্র'. ৩য় বর্ষ. ৭ম ভাগ. চৈত্র ১৩৩১

[]. 'আমাদের কথা'. সদ্গোপ পত্রিকা. ৭ম বর্ষ. ৫ম সংখ্যা. চৈত্র ১৩৪২

Aniruddha Roy. 'Morphology of Medieval Saptagram or Satgaon'. সপ্তগ্রাম -স্মৃতিপত্র. অগস্ট ২০০৮

অতীন্দ্রনাথ বসু. ভারতীয় সমাজ বিকাশের ধারা. ইতিহাস. তৃতীয় বর্ষ. দ্বিতীয় সংখ্যা-চতুর্থ সংখ্যা. ১৩৫৯-১৩৬০ বঙ্গাব্দ

অনাথনাথ ঘোষ. 'মল্লভূমি'. বিচিত্রা. ১/২/১. পৌষ ১৩৩৪

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়. বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ অ বৃত্তি. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা. বর্ষ ৭৫. সংখ্যা ১-৪. ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

আশীষ লাহিড়ী. 'হরিজনদের হিন্দুধর্ম ত্যাগ: গান্ধি বনাম রবীন্দ্রনাথ'. চেতনালহর. জানুয়ারি-জুন. ২০১৮

ক্ষিতিনাথ সুর. 'শ্যামানন্দের জাতি ও নিবাস'. 'প্রবাসী'. ৩৯ বর্ষ. ২য় খণ্ড. ৬ষ্ঠ সংখ্যা. চৈত্র ১৩৪৬

চিত্তরজন দাশগুপ্ত. 'মল্লরাজ্য বিষ্ণুপুর'. প্রত্ন পরিক্রমা: মল্লভূম. ৩য় সংখ্যা. ২০০৮

জগন্নাথ দাশগুপ্ত. 'বাংলার শাস্ত্রীয় সংগীতে লৌকিক উপাদান'প্রত্ন পরিক্রমা; মল্লভূম. ৮ নং সংখ্যা. ২০১৪

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার. 'নারায়ণগড় রাজবংশ'. প্রজাপতি পত্রিকা. ৪র্থ বর্ষ. ৪র্থ সংখ্যা. শ্রাবণ ১৩১৯

তরুণদেব ভট্টাচার্য. 'মানা মানা মানভূম ও ভূমযুক্ত অঞ্চল'. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. ৯০ বর্ষ. ৩য় সংখ্যা. পৃ.৩৬

ত্রিপুরা বসু. 'প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর'. সমকালীন. আষাঢ়. ১৩৮০

ত্রৈলোক্যনাথ পাল. 'গোপভূমের আটজন সদ্গোপ রাজা'. সদ্গোপ পত্রিকা. ১ম বর্ষ. ৭ম সংখ্যা. মাঘ ১৩৩৫

দীপান্বিতা ঘোষ. 'সাহিত্য দর্পণে নবাবী আমল'. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়. একাদশ সংখ্যা. ২০০১

নবীনচন্দ্র ঘোষ. 'জাতিবিচারে সদ্গোপ বৈশ্য না ক্ষত্রিয়'. সদ্গোপ পত্রিকা. ২য় বর্ষ. ২য় সংখ্যা. ভাদ্র. ১৩৩৬

পূর্ণচন্দ্র কুমার. 'অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ'. সদ্গোপ পত্রিকা. ৭ম বর্ষ. ৫ম সংখ্যা. চৈত্র ১৩৪২

প্রভাতকুমার সাহা. 'বিষ্ণুপুরের মধ্যযুগের মন্দির: কিছু কথা. প্রত্ন পরিক্রমা: মল্লভূম. ৪র্থ সংখ্যা. ২০০৯

প্রভাতকুমার সাহা. 'বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজপরিবার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম'. ঐতিহাসিক:প্রবন্ধ সংকলন. ৬. জুলাই ১৯৭৮

বিমানবিহারী মজুমদার. 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ'. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা. ৩১ বর্ষ. ৩য় সংখ্যা. ১৩৩১ বঙ্গাব্দ

মনস্বিতা সান্যাল. 'সপ্তগ্রাম(আঃ ১৩০০-১৬৩২). ঐতিহাসিক: প্রবন্ধ সংকলন. ৪. মাঘ. ১৩৮৩

মাণিকলাল সিংহ. 'মল্লভূমের মল্লরাজা দেবতাদের আদিবৃত্তান্ত'. কৌশিকী. ৪র্থ বর্ষ. ৯ম-১০ম সংখ্যা. ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮১

মাণিকলাল সিংহ. *পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি.* বিষ্ণুপুর: চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত. প্রথম প্রকাশ. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

মাণিকলাল সিংহ. *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি(২য় খণ্ড).* বিষ্ণুপুর: প্রণবকুমার সিংহ. প্রথম সংস্করণ. ১৯৮২

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি. '"ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়" ও চণ্ডীদাস'. প্রবাসী. আষাঢ় ৩৬ বর্ষ. ১ম খণ্ড. ৩য় সংখ্যা. ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ

রঙ্গলাল ঘোষ. 'সদ্গোপ জাতির ইতিহাসের কিঞ্চিৎ' সদ্গোপ পত্রিকা. ১ম বর্ষ. ৮ম সংখ্যা. ফাল্গুন ১৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. 'বল্লালসেন. সুবর্ণবণিক ও নবশাখ'. কৌশিকী নবপর্যায়. ৩য় বর্ষ. ১২ সংখ্যা. অগ্রহায়ণ. ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

শরৎচন্দ্র ঘোষ. 'সদ্গোপ-শব্দের উৎপত্তি'. সদ্গোপ পত্রিকা. ২য় বর্ষ. ৬ষ্ঠ সংখ্যা. পৌষ.১৩৩৬

শরৎচন্দ্র ঘোষ. *সদ্গোপ-তত্ত্ব(১ম খণ্ড).* কলকাতা: সুধীর চন্দ্র ঘোষ. ১ম সংস্করণ. ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ

শুচিব্রত সেন. 'হাবার্ট হোপ রিসলে; জাতিতত্ত্ব: উৎপত্তি ও পরিণাম'. অনুষ্টুপ. ৫২ বর্ষ. ৪র্থ সংখ্যা. প্রাক-শারদীয় বিশেষ সংখ্যা. ২০১৮

শ্যামচাঁদ বাগদী. 'রাঢ়-বাঙলা ও বহির্বঙ্গে প্রাচীন গ্রামীণসভ্যতার[যৎ] বাগতি জাতির অবস্থান'. আত্মশক্তি. চতুর্থ বর্ষ. প্রথম সংখ্যা

শ্রী হরিশচন্দ্র কবিরত্ন. 'সেকালের সংস্কৃত কলেজ'. পাতাবাহার. পঞ্চম বর্ষ. চতুর্থ সংখ্যা. এপ্রিল ২০১৮

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়. 'ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র'. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা. ১৩২৯ বঙ্গাব্দ. বর্ষ ২৯ সংখ্যা.৩

হারাধন দত্ত. 'শ্রীমদ্দত্ত-উদ্ধারণ-ঠাকুর'. জন্মভূমি. ৫ম ভাগ. দ্বাদশ সংখ্যা. অগ্রহায়ণ. ১৩০২

পত্র-পত্রিকা (ইংরেজি)

A.A. Macdonell. 'The Early History of Caste'. The American Historical Review. Vol.19. No.2. January. 1914

Ankur Barua. 'Revisiting the Gandhi-Ambedkar Debates over 'Caste': The Multiple Resonances of Varna'. Journal of Human Values. Vol.25. No.1. 2019

Arabindo Sharma. 'An Analysis of Three Epithets Applied to the Sudras in Aitareya Brahmana VII.29.4'. Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol.18. No.3.(Oct. 1975)

Ashutosh Biswas. 'Society and Culture in the Brahamana Period: Notes from the Aitareya Brahmana'. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. Vol.13. No.2(1931-32)

C Bougle. 'The Essence and Reality of the Caste System'. Contributions to Indian Sociology. Vol.2. No.7. 1968

Chitrarekha Gupta. ‘The Writers’ Class of Ancient India- A Case Study in Social Mobility’. The Indian Economic and Social History Review. Vol.20. No.2. 1983

Christophe Jaffrelot. ‘The Caste Based Mosaic of Indian Politics’. Seminar. University of Toronto Press. 2012. pp.49-53. hal-01024572

D.D. Kosambi. Early Stages of the Caste System in Northern India. Journal of the Bombay Branch. Royal Asiatic Society. Vol.22. 1946

D.G.Crawford. ‘Satgaon and Tribeni’. Bengal Past & Present. Vol. III. No.1. Serial No.7. January-March. 1909

D.R.Bhandarkar. ‘Aryan Immigration into Eastern India’. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. Vol.12. No.2. 1931

Debala Mitra. ‘The Abhiras and Their Contributions to the Indian Culture’. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.14. 1951

Dev Kumar Jhanjh. ‘Changing Social Contours of the Abhiras in Early India’. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.76. 2015

Dipankar Gupta. ‘Caste and Politics: Identity Over System’. Annual Review of Anthropology. Vol.21. 2005

E.M.S. Namboodiripad. ‘Once Again on Castes and Classes’. Social Scientist. Vol.9. No.12. December. 1981

George Varghese K. ‘Globalisation Traumas and New Social Imaginary: Visvakarma Community of Kerala’. Economic and Political Weekly. Vol. 38. No.45. Nov.8-14

Gopal Guru. ‘Appropriating Ambedkar’. Economic and Political Weekly. Vol.26. No.27/28. July 6-13. 1991

Gopal Guru. ‘Reservations and the Sanskritization of Scheduled Castes-Some Theoretical Aspects. Sociological Bulletin. Vol.33. No.1/2. September. 1984

H.C.Satyarthi. ‘Some Aspects of the Social Position of the Vaisyas During the Post-Maurya Period(c.200 B.C- A.D. 300). Proceedings of the Indian History Congress. Vol.37. 1976

Hanumanthan. ‘Origin of the Untouchables of South India’. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.39. 1978

Harish Chandra Satyarthi. ‘ Some Aspects of Group-Consciousness Among the Brahmanas of North India During the Post-Maurya Period(C.185 B.C- 19 A.D). Proceedings of the Indian History Congress. Vol. 31. 1969

John Leavitt. ‘Cultural holism in the anthropology of South Asia: The challenge of regional traditions’. Contributions to Indian Sociology. 1992. 26:1

K. Srinivasulu. ‘BSP & Caste Politics’. Economic and Political Weekly. Vol.29. No40. October 1. 1994

Kumkum Chatterjee. ‘Cultural Flows and Cosmopolitanism in Mughal India: The Bishnupur Kingdom’. Indian Economic and Social History Review. Vol.46. No.2. 2009

Kunal Chakrabarti. Cult Region: ‘The *Puranas* and the Making of the Cultural Territory of Bengal’. Studies in History. 2000. 16:1

Lotika Varadarajan. ‘Indian Seafaring: The Precept and Reality of Kalivarjya’. The Great Circle. Vol.5. No.1. April 1983

Lucia Michelutti. ‘We (Yadavs) are a Caste of Politicians: Caste and Modern Politics in a North Indian Town. Contributions to Indian Sociology. Vol.38. No. 1&2. 2004

Ludo Rocher. ‘Caste and Occupation in Classical India: The Normative Texts’. Contributions to Indian Sociology. Vol.9. No.1. []

M.N.Srinivas. ‘The Dominant Caste in Rampura’. American Anthropologist. New Series. Vol.61. No.1. 1959

M.N.Srinivas. *Social Changes in Modern India*. New Delhi: Orient BlackSwan. Reprint. 2016

Mahesh Gavaskar. ‘Gandhi’s *Hind Swaraj*: Retrieving the Sacred in the Time of Modernity’. Economic and Political Weekly. September 5-11. 2009. Vol.44. No.36

Maitrayee Mohanty. “Harpura Gada: The Bhanja Capital in Ruins’. Odisha Review. August 2015

Milton Singer. ‘Modernization or Traditionalization’. On the Nature of Caste in India A Review Symposium on Louis Dumont’s *Homo Hierachicus*. Contributions to Indian Sociology. Vol.5. 1971

Nicholas B. Dirks. ‘Political Authority and Structural Change in Early South Indian History’. Indian economic and Social History Review. Vol.XIII. No.2. April-June. 1976

Om Prakash Prasad. ‘Position of Goldsmiths in Early Medieval Karnataka (11th -13th Century AD). Proceedings of the Indian History Congress. Vol.42. 1981

Om Prakash. ‘The European Trading Companies and the Merchants of Bengal 1650-1725. The Indian Economic and Social History Review. 1. 1964

P. Acharya. ‘A Note on the ‘Bhum’ Countries in Eastern India. Indian Culture. Vol.12. No.2. 1945

Parimala V. Rao. ‘Nationalism and The Visibility of Women in Public Space: Tilak’s Criticism of Rakhmabai and Ramabai’. The Indian Historical Review. Vol.XXXV. No.2. July. 2008

Parinita Shetty. ‘Christianity. Reform. and the Reconstitution of Gender: The Case of Pandita Mary Ramabai. Journal of Feminist Studies in Religion. Vol.28. No.1. Spring 2012

Patrick Olivelle. Caste and Purity: A Study in the Language of the Dharma Literature. Contributions to Indian Sociology. Vol.32. No.2. 1998

R. N. Nandi. ‘Gotra and Social Mobility in the Deccan’. Proceedings of the Indian History Congress. Vol. 32. 1970

R.N. Nandi. ‘Some Social Aspects of the Grhyasutras’. Proceedings of the Indian History Congress. Vol. 38. 1977

R.S. Khare. ‘The Kanya-Kubja Brahmins and Their Caste Organization’. Southwestern Journal of Anthropology. Vol.16. No.3. Autumn. 1960

Radhakamal Mukherjee. ‘Caste and Social Change in India’. American Journal of Sociology. Vol.43. No.3. 1937

Rakhal Das Bandyopadhyaya. ‘Saptagrama or Satganw’. Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Vol. V. 1909

Ranabir Chakravarti. ‘Early Medieval Bengal and the Trade in Horses: A Note’. Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol.42. No.2. 1999

Raut. L.N. ‘Jati Formation in Medieval Orissa: Reflection on Karana(Kayastha Caste)’. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.65. 2004

Ryosuke Furui. 'Brahmanas in Early Medieval Bengal: Construction of Their Identity. Networks and Authority'. Indian Historical Review. 40:223. 2013

Ryosuke Furui. 'Merchant Groups in Early Medieval Bengal: With Special Reference to the Rajbhita Stone Inscription of the Time of Mahipala I. Year 33'. Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Vol.76. Issue.3. October 2013

S. C. Bindra. 'Notes on Religious Ban on Sea Travel in Ancient India'. Indian Historical Review. Vol.XXIX. No. 1-2. 2004

Sanjay Subrahmanyam. 'Notes on the Sixteenth Century Bengal Trade'. The Indian Economic and Social History Review. Vol.24. No.3. 1987

Sharma. K.l. . Downward Social Mobility: Some Observations. Sociological Bulletin. Vol.22. No.1. March. 1973

Stella Kramrisch. 'Tradition of the Indian Craftsman'. The Journal of American Folklore. Vol.71. No.281. Jul-Sep. 1958

Suchitra Majumdar. 'Agrarian Society in Early Medieval Bengal'. Social Scientist. Vol.43. No.5-6. May-June 2015

Sudha Pai. 'New Social and Political Movements of Dalits: A Study of Meerut District'. Contributions to Indian Sociology. Vol.34. No.2. 2000

Surajit Sinha. 'Bhumij-Kshatriya Social Movement in South Manbhum'. Bulletin of the Department of Anthropology. Vol.VIII. No.2. 1959

Suvira Jaiswal. 'Caste in the Socio-Economic Framework of Early India'. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.38. 1977

Suvira Jaiswal. 'Caste. Gender and Ideology in the Making of India'. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.68. Part 1. 2007

Suvira Jaiswal. 'Caste: Ideology and Context'. Social Scientist. Vol.25. No. 5/6. May-June 1997

Suvira Jaiswal. 'Changes in the Status and Concept of the Sudra Varna in Early Middle Ages'. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.41. 1980

Suvira Jaiswal. 'Some Recent Theories of The Origin of Untouchability: A Historiographical Assessment'. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.39. 1978

T. N. Madan. 'Introduction'. On the Nature of Caste in India A Review Symposium on Louis Dumont's *Homo Hierachichus*. Contributions to Indian Sociology. Vol.5. 1971

Tanika Sarkar. 'Holy Infancy: Love and power in a 'low caste' sect in Bengal'. South Asian History and Culture. Vol.2. No.3. July 2011

U.N.Ghoshal. 'The Status of the Brahmanas in the Dharmasutras'. The Indian Historical Quarterly. Vol.XXIII. No.2. June 1947

Uma Chakravarti. 'A Glance at the Word Jati in the Vedic Literature'. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. Vol.86 (2005)

Uma Chakravarty. 'A Glance at the Word Varna in the Vedic Literature. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. Vol.84. 2003

V.N.Jha. 'Status of the Rathakara in Early Indian History'. Proceedings of the Indian History Congress. Vol.34. 1973

V.N.Jha. 'Varnasamkara in the Dharmasutras: Theory and Practice'. Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol.XIII. 1970

Veena Das & Jit Singh Uberoi. 'The Elementary Structure of Caste'. On the Nature of Caste in India A Review Symposium on Louis Dumont's *Homo Hierarchichus*. Contributions to Indian Sociology. Vol.5. 1971

Vijay Kumar Thakur. 'Beginnings of Feudalism in Bengal'. Social Scientist. Vol.6. No.6/7

Vijay Nath. 'King Vena. Nisada and Prthu: A Recurrent Puranic Myth Re-Examined'. Indian Historical Review. Vol.XXIX. No.1-2. January and July. 2002

Vijaya Ramaswamy. 'Viswakarma Craftsmen in Early Medieval Peninsular India'. Journal of the Economic and Social History of the Orient'. Vol.47. No.4. 2004

Vivekanand Jha. 'Dharma and the Nature of Caste in the Bhagavadgita'. Indian Historical Review. Vol. XXIX. No. 1-2. January and July. 2002.

Vivekanand Jha. 'Social Stratification in Ancient India: Some Reflections'. Social Scientist. Vol.19. No.3/4. Mar-Apr. 1991

Y.Krishan. 'Buddhism and the Caste System'. The Journal of the International Association of Buddhist Studies. Vol.9. 1986

অন-লাইন তথ্য উৎস

https://www.parabass.com/PB65/LEKHA/pKumKum65.shtml. accessed on 30.11.2020

https://www.sahapedia.org/perspectives-caste-the-nineteenth-century-bengali-literati. accessed on 24.05.2021

https://www.parabaas.com/rabindranath/articles/pGopa3.html. accessed on 25.05.2021

https://www.google.co.in/books/edition/Rewriting_History/9TenDAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover . accessed on 27.05.2021

https://velivada.com/2015/06/28/jotiba-phule-and-tilak-and-question-of-education-for-women-and-non-brahmins/ accessed on 29.05.2021

https://thewire.in/caste/lower-caste-ambedkar-anti-caste-struggle . accessed on 29.05.2021

https://www.boloji.com/articles/11759/ambedkar-and-the-bhagwat-gita . accessed on 29.05.2021

https://www.mkgandhi.org/my_religion/36varna_caste.htm . accessed on 30.05.2021

https://www.gandhiashramsevagram.org/selected-letters-of-mahatma/gandhi-letter-extracts-caste-system-and-untouchability.php . accessed on 30.05.2021

https://theprint.in/opinion/savarkar-wanted-to-smash-caste-system-cooked-prawns-and-didnt-worship-the-cow/161016/ accessed on 31.05.2021

https://books.google.co.in/books?id=39HVDwAAQBAJ&pg=PT190&lpg=PT190&dq=portuguese+proselytization+in+kerala&source=bl&ots=ALbT0MOAxH&sig=ACfU3U1wvGTEjdQMb0aV0Zb4ktdzw9O1jQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjh8tvkjszxAhWrH7cAHcY5ALQQ6AEwFnoECDAQAg#v=onepage&q=portuguese%20proselytization%20in%20kerala&f=false, accessed on 01.07.2021

অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম

Chhatish Chandra Dhal. 'History of Mayurbhanj 1882-1949'. unpublished Ph.D. thesis submitted at Utkala University. 2006

Hitesranjan Sanyal. 'Temple Building Activities in Bengal: A Social Study From C.1450 to C.1900 A.D.. unpublished Ph.D. thesis submitted at the University of Calcutta. []

Kaberi Sanyal. 'Some Social Aspects of the Inscriptions of Bengal (C. 3rd Century B.C to C. 12th Century A.D)'. unpublished Ph.D. thesis submitted at the University of Burdwan. 1985

Konsam Manikchand Singh. 'The Social Institutions of the Meities'. unpublished Ph.D. thesis submitted at Gauhati University. 1984
Manotoshchandra Bhaumik. 'Kulinisim in Bengal'. Unpublished Ph.D. thesis submitted at the University of Calcutta. 1986
Narottam Kundu. 'Caste and Class in Pre-Muslim Bengal'. unpublished Ph.D. thesis submitted at University of London. 1963
Neha Chatterji. 'Sacred Calling. Worldly Bargain: Caste. Self-Cultivation and Mobilizattion in Late Colonial Bengal'. Unpublished Ph.D. thesis submitted at Jawaharlal Nehru University. 2017
Pragyan Choudhary. 'Caste Mobility and Social Transformation in Medieval India c. 9th to 16th century: Case Studies of Some Peasant Communities (Jats. Meos and Vellalas)'. unpublished Ph.D. thesis submitted at Jawaharlal Nehru University. 2009
Rabindranath Mandal. 'Vaishnavism and Vaishnavite Culture in Midnapore'. Unpublished Ph.D. Thesis submitted at Vidyasagar University. 2001
Ryosuke Furui. 'Rural Society and Social Networks in Early Bengal from the Fifth to the Thirteenth Century A.D.. unpublished Ph.D. thesis submitted at Jawaharlal Nehru University. 2007
S. Bebita Devi. 'The Advent of Caste: Emergence of Brahmans in Manipuri Society'. unpublished Ph.D. thesis submitted at Assam University. Silchar. 2013
Sekhar Bandyopadhyay. 'Social Mobility in Bengal in the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries'. unpublished Ph.D. thesis submitted at the University of Calcutta. 1985
Shirin Akhtar. 'The Role of Zamindars in Bengal (1707-1772)'. Unpublished Ph.D. Thesis submitted at the University of London. 1973
Sk. Salim. 'Administration of Bengal (1700-1757 A.D.)'. unpublished Ph.D. thesis submitted at University of Calcutta. 19969
Syed Ali Nadem Rezavi. 'Urban Middle Classes in Mughal India'. Unpublished Ph.D. thesis submitted at Aligarh Muslim University. 2006
Theodore Benke. 'The Sudracarasiromani of Krsna Sesa'. Unpublished Ph.D. thesis submitted at the University of Pennsylvania. 2010
চন্দ্রিমা সিনহা. 'ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় বাংলায় জাতি আন্দোলন ও বর্ণ সমাজের পুনর্বিন্যাস: মাহিষ্য ও সুবর্ণবণিক সমাজ'. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অপ্রকাশিত গবেষণাসন্দর্ভ. ২০১৩
পল্লবী হালদার. 'সীতারাম দাস বিরচিত ধর্মমঙ্গল: সবিমর্শ আলোচনা'. ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অপ্রকাশিত এম.ফিল গবেষণা সন্দর্ভ. ২০২০
সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়. 'হুগলী জেলায় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন ১৪৮৬-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ'. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অপ্রকাশিত পিএইচডি গবেষণা সন্দর্ভ. ১৯৯৯
স্বর্ণা. 'প্রাচীন ভারত মে স্বর্ণকার: এক অধ্যয়ন. পটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ. ২০১৮

সাক্ষাৎকার

Arpita Halder
8/7/2021

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত. আঞ্চলিক ইতিহাস বিশেষজ্ঞ. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার. ১৩.০৭.২০২০
জগন্নাথ দাশগুপ্ত. ধ্রুপদ শিল্পী. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার. ১৩.০৭.২০২০

অর্পিতা হালদার
09.07.2021